বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC - 2801

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচ এস সি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

h¡wm¡-cn E¾j š² ¢hn¢hcÉ¡mu

বাংলা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC - 2801

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচ এস সি প্রোগ্রাম)

সংকলন

ডীন
ওপেন স্কুল

ওপেন স্কুল

h¡wm¡-cn E¾j š² ¢hn¢hcÉ¡mu

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নাটক : সিরাজ-উ-দ্দৌলা	১-১২৭
বিরচন	
পত্রলিখন	১
প্রবন্ধ রচনা	৩০
ভাষণ ও প্রতিবেদন	৪৯
ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম	৫৫
ব্যাকরণ	
বাংলা ব্যাকরণ : প্রাথমিক কথা	১
বাংলা গদ্যরীতি : সাধু ও চলিত ভাষা	৮
ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি নিয়ম ও পরিচয়	১৯
ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান	২৪
সন্ধি	৩০
প্রকৃতি ও প্রত্যয়	৫৮
উপসর্গ	৬২
সমাস	৭১
পদ প্রকরণ	৯৫
ধাতু	১০৭
শব্দের ব্যবহার	১১৩
কারক ও বিভক্তি	১৩৩
বাক্য প্রকরণ	১৪৭
বাচ্য ও উক্তি পরিবর্তন	১৫৩
বিরাম চিহ্ন	১৬১
বানান পদ্ধতি	১৭৩
পরিভাষা	১৮৪

বাংলা

wØZxq cÎ

এইচ এস সি প্রোগ্রাম

কোর্স কোড : HSC - 2801

প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০০০

পুন: মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০

পুন: মুদ্রণ ২০১১

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 984-34-3037-9

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর - ১৭০৫

প্রচ্ছদ : কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কম্পিউটার কম্পোজ : মোঃ মামুন মিঞা, মোঃ আবুবকর সিদ্দিক

গ্রাফিকস্ : আবদুল মালেক

মুদ্রণ

বিজনেস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

১৪/১৫, পদ্মনিধি লেন

ঢাকা-১১০০।

আইকন বা প্রতীকগুলো কি বলছে ভাল করে জেনে নিন।

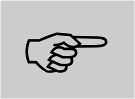

এখানে কিছু নির্দেশ আছে যেটি আপনি অনুসরণ করবেন।

পড়ুন

আরও যা পড়তে পারেন

শিক্ষার্থীদের প্রতি

এইচ এস সি প্রোগ্রামের বাংলা ২ বইটি প্রথম বছরের দ্বিতীয় ছয় মাসের পাঠ্য হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে। এতে উপন্যাস 'লাল সালু' স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বিরচন অংশে 'ভাষারীতি' ও প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কিত অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে।

আপনারা লক্ষ্য করবেন বইটি দূরশিক্ষণের উপযোগী করে মড্যুল পদ্ধতিতে রচনা করা হয়েছে। এইচ এস সি প্রোগ্রামের বাংলা-১ বইটি ও এ পদ্ধতিতে রচিত। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এস সি প্রোগ্রামের বাংলা বই রচনায় আমরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলাম। এখানে তারই কিছুটা বিকশিত রূপ লক্ষ্য করবেন। তবে মৌলিক বিষয়গুলো প্রায় অভিন্ন। এখানে ইউনিটের পরিকল্পনাটি লক্ষ্য করবেন। এ ইউনিটগুলো থেকে উপন্যাসের কাহিনীর গতিধারা বুঝতে চেষ্টা করবেন। পাঠগুলো থেকে কাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন। যেখানে যে নির্দেশ অথবা নির্দেশের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করবেন। পাঠোত্তর ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের যে উত্তরগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে- সেগুলো পড়ে বুঝবার চেষ্টা করবেন। যেগুলোর উত্তর লিখে দেওয়া হয়নি সেগুলো এ বইয়ের সাহায্য নিয়ে লিখতে পারবেন। নিজে লেখা এবং নিজের মত করে উত্তর তৈরি করা মোটেও কঠিন কাজ নয়।

'লালসালু' উপন্যাসটি যেহেতু গ্রামীণ জীবনকে অবলম্বন করে লেখা তাই এ উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ ও আঞ্চলিক ভাষারীতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শিষ্ট ভাষায় এগুলোর রূপ কেমন হবে তা জানার জন্য প্রচুর টীকা টিপ্পনী ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া বইটিতে ব্যাকরণের যে অংশগুলো আছে সেগুলো ভালভাবে পড়বেন।

ভাষারীতি ও প্রবাদ-প্রবচন অংশ দুটো ভাল করে পড়বেন। মানুষের পাঠের সীমানা নির্দিষ্ট নয় তবুও নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা ও পাঠক্রম অনুসরণ করতে হয়। এ সীমাবদ্ধতার মাঝে একটি একটি ক্ষুদ্র জানালা আমরা খুলে দিয়েছি - আরও যা পড়তে পারেন অংশে। এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু রচনা ও বইপত্রের নাম বলা হয়েছে। যেগুলো হাতের কাছে পেলে এবং সময় থাকলে পড়ে দেখতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এটি Further reading বা আরও কিছু পড়া ও জানার জন্য।

আইকন বা প্রতীকগুলো কি বলছে ভাল করে জেনে নিন।

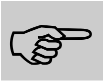

এখানে কিছু নির্দেশ আছে যেটি আপনি অনুসরণ করবেন।

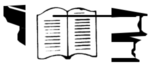

পড়ুন

আরও যা পড়তে পারেন

নাটক

সিরাজ-উ-দ্দৌলা

সিকান্‌দার আবু জাফর

ইউনিট ১

ভূমিকা

সাহিত্যের অন্যতম শাখা নাটক সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি অবহিত আছি। নাটক তুলনামূলকভাবে আধুনিক সাহিত্য শাখা। বাংলা নাটকের বয়স মোটামুটি দুশো বছর। মাধ্যমিক পর্যায়ে আপনারা নাটক পড়েছেন, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যসূচীতেও নাটক অন্তর্ভুক্ত আছে। এ পর্যায়ে আপনাদের পাঠ করতে হবে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) বিরচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' (রচনাকাল ঃ ১৯৫১, প্রকাশকাল : ১৯৬৫) নাটক। মূল নাটকে অনুপ্রবেশের পূর্বে নাটকের সংজ্ঞার্থ ও শিল্পরূপ, নাটকের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য, বাংলা নাটকের ইতিহাস, সিকান্দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্যসাধনা, সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটক সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। বর্তমান ইউনিটে আমরা উপরের বিষয়সমূহ অনুধাবনে সচেষ্ট হবো।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
২. নাটকের উপাদান, আঙ্গিক ও গঠনকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. নাটকের শ্রেণীবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করতে পারবেন;
৪. নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
৬. বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে পারবেন;
৭. সিকান্দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
৮. 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- নাটকের শিল্পরীতি আলোচনা করতে পারবেন।

মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

মূলপাঠ

নাটকের সংজ্ঞার্থ

যে-কোন শিল্প কর্মেরই সংজ্ঞার্থ প্রদান রীতিমতো দুরূহ বিষয়। কেননা, মহৎ সৃষ্টিশীল প্রতিভা কেবল পুরোনো সংজ্ঞানুবর্তিতায় আবদ্ধ থাকেন না, বরং সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি নতুন সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করেন। তবু বোঝার সুবিধার্থে আমরা সাহিত্যের সব শাখারই সংজ্ঞার্থ প্রদানের চেষ্টা করি। নাটকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হচ্ছে নাটক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক– সাহিত্যের এইসব বিচিত্র শাখার মধ্যে নাটক এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। দেখা ও শোনার যুগপৎ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে একটি প্রকৃত নাটক। অর্থাৎ নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। এই দুটি মৌল বিষয় নাটকের প্রধান শিল্প-বৈশিষ্ট্য হলেও, আমরা নাট্যগ্রন্থ পাঠ করেও সাহিত্য রস আস্বাদন করতে পারি।

সহজ কথায় আমরা নিম্নোক্তভাবে নাটককে সংজ্ঞায়িত করতে পারি– মঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন তা হয় নাটক। ইংরেজিতে বলা হয় "Drama is the creation and representation of life in terms of theater"

নাকট একটি সামবায়িক শিল্প। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক অভিনীত হবে এ উদ্দেশ্য নিয়েই নাট্যকার নাটক রচনা করেন। 'নাটক' শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এ সত্যের ইঙ্গিত। নট, নাট্য, নাটক এ তিনটি শব্দেরই মূল হলো নট্। আর নট্ এর অর্থ হলো নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা ইত্যাদি। নাটকের ইংরেজি প্রতিশব্দ Drama`-র মধ্যেও একই সত্য আমরা খুঁজে পাই। Drama শব্দের মূলে রয়েছে গ্রীক শব্দ Draein, যার অর্থ 'to-do` অর্থাৎ কিছু করা। নাটকের মধ্যে আমরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথাবার্তা এবং হাত-পা-মুখ-চোখ নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোন দিক বা ঘটনার অভিনয় দেখতে পাই। অভিনীত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের সৃষ্টি হলেও, কেবল পাঠ করেও আমরা নাটকের রস উপলব্ধি করতে পারি। তবে মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের মৌল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কাজেই নাট্যগ্রন্থ পাঠ করে যে আনন্দ লাভ, নাটকের শিল্পরূপ বিচারে তা মুখ্য নয়, গৌণ বিষয় মাত্র।

নাটকের শিল্পরীতি

সংজ্ঞার্থ থেকে জেনেছি, মানবজীবনের বিশেষ কোন ঘটনার সংলাপময় শিল্পরূপই নাটক। কিন্তু নাটক হয়ে উঠতে হলে নাট্যকারকে কয়েকটি জরুরি বিষয় মেনে চলতে হয়। এই জরুরি বিষয়গুলোকেই নাটকের শিল্পরীতি বলে। বস্তুত, এইসব শিল্পরীতি মেনে চলাই একটি সার্থক নাট্যকর্মের মৌল ভিত্তি। শিল্পরীতির এই বিষয়গুলো হলো– কর্ম বা ক্রিয়ার গতিবেগ (action) সংঘাত (conflict), আকস্মিকতা (unexpectedness), উৎকণ্ঠা (Suspense), নাট্যশ্লেষ (dramatic irony) ইত্যাদি।

নাটক জীবনের অনুকরণে নির্মিত হয়, তবে সেই জীবনকেই অনুকরণ করা হয় যে জীবন কর্মময়, গতিশীল, প্রগত এবং পরিবর্তমান। দর্শক শ্রোতার কৌতূহল এবং আগ্রহ ধরে রাখাই হচ্ছে গতিবেগ বা এ্যাকশনের মূল কথা। বস্তুত ক্রিয়া বা কর্মের গতিবেগই জীবনের আনন্দকে ধারণ করে। বিখ্যাত নাট্য সমালোচক শ্লেগেলে তাঁর Dramatic Literature গ্রন্থে লিখেছেন- 'Action is the true enjoyment of life, may, life itself' যা আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে, তাতেই আমরা আনন্দ পাই। গতি বা এ্যাকশনই আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করতে পারে। নাটকের এ্যাকশনে কেবল নড়াচড়া বা অগ্র-পশ্চাৎ গতি থাকলেই চলে না, তাতে অবস্থান্তর এবং পরিবর্তনশীলতাও থাকতে হবে।

নাটকের গতি প্রথমত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মঞ্চে আসা-যাওয়া এবং অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত নাট্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন– "অভিনেতা একভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বললে তা প্রায়ই একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। সেজন্য তাকে আসতে হয়, যেতে হয়, মঞ্চের মধ্যে নড়াচড়া করতে হয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষভাবে হাত, মুখ, চোখ ও ভ্রূযুগল সঞ্চালন করতে হয়। শুধু কেবল আঙ্গিক গতি নয়, বাচিক গতিও নাটকের পক্ষে প্রয়োজন। এজন্য অভিনেতার কণ্ঠস্বর কখনো উচ্চে এবং কখনো বা নিম্নে দ্রুত ও আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এইভাবে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের action আমাদের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের চিত্তকে কৌতূহলী ও উত্তেজিত করে রাখে।

পরিবেশের উপর নাটকের এ্যাকশন সম্পূর্ণত নির্ভরশীল। বিভিন্ন পরিবেশে এ্যাকশন ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। নাটকের গতি অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন। গতি বা এ্যাকশনের মাধ্যমে নাটকের এই অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন পথযাত্রা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাজনের সময় নাটকের গতিবেগ সাময়িকভাবে অদৃশ্য থাকে। কিন্তু নাট্যিক গতিতে তখনো আন্দোলিত হতে থাকে দর্শক মন। বস্তুত, গতির আসল উৎস হলো দর্শকের মনোজগৎ। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নাটকের ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ কারণে ঐতিহাসিক নাটকে যে ধরনের এ্যাকশন বা গতি ফুটিয়ে তোলা হয়, সামাজিক বা সাঙ্কেতিক নাটকে তা কার্যকর হতে পারে না।

গতিবেগ বা এ্যাকশন সৃষ্টির জন্য নাট্যকার প্রথমেই যে কৌশল অবলম্বন করেন, তার নাম conflict বা সংঘাত। সংঘাত নাটকের প্রাণ। নাটকে যদি সংঘাত সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে শিল্প হিসেবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নাটকে সংঘাত নানাভাবে দেখা দেয়। গ্রীক নাটকে আমরা দেখি দৈবশক্তি বা নিয়তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বেধেছে। কখনো কখনো নাটকে সংঘাত দেখা দেয় দু গুচ্ছ মানুষের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধই নাটকের প্রধান উপজীব্য। দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নাট্য সংঘাত সৃষ্টি হয়। বিপরীতধর্মী দুই গুচ্ছ মানুষের এক গুচ্ছ Good বা ভালোর প্রতীক, অন্য গুচ্ছ evil বা মন্দের প্রতীক। নাট্যসংঘাত যত তীব্র হয়, নাটক হিসেবে ততই তার সার্থকতা। সমালোচকের ভাষায় 'সেই নাটকের দ্বন্দ্বই নাটকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, যেখানে উভয় পক্ষই প্রায় সমান শক্তিশালী এবং নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পরস্পরবিরোধিতায় প্রবৃত্ত। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের নানা কারণ থাকতে পারে। উদ্দেশ্যের বৈপরীত্য, আদর্শের বিরোধিতা স্বার্থের বিরূপতা ইত্যাদি যে কোন প্রকার দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিশক্তির দ্বন্দ্বের ফলেও নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। অধিকাংশ নাটকেই আমরা এ ধরনের সংঘাতের সাক্ষাৎ পাই। সমাজনীতি ও যৌনচেতনার বিরোধ, সামাজিক ভেদাভেদের কারণে মতান্তর ও মনান্তর, বিবাহ ও ব্যক্তি অধিকারের সংঘাত, যন্ত্র ও জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ, সমাজবাদ ও ধনবাদের সংগ্রাম ইত্যাদি নানা কারণে আধুনিক নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হয়।

নাটকে অন্য এক ধরনের সংঘাত দেখা যায়। কোন বহিরঙ্গ কারণে নয়, বরং চরিত্র অভ্যন্তরেই এই সংঘাতের বীজ উপ্ত হয়। বস্তুত, এই দ্বন্দ্বই আধুনিক নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, সমাজ চেতনার সঙ্গে ব্যক্তি চেতনার, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, আদর্শের সঙ্গে আস্তবের, স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ব্যক্তি- অনুরাগের দ্বন্দ্ব চরিত্রের অভ্যন্তরে নিয়ত চলতে থাকে। চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের মূল সংঘাত। যে কোন ধরনের নাটকেই এই সংঘাত সৃষ্টি করতে হয়।

নাটকে এ্যাকশন বা গতিবেগ সৃষ্টি অপর কৌশল হচ্ছে ঘটনা ও চরিত্র সন্নিবেশে আকস্মিকতার আমদানি করা। রঙ্গ-মঞ্চের অপ্রকাশ্য তিন দিক থেকে চরিত্রের আগমন-নিগর্মন বিষয়ে দর্শকের কোন ধারণা থাকে না বলে, নাট্যকার এখানে আকস্মিকতা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন।

আকস্মিকতার মতো Suspense বা নাট্যোৎকণ্ঠাও নাটকের জন্য অপরিহার্য বিষয়। নাট্যোৎকণ্ঠার জন্যই দর্শক পুরো সময় গভীর বিস্ময় ও উত্তেজনা নিয়ে নাট্য অভিনয় উপভোগ করে থাকেন। নাটকে একটি উৎকণ্ঠা তৈরীর কিছুক্ষণ পর তার উত্তেজনা শেষ হয়ে যায়। অতঃপর পুনরায় নতুন পরিস্থিতির মাধ্যমে নতুন উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করা হয়। এভাবে সাসপেন্স বা উৎকণ্ঠা নাটককে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উৎকণ্ঠা আছে বলেই নাটকের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক শ্রোতার এক অদৃশ্য সেতুবন্ধ তৈরী হয়।

নাটকীয় এ্যাকশন বা গতিবেগ সৃষ্টির একটি বিশেষ উপায় হলো dramatic irony বা নাট্যশ্লেষ নির্মাণ। শ্লেষ অলঙ্কারে যেমন একটি শব্দের দ্বিবিধ অর্থ থাকে, নাট্যশ্লেষেও তেমনি ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে নাট্যকার সুকৌশলে দ্ব্যর্থতার সৃষ্টি করেন। নাট্যশ্লেষ দর্শকদের মনে কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বেদনা- এসব অনুভূতি উদ্রেক করতে পারে। তাই ট্রাজেডি, কমেডি বা যে কোন ধরনের নাটকেই আমরা নাট্যশ্লেষ লক্ষ করি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নাটকের সংজ্ঞার্থ দিন।
২. নাটকের প্রধান প্রধান শিল্পরীতি উল্লেখ করুন।
৩. নাটকীয় এ্যাকশন বা গতিবেগ বলতে কি বুঝেন?
৪. নাট্যসংঘাত কি?

৫. নাট্যোৎকণ্ঠা বলতে আপনি কি বুঝেন?

উত্তর

প্রশ্ন ঃ নাটকীয় এ্যাকশন বা গতিবেগ বলতে কি বুঝেন?

উত্তর ॥ নাটকে জীবনের অনুকরণ নির্মিত হয়, তবে সেই জীবনকেই অনুসরণ করা হয় যে-জীবন গতিশীল, প্রগত এবং পরিবর্তনমান। দর্শক-শ্রোতার কৌতূহল এবং আগ্রহ ধরে রাখাই হচ্ছে গতিবেগ বা এ্যাকশনের মূল কথা। বস্তুত, গতিবেগই জীবনের আনন্দকে ধারণ করে। বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক শ্লেগেল তাঁর 'Dramatic Literature গ্রন্থে লিখেছেন- 'Action is the true enjoyment of life, may, life itself. যা আমাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে, তাতেই আমরা আনন্দ পাই। গতি বা এ্যাকশনে কেবল নড়াচড়া বা অগ্র-পশ্চাৎ গতি থাকলেই চলে না, তাতে অবস্থান্তর এবং পরিবর্তনশীলতাও থাকতে হবে। নাটকের গতি প্রথমত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মঞ্চে আসা-যাওয়া এবং অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। পরিবেশের উপর নাটকের এ্যাকশন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে এ্যাকশন ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। নাটকের গতি অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন। গতি বা এ্যাকশনের মাধ্যমে নাটকের এই অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন পথযাত্রা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাজনের সময় নাটকের গতিবেগ সাময়িকভাবে অদৃশ্য থাকে। কিন্তু নাট্যিক গতিতে তখনো আন্দোলিত হতে থাকে দর্শক-মন। বস্তুত, গতির আসল উৎস হলো দর্শকের মনোজগৎ। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নাটকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ কারণে ঐতিহাসিক নাটকে যে ধরনের এ্যাকশন বা গতি ফুটিয়ে তোলা হয়, সামাজিক বা সাঙ্কেতিক নাটকে তা কার্যকর হতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ নাট্যসংঘাত কি?

উত্তর ॥ নাটকে গতিবেগ বা এ্যাকশন সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে (conflict) বা সংঘাত নির্মাণ। সংঘাত নাটকের প্রাণ। নাটকে যদি সংঘাত সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে শিল্প হিসেবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নাটকে সংঘাত নানাভাবে দেখা দেয়। গ্রীক নাটকে আমরা দেখি দৈবশক্তি বা নিয়তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বেধেছে। কখনো কখনো নাটকে সংঘাত দেখা দেয় দু গুচ্ছ মানুষের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধই নাটকের প্রধান উপজীব্য। দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের ক্রিয়া-ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নাট্যসংঘাত সৃষ্টি হয়। বিপরীতধর্মী দুই গুচ্ছ মানুষের একগুচ্ছ 'good` বা ভালোর প্রতীক। নাট্যসংঘাত যত তীব্র হয়, নাটক হিসেবে ততই তার সার্থকতা। সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিশক্তির দ্বন্দ্বের ফলেও নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। নাটকে অন্য এক ধরনের সংঘাত দেখা যায়। কোন বহিরঙ্গ কারণে নয়, বরং চরিত্র অভ্যন্তরেই এই সংঘাতের বীজ উপ্ত হয়। বস্তুত, এই দ্বন্দ্বই আধুনিক নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, সমাজচেতনার সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের স্বদেশ প্রেমের সঙ্গে ব্যক্তি অনুরাগের দ্বন্দ্ব চরিত্রের অভ্যন্তরে নিয়ত চলতে থাকে। চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের মূল সংঘাত। যে কোন ধরনের নাটকেই এই সংঘাত সৃষ্টি করতে হয়।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি

- নাটকের আঙ্গিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- নাটকের উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নাটকের আঙ্গিক ও উপাদান

আপনি ইতঃপূর্বেই জেনেছেন, মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে নাটক। বস্তুত, সাহিত্যের অন্য যে সব শাখা রয়েছে, সেখানেও মানবজীবনের নানা দিক রূপায়িত হয়। তাহলে নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্য শাখার মৌল পার্থক্য কোথায়? মূল পার্থক্য হলো, নাটকের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতার সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মানুষ একাকী যখন ও যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে পারে, কিন্তু নাটক উপভোগ করতে হয় নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে এবং সম্মিলিতভাবে। এ জন্যে অন্যান্য সাহিত্য শাখা থেকে নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিশেষ নিয়ম-নীতি দ্বারা সুনির্দিষ্ট।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে ১. কাহিনী বা বিষয়, ২. চরিত্র, ৩. সংলাপ, এবং ৪. পরিবেশ। একজন নাট্যকারকে নাটক রচনার সময় এ-চারটি উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়।

প্রতিটি নাটকে একটি নির্দিষ্ট কাহিনী থাকে। মানবজীবন মূল অবলম্বন হলেও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নাটকে উপস্থাপিত হয় না। জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে, নাটক নির্দিষ্ট একটি মঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হবে। তাই কাহিনীর মধ্যে এমন কিছু আনা যাবে না, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এ-ছাড়া, নাটকের অভিনয় সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে থাকে। তাই কাহিনী এতোটা বড় করা যায় না, যা অভিনীত হতে এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন নয়। এ কারণে একজন রাজা, একদল শ্রমজীবী মানুষ, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পথভ্রষ্ট এক তরুণের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে বসলে তার বা তাদের সব কথা নাটকে বলা যায় না, বলতে হয় নির্বাচিত কিছু কথা, যা দিয়েই গড়ে ওঠে নাটকের কাহিনী। এ ক্ষেত্রে টেলিভিশনের সিরিজ নাটকগুলোকে ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সিরিজ নাটকে বিশাল এবং বিস্তৃত জীব কাহিনী উপস্থাপন করা সম্ভব, কেননা নাটক সেখানে ৬০ থেকে ৯০ মিটিনের সময়সীমায় বন্দী নয়। ইচ্ছা করলেই অনেক কথা সেখানে নিয়ে আসা সম্ভব।

এ্যারিস্টটলের মতে, নাটকের উপাদানগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রেই গণ্য বৃত্ত বা plot. নাটকের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত হয়। এক একটি অঙ্কের মধ্যে নাটকীয় গতি এক একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীও যুক্ত হতে পারে। তবে মূল ঘটনাই যেন প্রাধান্য পায়, সেদিকে নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হয়।

কাহিনীকে সাজাতে হলে চরিত্রের প্রয়োজন। কারণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র ছাড়া নাটকের কাহিনী দাঁড়াবে কিভাবে? তাই নাট্যকারকে প্রথমেই কতিপয় চরিত্র নির্বাচন করতে হয়। নাটকে একটি প্রধান চরিত্র থাকে। প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করেই নাট্যঘটনা বিকশিত হয়। কিন্তু প্রধান চরিত্রতো একা একা কথা বলতে পারে না। তাই তার সঙ্গে সঙ্গে আসে আরও কিছু চরিত্র। এরা সবাই মিলে নাটকের কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। প্রত্যেক নাটকেই দু'গুচ্ছ চরিত্র থাকে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এবং বোঝেন, পৃথিবীর যে কোন সমস্যায় কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ বিশেষ একটি কাজকে সমর্থন করে, অন্যপক্ষ করে তার বিরোধিতা। এ দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনীতে চরিত্র বিকশিত হয়। ট্রাজেডির চরিত্র কেমন হবে সে সম্পর্কে এ্যারিস্টটল যা বলেছেন, তা মূলত সকল নাটকের চরিত্র সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তাঁর মতে, চরিত্রের থাকতে হবে নিম্নোক্ত গুণাবলি–

ক. নাটকের চরিত্রের মাঝে ভাল ও মন্দের সমাবেশ থাকবে;

খ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে যথাযথ;

গ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে বাস্তব;

ঘ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নাটকের মধ্যে অনেক চরিত্র থাকতে পারে, কিন্তু নাটকের গতি প্রধানত একটি কি দুটি প্রধান চরিত্রকে কেমন করে বিকশিত হয়। প্রধান চরিত্রের উপরই নাটকের সার্থকতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই প্রধান চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকারকে দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়।

কাহিনী আর চরিত্র তো পাওয়া গেল, এখনো কিন্তু নাটক হলো না। কারণ চরিত্রগুলো এখনো কথা বলতে পারছে না। কথা বলার জন্য চাই সংলাপ। সংলাপ কাহিনী ও চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনী বিকশিত হয়। বস্তুত সংলাপের মাধ্যমে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে–

ক. নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রমাণ করার জন্য সংলাপ;

খ. চরিত্রসমূহের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সংলাপ;

গ. নাটকের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংলাপ।

নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, সংলাপই মূলত নাটকের প্রাণ। সংলাপের মাধ্যমেই নাট্য পরিস্থিতি নির্মিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে, নাট্যরস ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। গল্প বা উপন্যাসে বর্ণনার অবকাশ আছে, সেখানে গল্পকার বা ঔপন্যাসিকও কথা বলতে পারেন। কিন্তু নাটকে সে সুযোগ থাকে না। নাট্যকারকে এখানে সংলাপের মাধ্যমেই সব কাজ করতে হয়। সংলাপের মাধ্যমেই যেহেতু নাট্যকাহিনী বিকশিত হয়, তাই সংলাপের ভাষা কেবল চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী হলেই চলে না। ভাষার মধ্য দিয়ে আবেগ দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা প্রভৃতিও ফুটিয়ে তুলতে হয়। সংলাপের ভাষা কেবল ভাব প্রকাশকই নয়, গতিসঞ্চারীতও। সেজন্য সংলাপের শব্দপ্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস, বিভিন্ন বাক্যের পারস্পরিক সংযোগ ইত্যাদিকেও নাট্যকারকে সতর্ক ও যত্নবান হতে হয়। সংলাপের ভাষা অবিকল বাস্তব হলে চলে না। সংলাপের ভাষা হলো শিল্পের ভাষা। তাই সংলাপের ভাষাকে একটু সাজিয়ে, বর্ণ ও সুরের সমাবেশে ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ প্রসঙ্গে এ্যারিস্টটলের অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন– "The perfection of Diction is for it to be at once clear and not mean" সাধারণ এবং অসাধারণ ভাষা ব্যবহারেই নাটকের সংলাপ নিখুঁত হয়ে ওঠে।

নাটকের সংলাপ কখনো গদ্য এবং কখনও বা পদ্যরীতি অবলম্বন করে। নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাট্যরসের দাবি অনুযায়ী উপরের যে কোন একটি রীতি সংলাপে ব্যবহৃত হয়। গ্রীক নাটকের ভাষায় পদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে, শেক্‌সপীয়ারের নাটকেও পদ্যরীতির ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু আধুনিক কালে আমরা নাটকের সংলাপে সাধারণত গদ্যভাষার ব্যবহার লক্ষ করি। তবে একালেও বিষয়ের প্রয়োজনে অনেক নাটকের সংলাপে পদ্যরীতির ব্যবহার লক্ষণীয়।

নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার পরিবেশ তৈরি করেন। নাচ, গান, শব্দ সংযোজন, আলোকবিন্যাস, কাহিনী অনুযায়ী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চনির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে নাটকের পরিবেশ নির্মাণ করা হয়। পরিবেশ যথাযথ না হলে নাটকের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন হয়। তাই পরিবেশ নির্মাণের প্রতি নাট্যকারকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। নাট্যকারের এমন কোন পরিবেশ নির্মাণ করা উচিত নয়, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা অসম্ভব।

উপরের চারটি উপাদান মিলেই গড়ে ওঠে একটি নাটক। প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, উপর্যুক্ত চারটি উপাদানের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বড় বা প্রধান/না, কোন উপাদানকেই প্রধান বলবো না- সবগুলো উপাদান মিলেই গড়ে ওঠে একটি নাটক- এটিই আমাদের জানার কথা। তবে এখানে জেনে রাখা ভালো, এক এক যুগে এক একটি উপাদান প্রধান হয়ে দেখা দেয়। সেদিক থেকে কাহিনী এবং চরিত্রের স্থানই উচ্চে। গ্রীক নাটকে কাহিনীর প্রাধান্য বেশি, পক্ষান্তরে শেক্সপীয়রের নাটকে দেখি চরিত্রের প্রাধান্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ‘নাটকের আঙ্গিক ও উপাদান’ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

২. নাটকের কাহিনী বা বিষয় বলতে আপনি কি বুঝেন?

৩. “নাটকের অন্যতম উপাদান চরিত্র”- কথাটির অর্থ কি?

৪. নাটকের সংলাপ কেমন হওয়া উচিত?

৫. ‘পরিবেশ’ বলতে কি বুঝেন?

উত্তর

প্রশ্ন ঃ নাটকের কাহিনী বা বিষয় বলতে আপনি কি বুঝেন?

উত্তর ॥ প্রতিটি নাটকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনী থাকে। মানবজীবন মূল অবলম্বন হলেও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নাটকে উপস্থাপিত হয় না। জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে, নাটক নির্দিষ্ট একটি মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হবে। তাই কাহিনীর মধ্যে এমন কিছু আনা যাবে না, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এ-ছাড়া, নাটকের অভিনয় সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের মধে শেষ হয়ে থাকে। তাই কাহিনী এতোটা বড় করা যায় না, যা অভিনীত হতে এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ কারণে একজন রাজা, একদল শ্রমজীবী মানুষ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পথভ্রষ্ট এক তরুণের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে বসলে তার বা তাদের সব কথা নাটকে বলা যায় না, বলতে হয় নির্বাচিত কিছু কথা, যা দিয়েই গড়ে ওঠে নাটকের কাহিনী। নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে কখনো কখনো উপকাহিনী যুক্ত হয়। উপকাহিনীরও একটি স্বতন্ত্র কাহিনীরূপ থাকে। উপকাহিনী যাতে মূল কাহিনীকে ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে নাট্যকারকে খুব সতর্ক থাকে হয়। নাটকের কাহিনী কতগুলো পর্বে বিন্যাস করতে হয়। এক একটি পর্ব এক একটি অঙ্কে বিন্যাস করা হয়। অঙ্কগুলো আবার কতগুলো দৃশ্যে বিভক্ত থাকে, কখনো বা এক অঙ্কেও নাটক রচিত হয়।

প্রশ্ন ঃ নাটকের সংলাপ কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর ॥ নাটকের কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টির প্রধান উপায় হল সংলাপ। সংলাপের মাধ্যমে যেমন কাহিনী ও চরিত্র বিকশিত হয়, তেমনি তার মাধ্যমে নাট্যকারের বক্তব্য ও জীবনার্থও প্রকাশিত হয়। সংলাপ কাহিনী ও চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনী বিকশিত হয়। বস্তুত, সংলাপের মাধ্যমে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে-

ক. নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রমাণ করার জন্য সংলাপ;

খ. চরিত্রসমূহের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সংলাপ;

গ. নাটকের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংলাপ।

নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, সংলাপই মূলত নাটকের প্রাণ। সংলাপের মাধ্যমেই নাট্য পরিস্থিতি নির্মিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে, নাট্যরস ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। ছোটগল্প বা উপন্যাসে বর্ণনার অবকাশ আছে, সেখানে গল্পকার বা ঔপন্যাসিকও কথা বলতে পারেন। কিন্তু নাটকে সে সুযোগ থাকে না। সংলাপের মাধ্যমেই সব উদ্দেশ্য এখানে সাধন করতে হয় নাট্যকারকে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- নাটকের গঠনকৌশল আলোচনা করতে পারবেন।
- নাটকের ত্রিমাত্রিক ঐক্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নাটকের পঞ্চ-সন্ধি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নাটকের গঠনকৌশল

নাটকের গঠনকৌশল নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন গ্রীক মনীষী এ্যারিস্টটল। প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলো পরীক্ষা করে নাটকের সংগঠন এবং শৈলী সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান ভিত্তি। এই ঐক্যত্রয় নিম্নরূপ–

১. কালের ঐক্য;

২. স্থানের ঐক্য;

৩. ঘটনার ঐক্য।

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি, নাটক যত সময় মঞ্চে অভিনীত হবে, সে সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটা সম্ভব, নাটকে কেবল তা-ই ঘটানো যাবে। অর্থাৎ ঘটনার বিশ্বস্ততা এবং মঞ্চ-যোগ্যতা নাট্যকারকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। কালের ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে এ্যারিস্টটল বলেছেন বা ২৪ ঘন্টার মধ্যে নাট্যকাহিনীকে সীমাবদ্ধ হতে হবে। তবে এ তত্ত্ব আধুনিক কালের নাটকে সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়।

স্থানের ঐক্য হলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাট্যচরিত্রসমূহ যতটা স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটাই দেখানো যাবে। এর চেয়ে বেশি স্থানান্তর নাটকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। নাটকে এমন কোন স্থানের উল্লেখ থাকতে পারবে না, যেখানে নাট্য নির্দেশিত সময়ের মধ্যে চরিত্রসমূহ যাতায়াত করতে পারে না।

ঘটনার ঐক্য হলো, নাটকে এমন কোন ঘটনা দেখানো যাবে না, যা মূল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এ্যারিস্টটলের মতে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট করে। ঘটনার ঐক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ লিখেছেন "নাটকে এমন কোন দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকিবে না, যাহাতে মূল সুর ব্যাহত হইতে পারে। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই ......।"

উপরের তিন ধরনের ঐক্যের মধ্যে এ্যারিস্টটল তাঁর On the Art of Poetry গ্রন্থে ঘটনার ঐক্যের উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, ঘটনার ঐক্যের প্রতি নাট্যকারকে খুবই মনোযোগী থাকতে হয়। আধুনিক কালে এই ত্রিমাত্রিক ঐক্যের সঙ্গে নতুন এক প্রকার ঐক্য আমরা কোন কোন নাটকে লক্ষ করি। একে বলা হয় চরিত্রের একত্ব বা Unity of charade। একটি মাত্র রিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাটকেই আমরা এই ঐক্য দেখতে পাই। এ ধরনের নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিনি পয়সার ভোজ', নরুল মোমেনের 'নেমেসিস', আব্দুল্লাহ আল মামুনের 'কোকিলারা', ইউজিন ও নীল-এর 'দি ব্রেক ফাস্ট', জাঁ ককতুর 'দি হিউম্যান ভয়েস' প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখ করতে পারি।

মূল নাট্যকাহিনীকে এ্যারিস্টটল আদি, মধ্য এবং অন্ত্য– এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। একই সঙ্গে ঐ তিনটি পর্যায়ের মধ্যে তিনি অখণ্ড সমন্বয়ের কথাও বলেছেন। নাট্যকাহিনী বিকাশের ক্রমকে অনুসরণ করেই আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্ব বিবেচনা করা হয়। খুব সংক্ষেপে এবং সহজে আমরা বলতে পারি– নাট্যসমস্যার উপস্থাপনা, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন এবং মূল সমস্যায় অনুপ্রবেশের পূর্বাবস্থা হলো আদি পর্যায়। মধ্য পর্যায়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং মূল সঙ্কটের একটি চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। অন্ত্য-পর্বে অতি দ্রুত কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। এ্যারিস্টটলের মতে, নাট্যকাহিনীর এই তিন পর্বের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

এখানে একটি কথা আপনার মনে রাখা প্রয়োজন, উপরের তিনটি ঐক্যের মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্য মেনে নিয়ে নাটক রচনা রীতিমতো দুরূহ কাজ। স্থান ও কালের ঐক্য মেনে চললে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই আধুনিক কালের নাটকে আপনি ঐ দু'ধরনের ঐক্য তেমন লক্ষ করবেন না। এমন কি উইলিয়ম শেক্সপীয়রও তাঁর নাটকে স্থান ও কালের ঐক্য সর্বদা মেনে চলেন নি। তবে ঘটনার ঐক্য নাটকের জন্য অনিবার্য শর্ত। ঘটনার ঐক্য বিনষ্ট হলে নাটক কিছুতেই সার্থক হবে না। এজন্য, পূর্বেই উল্লেখিত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে কাল, স্থান ও ঘটনার ঐক্যনীতি অনুসৃত হয় নি। ভবভূতির 'মহাবীর

চরিত্র' নাটকে আমরা বার বছরের কাহিনীধারা লক্ষ করি; অথচ কালের ঐক্যনীতিতে এ্যারিস্টটল বলেছেন, নাটকে কেবল চব্বিশ ঘন্টার কাহিনী দেখানো যাবে। মোটকথা, বিষয়ের প্রয়োজনেই নাট্যকারেরা নির্বাচন করে নেন, তাঁরা কতটুকু ও কোন মাত্রায় ত্রয়ী ঐক্যনীতি অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো, তাঁরা ঐক্যনীতি যেভাবে এবং যতটুকুই মেনে চলেন না কেন, দেখতে হবে মূল নাট্যরস যেন কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

একটি নাটকের গঠনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। এই পর্বগুলো নিম্নরূপ–

১. কাহিনীর আরম্ভ Exposition [মুখ],

২. কাহিনীর ক্রমব্যাপ্তি - Rising action [প্রতিমুখ]

৩. উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব climax [গর্ভ]

৪. গ্রন্থিমোচন Falling action [বিমর্ষ]

৫. যবনিকাপাত Conclusion বা Catastrophe

আপর্যুক্ত পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করেই রচিত হয় পঞ্চাঙ্ক নাটক। এক একটি পর্যায় নিয়ে লেখা হয় এক একটি অঙ্ক। এ্যারিস্টটলের মতে, পঞ্চাঙ্ক নাটকই হচ্ছে আদর্শ নাটক। নাটকের প্রথম অঙ্কে আখ্যানভাগের সূচনা এবং নাট্যিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে আখ্যানের জটিলতা এবং নাট্যদ্বন্দ্ব বিস্তার লাভ করে। তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত হয় ঘটনার ঘনীভূত অবস্থা এবং চরম নাট্যোৎকর্ষ। এখানেই নাট্যদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত রূপ বর্ণিত হয়। চতুর্থ অঙ্কে আস্তে আস্তে নাট্য-জটিলতার জট খুলতে থাকে। পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত হয় নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি বা উপসংহার। একটি পঞ্চাঙ্ক নাটকের কাহিনীধারা অনুসরণ করলে উপর্যুক্ত পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিভাজন অনুধাবন করা আপনার কাছে সহজ হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটক 'সাজাহান'-এর কাহিনীক্রম বিশ্লেষণ করতে পারি। 'সাজাহান' নাটকের অঙ্ক-বিভাজন নিম্নরূপ–

প্রথম অঙ্ক ঃ দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য সাজাহানের পুত্রদের মাঝে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমন করে বিজয়ী ঔরঙ্গজীব আগ্রায় প্রবেশ করে বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে বন্দী করেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ ঔরঙ্গজীব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মোরাদকে বন্দী করেন। পরাজিত দারা রাজপুতানার মরুভূমিতে সপরিবারে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। ঔরঙ্গজীব কর্তৃক সুজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ।

তৃতীয় অঙ্ক ঃ গুজরাটের সুবেদার সাহাবাজের দারার পক্ষ অবলম্বন। ঔরঙ্গজীব যশোবন্ত সিংহকে গুর্জরের সুবেদারির লোভ দেখিয়ে দারার পক্ষ থেকে সরিয়ে আনা।

চতুর্থ অঙ্ক ঃ পরাজিত ও ধৃত দারাকে ঔরঙ্গজীব কারাদণ্ড প্রদান করেন। জিহন খাঁ দারার ছিন্নমুণ্ড এনে ঔরঙ্গজীবকে উপহার প্রদান করেন।

পঞ্চম অঙ্ক ঃ দারার পুত্র সোলেমান বন্দী হলেন। সুজা আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দারার মৃত্যুতে সাজাহানের উম্মাদ অবস্থা। অনুতাপ দগ্ধ ঔরঙ্গজীব পিতা সাজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ পিতা মাতৃহীন পুত্রকে ক্ষমা করলেন এবং এভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

এ্যারিস্টটল পঞ্চাঙ্ক নাটকের কথা বললেও, আধুনিক কালে উপর্যুক্ত পাঁচটি পর্যায়, পাঁচের চেয়ে কম অঙ্কে ধারণ করেও নাটক রচিত হচ্ছে। আধুনিক নাট্যকারেরা তিন অঙ্কে নাটক রচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কখনো বা এক অঙ্কের পরিসরেই পাঁচটি পর্যায়কে ধারণ করে উৎকৃষ্ট নাটক লেখা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' এবং নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' নাটকের কথা বলতে পারি। এক অঙ্ক এবং এক দৃশ্যে রচিত হলেও উপর্যুক্ত নাট্যদ্বয়ে অদৃশ্য পঞ্চসন্ধি সহজেই নির্দেশ করা যায়।

নাটকের মূল লক্ষ্য হলো নাট্যকাহিনীর বিকাশ ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মাণ। এদিকে লক্ষ রেখেই নাট্যকার তাঁর নাটকের সংগঠন নির্মাণ করেন। অঙ্ক ভাগের গাণিতিক হিসেব দিয়ে জীবনের হিসেব সর্বদা মেলে না। তাই সৃজনশীর নাট্যকার প্রায়শই নতুন নতুন সংগঠন-শৈলী নির্মাণ করে নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ধারা অক্ষুণ্ন রাখেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে নাটকের গঠনকৌশল আলোচনা করুন।

২. নাটকের ত্রিমাত্রিক ঐক্য বলতে আপনি কি বুঝেন? আলোচনা করুন।

৩. নাটকের পঞ্চসন্ধি ব্যাখ্যা করুন।

৪. এ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী নাটকের ত্রয়ী পর্ব কি কি? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ নাটকের ত্রিমাত্রিক ঐক্য বলতে আপনি কি বুঝেন? আলোচনা করুন।

উত্তর ।। নাটকের ত্রিমাত্রিক ঐক্য নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন গ্রীক মনীষী এ্যারিস্টটল। প্রাচীন গ্রীক নাটকগুলো পরীক্ষা করে নাটকের সংগঠন এবং শৈলী সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান ভিত্তি। এই ঐক্যত্রয় নিম্নরূপ–

১. কালের ঐক্য বা,

২. স্থানের ঐক্য বা এবং

৩. ঘটনার ঐক্য বা।

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি, নাটক যত সময় মঞ্চে অভিনীত হবে, সে সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটা সম্ভব, নাটকে কেবল তা-ই ঘটানো যাবে। অর্থাৎ ঘটনার বিশ্বস্ততা এবং মঞ্চ যোগ্যতা নাট্যকারকে সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলতে হয়। কালের ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে এ্যারিস্টটল বলেছেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে নাট্যকাহিনীকে সীমাবদ্ধ হতে হবে। তবে এ-তত্ত্ব আধুনিক কালের নাটকে অনুসৃত হয় না বললেই চলে।

স্থানের ঐক্য হলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাট্যচরিত্রসমূহ যতটা স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটাই দেখানো যাবে। এর চেয়ে বেশি স্থানান্তর নাটকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। নাটকে এমন কোন স্থানের উল্লেখ থাকবে না, যেখানে নাট্য-নির্দেশিত সময়ের মধ্যে চরিত্রসমূহ যাতায়াত করতে পারে না।

ঘটনার ঐক্য হলো, নাটকে এমন কোনো ঘটনা দেখানো যাবে না, যা মুল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয বলে মনে হয়। এ্যারিস্টটলের মতে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট করে। ঘটনার ঐক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ লিখেছেন– "নাটকে এমন কোনো দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকিবে না, যাহাতে মূল সুর ব্যাহত হইতে পারে। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই ......।"

উপরের তিন ধরনের ঐক্যের মধ্যে এ্যারিস্টটলে তাঁর গ্রন্থে ঘটনার ঐক্যের উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তার মতে, ঘটনার ঐক্যের প্রতি নাট্যকারকে খুবই মনোযোগী থাকতে হয়। আধুনিক কালে এই ত্রিমাত্রিক ঐক্যের সঙ্গে নতুন এক প্রকার ঐক্য আমরা কোন কোন নাটকে লক্ষ করি। একে বলা হয় চরিত্রের একত্ব। একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাটকেই আমরা এই ঐক্য দেখতে পাই।

এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, উপরের তিনটি ঐক্যের মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্য মেনে নিয়ে নাটক রচনা রীতিমতো দুরূহ কাজ। স্থান ও কালের ঐক্য মেনে চললে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই আধুনিক কালের নাটকে এই দুই ধরনের ঐক্য তেমন লক্ষ করা যায় না। এমন কি উইলিয়ম শেক্সপীয়রও তাঁর নাটকে স্থান ও কালের ঐক্য সর্বদা মেনে চলেন নি। তবে ঘটনার ঐক্য নাটকের জন্য অনিবার্য শর্ত। ঘটনার ঐক্য বিনষ্ট হলে

নাটক কিছুতেই সার্থক হবে না। এজন্য, ঘটনার ঐক্যকেই এ্যারিস্টটল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করেছেন।

বিষয়ের প্রয়োজনেই নাট্যকারেরা নির্বাচন করে নেন, তাঁরা কতটুকু ও কোন মাত্রায় উপর্যুক্ত ত্রয়ী ঐক্যনীতি অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো, তাঁরা ত্রয়ী ঐক্যনীতি যেভাবে এবং যতটুকু মেনে চলেন না কেন, দেখতে হবে মূল নাট্যরস যেন কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

প্রশ্ন ঃ এ্যারিস্টটলের মতানুযায়ী নাটকের ত্রয়ী পর্ব কি কি? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ॥ মূল নাট্যকাহিনীকে এ্যারিস্টটল আদি, মধ্য এবং অন্ত্য এই তিন পর্বে বিভক্ত করেছেন। নাটকের কাহিনীকে তিনটি পর্বে বিভক্তির কথা বললেও, একই সঙ্গে ঐ তিন তিনটি পর্বে মধ্যে তিনি অখণ্ড সমন্বয়ের কথাও বলেছেন। নাট্যকাহিনী বিকাশের ক্রমকে অনুসরণ করেই আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্ব বিবেচনা করা হয়। খুব সংক্ষেপে এবং সহজে আমরা বলতে পারি– নাট্যসমস্যার উপস্থাপনা, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন এবং মূল সমস্যায় অনুপ্রবেশের পূর্বাবস্থা হলো আদি পর্যায়। মধ্য পর্যায়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘণীভূত হয়ে ওঠে এবং মূল সঙ্কটের একটি চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। অন্ত্য পর্বে অতি দ্রুত কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ্যারিস্টটলের মতে, নাট্যকাহিনীর তিনটি পর্বের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। তিনটি পর্বের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় ব্যাহত হলে নাটকের শৈল্পিক সিদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়। তিনটি পর্ব মিলিয়ে একটি জৈব-ঐক্য কাঠামো নির্মাণই একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের প্রধান কাজ বলে এ্যারিস্টটল মত প্রকাশ করেছেন।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- নাটকের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নাটকের শ্রেণীবিভাগ

আপনি নিশ্চয়ই অনেক নাটক দেখেছেন; কখনো রেডিওতে নাটক শুনেছেন, কখনো টেলিভিশনে নাটক উপভোগ করেছেন, কখনো বা বিশেষ কোন নাট্যগ্রন্থ পাঠ করেছেন। আপনার দেখা শোনা বা পাঠ করা সবগুলো নাটকই কি একই ধরনের? নিশ্চয়ই নয়। কোন নাটক দেখে আপনি হেসেছেন, কখনো কেঁদেছেন, কখনো পেয়েছেন আনন্দ, কখনো বা বেদনায় হয়েছেন বিমর্ষ। কোন কোন নাটকে আপনি সমাজের বিশেষ কোন ঘটনা বা চিত্র দেখেছেন; কোথাও বা দেখেছেন ঐতিহাসিক কোন চরিত্রের বিজয়কাহিনী কিংবা তার পতন ও পরাভবের ইতিহাস। এসব কারণে নাটককে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত করতে পারি। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেই নাটককে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি; আবার রসের বিচারে নাটককে ট্র্যাজেডি, কমেডি, ফার্স ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি। বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠির আলোকে নাটককে যে সব শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব, তার একটা ছক নিচে দেওয়া হলো–

মাপকাঠি	নাটকের শ্রেণীবিভাগ				
ভাব অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	ক্ল্যাসিকাল	রোমান্টিক	বাস্তববাদী	-	-
বিষয় অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	পৌরাণিক	ঐতিহাসিক	সামাজিক	চরিত্রমূলক	-

রস অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	ট্রাজেডি	কমেডি	মেলোড্রামা	ট্র্যাজিকমেডি	প্রহসন
উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	সমস্যামূলক	রূপকনাট্য	সাঙ্কেতিক	অভিব্যক্তিবাদী	অ্যাবসার্ড
রূপ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	লোকনাট্য	গীতিনাট্য	নৃত্যনাট্য	মহাকাব্যিক	পথনাটক
আয়তন অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	পাঁচ অঙ্কের নাটক	চার অঙ্কের নাটক	তিন অঙ্কের নাটক	দুই অঙ্কের নাটক	এক অঙ্কের নাটক

আপনি ইচ্ছা করলে আরো কিছু মাপকাঠি প্রয়োগ করে নাটককে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন। যেমন, প্রচারমাধ্যম বা অভিনয় স্থল অনুসারে আপনি নাটককে তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন– বেতার নাটক, টেলিভিশন নাটক, মঞ্চ নাটক ইত্যাদি।

উপরের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ট্র্যাজেডি নাটক সম্পর্কে এখানে বিস্তৃতভাবে আপনার জানা প্রয়োজন। কেননা, আপনার পাঠ্যসূচিভুক্ত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা একটি ট্র্যাজেডি নাটক। ট্র্যাজেডি হিসেবে 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' কতটুকু সার্থক, তা বিবেচনা করতে হলে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বে পরাভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারনত ট্র্যাজেডি বলা হয়। এ জাতীয় নাটকে নায়কের বিশেষ কোন মানস প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দেয়; কখনো বা দৈব এবং অদৃষ্ট পীড়িত হয়ে তাকে মেনে নিতে হয় করুণ পরিণতি। ট্র্যাজেডি নাটকের নায়ক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হন এবং অবশেষে তার জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ করুণ পরিণতির। গ্রীক মনীষী এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে লিখেছেন–

Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.

এ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার্থ থেকে ট্র্যাজেডি নাটকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা শনাক্ত করতে পারি–

১. ট্র্যাজেডি কোন গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিজাত কর্মের অনুকরণ। এ ধরনের নাটকের ঘটনা হবে সুগভীর ও পূর্ণ বয়ব।
২. ট্র্যাজেডিতে কোন সকর্মক জীবন ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়।
৩. ভাবগৌরবে, শব্দচয়নে এবং সঙ্গীত-সংযোগে ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ প্রসাধিত হয়।
৪. নাটকীয়, বিচিত্র ঘটনাধারা হবে একক পরিণামমুখী (unity of action)।
৫. ট্র্যাজেডি ঘটনাত্মক, বর্ণনাত্মক কাহিনী নয়।
৬. ট্র্যাজেডি দর্শনে দর্শকচিত্তে করুণা ও ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং অন্তিমে এর নিরসন (Purgation) ঘটে।

ট্র্যাজেডি মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করে দর্শকচিত্ত করুণা ও ভীতিতে পূর্ণ করে দেয়। এখানে মানবজীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা ও অসহায়তার কথা ফুটে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিই জীবনের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা বীতস্পৃহার পরিচয়ব্যঞ্জক নয়। ট্র্যাজেডি দর্শনে মানুষ তার সম্ভাবনার কথা জানতে পারে। তাই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা থাকলেও, ট্র্যাজেডি দেখে মানুষ আনন্দ পায়।

নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ

খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রীস দেশে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রীসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষেও সংস্কৃত নাটক খুব সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। আদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিখ্যাত নাটক ও তাঁর রচয়িতাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

নাট্যকার	সময়কাল	দেশ	প্রধান নাটকের নাম

ইসকাইলাস	খ্রি.পূ. ৫২৫-খ্রি.পূ. ৪৫৬	গ্রীস	প্রমিথিউস বাউন্ড
সফোক্লিস	খ্রি.পূ.৪৯৬-খ্রি.পূ. ৪০৬	গ্রীস	দি কিং ইডিপাস
ইউরিপিডিস	খ্রি.পূ.৪৮৪-খ্রি.পূ.৪০৬	গ্রীস	ইলেকট্রা
এ্যারিস্টোফেনিস	খ্রি.পূ.৪৪৮-খ্রি.পূ.৩৪৮	গ্রীস	দি ফ্রগস্
সেনেকা	খ্রি.পূ.৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দ	ইতালি	ফিয়েড্রা
ভবভূতি	খ্রিস্টীয় ২য় শতক	ভারত	স্বপ্ন-বাসবদত্তা
কালিদাস	খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক	ভারত	অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্
শূদ্রক	খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক	ভারত	মৃচ্ছকটিকম্
শেক্সপীয়র	১৫৬৪-১৬১৬	ইংল্যান্ড	হ্যামলেট, ম্যাকবেথ
মলিয়ের	১৬২২-১৬৭৩	ফ্রান্স	লে বুর্জোয়া
রাসিন	১৬৩৯-১৬৯৯	ফ্রান্স	এ্যান্ডোমেকি
গ্যেটে	১৭৪৯-১৮৩২	জার্মানি	ফাউস্ট
ইবসেন	১৮২৮-১৯০৬	নরওয়ে	দি ডলস্ হাউস
স্ট্রীন্ডবার্গ	১৮৪৯-১৯১২	সুইডেন	দি ড্রিম প্লে
অস্কার ওয়াইল্ড	১৮৫৬-১৯০০	ইংল্যান্ড	সালোমি
বার্ণার্ড শ’	১৮৫৬-১৯৫০	ইংল্যান্ড	ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান
চেখভ	১৮৬০-১৯০৪	রাশিয়া	দি চেরি অরচার্ড
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১-১৯৪১	ভারতবর্ষ	বিসর্জন, রক্তকরবী
ইউজিন ও’নীল	১৮৮৮-১৯৩৫	আমেরিকা	দি এম্পেয়ার জোনস্
লোরকা	১৮৯৮-১৯৩৬	স্পেন	ব্লাড ওয়েডিং
ব্রেষ্ট	১৮৯৮-১৯৫৬	জার্মানি	মাদার কারেজ
বুদ্ধদেব বসু	১৯০৮-১৯৭৪	ভারতবর্ষ	তপস্বী ও তরঙ্গিনী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	১৯২২-১৯৭১	বাংলাদেশ	তরঙ্গ-ভঙ্গ

উপরের তালিকা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাটকের বিকাশ ও প্রধান প্রধান নাট্যকার সম্পর্কে আপনি ধারণা লাভ করতে পারবেন। উপর্যুক্ত তালিকার বাইরে আলো অনেক নাট্যকার আছেন। কিন্তু পরিসরের কথা বিবেচনা করে আমরা তাঁদের কথা উল্লেখ করিনি। আপনি মনে করলে, এই তালিকার সঙ্গে আরো কিছু নাম যুক্ত করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নাটকের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

২. বিষয় অনুসারে নাটককে কয়ভাগে বিভক্ত করা যায়? বিভাগগুলোর পরিচয় দিন।

৩. নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৪. ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ প্রদান করুন। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের ধারণার পরিচয় দিন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ বিষয় অনুসারে নাটককে কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়? বিভাগগুলোর পরিচয় দিন।

উত্তর ॥ বিভিন্ন মাপকাঠির আলোকে নাটককে নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। বিষয় অনুসারে আমরা নাটককে প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। এই বিভাগগুলো নিম্নরূপ–

১. পৌরাণিক নাটক

২. ঐতিহাসিক নাটক

৩. সামাজিক নাটক

৪. চরিতমূলক নাটক

পৌরাণিক নাটক ঃ পৌরাণিক কোন কাহিনী বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে যখন কোন নাটক রচিত হয়, তখন তাকে পৌরাণিক নাটক বলে। রামায়ন, মহাভারত, ভাগবত পুরাণ বা অন্য কোন ধর্মমূলক কাহিনী অবলম্বনে পৌরাণিক নাটক লিখিত হয়। পৌরাণিক কোন কাহিনী বা চরিত্রকে সমকালীন জীবন ও চিন্তার সঙ্গে একাত্ম করার মধ্যেই এ ধরনের নাটকের সার্থকতা নিহিত। Byron এর The Four P'S গিরিশচন্দ্রের 'জনা', অমৃতলালের 'হরিশচন্দ্র', দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা, মন্মথ রায়ের 'কারাগার ইত্যাদি পৌরাণিক নাটকের উদাহরণ।

ঐতিহাসিক নাটক ঃ অতীতের কোন ঘটনা বা ইতিহাসের কোন চরিত্র অবলম্বনে যখন নাটক লিখিত হয়, তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলে। এ ধরনের নাটকে নাট্যকারকে ঐতিহাসিক সত্য অক্ষুণ্ন রাখতে হয়, তবে নাটকের প্রয়োজনে তিনি একাধিক কল্পিত চরিত্র বা ঘটনার অবতারণা করতে পারেন। ঐতিহাসিক ঘটনাকে বর্তমানের মানবভাগ্যের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়ার মধ্যেই এ জাতীয় নাটকের সার্থকতা নিহিত। শেক্সপীয়রের Henry IV দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা', সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকের উদাহরণ।

সামাজিক নাটক ঃ সমাজের কোন সমস্যা নিয়ে রচিত নাটককে সামাজিক নাটক বলা হয়। সামাজিক নাটকে সমাজের মৌল প্রবণতা এবং নানা অনুষদের প্রতি নাট্যকারকে সতর্ক থাকতে হয়। এ ধরনের নাটকে সমাজের দুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দেয়- পরিণতিতে অশুভ পতন দেখানো হয়। বার্ণার্ড শ'র Heart-break House দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ, নুরুল মোমেনের 'রূপান্তর' প্রভৃতি সামাজিক নাটকের উদাহরণ।

চরিতমূলক নাটক ঃ বিশেষ কোন ব্যক্তিত্বের চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখা হয় চরিতমূলক নাটক। চরিত্রমূলক নাটকে যে ব্যক্তিত্বের জীবন নিয়ে নাটক লেখা হয়, নাট্যকার তার জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কিছু কল্পনারও আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তবে এ ব্যাপারে নাট্যকারকে খুবই সচেতন থাকতে হয়, যেন কল্পনার অংশটুকু বিশেষ ব্যক্তিত্বকে বিবর্ণ না করে। বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর', মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল' প্রভৃতি চরিতমূলক নাটকের উদাহরণ।

প্রশ্ন ঃ ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ প্রদান করুন। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে এ্যারিস্টটলের ধারণার পরিচয় দিন।

উত্তর ॥ অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বে পরাভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারনত ট্র্যাজেডি বলা হয়। এ জাতীয় নাটকে নায়কের বিশেষ কোন মানস প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দেয়; কখনো বা দৈব এবং অদৃষ্ট পীড়িত হয়ে তাকে মেনে নিতে হয় করুণ পরিণতি। ট্র্যাজেডির নায়ক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হন এবং অবশেষে তার জীবনে আসে ভয়াবহ করুণ পরিণতি। গ্রীক মনীষী এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে লিখেছেন-

Tragedy, then, is and imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate

parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার্থ থেকে ট্রাজেডি নাটকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ আমরা শনাক্ত করতে পারি-

১. ট্র্যাজেডি কোন গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিজাত কর্মের অনুকরণ। এ ধরনের নাটকের ঘটনা হবে সুগভীর ও পূর্ণাবয়ব।

২. ট্র্যাজেডিতে কোন সকর্মক জীবন ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়।

৩. ভাবগৌরবে, শব্দচয়নে এবং সঙ্গীত সংযোগে ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ প্রসাধিত হয়।

৪. নাটকীয় বিভিন্ন ঘটনাধারা হবে একক পরিণামমুখী।

৫. ট্র্যাজেডি ঘটনাত্মক, বর্ণনাত্মক কাহিনী নয়।

৬. ট্র্যাজেডি দর্শনে দর্শকচিত্তে করুণা ও ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং অন্তিমে এর নিরসন ঘটে।

ট্র্যাজেডি নাটক মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করে দর্শকচিত্ত করুণা ও ভীতিতে পূর্ণ করে দেয়। এখানে মানবজীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা ও অসহায়তার কথা ফুটে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিই জীবনের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা বীতস্পৃহার পরিচয় ব্যঞ্জক নয়। ট্র্যাজেডি দর্শনে মানুষ তার সম্ভাবনার কথা জানতে পারে। তাই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা থাকলেও, ট্র্যাজেডি দেখে মানুষ আনন্দ পায়।

এ্যারিস্টটলের মতে, মানুষের জীবনের কর্মের যে বহুমাত্রিক অনুকরণ হয়ে থাকে, ট্র্যাজেডিই হচ্ছে সেক্ষেত্রে সর্বোত্তম। কারণ এখানে অভিজাত মানুষের মহৎ কোন কর্মের অনুকরণ করা হয়। ট্র্যাজেডি দর্শনে মানুষ বাস্তবের সব সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে পরাজয় ও বেদনার এক অপরূপ অর্থ ব্যঞ্জনায় পরম আশ্বাস লাভ করে। এ্যারিস্টটলের এই অভিমত ব্যাখ্যাসূত্রেই বিখ্যাত সমালোচক Lucas বলেছেন–

The great tragic writer says 'yea` to life in every fibre of his being, however terrible, grim of ghastly it may appear.

এ্যারিস্টটলের মতে, আত্ম বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে ট্র্যাজেডি দর্শনকালে আমাদের অর্থাৎ দর্শকের নবজন্ম ঘটে। নায়কের সংগ্রাম আর সাহসিকতার মধ্যে দর্শক আপন সংগ্রামশীল সত্তাকে আবিস্কার করতে পারে।

ট্র্যাজেডি নাটকের মধ্যে এ্যারিস্টটল ছয় প্রকার উপাদানের কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে– প্লট, চরিত্র, চিন্তা, সংলাপ, দৃশ্যসজ্জা এবং সঙ্গীত। তাঁর মতে, যে কোন ট্র্যাজেডি নাটকেই এই ছয়টি উপাদান পাওয়া যাবে। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি বর্তমান কালের জন্য প্রযোজ্য হলেও, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। সঙ্গীত ট্র্যাজেডি নাটকে ব্যবহৃত হলেও, সর্বক্ষেত্রে যে তা সত্য এমন কথা বলা যাবে না। এ্যারিস্টটল যে কটি গ্রীক নাটক দেখে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সেগুলোতে কোরাস বা সঙ্গীত ছিল বলে তিনি সঙ্গীতকে ট্র্যাজেডির উপাদান হিসেবে কল্পনা করেছে।

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- বাংলা নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- তালিকার মাধ্যমে বাংলা নাটকের ইতিহাস উপস্থাপন করতে পারবেন।
- তালিকার সাহায্যে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে দুশো বছর পূর্বে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতার বেঙ্গলি থিয়েটার-এ মঞ্চস্থ হয় প্রথম বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। এটি কোন মৌলিক নাটক নয়, অনুবাদ নাটক। রুশদেশীয় যুবক গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লেবেদেফ ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে লেখেন 'কাল্পনিক সংবদল'। এ সময় লেবেদেফ 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' নামে আরও একটি কৌতুক নাটক অনুবাদ করেন। এ নাটকটিও কলকাতার বেঙ্গলি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। নাটকদ্বয় বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে লেবেদেফ পন্ডিত গোলকনাথ দাসের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৯৫ সালে রুশীয় যুবক লেবেদেফের এই সাহসী উদ্যমের পর ধীরে ধীরে বাংলা নাটক বিকশিত হতে আরম্ভ করে।

এখানে একটি কথা আপনি মনে রাখবেন– ১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাটকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নানা শাখায় বিপুল পরিমাণ নাট্য উপাদান বহু পূর্ব থেকেই বিরাজমান ছিল। মঙ্গলকাব্য, লোকসঙ্গীত, পালাগান, গাজীর গান, কবিগান, গম্ভীরা গান, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতির মধ্যে বাংলা নাটকের নানা উপাদান পাওয়া যায়। লোকনাটকের অন্যতম উপাদান নৃত্য এবং গীতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের এসব নিদর্শনে। কালক্রমে এসব উপাদান থেকেই আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটেছে।

১৮৫২ সালে রচিত তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' কেই বাংলাভাষা প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর দীর্ঘ দেড়শত বছরে বাংলা নাটক নানাভাবে বিচিত্র মাত্রায় বিকশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বহু নাটক। বাংলা নাটকের এই বিকাশধারাকে আমরা নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করতে পারি–

ক. সামাজিক নাটক

খ. ঐতিহাসিক নাটক

গ. পৌরাণিক নাটক

ঘ. রূপক সাঙ্কেতিক নাটক

ঙ. প্রহসন ও কৌতুক নাটক

চ. গণনাট্যধারা

ছ. কাব্যনাটক।

সামাজিক নাটকের ধারায় উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের নাম তাঁদের প্রধান রচনার নামসহ নিচে উল্লেখ করা হলো–

নাট্যকার	নাটক
রামনারায়ন তর্করত্ন	কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ, সধবার একাদশী
মীর মশাররফ হোসেন	জমীদারদর্পণ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	অলীক বাবু
অমৃতলাল বসু	ব্যাপিকা বিদায়
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	প্রফুল্ল
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	পুনর্জন্ম

উপর্যুক্ত তালিকা ছাড়াও আরও অনেক নাট্যকারের সাধনায় বিকশিত হয়েছে বাংলা সামাজিক নাটকের ধারা। কিন্তু আমরা সকলের নাম উল্লেখ করিনি। বলাই বাহুল্য উপরের তালিকাটি একটি নমুনা মাত্র।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় প্রধান নাট্যকারদের নাম তাঁদের প্রধান রচনার নামসহ নিচে উল্লেখ করা হলো–

নাট্যকার	নাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সিরাজদ্দৌলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রায়শ্চিত্ত
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, নূরজাহান
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	সিরাজদ্দৌলা, গৈরিক পতাকা
মহেন্দ্র গুপ্ত	টিপু সুলতান, মহারাজা নন্দকুমার

পৌরাণিক নাটক রচনায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁরা হচ্ছেন– গিরিশচন্দ্র ঘোষ ('বিলমঙ্গল, 'জনা'), অমৃতলাল বসু(হরিশচন্দ্র), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ('সীতা'), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (নর-নারায়ণ'), মন্মথ রায় ('কারাগার') প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একক সাধনায় গড়ে উঠেছে বাংলা রূপক সাঙ্কেতিক নাটকের ধারা। এই পর্যায়ে তাঁর 'অচলায়তন', মুক্তধারা', ডাকঘর, 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকের নামোল্লেখ করা যায়। সাম্প্রতিককালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'জয়হিন্দ বা সোনার স্বপন' সাঙ্কেতিক নাটক হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

বাংলা প্রহসন ও কৌতুক নাটক রচনায় যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, গ্রন্থনামসহ তাঁদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

নাট্যকার	নাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ
দীনবন্ধু মিত্র	কমলে কামিনী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কিঞ্চিৎ জলযোগ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	কল্কি-অবতার, বিরহ
অমৃতলাল বসু	তাজ্জব ব্যাপার
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	আলিবাবা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলা গণনাট্যধারার সূত্রপাত। সাধারণ মানুষকে প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই ধরনের নাটক লেখার মৌল উদ্দেশ্য। এ পর্যায়ে প্রধান নাট্যকারেরা হচ্ছে বিজন ভট্টাচার্য ('নবান্ন', 'আগুন', জবানবন্দী), বিনয় ঘোষ ('ল্যাবরেটরি'), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ('হোমিওপ্যাথি), সুনীল চট্টোপাধ্যায় ('কেরানী'), বিধায়ক ভট্টাচার্য ('আঁঠার পথে'), তুলসী লাহিড়ী ('ছেঁড়াতার) প্রমুখ।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় কাব্যনাটকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কাব্যনাটক রচনায় যাঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো–

নাট্যকার	কাব্যনাটক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, কর্ণকুন্তীসংবাদ, মুক্তধারা, রক্তকরবী, ডাকঘর, রথের রশি
আলোক সরকার	মায়াকাননের ফুল, সিঁড়ি
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	উত্তরমেঘ, শেষ প্রহর

বুদ্ধদেব বসু	তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কালসন্ধ্যা, প্রথম পার্থ, অনাম্নী অঙ্গনা, সংক্রান্তি

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান রচনার নাম প্রকাশকালসহ একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি। বলাই বাহুল্য, এ-ছক একটা নমুনা মাত্র। তবে এ ছকের সাহায্যে বাংলা নাটক সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন—

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
তারাচাঁদ শিকদার	ভদ্রার্জ্জুন	১৮৫২
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্তিবিলাস নাটক	১৮৫২
হরচন্দ্র ঘোষ	ভানুমতি চিত্ত বিলাস	১৮৫৩
রামনারায়ণ তর্করত্ন	কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক	১৮৫৪
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী নাটক	১৮৬০
	একেই কি বলে সভ্যতা	১৮৬০
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পন	১৮৬০
	সধবার একাদশী	১৮৬০
মনোমোহন বসু	সতী	১৮৭৩
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী নাটক	১৮৭৩
	জমীদার-দর্পণ	১৮৭৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	পুরুবিক্রম	১৮৭৪
অমৃতলাল বসু	তাজ্জব ব্যাপার	১৮৯৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	প্রফুল্ল	১৮৮৯
	জনা	১৮৯৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	নূরজাহান	১৯০৮
	সাজাহান	১৯০৯
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	প্রতাপাদিত্য	১৯০৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন	১৮৯০
	ডাকঘর	১৯১১
	মুক্তধারা	১৯২১
	রক্তকরবী	১৯২৬
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	সিরাজউদ্দৌলা	১৯৩৮
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন	১৯৪৪
তুলসী লাহিড়ী	ছেঁড়াতার	১৯৫১
উৎপল দত্ত	কল্লোল	১৯৬৮
বাদল সরকার	এবং ইন্দ্রজিৎ	১৯৬৫

বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উপরের আলোচনা থেকে আপনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম জানতে পেরেছেন। লক্ষ করেছেন উপরের আলোচনায় বাংলাদেশের নাট্যকারদের নাম নেই। বাংলাদেশের নাট্যকারদের অবদান স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যেই আমরা উপরের আলোচনায় তাঁদের নাম উল্লেখ করিনি। এবার আমরা বাংলাদেমের নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান নাটকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরবো। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পূর্বে বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে আমাদের এ অঞ্চলে নাটক তেমন বিকশিত হয়নি। দেশবিভাগের পর থেকেই পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে নাটক রচনায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর নাটক রচনা ও নাট্যচর্চায় ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। এ সময় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের নাটকে লাগে পালা বদলের হাওয়া। প্রাক,-স্বাধীনতা পর্বের মৌসুমী নাট্যচর্চার পরিবর্তে নাট্যকর্মীরা নিয়মিত নাটক-মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন, নাট্যকর্মীরা নাটককে গ্রহণ করলেন সমাজবদলের হাতিয়ার হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে নাটক হয়ে উঠলো একটি নিয়মিত শিল্পমাধ্যম। স্বাধীনতার মূল্যচেতনাকে অর্থবহ করার আন্তর গরজে নাট্যকর্মী ও নাট্যকাররা এগিয়ে এলেন নতুন উদ্যমে এবং এভাবেই বাংলাদেশের নাটক অর্জন করলো নতুন মাত্রা। শতাব্দী বহমান নাট্য ঐতিহ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজমানসকে আর প্রতিনিধিত্ব করতে পারলো না; ফলে দেশ কালের দাবিতেই রচিত হলো নতুন নাটক, আবির্ভূত হলেন নতুন নাট্যকার। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত আর রূপকথার মোহান্ধতার পরিবর্তে বাংলাদেশের নাটকের প্রধান বিষয় হয়ে উঠলো মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজমানস। সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন কোনো বিষয় নাটককে আর স্থান পেল না, সমাজবিভক্তি নাট্যযুগের ঘটলো অবসান।

১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশে প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে। এই পর্বে বাংলাদেশের প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের নাম নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
আকবরউদ্দিন	সিন্ধু-বিজয়	১৯৩০
	সুলতান মাহমুদ	১৯৩০
	নাদির শাহ	১৯৫৩
শাহাদাৎ হোসেন	সরফরাজ খাঁ	১৯২১
	আনারকলি	১৯৪৫
	মসনদের মোহ	১৯৪৬
ইব্রাহীম খাঁ	কামালপাশা	১৯২৮
	আনোয়ার পাশা	১৯৩২
ইব্রাহিম খলিল	স্পেন বিজয়ী মুসা	১৯৪৯
শওকত ওসমান	তস্কর ও লস্কর	১৯৪৫
	কাঁকরমণি	১৯৪৯

১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটকের পাশাপাশি সামাজিক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৭ থেকে প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধ কালখন্ডে যাঁরা নাটক লিখেছেন, তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো–

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
নুরুল মোমেন	নেমেসিস	১৯৪৮
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর	১৯৬২
	কবর	১৯৬৬

	চিঠি	১৯৬৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	বহিপীর	১৯৬০
	তরঙ্গভঙ্গ	১৯৬৫
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজ-উ-দ্দৌলা	১৯৬৫
	মহাকবি আলাউল	১৯৬৬
সাঈদ আহমদ	কালবেলা	১৯৭৬
	মাইলপোস্ট	১৯৭৬
	তৃষ্ণায়	১৯৭৬
আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা	১৯৫২
	অগ্নিগিরি	১৯৫৯
জিয়া হায়দার	শুভ্রা সুন্দরী কল্যাণী আনন্দ	১৯৭০

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ উত্তর কালে বাংলাদেমের নাটকে যে নবতরঙ্গের সূত্রপাত ঘটে, সে কথা পূর্বেই আপনি জেনেছেন। এই সময়ে বাংলাদেমের নাট্যসাহিত্যকে প্রধান পাঁচটি শাখায় বিন্যস্ত করা যায়। নাট্যকার ও তাঁদের প্রদান প্রধান নাটকের নাম আমরা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করছি–

মুক্তিযুদ্ধের নাটক ঃ মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যাঁরা নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন– মমতাজউদদীন আহমদ– ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’ (১৯৭৬), ‘বকুলপুরের স্বাধীনতা’ (১৯৮৬), বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল’ (১৯৮৫); জিয়া হায়দার– ‘সাদা গোলাপে আগুন’ (১৯৮২), ‘পঙ্কজ বিভাস’ (১৯৮২); আলাউদ্দিন আল আজাদ– ‘নিঃশব্দ যাত্রা’ (১৯৭২), ‘নরকে লাল গোলাপ’ (১৯৭৪); মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ– ‘কিংশুক যে মরুতে’ (১৯৭৪); নীলিমা ইব্রাহিম– ‘হে জনতা আরেক বার’ (১৯৭৪) প্রমুখ। উপর্যুক্ত নাটকসমূহে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের নানা খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে– কখনো আবেগী ভাষ্যে, কখনো বা শিল্পিত পরিচর্যায়।

প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের নাটক ঃ প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ চেতনাই বাংলাদেশের নাটকের প্রধান প্রবণতা। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হচ্ছে– মামুনুর রশীদের ‘ওরা কদম আলী’ (১৯৭৮), ‘ইবলিস’ (১৯৮২), ‘এখানে নোঙর’ (১৯৮৪), ‘গিনিপিগ’ (১৯৮৬); আবদুল্লাহ আল মামুনের ‘শপথ’ (১৯৭৮), সেনাপতি’ (১৯৮০), এখনও ক্রীতদাস’ (১৯৮৪); মমতাজউদ্দীন আহমদের ‘সাতঘাটের কানাকড়ি’ (১৯৯১); সেলিম আল দীনের ‘করিম বাওয়ালীর শত্রু বা মূল মুখ দেখা’ (১৯৭৩), কিত্তনখোলা (১৯৮৬); রাজীব হুমায়ুনের ‘নীলপানিয়া’ (১৯৯২); আবদুল মতিন খানের ‘মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব; (১৯৮০); এস.এম সোলায়মানের ‘ইঙ্গিত’ (১৯৮৫) ‘এই দেশে এই বেশে’ (১৯৮৮) ইত্যাদি।

ইতিহাস-ঐতিহ্য পুরাণ পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাটক ঃ মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর কালের ইতিহাস-ঐতিহ্য পুরাণের অনুষঙ্গে নাটক রচনায় সঞ্চারিত হয় নতুন মাত্রা। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হচ্ছে– সৈয়দ শামসুল হকের ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ (১৯৮২); সাঈদ আহমদের ‘শেষ নবাব’ (১৯৮৯); মমতাজউদদীন আহমদের ‘স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা’ (১৯৭৬); সেলিম আল দীনের ‘অনিকেত অন্বেষণ’, ‘শকুন্তলা’ (১৯৮৬); আবদুল মতিন খানের ‘গিলগামেশ’ (১৯৮২) ইত্যাদি।

সামাজিক নাটক ঃ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরকরণ। ১৯৭১-উত্তর কালে শেক্সপীয়র, মলিয়ের, মোলনার, বেকেট, ইয়োসেনেস্কো, ব্রেখট, সার্ত, কাম্যু, এ্যালবী প্রমুখ নাট্যকারের নাটক অনূদিত কিংবা রূপান্তরিত হয়েছে। অনুবাদ ও রূপান্তরণে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কবীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমদ, আলী যাকের, জিয়া হায়দার, আসাদুজ্জামান নূর প্রমুখ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে বাংলা নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

২. ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

৩. বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার এবং প্রকাশকালসহ তাঁদের প্রধান রচনার নাম বিষয়ক একটি ছক তৈরি করুন।

৪. সংক্ষেপে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের পরিচয় দিন।

৫. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের প্রধান প্রবণতাসমূহ আলোচনা করুন।

৬. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নাট্যকার এবং প্রকাশকালসহ তাঁদের প্রধান রচনার নাম বিষয়ক একটি ছক তৈরি করুন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ ঐতিহাসিক নাটক কাকে বলে? বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর ॥ ইতিহাসের কোন চরিত্র বা কাহিনীকে নিয়ে রচিত নাটককে বলা হয় ঐতিহাসিক নাটক। এ ধরনের নাটকে নাট্যকারকে ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যকে মেনে চলতে হয়। তবে নাটকের বিশেষ প্রয়োজনে তিনি এক বা একাধিক কল্পিত চরিত্র নির্মাণ করতে পারেন। এ ধরনের নাটকে নাট্যকারকে ঐতিহাসিক সত্য এবং কল্পনার মধ্যে একটা আনুপাতিক সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে সেই নাটকই সার্থক, যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনার সহায়তায় নাট্যকার তুলে ধরেন বর্তমানকালের মানবভাগ্যের বিশেষ কোন মুহূর্তটি। ইতিহাসের পুনর্লিখন কখনোই ঐতিহাসিক নাট্যকারের লক্ষ্য নয়, বরং ইতিহাসের কাঠামোতে বর্তমানের জীবনবাস্তবতা উপস্থাপনই তাঁর উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক নাটকে সংলাপ, দৃশ্য পরিকল্পনা, পরিবেশ, ঘটনাংশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ নাট্যরীতি অনুসরণ করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব থেকে বাংলা নাটকের উদ্ভব। উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের যাত্রা শুরু। মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক নাট্যকার। মধুসূদনের পর অনেক নাট্যকার নাটক লিখেছেন। বাংলার প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক নাট্যকারের নাম তাঁদের প্রধান রচনার নামসহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

নাট্যকার	নাটকের নাম
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সিরাজদ্দৌলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রায়শ্চিত্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান
	চন্দ্রগুপ্ত
	নূরজাহান
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	বাংলার মসনদ
	আলমগীর
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	সিরাজদ্দৌলা
	গৈরিক পতাকা
মহেন্দ্র গুপ্ত	পিটু সুলতান
	মহারাজা নন্দকুমার
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজ-উ-দ্দৌলা
আসকার ইবনে শাইখ	অগ্নিগিরি
সাঈদ আহমদ	শেষ নবাব

প্রশ্ন ঃ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের প্রধান প্রবণতাগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর ॥ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর কালে বাংলাদেশের নাটকে নবতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ সময় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের নাটকে লাগে পালা-বদলের হাওয়া। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের মৌসুমী নাট্যচর্চার পরিবর্তে নাট্যকর্মীরা নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন, নাট্যকর্মীরা নাটককে গ্রহণ করলেন সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কালে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের বিকাশধারাকে আমরা প্রধান পাঁচটি শাখায় বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করতে পারি। এই শাখাগুলো নিম্নরূপ–

ক. মুক্তিযুদ্ধের নাটক
খ. প্রতিবাদের নাটক : প্রতিরোধের নাটক
গ. ইতিহাস-ঐতিহ্য পুরাণ পুনর্মূল্যায়ধর্মী নাটক
ঘ. সামাজিক নাটক
ঙ. অনুবাদ নাটক : রূপান্তরিত নাটক

মুক্তিযুদ্ধের নাটক ॥ বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা। মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে যাঁরা নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন মমতাজউদদীন আহমদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, জিয়া হায়দার, সৈয়দ শামসুল হক, রণেশ দাশগুপ্ত, সাঈদ আহমদ, কল্যাণ মিত্র, আল মনসুর, রাবেয়া খাতুন প্রমুখ। মমতাজউদদীন আহমদের, বিবাহ ও কি চাহ শঙ্কচিল', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' এবং কল্যাণ মিত্রের 'জল্লাদের দরবার' মুক্তিযুদ্ধের নাটক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

প্রতিবাদের নাটক : প্রতিরোধের নাটক ঃ মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের একটি প্রধান প্রবণতাই হচ্ছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধচেতনা। এ ধারায় যাঁরা স্মরণীয় অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মমতাজউদদীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন, আবদুল মতিন খান, এস.এম সোলায়মান, কবীর আনোয়ার, রাজীব হুমায়ুন প্রমুখ। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চেতনা বাংলাদেশের যে সব নাটককে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী', 'ইবলিস', 'এখানে নোঙর;

আবদুল্লাহ আল মামুনের সেনাপতি', এখনও ক্রীতদাস', সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা'; মমতাজউদ্‌দীন আহমদের 'সাতঘাটের কানাকড়ি'; আবদুল মতিন খানের 'মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব'; কবীর আনোয়ারের 'জনে জনে জনতা' ইত্যাদি।

ইতিহাস ঐতিহ্য পুরাণ পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাটক ॥ উনিশশ' একাত্তর-উত্তর বাংলাদেশের নাটকের একটি উল্লেযোগ্য প্রবণতা হচ্ছে ইতিহাস ঐতিহ্য পুরাণের পুনর্মূল্যায়ন প্রচেষ্টা। এ ধারায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক, সাঈদ আহমদ, মমতাজউদদীন আহমদ, সেলিম আল দীন, আবদুল মতিন খান, মামুনুর রশীদ প্রমুখ নাট্যকারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইতিহাস ঐতিহ্য পুরাণের পুনর্মূল্যায়নধর্মী বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হচ্ছে সৈয়দ শামসুল হকের নূরলদীনের সারাজীবন', সাঈদ আহমদের 'শেষ নবাব', মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা', সেলিম আল দীনের 'শকুন্তলা', আবদুল মতিন খানের 'গিলগামেশ', মামুনুর রশীদের 'লেবেদেফ' ইত্যাদি।

সামাজিক নাটক ॥ স্বাধীনতা-উত্তর কালে সমাজের অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিচ্যুতি আর মুক্তিযোদ্ধাদের বিপথগামিতা নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক নাটক। এ ধারায় উল্লেযোগ্য নাটক রচনা করেছেন আবদুল্লাহ আল মামুন। এ ছাড়া অন্য যেসব নাট্যকার সামাজিক নাটক রচনায় বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদদীন আহমদ, রশীদ হায়দার, আতিকুল হক চৌধুরী, সেলিম আল দীন, হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, এস.এম সোলায়মান, আল মনসুর, গোলাম আম্বিয়া নূরী প্রমুখ। এঁদের সম্মিলিত সাধনায় বাংলাদেশের সামাজিক নাট্যধারা সমৃদ্ধ হয়েছে।

অনুবাদ নাটক : রূপান্তরিত নাটক ॥ স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরকরণ। সময়ের এই পর্বে অনুবাদ ও রূপান্তরিত নাটকের ধারায় যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সৈয়দ শামসুল হক, কবীর চৌধুরী, মমতাজউদদীন আহমদ, আলী যাকের, জিয়া হায়দার, আতাউর রহমান, আসাদুজ্জামান নূর, খোন্দকার আশরাফ হোসেন প্রমুখ।

বাংলাদেশের নাটক এখন দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্যের এই খাখাটি আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠ ৬

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সিকান্‌দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন;
- সিরাজ-উ-দ্দৌলার ট্র্যাজিক ইতিহাস নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে সব নাটক লেখা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

সিকান্‌দার আবু জাফরের জীবন কথা

সিকান্‌দার আবু জাফর ১৯১৯ সালের ৩১ মার্চ খুলনা জেলার সাতক্ষীরার (বর্তমানে জেলা) তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী আর মাতা জোবেদা খানম। কবির প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ সিকান্‌দার

আবু জাফর হাশেমী বখত। সিকান্দার আবু জাফরের পূর্বপুরুষ পেশোয়ারের অধিবাসী ছিলেন। কবির প্রপিতামহ পেশোয়ার থেকে খুলনায় এসে বসবাস করতে থাকেন।

সিকান্দার আবু জাফরের কৈশোর কেটেছে খুলনা জেলার তালা গ্রামে। তালা গ্রামের বি.ডি. উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ সনে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলের শিক্ষাজীবন শেষে তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন। বি.এ শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় তিনি পড়ালেখা ছেড়ে দেন।

প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্তির পর ১৯৪১ সালে তিনি চাকুরী জীবন আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি কলকাতার একটি সরকারী সংস্থায় চাকুরি গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সাংবাদিকতার দিকেও খানিকটা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন। চাকুরি এবং সাংবাদিকতার পাশাপাশি স্বাধীন ব্যবসার প্রতিও তিনি একসময় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি 'সেনটেড কোকোনাট অয়েল' নামে নারকেল তেলের ব্যবসা করেন, কিন্তু লাভজনক না হওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি এ ব্যবসা ছেড়ে দেন।

১৯৪৭ সালে নানা জটিলতা, ষড়যন্ত্র আর গোপন আঁতাতের ফলে ভারত বিভক্তির পর সিকানদার আবু জাফর কলকাতার জীবন ছেড়ে পূর্ববাংলার ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় শুরু হয় সিকান্দার আবু জাফরের দ্বিতীয় জীবন। ঢাকায় এসে একদিকে সাহিত্যচর্চা, অন্যদিকে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন সিকান্দার আবু জাফর। ১৯৪৮ সালে তিনি বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু নারকেল তেলে ব্যবসার মতো এক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হলেন। এ সময় তিনি কিছুকাল ঢাকা ও কলকাতা উভয় এলাকায় যাতায়াত করেছেন ব্যবসায় সাফল্য লাভের আশায়। কিন্তু তিনি ব্যবসায় কখনো সফল হননি।

১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে সিকান্দার আবু জাফর স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন। চাকুরির পাশাপাশি আবার তিনি ব্যবসার চেষ্টা করেন। প্রথমে চামড়ার ব্যবসা আরম্ভ করেন তিনি। এ ব্যবসায় বড় রকমের আর্থিক ক্ষতি হলে তিনি আরম্ভ করেন গুরুর ব্যবসা, ইটের ব্যবসা ইত্যাদি। কিন্তু সর্বত্রই তিনি ব্যর্থ হন। বস্তুত, ব্যবসায়ে ব্যর্থতাই ছিল তার নিত্য-সহচর।

সিকান্দার আবু জাফরের জীবনের একটা বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে তাঁর সাংবাদিক কর্মধারা। কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার পরে তিনি দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় সম্পাদীয় বিভাগে কিছুদিন কাজ করেন। দৈনিক 'সংবাদের' প্রথম সম্পদকীয় তাঁরই লেখা। 'সংবাদের' পর তিনি 'ইত্তেফাক' এবং মিল্লাত' পত্রিকায়ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন।

১৯৫৭ সালে সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'সমকাল' পত্রিকা। বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে 'সমকাল' পত্রিকার অবদান অসামান্য। 'সমকাল' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। নতুন লেখক সৃষ্টিতে 'সমকাল'-এর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক পালন করেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। বস্তুত, 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদনা সিকান্দার আবু জাফরের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'অভিযান' পত্রিকা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 'অভিযান' পত্রিকার প্রকাশ একটি দুঃসাহসী এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যজীবনও গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিতে ভাস্বর। স্কুল জীবন থেকেই তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকে তাঁর সাহিত্যসাধনা। একে একে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছড়া ও অনুবাদগ্রন্থসমূহ। গীতিকার হিসেবেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একজন সুরকার হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত।

বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গেও সিকান্দার আবু জাফরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে' গানটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিপুল প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করেছে। বাংলাদেশের সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর সংগ্রাম ছিল নিরলস ও অকুণ্ঠ।

১৯৪৬ সালে সিকান্দার আবু জাফর পুষ্প সেনকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর পুষ্প সেন নার্গিস জাফর নামে পরিচিতা হন।

১৯৭৩ সাল থেকে সিকান্‌দার আবু জাফরের নানা শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়। তিনি প্রায়শই হাঁপানী রোগে কষ্ট পেতে থাকেন। হাঁপানী রোগ বেড়ে গেলে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে তাঁকে পি.জি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট রাত ৩.২০ মিনিটে সিকান্‌দার আবু জাফর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সিকান্‌দার আবু জাফরের সাহিত্যকর্ম

কবিতা

১. প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), ২. বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), ৩. তিমিরান্তিক (১৯৬৫), ৪. কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), ৫. কবিতা- ১৩৭৪ (১৯৬৮), ৬. বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১), ৭. বাঙলা ছাড়ো (১৯৭২)।

গানের বই

১. মালব কৌশিক (১৯৬৬)

উপন্যাস

মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), ২. জয়ের পথে (১৯৪৩), ৩. পূরবী (১৯৪৪), ৪. নূতন সকাল (১৯৪৬)

নাটক

১. সিরাজ-উ-দ্দৌলা (১৯৬৫), ২. মহাকবি আলাউল (১৯৬৬), ৩. মাকড়সা (১৯৬০ সালে পত্রিকায় প্রকাশ), ৪. শকুন্ত উপখ্যান(১৯৬৮)

অনুবাদ

১. যাদুর কলস (১৯৫৯), ২. সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), ৩. পশ্চিমের পারাবাত (১৯৬২), ৪. রুবাইয়াৎই ওমর খাইয়াম (১৯৬৬), ৫. সিংগের নাটক (১৯৭১)।

পাঠ্যপুস্তক

নবীকাহিনী (১৯৫১), ২. আওয়ার ওয়েলথ (১৯৫১)

সম্পাদনা

সমকাল (মাসিক) ১৯৫৭-১৯৭৫, অভিযান (সাপ্তাহিক) - ১৯৭১

নির্বাচিত নাটক প্রসঙ্গ

সিকান্‌দার আবু জাফরের ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে (পৌষ ১৩৭২)। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উ-দ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটক। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত থেকে কাহিনীর মৌল উপাদান গৃহীত হলেও, সিকান্‌দার আবু জাফর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচ্য নাটকে বর্তমান কালের জীবন জিজ্ঞাসাকে ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। তাঁর হাতে পলাশীর ইতিহাস পুনর্জীবন লাভ করেছে। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামশীল সত্তা প্রকাশের আন্তরগরজেই নাট্যকারের সিরাজ-উ-দ্দৌলা স্মরণ। ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের ভূমিকায় সিকান্‌দার আবু জাফরের অভিমত এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়-

জাতীয় জাগরণের প্রয়োজনে উদ্দীপনার প্রেরণা হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলা জাতীয় বীরের আসন লাভ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক নায়ক রূপে সিরাজ-উ-দ্দৌলা আজ সর্বজনপ্রিয় চরিত্র। এই সাফল্যের পথ প্রসারিত হয়েছে জাতীয় নাট্যান্দোলনের মাধ্যমে। উক্ত আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।.....

রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেও সিরাজ-উ-দ্দৌলার কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা হয়েছে। ইংরেজের সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক প্রচারণার অবিসংবাদী সত্য হিসেবে গৃহীত সিরাজ-উ-দ্দৌলার বর্বরতার সবচেয়ে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত ‘অন্ধকূপ হত্যা’ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। অন্ধকূপ হত্যার স্মারক স্তম্ভ ‘হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণে রাজনৈতিক নেতা

সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে কলঙ্ক স্তম্ভটি চূর্ণ করবার জন্যে তাঁর প্রত্যক্ষ আত্মনিয়োগের আমি চাক্ষুষ সাক্ষী।

জাতীয় চেতনা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই নতুন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে প্রকৃতই ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজ-উ-দ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজ-উ-দ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলির চাপা দেবার জন্যে ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারী ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধান সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।

নাট্যকারের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকেই আপনি অনুধাবন করতে পারবেন কেন তিনি সিরাজ-উ-দ্দৌলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনী নিয়ে আলোচ্য নাটক করেছেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলার চরিত্রের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ যেসব কলঙ্ক লেপন করতে চেয়েছিল, সিকান্দার আবু জাফর সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতনের কথা বলতে গিয়ে সে কলঙ্ককে মোচনের চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি নতুন করে ইতিহাস লেখেননি, বরং নির্মাণ করেছেন কালজয়ী সাহিত্য। ১৯৬৫ সালে আইয়ুবী শাসনের যাঁতাকলে পূর্ববাংলার মানুষ যখন দিশেহারা, তখন সিকান্দার আবু জাফরের এই নাটক রচনা ভিন্নতর মাত্রা নির্দেশকও বটে। তিনি চেয়েছেন সিরাজ-উ-দ্দৌলার শক্তি আর সাহস আর দেশপ্রেমকে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে, যাতে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। এই সূত্রে আলোচ্য নাটক রচনা ও প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি সাহসী কর্ম।

সিরাজ-উ-দ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে নিয়ে সিকান্দার আবু জাফরের পূর্বে এবং পরে একাধিক নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন। বর্তমান আলোচনায় সে সব নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানও এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আপনার জানা প্রয়োজন।

সিরাজ-উ-দ্দৌলার ট্র্যাজিক ইতিহাস নিয়ে প্রথম নাটক রচনা করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর নাটক প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ই(১৯০৫) তিনি এই নাটক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ পাঁচ অঙ্কের নাটক, যেখানে মোট ৩৬টি দৃশ্য রয়েছে। এই নাটকেও গিরিশচন্দ্র সিরাজ-উ-দ্দৌলার চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর অভিমত- ‘বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন।’ এভাবে সিরাজ-চরিত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে নতুন মহিমা ও মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হলো।

সিরাজ-উ-দ্দৌলার ট্র্যাজিক পরিণতি নিয়ে সবচেয়ে মঞ্চসফল ও বহুল পঠিত নাটক রচনা করেছেন সচীন সেনগুপ্ত। বস্তুত, শচীন সেনগুপ্তের ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকই বাংলার রঙ্গমঞ্চে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। শচীন সেনগুপ্তের নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালে। তাঁর ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ ৩ অঙ্কের ৯ দৃশ্যের নাটক। নাটকে ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে নাট্যকার নিপুণতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কল্পনার সত্যকে। এখানে নাট্যকার সিরাজ চরিত্রকে বাঙালি জাতির নায়করূপে নির্মাণ করেছেন।

সিকান্দার আবু জাফরের পরে সিরাজ-উ-দ্দৌলা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছেন সাঈদ আহমদ। সাঈদ আহমদের ‘শেষ নবাব’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন- ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে আমি নবরূপে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। নতুন কিছু বলবারও চেষ্টা করেছি।’ আলোচ্য নাটকে সাঈদ আহমদ ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের নিহত সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতনের মৌল কারণ তুলে ধরেছেন। ফলে ইতিহাসের অনেক তথ্য তিনি বাদ দিয়েছেন, ইতিহাস সন্ধান করে পরিবেশন করেছেন প্রকৃত সত্য। সাঈদ আহমদের ‘শেষ নবাব’ নাটক প্রসঙ্গে কবি শামসুর রাহমানের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন–

আরেকটি কথা। ‘শেষ নবাবে’র পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে বারবার আমার মনে পড়েছে সমকালীন বাংলাদেশের কথা। আর সবকিছু ছাপিয়ে সিরাজদ্দৌলার অন্তরালে এক অতিকায় ছায়ার মতো জেগে রয়েছেন সেই মহানায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যাঁর নাম। সৎ সাহিত্যের একটি গুণ এই যে তা কোনো বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ থাকে না।

উপরের আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন সকল নাট্যকারেরই মৌল উদ্দেশ্য সিরাজ চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচন এবং তাঁর অতুল দেশপ্রেমের শিল্পরূপ নির্মাণ। এভাবে, বাঙালি নাট্যকারের হাতে সিরাজ-উ-দ্দৌলা নতুন মহিমায় হলেন অভিষিক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞ নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে সিকান্দার আবু জাফরের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করুন।

২. সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিন।

৩. সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের একটি সাধারণ পরিচয় প্রদান করুন।

৪. 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' বিষয়ক উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখুন।

ভূমিকা

বর্তমান ইউনিটটি পাঠ করলে আপনি পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হবেন। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজ এবং তাদের এ-দেশীয় সহচরদের ক্রমিক ষড়যন্ত্রের কথাও আপনি আলোচ্য ইউনিট থেকে জানতে পারবেন। আলোচ্য ইউনিটে মোট তিনটি দৃশ্য রয়েছে। প্রথম দৃশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র এবং তার বিরুদ্ধে সিরাজের দৃঢ় অবস্থানের কথা জানা যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যে সিরাজ কর্তৃক বিতারিড়ত ইংরেজ কর্মকর্তারা ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়ম জাহাজে বসে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছে। তাদের কর্মধারা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে করেই হোক, তারা সিরাজকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। এ উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করতে চায় শওকতজঙ্গকে। কিন্তু নবাবের কাছে সব সংবাদই পৌঁছে যেত। তৃতীয় দৃশ্যে আমরা এ কথাই জানতে পারি। এই দৃশ্যে ঘষেটী বেগমের বাড়িতে এমনি একটা ষড়যন্ত্রের কথা আমরা জানতে পারি। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা এসব ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে নানা ধরনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা তা কিছুই মানেনি। অবশেষে ঘসেটী বেগম এবং সিরাজের উত্তপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্তমান ইউনিটটি সমাপ্ত হয়।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে পারবেন।
২. সিরাজের পতনের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে এ-দেশের যে সব ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. সিরাজের চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ইংরেজদের ক্রমিক ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিরাজ চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
গোলন্দাজ – যে সৈনিক কামান দাগিয়ে গোলা নিক্ষেপ করে। **বেঈমান** – বিশ্বাসঘাতক।	**প্রথম অংক ॥ প্রথম দৃশ্য** সময় ঃ ১৭৫৬ সাল, ১৯শে জুন। স্থান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। *[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ওয়ালী খান, জর্জ হলওয়ে, উর্মিচাঁদ, মীরমর্দান, মানিক চাঁদ, সিরাজ, রায়দুর্লভ, ওয়াট্স।]*

ডাচদের – ওলন্দাজ বা হল্যান্ডের কর্মচারীদের।

হাতুড়ে – আনাড়ি চিকিৎসক।

সর্বাধিনায়ক – যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি।

জুলুম – অত্যাচার।

Secret Committee – গোপন সংস্থা, গোপন পরিষদ।

কোম্পানী – ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত নাম।

সিরাজ-উ-দ্দৌলা – বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। আলীবর্দী খাঁর প্রিয় দৌহিত্র। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে তিনি পরাজিত হন। তাঁর অধিকাংশ পারিষদই ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সিরাজ ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং সাহসী সৈনিক। নানা ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়লেও তিনি কখনো দিশাহারা হননি কিংবা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই একজন প্রজাবৎসল নবাব।

আলীবর্দী – প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দী খাঁ। বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মাতামহ। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক। তিনিই মৃত্যুর সময় সিরাজকে ভবিষ্যৎ নবাব হওয়ার কথা বলে যান।

ওয়াটস – উইলিয়ম ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির পরিচালক। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে

নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে। দুর্গের ভেতরে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয়। তবু যুদ্ধ না করে উপায় নেই। তাই ক্যাপ্টেন ক্লেটন দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ থেকে মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ নিয়ে কামান চালাচ্ছেন। ইংরেজ সৈন্যদের মনে কোনো উৎসাহ নেই, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ক্লেটন॥ প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা Victory or death-Victory or death.।

(গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লেটন একজন বাঙ্গালী গোলন্দাজের দিকে এগিয়ে গেলেন)।

ক্লেটন॥ তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙ্গালী বীর। বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মত হাল ছেড়ে দিও না। যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

ওয়ালী খান॥ যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। নবাব সৈন্য দুর্গের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ক্লেটন॥ না, না।

ওয়ালী॥ এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গের একটি প্রাণীকেও তারা রেহাই দেবে না।

ক্লেটন॥ চুপ বেঈমান। কাপুরুষ বাঙালীর কথায় যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ওয়ালী॥ ও সব কথা বলবেন না সাহেব। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানীর টাকার জন্যে। তা'বলে বাঙ্গালী কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এখুনি তার প্রমাণ দেবে।

ক্লেটন॥ What? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

(ওয়ালী খানকে চড় মারার জন্যে এগিয়ে গেল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)

জর্জ॥ ক্যাপ্টেন ক্লেটন, অধিকায়ক এনসাইন পিকার্ডের পতন হয়েছে। পেরিন্স পয়েন্টের সমস্ত ছাউনী ছারখার করে দিয়ে ভারী ভারী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

ক্লেটন॥ কি করে তারা এখানে আসবার রাস্তা খুঁজে পেলো?

জর্জ॥ উমিচাঁদের গুপ্তচর নবাব ছাউনীতে খবর পাঠিয়েছে। নবাবের পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে, আর গোলন্দাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্রোতের মত ছুটে আসছে।

ক্লেটন॥ বাধা দেবার কেউ নেই। (ক্ষিপ্তস্বরে) ক্যাপ্টেন মিন্‌চিন দমদমের রাস্তাটা উড়িয়ে দিতে পারেন নি?

জর্জ॥ ক্যাপ্টেন মিন্‌চিন, কাউন্সিলার ফ্রাঙ্কল্যান্ড আর ম্যানিংহাম নৌকোয় করে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।

ক্লেটন॥ কাপুরুষ, বেঈমান। জ্বলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়। চালাও, গুলী চালাও। নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্জয় হয়ে ওঠে।

(জন হলওয়েলের প্রবেশ এবং জর্জের প্রস্থান)

হলওয়েল॥ এখন গুলি চালিয়ে বিশেষ ফল হবে কি ক্যাপ্টেন ক্লেটন?

ক্লেটন॥ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি সার্জন হলওয়েল?

প্রথম থেকেই তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

হলওয়েল – প্রকৃত নাম জন জেফানায়া হলওয়েল। চরম মিথ্যাবাদী। কোন ঘটনাকে বেশি করে বলা ছিল তার অভ্যাস। পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক। সিরাজের চরিত্র কলঙ্কিত করার জন্য তিনিই অন্ধকূপ হত্যা ঘটনাটি কল্পনা করে প্রচার করেন।

মীর মর্দান – নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিশ্বাসী এবং দেশপ্রেমিক সেনাপতি। পলাশীর যুদ্ধে তিনি অকুতোভয়ে যুদ্ধ করে সিরাজের প্রতি তার আনুগত্য প্রদর্শন করেন। যুদ্ধরত অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মানিকচাঁদ – সিরাজ-উ-দ্দৌলার অন্যতম সেনাপতি। ১৭৫৬ সালে সিরাজ-উ-দ্দৌলা তাকে কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত করেন। মানিকচাঁদ চিলেন চরম বিশ্বাসঘাতক।

উর্মিচাঁদ – লাহোরের অধিবাসী উমিচাঁদ ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন শিখ। ইংরেজদের সঙ্গে দালালী করে উমিচাঁদ সিরাজের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন।

হলওয়েল॥ আমার মনে হয় গভর্নর রজার ড্রেকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত।

ক্লেটন॥ তাকে কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো ভেবেছেন?

হলওয়েল॥ তবু কিছুটা আশা থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ করে টিকে থাকবার কোনো আশা নেই। গোলাগুলি যা আছে তা দিয়ে আজ সন্ধ্যে পর্যন্তও যুদ্ধ করা যাবে না। ডাচদের কাছে, ফরাসিদের কাছে, সবার কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু সৈন্য ত দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।
(বাইরে গোলার আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠল)

ক্লেটন॥ তা হলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি গভর্ণর ড্রেকের সঙ্গে একবার আলাপ করে আসি। (ক্লেটনের প্রস্থান। বাইরে থেকে যথারীতি গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। হলওয়ের চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক পায়চারী করছে।)

হলওয়েল॥ (পায়চারী থামিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে) এই, কে আছ? (রক্ষীর প্রবেশ)

জর্জ॥ Yes sir

হলওয়েল উমিচাঁদকে বন্দী করে কোথায় রাখা হয়েছে?

জর্জ॥ পাশেই একটা ঘরে।

হলওয়েল॥ তাকে এখানে নিয়ে এসো।

জর্জ॥ Right sir
(জর্জ দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় এবং প্রায় পর মুহূর্তে উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে।)

উমিচাঁদ॥ (প্রবেশ করতে করতে) সুপ্রভাত সার্জন হলওয়েল।

হলওয়েল॥ সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ? (গোলাগুলির আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। হলওয়েল বিস্মিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন) নবাব সৈন্যের গোলাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন বলুন ত?

উমিচাঁদ॥ (কান পেতে শুনল) বোধ হয় দুপুরের আহারের জন্যে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে।

হলওয়েল॥ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে উমিচাঁদ। আপনি নবাবের সেন্যধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান। তাঁকে অনুরোধ করুন নবাব সৈন্য যেন আর যুদ্ধ না করে।

উমিচাঁদ॥ বন্দীর কাছে এ প্রার্থনা কেন সার্জন হলওয়েল? (কঠিন স্বরে) আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।
(জর্জের প্রবেশ)

জর্জ॥ সার্জন হলওয়েল, গভর্নর রজার ড্রেক আর ক্যাপ্টেন ক্লেটন নৌকা করে পালিয়ে গেছেন।

হলওয়েল॥ দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।

জর্জ॥ গভর্নরকে পালাতে দেখে একজন রক্ষী তাঁর দিকে গুলি ছুঁড়েছিল কিন্তু তিনি আহত হননি।

উমিচাঁদ॥ দুর্ভাগ্য, পরম দুর্ভাগ্য।

হলওয়েল॥ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে আধঘণ্টা আগেও প্রতিজ্ঞা করছিলেন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। শেষে তিনিও পালিয়ে গেলেন।

উমিচাঁদ॥ বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এ বড় লজ্জার কথা।

হলওয়েল॥ উমিচাঁদ, এখন উপায়?

উমিচাঁদ॥ আবার কি? ক্যাপ্টেন কর্নেলেরা সব পালিয়ে গেছেন, এখন ফাঁকা ময়দানে গাইস হাসপাতালের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাধিনায়ক। আপনিই এখন কম্যান্ডার ইন-চীফ।
আবার প্রচন্ড গোলার আওয়াজ ভেসে এল)

হলওয়েল॥ (হতাশার স্বরে) উমিচাঁদ।

উমিচাঁদ॥ আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ প্রকারে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন। (উমিচাঁদের প্রস্থান। হঠাৎ বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গেল। বেগে জর্জের প্রবেশ।)

জর্জ॥ সর্বনাশ হয়েছে। একদল ডাচ সেন্য গঙ্গার দিক্কার ফটক ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে নবাবের সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী হুড় হুড় করে কেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

হলওয়েল॥ সাদা নিশান ওড়াও। দুর্গ তোরণে সাদা নিশান উড়িয়ে দাও। (জর্জ ছুটে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবাব সৈন্যের অধিনায়ক রাজা মানিকচাঁদ ও মীরমর্দানের প্রবেশ।)

মীরমর্দান॥ এই যে দুশমনরা এখান থেকেই গুলি চালাচ্ছে।

হলওয়েল॥ আমরা সন্ধির সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে।

মীরমর্দান॥ সন্ধি না আত্মসমর্পণ?

মানিকচাঁদ॥ সবাই অস্ত্র ত্যাগ করো।

মীরমর্দান॥ মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।

মানিকচাঁদ॥ তুমি হলওয়েল, তুমিও মাথার ওপর দু'হাত তুলে দাঁড়াও। কেউ একচুল নড়লে প্রাণ যাবে।
(দ্রুতগতিতে নবাব সিরাজের প্রবেশ। পেছনে সসৈন্য সেনাপতি রায়দুর্লভ। বন্দীরা কুর্ণিশ করে এ পাশে সরে দাঁড়াল। সিরাজ চারদিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে হলওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন।)

সিরাজ॥ কোম্পানীর ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেনাধ্যক্ষ হয়ে বসেছেন। তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরী হও হলওয়েল।

হলওয়েল॥ আশা করি নবাব আমাদের ওপরে অন্যায় জুলুম করবেন না।

সিরাজ॥ জুলুম? এ পর্যন্ত তোমরা যে আচরণ করে এসেছো তাতে তোমাদের ওপরে সত্যিকার জুলুম করতে পারলে আমি খুশী হতুম। গভর্নর ড্রেক কোথায়?

হলওয়েল॥ তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।

সিরাজ॥ কলকাতার বাইরে গেছেন, না প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন? আমি সব খবর রাখি হলওয়েল। নবাব সৈন্য কলকাতা আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রজার ড্রেক প্রাণ ভয়ে কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কৈফিয়ৎ তবু কাউকে দিতেই হবে। বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।

হলওয়েল॥ আমরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই নি। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে-

সিরাজ॥ শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই কাশিমবাজার কুঠিতে তোমরা গোপনে অস্ত্র আমদানী করছিলে তাই না? খবর পেয়ে আমার হুকুমে কাশিমবাজার কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দী করা হয়েছে ওয়াট্‌স আর কলেটকে।

	রায়দুর্লভ।
রায়দুর্রভ॥	জাঁহাপনা।
সিরাজ॥	বন্দী ওয়াট্সকে এখানে হাজির করুন।
	(ওয়াট্সসহ রায়দুর্লভের প্রবেশ)
	ওয়াট্স!
ওয়াট্স॥	Your Excellency.
সিরাজ॥	আমি জানতে চাই তোমাদের অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি কে করবে? কাশিমবাজারে তোমরা গোলাগুলি আমদানী করছ, কলকাতার আশে পাশে গ্রামের পর গ্রাম তোমরা নিজেদের দখলে আনছ, দুর্গ সংস্কার করে তোমরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবল্লভকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, বাংলার মসনদে বসবার পর আমাকে তোমরা নজরানা পর্যন্ত পাঠাও নি। তোমরা কি ভেবেছ এই সব অনাচার আমি সহ্য করব?
ওয়াট্স॥	আমরা আপনার অভিযোগের কথা কাউন্সিলের কাছে পেশ করব।
সিরাজ॥	তোমাদের ধৃষ্ঠতার জবাবদিহি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে তোমাদের বাণিজ্য করবার অধিকার আমি প্রত্যাহার করছি।
ওয়াট্স॥	কিন্তু বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লীর বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।
সিরাজ॥	বাদশাকে তোমরা ঘুষের টাকায় বশীভূত করেছো। তিনি তোমাদের অনাচার দেখতে আসেন না।
হলওয়েল॥	Your Excellency. নবাব আশিবর্দী আমাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন।
সিরাজ॥	আর আমাদের তিনি যে অনুমতি করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর এ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন, কিলপ্যাট্রিক, ক্লাইভ সকলেরই জানা আছে। মাদ্রাজে বসে ক্লাইভ লন্ডনের Secret Committe-র সঙ্গে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছো? আমি সব জানি। তবু তোমাদের অবাধ বাণিজ্যে এ পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন ঘটাইনি। কিন্তু সদ্ব্যবহার ত দূরের ককা তোমাদের জন্যে করুণা প্রকাশ করাও অন্যায়।
ওয়াট্স॥	Your Excellency, আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর শুনেছেন। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। We have come to earn money and not to get into politicos. রাজনীতি আমরা কেন করব?
সিরাজ॥	তোমরা বাণিজ্য করো? তোমরা করো লুট। আর তাতে বাধা দিতে গেলেই তোমরা শাসন ব্যবস্থা ওলটপালট আনতে চাও। কর্ণাটকে, দাক্ষিণাত্যে তোমরা কি করেছো? শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অবাধ লুঠতরাজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছো। বাংলাতেও তোমরা সেই ব্যবস্থাই করতে চাও। তা' না হলে আমার নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গ সংস্কার তোমরা বন্ধ করনি কেন?
হলওয়েল॥	ফরাসী ডাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।
সিরাজ॥	ফরাসীরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি কেমন?
ওয়াট্স॥	আমরা অশান্তি চাই না Your Excellecy।
সিরাজ॥	চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্লভ।

রায়দুর্লভ৷ জাঁহাপনা।

সিরাজ৷ গভর্নর ড্রেকের বাড়ীটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন ধরিয়ে ঘোষণা করে দিন সমস্ত ইংরেজ যেন অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আশে-পাশের গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিন তারা যেন কোন ইংরেজের কাছে কোন প্রকারের সওদা না বেঁচে। এই নিষেধ কেউ অগ্রাহ্য করলে তাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

রায়দুর্লভ৷ হুকুম জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

সিরাজ৷ আপনি অবিলম্বে কোম্পানীর যাবতীয় সম্পত্তি আর প্রত্যেকটি ইংরেজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নবাব তহবিলে বাজেয়াপ্ত করুন। কলকাতা অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করবে কোম্পানীর প্রতিনিধি আর কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ।

মানিকচাঁদ৷ হুকুম জাঁহাপনা।

সিরাজ৷ নাসারার দুর্গ এই ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে একটি মসদিজ তৈরী হবে। আয়োজন করুন। সেনাপতি মীরমর্দান।

সেনাপতি নত হয়ে আদেশ গ্রহণের ভঙ্গী করলেন)

সিরাজ৷ (উমিচাঁদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে) আপনাকে মুক্তি দেওয়া হল উমিচাঁদ।

(উমিচাঁদ কৃতজ্ঞতায় নতশির)

আর (মীরমর্দানকে) হ্যাঁ, রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই কৃষ্ণবল্লভকেও মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।

মীরমর্দান৷ হুকুম জাঁহাপনা।

সিরাজ৷ হলওয়েল।

হলওয়েল৷ Your Excellency.

সিরাজ৷ তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দী। (রায়দুর্লভকে) কয়েদী হলওয়েল, ওয়াট্স আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।

রায়দুর্লভ৷ জাঁহাপনা।

(সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল।)

বস্তুসংক্ষেপ

সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজপক্ষ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বসে ষড়যন্ত্র করছে। ক্লেটন, জর্জ, হলওয়েল, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ-এরা সম্মিলিতভাবে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বসে তারা যখন সিরাজের পতনের কথা আলোচনায়, তখন অকস্মাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। তিনি ওয়াট্স হলওয়েল প্রমুখকে ষড়যন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করতে বললেন। সিরাজের সংলাপে এখানে পরোক্ষভাবে দেখা যায় যে, কলকাতা থেকে ইংরেজদের বিতারনের ফলে ইংরেজপক্ষ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ক্লেটন তার সৈন্যদের কি কথা বলতে চেয়েছেন?
২. 'বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এ বড় লজ্জার কথা' –একথা কে কাকে কখন কোথায় বলেছে?
৩. বর্তমান পাঠে সিরাজের যে চারিত্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা লিপিবদ্ধ করুন।
৪. সিরাজের বিরুদ্ধে ওয়াটস এবং হলওয়েল যে সব তথ্য ও ষড়যন্ত্র বিস্তার করেছে, তার পরিচয় দিন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ ক্লেটন তার সৈন্যদের কি কথা বলতে চেয়েছেন?

উত্তর ॥ ক্লেটন একজন সেনাপতি। তিনি নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পক্ষের সৈনিকদের উত্তেজিত করতে অনেক কথা বলেছেন। নাটকের শুরুতেই আমরা তাকে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত দেখতে পাই। তিনি সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন– "প্রাণপণে যুদ্ধ কর সাহসী বৃটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। 'Victory or death - Victory or death'।

প্রশ্ন ঃ বৃটিশ সিংহ ভয়ে ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন- এ বড় লজ্জার কথা" এ কথা কে কাকে কখন কোথায় বলেছে।

উত্তর ॥ উমিচাঁদ হলওয়েলকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন। ক্যাপ্টেন ক্লেটন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রথম দিকে বললেও, ক্রমে নবাব সৈন্যের আক্রমণে ভীত সন্ত্রস্ত ক্লেটন পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। হলওয়েলকে উমিচাঁদ একথা বলেছে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে বসে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্বল হয়ে ওঠে।
২. তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরি হও হলওয়েল।
৩. বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেল কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।
৪. We have come to earn money and not to get into politics রাজনীতি আমরা কেন করব?

বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেল কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।

উত্তর ॥

আলোচ্য অংশটি সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে সিরাজের দেশপ্রেম এবং একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

হলওয়েল, ওয়াটস, ক্লেটন প্রমুখ কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম বসে সিরাজের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করছিল। এমন সময় সেখানে অতর্কিতে উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। তিনি প্রথমে ইংরেজ সৈনিকদের কাছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি হলওয়েলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, নবাব সৈন্যের আক্রমণে ভীত অনেক ইংরেজ কর্মচারী কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। অথচ হলওয়েল বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বাঙালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। তাই তিনি হলওয়েলকে এই দুষ্কর্মের কৈফিয়ৎ দিতে বলেন। এই সংলাপের মধ্যে একদিকে যেমন সিরাজের দেশপ্রেমের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি শত্রুর বিরুদ্ধে তার দৃঢ় অবস্থানের কথাও প্রকাশ করছে। সিরাজ যে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে সাহস নিয়ে ইংরেজদের মোকাবিলা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উপর্যুক্ত সংলাপ থেকে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির প্রতি প্রবল ভালবাসাই সিরাজকে শত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী

হয়ে দাঁড়ানোর অন্তহীন প্রেরণা সঞ্চার করেছে। তাঁর সংলাপ থেকে একথাও পরোক্ষে আভাসিত হয়েছে যে, তিনি এই সব ষড়যন্ত্রের জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করবেন।

বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এ বড় লজ্জার কথা।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে উৎকলিত হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের সময় নবাব সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা যেভাবে পালিয়ে গিয়েছিল, উমিচাঁদের বিদ্রূপাত্মক সংলাপে তাই প্রকাশিত হয়েছে।
পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ সৈনিকদের দম্ভে নবাবের বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলার সৈন্যরা ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেয়। ক্লেটন, রজার ড্রেক, মিন্‌চিন, ফ্রাঙ্কল্যান্ড, ম্যানিংহাম প্রমুখ সকলেই নবাব সৈন্যের আক্রমণে ভীত হয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে যায়। ফলে সার্জেন হলওয়েলই এখন ব্রিটিশ পক্ষের সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। হলওয়েলের কাছে উমিচাঁদ এসব কথা শুনে খুব মজা পেয়ে উপর্যুক্ত সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন। ব্রিটিশ সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেছে – একথা হলওয়েলের কাছে প্রকাশ করে উমিচাঁদ পেতে চেয়েছে এক ধরনের আনন্দ। ইংরেজদের মর্মান্তিক কাপুরুষতায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন উমিচাঁদ। উমিচাঁদের এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারি, সিংহের মত সাহস ও শক্তির অধিকারী বলে জাহির করলেও ভেতরে ভেতরে ইংরেজরা কাপুরুষই বটে। ইংরেজদের এই কাপুরুষতাকে বিদ্রূপ করতে গিয়েই উমিচাঁদ হলওয়েলকে উদ্দেশ্য করে আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছে। ইংরেজদের দালালি করলেও এই সংলাপের মাধ্যমে উমিচাঁদের অন্তরের গোপন এক প্রদেশকে আমরা যেন সহসাই আবিষ্কার করতে পারি। দেশের প্রতি সংগোপনে সেও যে ভালোবাসা পোষণ করে, তা এই সংলাপ থেকে উপলব্ধি করা যায়। অর্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে, ক্ষমতার মোহে এই দেশপ্রেমকে বিসর্জন দিয়ে উমিচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের সময় ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- নবাব সৈন্যদের আক্রমণে ভীত হয়ে ইংরেজ সৈন্যরা কলকাতা থেকে পালিয়ে কোথায় গেল এবং অতঃপর কি করলো, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাহাজে বসে ইংরেজ সৈন্যরা নবাবের বিরুদ্ধে পুনরায় যে সব ষড়যন্ত্র করছে, তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
দুরবস্থা – খারাপ অবস্থা। **আকীর্ণ** – পরিপূর্ণ। **ড্রেক** – ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গবর্নর রজার ড্রেক। **অহোরাত্র** – দিবারাত্রি, সর্বক্ষণ। **মনুষ্যত্ব** – মানবিক গুণাবলী। **আব্রু** – আবরণ, পর্দা। Gracious – করুণাময়,	**প্রথম অংক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য** সময় ঃ ১৭৫৬ সাল, ৩রা জুলাই। স্থান ঃ কালকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ (চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- ড্রেক, হ্যারী, মার্টিন, কিলপ্যাট্রিক, ইংরেজ মহিলা, সৈনিক, হলওয়েল, ওয়াট্‌স, আর্দালী) (কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং তাদের দলবল এই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের চরম দুরবস্থা। আহার্য দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ সামান্য চোরাচালান আসে। পরিধেয়-বস্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে। সকলেই এক কাপড় সম্বল। এর ভেতরেও

সদয়, দয়াশীল।
করমর্দন – হাতে হাতে প্রীতিমূলক বিশেষ মিলন বা স্পর্শ।
মীরজাফর – প্রকৃত নাম মীর জাফর আলী খান। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আসেন মীরজাফর। নবাব আলিবর্দী বৈমাত্র ভগ্নী শাহ খানমের সঙ্গে মীর জাফরের বিয়ে দিয়ে তাকে সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধের সময় তিনি সর্বদা নবাবের সঙ্গে থাকবেন এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নবাবের সঙ্গে তিনি বিশ্বাস ঘাতকতা করেন। ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত এবং চিরকালের বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত মীরজাফর ১৭৫৭ সালে ২৯ জুন বিকেলবেলা কর্ণেল ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে বসেন। কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে ১৭৬৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মারা যান।
Scoundrel – নীচমনা, ইতর, নীতিবর্জিত মানুষ।
জগৎশেঠ – জগৎশেঠ কোন নাম নয়, উপাধি। ১৭২৩ সালে দিল্লীর সম্রাট মানিক চাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেহ চাঁদকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। পলাশীর যুদ্ধের সময় জগৎশেঠ সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন।
ফৌজদার – সেনানায়ক, আঞ্চলিক শাসক।
ভাঙ – এক ধরনের মাদক।
আরদালি – চাপরাশি, পিওন।
বাত্তি – বাতি।
কয়েদখানা – কারাগার, বন্দিশালা।

নিয়মিত পরামর্শ চলছে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর একদিক দেখা যাবে ঘণ জঙ্গলে আকীর্ণ। জাহাজের ডেকে পরামর্শরত ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং আরও দু'জন তরুণ ইংরেজ।)

ড্রেক॥ এই ত কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসেছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোনো, প্রয়োজনীয় সাহায্য-

হ্যারী॥ এসে পড়ল বলে, এই ত বলতে চাইছেন? কিন্তু সে সহায্য এসে পৌছোবার আগেই আমাদের দফা শেষ হবে মিঃ ড্রেক।

মার্টিন॥ কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আপাততঃ আমাদের কাছে মোটেই সুখবর নয়। তিনি মাত্র শ'আড়াই সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভরসায় একটা দাঙ্গাও করা যাবে না। যুদ্ধ করে কলকাতা জয় ত দূরের কথা।

ড্রেক॥ তবু ত লোকবল কিছুটা বাড়ল।

হ্যারী॥ লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আহার্যের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।

ড্রেক॥ আহার্য কোন রকমের জোগাড় হবেই।

মার্টিন॥ কি করে হবে তাই বলুন মিঃ ড্রেক। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাই ত জানতে চাইছি। এ পর্যন্ত দু'বেলা আহার্যের বন্দোবস্ত হয়েছে? ধারে কাছে হাটবাজার নেই। নবাবের হুকুমে প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেঁচেও না। চারগুণ দাম দিয়ে গোপনে সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবস্থা কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দরকার।

কিলপ্যাট্রিক॥ এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?

হ্যারী॥ ধৈর্য ধরব আমরা কিসের আশায় সেটাও ত'জানতে হবে।

ড্রেক॥ যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। দোষ কারো একার নয়।

মার্টিন॥ যাঁরা এ পর্যন্ত হুকুম দেবার মালিক তাঁদের দোষেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত। বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ।

ড্রেক॥ আমার হঠকারিতা?

মার্টিন॥ তা নয়ত কি? অমন উদ্ধত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেবার কি প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া নবাবের আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেবারই বা কি কারণ?

ড্রেক॥ সব ব্যাপারে সকলের মাথা গলানো সাজে না।

হ্যারী॥ তা ত' বটেই। কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে কি পরিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মিঃ ড্রেক, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু এটা বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই যে, ঘুষের অঙ্ক বড় বেশি মোটা হবার ফলেই নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে পারেন নি মিঃ ড্রেক।

ড্রেক॥ আমার রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে দাখিল করেছি।

মার্টিন॥ রিপোর্টের কথা রেখে দিন। তাতে আর যাই থাক সত্যি কথা বলা হয়নি। (টেবিলের ওপর এক বান্ডিল কাগজ দেখিয়ে) ওই ত রিপোর্ট তৈরী করেছেন কলকাতা যে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তাই ওর ভেতরে একটি বর্ণ সত্যি কথা খুঁজে পাওয়া যাবে?

Celebrate – উদ্‌যাপন করা।

তহবিল – সঞ্চিত নগদ টাকা কড়ি।

মানিকচাঁদ – নবাবের অন্যতম সেনাপতি। আলিবর্দীর কৃপায় মুর্শিদাবাদের সেরেস্তাদারীর পদে নিযুক্ত হন। মানিক চাঁদ পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবের বিরুদ্ধাচারণ করে।

ড্রেক	(টেবিলে ঘুসি মেরে) Thar's none to your business
মার্টিন॥	Of course it is
কিল্‌প্যাট্রিক॥	তোমরাই বা হঠাৎ এমন সাধুত্বের দাবীদার হলে কিসে?
ড্রেক॥	তোমাদের দু'জনের Bank balance বিশ হাজারের কম নয় কারুরই। অথচ তোমরা কোম্পানীর সত্তর টাকা বেতনের কর্মচারী।
হ্যারী॥	ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানী সকলকেই দিয়েছে। সবাই উপার্জন করছে, আমরাও করছি। কিন্তু আমরা ঘুষ খাইনি।
ড্রেক॥	আমিও ঘুষ খাইনে।
মার্টিন॥	অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।
ড্রেক॥	তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ। ভুলে যেও না এখনও ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃত্ব আমার হাতে।
হ্যারী॥	ফোর্ট উইলিয়াম?
ড্রেক॥	ইংরেজের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি? এই জাহাজটাই একন আমাদের কলকাতার দুর্গ। আর দুর্গ শাসনের ক্ষমতা এখনও আমার অধিকারে। বিপদের সময়ে সকলে একযোগে কাজ করার জন্যেই মন্ত্রণা সভায় তোমাদের ডেকেছিলাম। কিন্তু দেখছি তোমরা এই মর্যাদার উপযুক্ত নও।
মার্টিন॥	বড়াই করে কোন লাভ হবে না মিঃ ড্রেক। আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।
ড্রেক॥	এতবড় স্পর্ধা? মাফ চাও দ্বিতীয় কথা না বলে। না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের কয়েদ করবার হুকুম দিয়ে দেব। (জনৈক ইংরেজ মহিলা দড়ির ওপর একটা ছেড়া গাউন মেলতে আসছিলেন। তিনি হঠাৎ ড্রেকের কথায় রুখে উঠলেন। ছুটে গেলেন বচসারত পুরুষদের কাছে।)
রমণী॥	তবু যদি মেয়েদের নৌকোয় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না হয় এই দম্ভ সহ্য করা যেতো।
ড্রেক ॥	we are in the council Session madam. এখানে মহিলাদের কোনো কাজ নেই।
রমণী ॥	Damn your Council প্রাণ বাঁচবে কি করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।
ড্রেক॥	সেই ব্যবস্থাইত হচ্ছে।
রমণী॥	ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে ত'নিজেদের ভেতরে ঝগড়া। এ-দিকে দিনের পরদিন একবেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে অহোরাত্র এক কাপড় পরে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার জোগাড়।
ড্রেক॥	But you see.
রমণী॥	I do not see alone, you can also see every night এক প্রস্থ জামা কাপড় সম্বল। ছেলে বুড়ো সকলকেই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়। কোনো আড়াল নেই, আব্রু নেই। এর চেয়ে বেশি আর কি দেখাতে চান? (হাতের ভিজা গাউনটা ড্রেকের মুখে ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলাটি

	এমন সময় জনৈক গোরা সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।
সৈনিক॥	মিঃ হলওয়েল আর মিঃ ওয়াট্‌।
	(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েল আর ওয়াট্‌স ঢুকলো)
কিলপ্যাট্রিক॥	God gracious.
হলওয়েল॥	(সকলের উদ্দেশ্যে) Good morning to you.
	(সকলের সঙ্গে করমর্দন। ওয়াট্‌স কোন কথা না বলে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। মহিলাটি একটু ইতস্তঃ করে অন্যদিকে চলে গেলেন।)
ড্রেক॥	বলো, খবর বলো হলওয়েল। উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো যে।
হলওয়েল॥	মুর্শিদাবাদে ফিরেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতে হয়েছে, নাকে-কানে খৎ দিতে হয়েছে এই যা।
ড্রেক॥	কলকাতায় ফেরা যাবে?
হলওয়েল॥	না।
ওয়াট্‌স॥	আপাততঃ নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
কিলপ্যাট্রিক॥	কি রকম ব্যবস্থা?
ওয়াট্‌স॥	অর্থাৎ মেজাজ বুখে যতাসময়ে কিছু উপঢৌকন সহ হাজির হয়ে আবার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
ড্রেক॥	তার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।
হলওয়েল॥	একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবাব ইংরেজদের ব্যবসা সমুলে উচ্ছেদ করতে চান না। তা চাইলে এই ফলতায় আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারতেন না।
ড্রেক॥	তা হলে নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হয।
হলওয়েল॥	কিছুটা করেই এসেছি। তা ছাড়া উমিচাঁদ নিজের তেকেই আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।
ড্রেক॥	Hurray!
ওয়াট্‌স॥	মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ এঁরাও আস্তে আস্তে নবাবের কানে কতাটা তুলবেন।
ড্রেক॥	(হ্যারী ও মার্টিনকে) আশা করি তোমাদের মেজাজ একন কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে। আমাদের মিলেমিশে তাকতে হবে, একযোগে কাজ করতে হবে।
হ্যারী॥	আমরা ত' ঝগড়া করতে চাইনে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।
মার্টিন॥	যেমনই হক একটা নিষ্ফিলাফল দেখতে চাই।
	(উভয়ের প্রস্থান)
ড্রেক॥	(উচ্চ কণ্ঠে) Patience is the key-word youngmen.
হলওয়েল॥	(পায়ে চাপড় মেরে) উঃ কি মশা।
ড্রেক॥	যা বলেছো। ম্যালেরিয়া আর আমাশয়ে ভুগে কয়েকজন এর ভেতরে মারাও গেছে।
ওয়াট্‌স॥	বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা।
ড্রেক॥	But it is important from military point of fiew. সমুদ্র কাছেই। কলকাতাও চল্লিশ মাইলের ভেতরে। প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া করা যাবে।

কিলপ্যাট্রিক॥	কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। নদীর দু'পাশে ঘন জঙ্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোনো আশঙ্কা নে॥ বিপদ যদি আসেই তা হলে তা আসবে কলকাতার দিক দিয়ে গঙ্গার স্রোতে বেসে। কাজেই সতর্ক হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।
হলওয়েল॥	কলকাতার দিক থেকে আপাততঃ কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। উমিচাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত করেছে। তার অনুমতি পেলেই জঙ্গল কেটে আমরা এখানে হাট-বাজার বসিয়ে দেবো।
ড্রেক॥	নেটিভরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু জৌজদারে ভয়েই তা পারছে না। (প্রহরী সৈনিকের প্রবেশ। সে ড্রেকের হাতে এক টুকরা কাগজ দিল। ড্রেক কাগজ পড়ে চেঁচিয়ে উঠল) উমিচাঁদের লোক এই চিঠি এনেছে।
সকলে॥	(What)? এত তাড়াতাড়ি।
ড্রেক॥	(মাঝে মাঝে উচ্চৈস্বরে পত্র পড়তে লাগল) 'আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব। মানিকচাঁদকে অনেক কষ্টে রাজী করানো হইয়াছে। সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছে। এরজন্য তাহাকে বার হাজার টাকা নজর দিতে হইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত হুকমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমরা পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায্য বিবেচিত হয় তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলে আমি চিরকৃতজ্ঞ তাকিব। বলা বাহুল্য পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি। সুদূর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানীর লোকেরা। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করলে আমি আপনাকেরই সমগোত্রীয়। (চিঠি ভাঁজ করতে করতে) A Perfect scoundrel is this Omichand.
হলওয়েল॥	কিন্তু উমিচাঁদের সাহায্য ত হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।
ওয়াট্‌স॥	Even when it is too costly.
ড্রেক॥	সেই ত মুস্কিল। ওর লোভের অন্ত নেই। মানিকচাঁদের হুকুমনামার জন্যে সতের হাজার টাকা দাবী করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি দু'হাজারের বেশি মানিকচাঁদের পকেটে যাবে না। বাকিটা যাবে উমিচাঁদের তহবিলে।
হলওয়েল॥	কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?
ড্রেক॥	দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি। (বেরিয়ে গেল)
ওয়াট্‌স॥	শুধু উমিচাঁদের দোষ দিয়ে কি লাভ? মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ কে হাত পেতে নেই?
কিলপ্যাট্রিক॥	দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ফরাসিরা।

হলওয়েল॥ কিছু না, কিছু না। হাজার হাতে হাজার হাজার হাত তেকে নিয়ে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে? বিপদ সেখানে নয়। বিপদ হল বখরা নিয়ে মনান্তর ঘটলে। (ড্রেকের প্রবেশ)

ড্রেক॥ (উমিচাঁদের চিঠি বার ক'রে) আর একটা জরুরী খবর আছে উমিচাঁদের চিঠিতে। শওকতজঙ্গের সঙ্গে সিরাজ-উ-দ্দৌলার লেগে গেল বলে। এই সুযোগ নেবে মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল। তারা শওকতজঙ্গকে সমর্থন করবে।

ওয়াট্স॥ খুব স্বাভাবিক। শওকতজঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। ভাৎ কেয়ে নাচওয়ালীদের নিয়ে সারাক্ষণ সে পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা যার যা খুশি তাই করতে পারবে।

ড্রেক॥ আগে ভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট পাঠানো উচিৎ বলে আমার মনে হয়।।

কিলপ্যাট্রিক॥ I second you

ওয়াট্স॥ তা পাঠান। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবেনা?

ড্রেক॥ (আরদালি) বাত্তি লে আও।

হলওয়েল॥ নবাবের কয়েদখানায় থেকে এ দু'দিনে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি। আপনাদের অবস্থা কি ততটাই খারাপ?

ড্রেক॥ Not so bad I hope.

ড্রেক॥ (আর্দালী একটা বাতি রাখলো)

ড্রেক॥ পেগ লাগাও।

নেপথ্যে॥ জাহাজ-জাহাজ আসছে।

চারজনে সমস্বরে। কোথায়? From which side.

নেপথ্যে॥ সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে। দু'খানা, তিন খানা, চার কানা, পাঁচখানা। পাঁচখানা জাহাজা। কোম্পানীর জাহাজ!
(আর্দালী বোতল আর গ্লাস রাখল টেবিলে)

ড্রেক॥ কোম্পানীর জাহাজ? Must be from Madras. Let us celebrate. Hip Hip Hurray.

সমস্বরে॥ Hurray

(সবাই গ্লাসে মদ ঢেলে নিল)

বস্তুসংক্ষেপ

নবাবের সৈন্যবাহিনীর সাড়া খেয়ে কোম্পানীর সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক প্রমুখ সেনাপতি দলবলসহ ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে আশ্রয় নেয়। চরম দুরবস্থার মধ্যে তাদের দিন কাটতে থাকে। খাদ্যের অভাবই তারের সবচেয়ে বেশি দু:শ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। এই দুরবস্থার মাঝেও সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের কোন শেষ নেই। কীভাবে সিরাজকে পরাজিত করা যায় এটাই তাদের সকল চিন্তার মূল কথা। অবশ্য এক্ষেত্রে এ-দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কর্মকান্ডই তাদের আশান্বিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে চিত্রিত ইংরেজ সেনাপতি ও তাদের বাহিনীর দুর্দশার চিত্র বর্ণনা করুন।
২. রমনীর চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।
৩. ড্রেক এর কাছে লেখা উমিচাঁদের চিঠির মূল বক্তব্য কি?
৪. দূর থেকে জাহাজ আসতে দেখে ইংরেজ সৈন্যদের মনোভাবে যে পরিবর্তন ঘটলো, তার পরিচয় দিন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে চিত্রিত ইংরেজ সেনাপতি ও তাদের বাহিনীর দুর্দশায় চিত্র বর্ণনা করুন।

উত্তর ॥ নবাবের সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে কোম্পানীর সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। কলকাতা পরিত্যাগ করে কিলপ্যাট্রিক ও তার দলবল ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সকলের চরম দুরবস্থা। খাবার প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। গোপনে চোরাচালানের মাধ্যমে আসা সামান্য কিছু খাবারে তাদের দিন কেটে যায়। পরিধেয় বস্ত্রেরও একই অবস্থা। সকলেরই একটি মাত্র কাপড় সম্বল। রমণীর সংলাপে ইংরেজদের এই দুর্দশার চিত্র ধরা পড়েছে এভাবে–

'ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে ত নিজেদের ভেতরে ঝগড়া। এ দিকে দিনের পর দিন একবেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে, অহোরাত্র এক কাপড় পরে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার যোগাড়। ... এক প্রস্থ জামা-কাপড় সম্বল। ছেলে-বুড়ো সকলেরই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়। কোনো আড়াল নেই, আব্রু নেই।

প্রশ্ন ঃ ড্রেক-এর কাছে লেখা উমিচাঁরের চিঠির মূল বক্তব্য কি?

উত্তর ॥ ড্রেক-এর কাছে লেখা উমিচাঁদের চিঠিতে ধরা পড়েছে তার দেশদ্রোহিতা এবং স্বার্থপরতার চিত্র। চিঠিতে সে লিখেছে যে, সে চিরকালই ইংরেজদের বন্ধু। তাই ইংরেজদের এই বিপদের মুহূর্তে সে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে চায়। এ-উদ্দেশ্যে কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে টাকা দিয়ে বশ করেছে সে। ইংরেজরা যাতে কলকাতায় পুনরায় ব্যবসা করতে পারে, সে ব্যবস্থাও মানিক চাঁদের মাধ্যমে করে রেখেছে উমিচাঁদ। তার এই দেশদ্রোহিতা ও স্বার্থপরতা এতই দৃষ্টিকটু যে ড্রেক পর্যন্ত এ-কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন– মানিক চাঁদকে হাত করা ছাড়াও উমিচাঁদের চিঠিতে আর একটা জরুরি সংবাদ ছিল। সে জানিয়েছে যে, সিরাজ-উ-দ্দৌলার সঙ্গে শওকতজঙ্গের বিরোধ বাধা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল সিরাজ-শওকতজঙ্গের বিরোধের সময় শওকতজঙ্গকে সমর্থন করবে। ফলে সিরাজের পতন ত্বরান্বিত হবে। এইসব সংবাদ ইংরেজ সেনাপতিদের নতুন করে আক্রমণ রচনায় উৎসাহ সঞ্চার করেছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. লোকবল বাড়ুন আর না বাড়ুক আহার্যের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।
২. প্রাণ বাঁচবে কি করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।
৩. দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ডাচ আর ফরাসিরা।
৪. কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?

উত্তর

লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আহার্যের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। নবাবের সৈন্য কর্তৃক তাড়া খেয়ে ভাগীরথী নদীর উপর ভাসমান জাহাজে বসে নিজেদের চরম দুরবস্থা এবং আহার্যের অভাব প্রসঙ্গে মার্টিন ও ড্রেক-কে উদ্দেশ্য করে হ্যারী আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করে।
নবাবের সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে কোম্পানীর সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। কলকাতা পরিত্যাগ করে কিলপ্যাট্রিক ও তার দলবল ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে দিন কাটাতে থাকে। সকলের চরম দুরবস্থা। কোথাও কোন খাবার পাওয়া যায় না। গোপনে চোরাচালানের মাধ্যমে আসা সামান্য কিছু খাবারে তাদের দিন কেটে যায়। জাহাজে সামান্য যে খাবার আছে, তা দিয়ে বেশি দিন চলবে না। এমন সময় মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে কিলপ্যাট্রিক এই সংবাদ দিয়েছে যে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখান থেকে বেশ কিছু সৈন্য শীঘ্রই জাহাজে করে কলকাতা পৌঁছবে। একথা শুনে ড্রেক ব্যতীত কেউই খুশী হতে পারেনি। কেননা, হয়তো দুশো আড়াইশোর মতো সৈন্য আসবে মাদ্রাজ থেকে। যে কজন সৈন্য আসবে, তারা আদৌ কোন লোকবল বৃদ্ধি করবে না; বরং উল্টো তারা খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি করবে। এই সংলাপের মাধ্যমে ইংরেজদের দুরবস্থার স্বরূপ এবং হ্যারীর মননশীল কৌতুক প্রবণতার পরিচয় এক সঙ্গেই পাওয়া যায়।

প্রাণ বাঁচবে কি করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌরা’ নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। জনৈকা রমনীর সংলাপে মাধ্যমে এখানে ইংরেজ সৈন্যদের চরম অসহায়তা এবং দুরবস্থার ছবি উপস্থাপিত হয়েছে।
নবাবের সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে কোম্পানীর সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। কলকাতা পরিত্যাগ করে কিলপ্যাট্রিক ও তার দলবল ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে দিন কাটাতে থাকে। সকলের চরম দুরবস্থা। কোথাও কোন খাবার পাওয়া যায় না। গোপনে চোরাচালানের মাধ্যমে আসা সামান্য কিছু খাবারে তাদের দিন দুর্বিষহভাবে কেটে যায়। এইসব বিপদের মাঝেও কীভাবে নবাবকে আক্রমণ করা যায়, সে সম্পর্কে ড্রেক মন্ত্রণা সভা ডেকেছে। কিন্তু সভায় মার্টিনসহ সকলেই ড্রেকের নির্দেশে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ কারণে মার্টিনকে উদ্দেশ্য করে ড্রেক বলে যে, সে ইচ্ছা করলে যে কোন মুর্হূতে মার্টিনকে কয়েদখানায় বন্দী করতে পারে। একথা শুনে ব্যঙ্গ আর কৌতুকে নিজেকে প্রকাশ করেন জনৈকা রমনী। রমনী বলেন যে, যে সৈন্য যুদ্ধের সময় মেয়েদের নৌকায় করে পালিয়ে যায়, সে এখন আবার অন্য কয়েদখানায় বন্দী করার হুমকি দেয়। একথা শুনে ড্রেক তাকে ধমক দেয়। ড্রেক বলে, যে, এখন অধিবেশন হচ্ছে। তাই রমনীর কোন কথাই এখানে শোভন নয়। কিন্তু ড্রেকের কথায় এতটুকুও ভড়কে না গিয়ে সে উল্টো করে বলে যে- প্রাণ বাঁচবে কি করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব। রমনীর এই সংলাপের মাধ্যমে ইংরেজ সৈন্যদের চরম অসহায়তার কথা, দুর্বিষহ জীবনের কথা প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘসেটী বেগম প্রমুখের ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে পারবেন।
- শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্যোগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- সিরাজের চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
	প্রথম অংক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

তাম্বুল – পান।
তাম্রকুট – তামাক।
মেহমান – অতিথি।
জবরদস্ত – শক্তিশালী, জোরালো।
কেরামতি –ক্ষমতা, শক্তি, প্রতাপ।
ধান্দা – ধাঁধা, ধোঁকা, প্রতারণা। এখানে জীবিকার প্রচেষ্টা।
সরগরম – জমজমাট, পরিপূর্ণ।
তারিফ – প্রশংসা।
ওয়াকিফহাল – বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত বা অভিজ্ঞ।
কালোয়াতী – উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে নৈপুণ্য; রাগ সঙ্গীতে পারদর্শিতা।
রাইসুল জুহালা – ইতিহাস সিদ্ধ নারান সিংহ (নারায়ণ সিংহ) চরিত্র সিকান্দার আবু জাফরের হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে কৌতুক-চরিত্র রাইসুল জুহালা। রাইসুল জুহালা সাহসী, বুদ্ধিমান এবং কৌশলী, সর্বোপরি তিনি দেশপ্রেমিক। নারান সিংহ ছদ্মবেশ ধারণ করে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের খবর নবাবকে জানাতেন।
রাজবল্লভ – বিশ্বাসঘাতক এবং অর্থলোলুপ মন্ত্রী। রাজবল্লভ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী। ঢাকায় জাহাজী যৌক্তি বিভাগে কেরানীর চাকরি করতেন। পরবর্তীকালে 'রাজা' উপাধি পান। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে রাজবল্লভ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজবল্লভের বিশ্বাস

সময় ঃ ১৭৫৬ সাল ১০ইই অক্টোবর। স্থান ঃ ঘসেটী বেগমের বাড়ী।

চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে গসেটী বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রাইসুল জুহালা, রায় দুর্লভ, প্রহরী, সিরাজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকগণ।)

প্রৌঢ়া ঘসেটী বেগম জাঁকজমপূর্ণ জলসার সাজে সজ্জিতা। আসরে উপস্থিত রাজবল্লভ, জগৎশেট, রায়দুর্লভ, বাদক এবং নর্তকী। সুসজ্জিত খানসামা তাম্বুল এবং তাম্রকুট পরিবেশন করছে। একজন বিচিত্র বেশী অতিথি রাইসুল জুহালার সঙ্গে আসরে প্রবেশ করল উমিচাঁদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ের নাচ শেষ হল। সকলের হাততালি।)

ঘসেটী॥ বসুন উমিচাঁদজী। সঙ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলেই মনে হচ্ছে।

উমিচাঁদ॥ (যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে) মাফ করবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদস্ত শিল্পী। আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় কিন্তু তাতেই আমি এঁর কেরামতিতে একেবারে মুগ্ধ। আজকের জলসা সরগরম করে তুলতে পারবেন আশা করে এঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

রাজবল্লভ॥ তা'হলেও এখানে একজন অপরিচিত মেহমান-

উমিচাঁদ॥ না না সে সব কিছু ভাবতে হবে না। দরিদ্র শিল্পী, পেটের ধান্দায় আসরে জলসায় কেরামতি দেখিয়ে বেড়ান।

জগৎশেঠ॥ তা হলে আরম্ভ করুন ওস্তাদজী। দেখি নাজওয়ালীদের ঘুংগুর এবং ঘাগরা বাদ দিয়ে আপনার কাজের তারিফ করা যায় কিনা।

(ঘসেটী ও রাজবল্লভের দৃষ্টি বিনিময়। আগন্তুক আসরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল)

রাজবল্লভ॥ ওস্তাদজীর নামটা-

আগন্তুক॥ রাইসুল জুহালা॥ (সকলের উচ্চহাসি)

রায়দুর্লভ॥ জাহেলদের রইস। এই নামের গৌরবেই আপনি উমিচাঁদজীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?

(আবার সকলের হাসি)

উমিচাঁদ॥ (ঈষৎ রুষ্ট) আমি ত বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ কেয়েও গোপ মুকনো রাকেন, আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ির কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।

ঘসেটী॥ আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন। শুরু করুন ওস্তাদজী।

রাইসুল জুহালা ॥ য্যায়সা হুকুম। আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদব কায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। আপততঃ আমি আপনাদের একটা নাচ দেখাবো। পক্ষীকূলের একটি বিশেষ শ্রেণী, ধার্মিক হিসাবে যার জবরদস্ত না, সেই পাখীর নৃত্যকলা আপনারা দেখবেন। দেমের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই বিশেষ নৃত্যটি আমি জনপ্রিয় করতে চাই। (তবলচীকে) একটু ঠেকা দিয়ে দিন। (তাল বলে দিল। নৃত্য শুরু করল। নৃত্য চলাকালে ঘসেটী এবং রাজবল্লভ নিচুস্বরে পরামর্শ করলেন। পরে উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভ কিছু আলোচনা করলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)

রাজবল্লভ ॥ ওস্তাদজী জবরদস্ত লোক মনে হচ্ছে। ওঁকে আরও কিছু কেরামতি দেখাবার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?

(উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু বলল। তারপর

ঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

রায়দুলর্ভ (দুর্লভ রাম) – রাজা জানকীরামের পুত্র রায়দুর্লভ। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে রায়দুর্লভও গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরন তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। অবশেষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপে তিনি কলকাতা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

অকর্মণ্য – যে কোন কাজ করে না। কর্মক্ষম নয় এমন। অপটু।

ভাঙের গেলাস – ভাঙ নামক এক প্রকার নেশার কথা বলা হয়েছে।

ধনকুবের – ধনবান, বিত্তশালী।

একরারনামা – স্বীকারনামা বা কবুলনামা।

সিপাহসালার – সেনাপতি।

দত্তলৎ – দৌলত, ধন-সম্পদ।

রোশনাই – জ্যোতি, আলো।

দেউড়ি – উঠান।

ইতস্ততঃ – দ্বিধা, সঙ্কোচ।

রাজদ্রোহিতা – রাজা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

জাঁহাপনা – মহারাজ, সম্রাট, বাদশা।

কেয়ামত – ইসলাম ধর্মমতে প্রলয়ের দিন। প্রলয়, ধ্বংস।

নাজেল – অবতরণ, আবির্ভাব।

নিজের আসনে ফিরে এলো)

উমিচাঁদ ॥ উনি রাজী আছেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কলাকৌশল দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারখানা চিঠিপত্রের আদান প্রদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।

রাজবল্লভ ॥ তা'হলে এখন ওঁকে বিদায় দিন। পরে দরকার মত কাজে লাগানো হবে।

রাইসুল জুহালা॥ বহোত আচ্ছা হুজুর।

(সবাইকে সালাম করে কালোয়াতী করতে করতে বেরিয়ে গেল)

ঘসেটী ॥ তা'হলে আবার নাচ শুরু হোক?

রাজবল্লভ ॥ আমার মনে হয় নাচওয়ালীদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে কাজের কথা সেরে নেওয়াই ভালো।

ঘসেটি॥ তাই হোক

(ইঙ্গিত করতেই দলবল সহ নাচওয়ালীদের প্রস্থান)

রায়দুর্লভ॥ বেগম সাহেবাই আরম্ভ করুন।

ঘসেটী॥ আপনারা তো সব জানেন। এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।

জগৎশেঠ॥ সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে আমরা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েই দিইছি। কিন্তু শওকতজঙ্গ নবাব হলে আমি কি পাবো তা আমাকে পরিষ্কার করে বলুন।

ঘসেটি॥ শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবী পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।

রায়দুর্লভ॥ এটা কোনো কথা হল না। যিনি নবাব হবেন-

জগৎশেঠ॥ আমার কথা আগে শেষ হোক দুর্লভরাম।

রায়দুর্লভ॥ বেশ আপনার কথাই শেষ করুন। কিন্তু মনে রাখবেন কথা শেষ হবার পর আর কোনো কথা উঠবে না।

জগৎশেঠ॥ সে আবার কি কথা?

রাজবল্লভ॥ আপনারা তর্কের ভিতরে যাচ্ছেন আলোচনা শুরু করার আগেই। খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করা দরকার। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের আলোচনা দীর্ঘ করা বিপদজনক।

জগৎশেঠ॥ কথা ঠিক। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও তা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাফ করবেন বেগম সাহেবা, আমি খোলাখুলিই বলছি। অস্বীকার করে লাভ নেই যে শওকতজঙ্গ নিতান্তই অকর্মণ্য। ভাংয়ের গেলাম এবং নাচওয়ালী ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কাজেই শওকতজঙ্গ নবাব হবে নামমাত্র। আসল কর্তৃত্ব থাকবে বেগম সাহেবার এবং পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন।

রায়দুর্লভ॥ ঠিক এই ধরনের একটা সম্ভাবনার উল্লেখ করার ফলেই হোসেনকুলি খাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

জগৎশেঠ॥ আমি তা বলছিনে। তাছাড়া এখানে সে কথা অবান্তর। আমি বলতে চাইছি যে, শওকতজঙ্গ নবাবী পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।

ঘসেটী॥ ধনকুবের জগৎশেঠকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজঙ্গের যুদ্ধের খরচ

চলবে কি করে?

জগৎশেঠ॥ না না আমি নগদ টাকা চাইছি নে। যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আমি দেবো অবশ্য আমার যা সাধ্য। কিন্তু আসল এবং লাভ মিলেয়ে আমাকে একটা কর্জনামা সই করে দিলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি।

রায়দুর্লভ॥ আমাকেও পদাধিকারের একটা একরারনামা সই করে দিতে হবে।

(প্রহরীর প্রবেশ। ঘসেটী বেগমের হাতে পত্র দান)

ঘসেটী॥ (চিঠি খুলতে খুলতে) সিপাহসালার মীরজাফরের পত্রএত পড়তে) তিনি শওকতজঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।

রাজবল্লভ॥ বহোতখুব।

উমিচাঁদ॥ আমার তো কোন বিষয়ে কোনো দাবী দাওয়া নেই। আমি সকলের খাদেম। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিই। কাজেই এতক্ষণ আমি চুপ করেই আছি।

ঘসেটী॥ আপনারও যদি কিছু বলার থাকে এখুনি বলে ফেলুন।

উমিচাঁদ॥ নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বলছি। ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখুনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তাঁর অবধারিত।

ঘসেটী॥ সিরাজের পতন কে না চায়?

উমিচাঁদ॥ কিছুমাত্র নয় বেগম সাহেবা। দওলৎ আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী। তা না হলে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে বাতিল করে শওকতজঙ্গকে চাইব কেন? আমি কাজ কতদূর এগিয়ে এসছি এই দেখুন তার প্রমাণ। (পকেট থেকে চিঠি বার ক'রে ঘসেটী বেগমের হাতে দিল)

ঘসেটী॥ (চিঠির নীচে স্বাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে) এ যে ড্রেক সাহেবের চিঠি।

উমিচাঁদ॥ আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে তিনি জবাব দিয়েছেন।

ঘসেটী॥ (পত্র পড়তে পড়তে) লিখেছেন শওকতজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাবাহিনীতে যেন বিদ্রোহ ঘটানো হয়। আমাদের মিত্র সেনাপতিদের অধীনস্থ ফৌজ যেন রাজধানী আক্রমণ করে। তা'হলে সিরাজ-উ-উদ্দৌলার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

রাজবল্লভ॥ আমাদের বন্ধু সিপাহসালার মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ইচ্ছে করলেই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

(হঠাৎ বাইরে তুমুল কোলাহল। সকলেই সচকিত। ঘসেটী বেগম কোলাহলের কারণ কানবার জন্যে বাইরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাহির থেকে নবাব শব্দটি কানে যেতেই রাজবল্লভ তাঁকে থামেয়ে দিয়ে নাচওয়ালীদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে কামরায় এলো।)

রাজবল্লভ॥ আরম্ভ করো জলদি। (ঘুংঘুরের আওয়াজ উঠবার পর পরই সবেগে কামরায় ঢুকলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। পেছনে মোহনলাল। সবাই তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়ালো। নাচওয়ালীদের নাচ থেমে গেলো।

ঘসেটী॥ (ভীতিরুদ্ধ কণ্ঠে) নবাব!

সিরাজ॥ কি ব্যাপার খালাআম্মা, বড়ো ভারী জলসা বসিয়েছেন?

ঘসেটী॥ (আত্মস্থ হয়ে) এ রকম জলসা এই নতুন নয়।

সিরাজ॥ তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই শুধু শামিল হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন।

ঘসেটী॥ নবাব কি নাচগানের মজলিস মানা করে দিয়েছেন?

সিরাজ॥ নাচগানের মহফিলের জন্যে দেউড়িতে কড় পহাড়া বসিয়ে রেখেছেন খালাআম্মা। তারা ত আমার ওপরে গুলিই চালিয়ে দিয়েছিল প্রায়। দেহরক্ষী ফৌজ সঙ্গে না থাকলে এই জলসায় এতক্ষণে মর্সিয়া শুরু করতে হ'ত।

(হঠাৎ কণ্ঠস্বরে অবিচল তীব্রতা ঢেলে)

রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, আপনারা এখন যেতে পারেন। মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালে মত ভেঙ্গে দিলাম। (ঘসেটী বেগমকে) তৈরী হয়ে নিন খালাআম্মা। আপনাকে আমি প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার চারিদিকে যড়যন্ত্রের জাল। এ সময়ে নবাবের খালাআম্মার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

ঘসেটী॥ (রোষে চীৎকার করে) তুমি আমাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছো? তোমার এতখানি স্পর্ধা?

সিরাজ॥ এতে ক্রুদধ হবার কি আছে? আম্মা আছেন, আপনিও তাঁর সঙ্গেই প্রাসাদে থাকবেন।

ঘসেটী॥ মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না। তোমার প্রাসাদে যাবো? (তোমার প্রাসাদ বাজ পড়ে খান খান হয়ে যাবে। (সহসা কাঁদতে আরম্ভ করলেন)

সিরাজ॥ (অবিচলিত) তৈরী হয়ে নিন খালাআম্মা। আপনাকে আমি নিয়ে যাবো।

ঘসেটী॥ (মাতম করতে করতে) রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেট, বিধবার ওপরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না?

রাজবল্লভ॥ (একটু ইতস্ততঃ করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই-

সিরাজ॥ (উত্তপ্ত) আপনাদের চলে যেতে বলেছি রাজা রাজবল্লভ। নবাবের হুকুম অমান্য করা রাজ দ্রোহিতার শামিল। আশা করি অপ্রিয় ঘটনার ভেতর দিয়ে তা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

(রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রস্থানোত্যত) হ্যাঁ, শুনুন রায়দুর্লভ, শওকতজঙ্গকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করেছি। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি তৈরী থাকবেন। প্রয়োজন হলে আপনাকেও মোহনলালের অনুগামী হতে হবে।

রায়দুর্লভ॥ হুকুম জাঁহাপনা। (তারা নিষ্ক্রান্ত হ'ল। ঘসেটী বেগম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন)

সিরাজ॥ মোহনলাল আপনাকে নিয়ে আসবে খালাআম্মা। আপনার কোনো রকম অমর্যাদা হবে না।

বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন)

ঘসেটী॥ তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে সিরাজ। নবাবী? নবাবী করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব- দেখব।

বস্তুসংক্ষেপ

নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটী বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। নিজের বাড়িতে সহচরদের ডেকে তিনি ষড়যন্ত্র করছিলেন। ঘসেটী বেগমের বাড়িতে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ। এমন সময় রাইসুল জুহালাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় উমিচাঁদ। রাইসুল জুহালা ছদ্মবেশে এসে নৃত্য পরিবেশন করে। কিন্তু সেদিকে কেউ তেমন নজর না দিয়ে সকলেই সিরাজকে পদচ্যুত করার কৌশল সন্ধান করছিল। সকলেই একমত হল যে সিরাজের বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে নবাব হিসেবে দাঁড় করাতে পারলে কাজটা অনেক সহজ হবে। এক্ষেত্রে ইংরেজদেরও সহায়তা পাওয়া যাবে। কিন্তু এ প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও সকলেই নিজ নিজ স্বার্থের কথা বলছিল। তাদের কথাবার্তায় অর্থলোলুপতা প্রকাশ পেয়েছে। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। সিরাজকে দেখে সকলেই চমকিত ও বিস্মিত হলো। দূতের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে সিরাজ ঘসেটী বেগমের বাড়ির জলসা ভেঙে দিলেন। ঘসেটী বেগমকে তিনি নিজ প্রাসাদে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। তার এই প্রস্তাবে ঘসেটী বেগম ক্রোধান্বিত হলেন ও সিরাজকে অভিশাপ দিতে থাকলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘসেটী বেগম প্রমুখের ষড়যন্ত্রের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্যোগ উল্লেখ করুন।
৩. বর্তমান দৃশ্যে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে, তা লিপিবদ্ধ করুন।
৪. সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটী বেগমের মনোভাব ব্যক্ত করুন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধ পক্ষের উদ্যোগ উল্লেখ করুন।

উত্তর ॥ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটী বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। তার বাড়িতেই সিরাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছে। নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার কৌশল হিসেবে তারা শওকতজঙ্গকে নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসানোর প্রয়াস নিয়েছে। রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, ঘসেটী বেগম সকলেই শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাতে চায়। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। ঘসেটী বেগমের কাছে লেখা পত্রে মীরজাফরও শওকতজঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। মীরজাফর অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য শওকতজঙ্গকে পরামর্শ দিয়েছেন। উমিচাঁদের সংলাপে তাদের ষড়যন্ত্রের মূল কথা প্রকাশ পেয়েছে। ঘসেটী বেগমকে উদ্দেশ্য করে উমিচাঁদ বলেছে – "নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে, তাই বলছি। ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজ-উ-দ্দৌলা পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখুনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তার অবধারিত।" এভাবে দেখা যায়, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার অতি নিকটজন ও অমাত্যরাই তাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসানো নয়, বরং সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়াই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ঃ সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটী বেগমের মনোভাব ব্যক্ত করুন।

উত্তর ॥ নবাব সিরাজ-উ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটী বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। তাঁর বাড়িতেই সিরাজ বিরোধী ব্যক্তিদের গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছে। নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার কৌশল হিসেবে তারা শওকতজঙ্গকে নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসানোর প্রয়াস নিয়েছে। গুপ্তচরের মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে সিরাজ-উ-দ্দৌলা আকস্মিকভাবে ঘসেটী বেগমের বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি ঘসেটী বেগমের বাড়ির জলসা ভেঙ্গে

দেন এবং ঘসেটী বেগমকে প্রাসাদে চলে যাবার অনুরোধ করেন। কিন্তু সিরাজের এ আচরণে ঘসেটী বেগম ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন এবং তাকে বন্দী করতে এসেছে এই অভিযোগে সিরাজকে অভিশাপ দিতে থাকেন। সিরাজকে উদ্দেশ্য করে ঘসেটী বেগম ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছে– "তুমি আমাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছ? তোমার এতখানি স্পর্ধা?" সিরাজের বিনয় ভাষণও তাকে শান্ত করতে পারেনি। তাই সিরাজের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করেছেন এই অভিশাপ–

"তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে সিরাজ। নবাবী? নবাবী করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব – দেখব।"

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. আমিত বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরশুদ্ধ দুধ খেয়েও গোঁফ শুকনো রাখেন, আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ি কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।
২. নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
৩. দওলৎ আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দওলতের পূজারী।
৪. বাংলাদেশের সেরা লোকেরই শুধু শামিল হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

উত্তর

দওলৎ আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড় আমি দওলতের পূজারী।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। ঘসেটী বেগমকে উদ্দেশ্য করে উমিচাঁদের এই সংলাপে তার অর্থলোলুপ মানসিকতার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

নবাব সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটী বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। তার বাড়িতেই সিরাজ বিরোধী ব্যক্তিদের গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার কৌশল হিসেবে তারা শওকতজঙ্গকে নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসানোর প্রয়াস নিয়েছে। রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাদ, ঘসেটী বেগম সকলেই শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাতে চায়। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার প্রসঙ্গ এলো, তখন সবার মধ্যেই দেখা দিল স্বার্থ চিন্তা। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানই তখন তাদের সামনে প্রাধান্য বিস্তার করে। এ অবস্থায় ঘসেটী বেগমের কাছে উমিচাঁদ প্রকাশ করে তার অর্থলোভী মনোভাব। সে বলে যে অর্থ ও দৌলত তার কাছে ঈশ্বর। অর্থ ছাড়া অন্য কিছুই সে বোঝে না, সে একমাত্র অর্থেরই পূজারী। শওকতজঙ্গকে নবাব বানানো হলে সে কত টাকা পাবে, তা আগে নিশ্চিত হয়েই সে কাজে নামতে চায়। এই সংলাপের মাধ্যমে উমিচাঁদের অর্থলোভী স্বভাব প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ইউনিট ৩

ভূমিকা

নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত করার জন্য তাঁর অধিকাংশ সভাসদ ও কোম্পানীর ষড়যন্ত্রের কোন শেষ নেই। পূর্ববর্তী ইউনিটে সিরাজের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের কথা আপনি জানতে পেরেছেন। এইসব ষড়যন্ত্রের কথা সিরাজ যে মোটেই জানেন না, তা নয়। গুপ্তচরের মাধ্যমে তিনি ষড়যন্ত্রের সকল সংবাদই জেনেছেন। কিন্তু দৃঢ়হস্তে এইসব ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করার জন্য সিরাজ কখনোই কঠোর হতে পারেননি। দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্যত্রয়ে আপনি সিরাজের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র এবং একই সঙ্গে সিরাজের শিথিল শাসনব্যবস্থার কথা জানতে পারবেন।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা সম্পর্কে তাঁর পারিষদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধির মনোভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
২. নবাবের বিরুদ্ধে তাঁর পারিষদবর্গের গভীর ষড়যন্ত্রের বিবরণ দিতে পারবেন।
৩. নবাবের পারিষদবর্গ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধির স্বার্থচিন্তা ও ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের জন্য কর্ম পরিচালনার বিষয় বিস্তারিত তাতে লিখে জানাতে পারবেন।
৪. নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ও তার পারিষদবর্গের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কতিপয় দিক উল্লেখ করতে পারবেন।
৫. সিরাজের পক্ষের সেনাপতিদের দেশপ্রেম ও সাহসের পরিচয় দিতে পারবেন।
৬. প্রজাদের প্রতি সিরাজ -উ-দ্দৌলার ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
৭. সিরাজ-উ-দ্দৌলার দেশপ্রেমের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- প্রজাদের প্রতি নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার গভীর ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রজাদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতে পারবেন।
- সিরাজ-উ-দ্দৌলার চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারবেন।
- সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর সভাসদ এবঙ কোম্পানীর প্রতিনিধি মি. ওয়াট্সের মনোভাব লিপিবদ্ধ করতে পারবেন এবং
- সিরাজ-উ-দ্দৌলার সভাসদদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

☞	মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নকীব – তুর্যবাদক। ঘোষক। **সিপাহসালার** – সেনাপতি। সৈন্যাধক্ষ।	**দ্বিতীয় অংক ॥ প্রথম দৃশ্য** সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ১০ই মার্চ। স্থান ঃ নবাবের দরবার। [চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে নকীব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মীরজাফর,

ডুকরে – ফুঁপিয়ে কাঁদা।
জালিম – অত্যাচারী, শোষক।
পোয়াতি – সন্তানসম্ভবা।
অনাচার – বিশৃঙ্খলা, ন্যায়-নীতিহীনতা, যথেচ্ছাচার।
কৈফিয়ত – জবাবদিহি, নিজ দোষের কারণ প্রদর্শন।
ইজারাদার – কর বা খাজনা আছে এমন জমির ইজারা নেয় যে।
ঠিয়ালদের – কোম্পানীর প্রতিনিধি, যারা কুঠিতে বাস করেন।
প্রশ্রয় – আশকারা, লাই, আদর।
তারিফ – প্রশংসা।
বরখাস্ত –অপসারণএয়দখানা – বন্দিশালা, কারাগার।
সম্প্রীতি – সুসম্পর্ক, ভালো সম্পর্ক।
উঠকণ্ঠিত – চিন্তিত।
খেলাপ – অমান্য।
কুর্নিশ – সালাম, অভিবাদন।
গুপ্তচর – গোয়েন্দ, গোপনে যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহ করে।
নতজানু – আত্মসমর্পণ।
আজ্ঞাবহ – যে আজ্ঞা বা আদেশ পালন করে।

জগৎশেঠ,রায়দুর্লভ, উৎপীড়িত ব্যক্তি, প্রহরী ওয়াট্স, মোহনলাল।]

(দরবারে উপস্থিত মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্স। মোহনলাল, মীরমদন, সাঁফ্রে অস্ত্রসজ্জিত বেশে দন্ডায়মান। নকীবের কণ্ঠে দরবারে নবাবের আগমন ঘোষিত হ'ল)।

নকীব॥ নবাব মনসুর-উল-মুলক সিরাজ-উ-দ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মীর্জা মুহম্মদ হয়বতজঙ্গ বাহাদুর। বা-আদাব আগাহ বাশে'দ।

(সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব ঢুকলেন। সবাই নতশিরে শ্রদ্ধা জানালো।

সিরাজ॥ (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে কয়েকটি জরুরী বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।

রাজবল্লভ॥ বে-আদবী মাফ করবেন জাঁহাপনা। দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জরুরী বিষয়ের মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন-

সিরাজ॥ গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। আমার পথ বিঘ্ন সঙ্কুল হয়ে উঠবে না। অন্ততঃ নবাব আলিবর্দীর অনুরাগ জনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।

মীরজাফর॥ জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?

সিরাজ॥ আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।

জগৎশেঠ॥ আপনার অপরাধ।

সিরাজ॥ পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজী? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

রায়দুর্লভ॥ একি! এর এই অবস্থা কে করলে?(তরবারি নিষ্কাশন)

সিরাজ॥ তরবারি কোষবদ্ধ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বলশাসন।

উৎপীড়িত॥ আমাকে শেষ করে দিয়েছে হুজুর।

মীরজাফর॥ আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছিনে জাঁহাপনা।

উৎপীড়িত॥ লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। (ক্রন্দন)

সিরাজ॥ (সিংহাসনের হাতলে ঘুষি মেরে) কেঁদনা। শুকনো খটখটে গলায় বলো আর কি হয়েছে। আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।

উৎপীড়িত॥ লবণ বিক্রি করি নি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষন্ডা ষন্ডা পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে ওহ হো হো (কান্না)- আমি দেখতে চাই নি। কিন্তু চোখ বুজলেই ওদের আর একজন আমার নখের ভেতরে খেজুর কাঁটা ফুটিয়েছে।

আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল)

সিরাজ॥ (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াট্‌সের কাছে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে) ওয়াট্‌স!

ওয়াট্‌স॥ (ভয়ে বিবর্ণ) Your Excellency.

সিরাজ॥ আমার নিরীহ প্রজাটির এই দুরবস্থার জন্যে কে দায়ী? How can I know that your Excellency? আমি কি করে জানব?

সিরাজ॥ তুমি কি করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কাছে পৌঁছায় না ভেবেছো? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতকগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।

ওয়াট্‌স॥ আপনি আমায় অপমান করছেন Your Excellency. দেশের কোথায় কি হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কি করে? আমি ত আপনার দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি।

সিরাজ॥ তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনে ভেবেছো? দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃংখলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের জন্য তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পার নি। কৈফিয়ৎ দাও, আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?

ওয়াট্‌স॥ আপনার প্রজাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক। আমরা ট্যাক্স দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।

সিরাজ॥ ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য করো বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকারও তোমরা পাওনি।

(সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে)

এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। স্থানীয় লোকদের তৈরী যাবতীয় লবণ তারা তিন চার আনা মণ দরে পাইকারী হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।

মীরজাফর॥ এ তো ডাকাতি।

সিরাজ॥ আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানীকে লবণের ইজারাদারী দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারী দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা। বলুন শেঠজী, বলুন রাজবল্লভ, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কি-না? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কিনা? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী।

(প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল)

রাজবল্লভ॥ জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও চলত।

জগৎশেঠ॥ নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই। তাই-

সিরাজ॥ আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে

দিতে চান এই তো?

মীরজাফর॥ এ-কথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হৃষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।

সিরাজ॥ বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কি রকম আচরণ করা বিধেয় তাও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ কোনো দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল।

(মোহনলাল তরবারি নিষ্কাশন করল)

সিরাজ॥ (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শান্তভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌখিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।

মীরজাফর॥ আমাদের প্রতি নবাবের সন্ধিগ্ধ মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠব।

সিরাজ॥ ওই একটি পথ সিপাহসালার- দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি। আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কিনা?

রাজবল্লভ॥ জাঁহাপনার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। কলকাতায় ওয়াট্‌স এবং ক্লাইভ আলীনগরের সন্ধি খেলাপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখুনি এর প্রতিবিধান করতে না পারলে ওরা একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করবে।

মীরজাফর॥ জাঁহাপনা আমাদের হুকুম করুন।

সিরাজ॥ আমি অন্তহীন সন্দেহ বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বহ হোক আমি একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

মীরজাফর॥ দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

সিরাজ॥ আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনও তুচ্ছ করবেন না।

(সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরীফ দিল। সিরাজ দু'হাতে সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মীরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন। মীরজাফর নতজানু হয়ে দু'হাতে পবিত্র কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন।)

মীরজাফর॥ আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

(সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান শরীফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজল এর পাত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন)।

রাজবল্লভ॥ আমি রাজবল্লভ, তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

রায়দুর্লভ॥ ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।

উমিচাঁদ॥ রামজীকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।
(প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল।)

সিরাজ॥ (ওয়াট্‌সকে) ওয়াসট্‌স।

ওয়াট্‌স॥ Your Excellency.

সিরাজ॥ আলীনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি গুপ্তচরের কাজ করছো। তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যাও দরবার থেকে। ক্লাইভ আর ওয়াট্‌সকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেঈমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দনগর ধ্বংস করেছে। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি তাদের যথাযোগ্যভাবেই দেওয়া হবে।

ওয়াট্‌স॥ Your Excellency.
(কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল)

বস্তু সংক্ষেপ

মুরশিদাবাদের নবারের শাহী দরবারে সভাসদদের নিয়ে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা বসে আছে। সমাজের বিরুদ্ধে সভাসদ এবং কোম্পানীর ষড়যন্ত্রের কথা নবাব জানতে পেরেছেন। তাই একটা মীমাংসা করার জন্য তিনি সভা ডেকেছেন। তিনি অত্যাচারী এবং ষড়যন্ত্রীদের শাস্তি দিতে চান। কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌সের বিরুদ্ধেও ন্যাব অতিরিক্ত কর আদায় এবং অত্যাচারের অভিযোগ এনেছেন। প্রকাশ্য দরবারে সভাসদ ও কোম্পানীর প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সিরাজের অভিযোগ উত্থাপনের জন্যে সকলেই খুব ক্ষিপ্ত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেও উপরে উপরে তারা নবাবের অনুগত আছে বলেই মত প্রকাশ করলো। সিরাজ-উ-দ্দৌলা তাদের প্রকৃত মনোভাব বুঝতে না পেরেই সভা সমাপ্ত করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নিজেকে নিজেই অভিযুক্ত করেছেন কেন?
২. কুঠির সাহেবরা জনৈক প্রজাকে কীভাবে অত্যাচার করেছে?
৩. জালিমদের বিরুদ্ধে নবাবের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

৪. কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌সকে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন?
৫. সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াটস্ সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে কেন ক্ষিপ্ত হলেন?

উত্তর

প্রশ্ন ঃ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নিজেকে নিজেই অভিযুক্ত করেছেন কেন?

উত্তর ।। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা প্রজাবৎসল দয়ালু শাসক। প্রজাদের কীভাবে সুখ ও শান্তি হয়, এই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা। প্রজাদের উপর তিনি কখনোই নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারতেন না। অথচ তাঁর রাজ্যের প্রজারাই আজ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের তাতে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, অতিরিক্ত কর প্রদান করে তারা সর্বস্বান্ত হচ্ছে। শাসক হয়েও কুঠিয়ালদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা ররতে পারেননি বলে, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌরা নিজেই নিজেকে অভিযুক্ত করে বলেছেন- "আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।" এই বলে নবাব নিজেই নিজেকে অভিযুক্ত করেছেন।

প্রশ্ন ঃ কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌সকে সিরজজ-উ-দ্দৌলা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন?

উত্তর ।। কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌সকে সিরাজ-উ-দ্দৌলার প্রজাদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ ও অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। জনৈক প্রজা অল্প মূল্যে কোম্পানীর প্রতিনিধির কাছে লবণ বিক্রি করেনি বলে কোম্পানীর লোকজন তার বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, পাঁচছয় জনে মিলে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে অত্যাচার করে হত্যা করেছে। অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার এই বিবরণ শুনে নবাব সভা ডেকে কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌সের কাছে তাঁর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ওয়াট্‌সকে উদ্দেশ্য করে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন- "…. এদেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পারনি। কৈফিয়ত দাও, আমার নিপীত প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন? … ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য কর বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকারও তোমরা পাওনি।"

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে।
২. আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।
৩. আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাদের জন্য বিচারপ্রার্থী।
৪. অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌখিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।
৫. শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোদ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।
৬. দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

উত্তর

আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অংক প্রথম দৃশ্য থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে প্রজাবৎসল নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার চিত্তলোকে প্রজাদের জন্য গভীর ভালোবাসার কথা অভিব্যক্ত হয়েছে।

সিরাজ-উ-দ্দৌলা গুপ্তচর মারফত জানতে পেরেছেন, কোম্পানীর প্রতিনিধিরা তাঁর প্রজাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করছে। জনৈক প্রজা অল্প মূল্যে কোম্পানীর প্রতিনিধির কাছে লবণ বিক্রি করেনি বলে কোম্পানীর লোকজন তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, পাঁচ ছয় জনে মিলে তার সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে অত্যাচার করে হত্যা করেছে। এ-কথা জেনে সিরাজ-উ-দ্দৌলা খুবই ক্ষিপ্ত হয়েছেন। কোম্পানীর প্রতিনিধিকে ডেকে তিনি তার অভিযোগের কথা জানিয়েছেন। তিনি প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা তার প্রজাদের উপর অত্যাচার করেছে, সেইসব জালিমের বিরুদ্ধে তার প্রজারা যেন অধিকতর নিষ্ঠরতা ও জালিমের পরিচয় দেয়। এই সংলাপের মাধ্যমে প্রজাদের প্রতি নবাবের গভীর ভালোবাসর কথা সঞ্চারিত হয়েছে।

শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

আলোচন্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অংক প্রথম দৃশ্য থেকে উৎকলিত হয়েছে। এই সংলাপের মাধ্যমে দেশের প্রতি সিরাজ-উ-দ্দৌলার গভীর ভালোবাসা এবং একই সঙ্গে তাঁর চরম অসহায়তার কথা ব্যক্ত হয়েছে।
সিরাজ-উ-দ্দৌলা গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, সভাসদ এবং কোম্পানীর লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রজাদের উপর কোম্পানীর লোকদের অত্যাচার দিন দিনই বেড়ে চলেচে। কর ও রাজস্ব আদায়ের নামে তাদের অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অথচা তাঁর সভাসদেরা, তাঁর সহকর্মীরা এ বিষয়ে কিছুই বলছে না, প্রজাদের স্বার্থ নিয়ে তাদের কোন চিন্তা নেই। সিরাজ বুঝতে পেরেছেন, তাঁর সভাসদেরা ক্রমশই তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। এই অবস্থায় প্রজাদের রক্ষা করা এবং কোম্পানীর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তিনি সভাসদদের কাছ থেকে সত্যিকার প্রতিশ্রুতি কামনা করেছেন, যাতে তারা সংগ্রামের সময় নবাবের পাশে থাকেন। সিরাজ কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে বিভ্রান্ত না করার জন্যেও সবার কাছে আকুল প্রার্থনা করেচেন। এই সংলাপের মধ্য দিয়ে গভীরতর অর্থে তাঁর প্রজাবাৎসসেল্যর কথাই প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে তার সভাসদদের ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে পারবেন।
- সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য মীরজাফরের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মীর জাফরের উচ্চাশার কথা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
অগ্নিগিরি – আগুনের পর্বত। **বিদ্বেষ** – হিংসা। **কেয়ামত** – ইসলাম ধর্মমতে প্রলয়ের দিন, প্রলয়, ধ্বংস। **বিনাশ** – ধ্বংস। **অশ্বারোহী** – ঘোড়ার পিঠে চরে যুদ্ধ করে যে সৈনিক।	**দ্বিতীয় অংক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য** সময় ১৭৫৭ সাল, ১৯শে মে। স্থান ঃ মীরজাফরের আবাস। [চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, রাইসুল জুহালা, প্রহরী)] (মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ) জগৎশেঠ॥ সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন। মীরজাফর॥ না শেঠজী, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি। অগ্নিগিরির মত প্রচন্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি । বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা

কর্মপন্থা – কাজ করার প্রক্রিয়া ও পথ।

খোলাসা করা – পরিষ্কার করা, সব কিছু খুলে বলা।

দেউড়ী – বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বার, সদর দরজা।

আলবৎ – অবশ্য, নিশ্চয়।

গর্দান – স্কন্ধ, ঘাড়, গলা।

কন্দকাটা – গলা কাটা।

শাঁশচুন্নী – এক প্রকার ফুতের নাম।

বেনিয়ার জাত – ব্যবসায়ী জাত। ব্যবসা করাই যাদের জাতিগত পরিচয়।

তহবিল – সিংহাসন।

অবনত – নীচু।

আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবোই।

রাজবল্লভ॥ প্রকাশ্য দরবারে এতবড় অপমানের কথা আমি কল্পনাও করিনি।

মীরজাফর॥ শুধু অপমান! প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে নি? পদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্তু মোহনলালের মত সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।

রায়দুর্লভ॥ সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।

মীরজাফর॥ এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের স্বস্তি দেবেনা।

জগৎশেঠ॥ তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দী করতে চায়। এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে ত'কথাই নেই।

রাজবল্লভ॥ আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইবের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করে নি। শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে। এতে আমাদের নিশ্চিন্ত হবার কিছুই নেই।

জগৎশেঠ॥ তার প্রমাণও ত' রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের গ্রেফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে ত' ছাড়ল না। তাকে ত' কয়েদখানায় যেতে হল। শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

মীরজাফর॥ আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজী।

রাজবল্লভ॥ আমি ভাবছি তেমন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা' হলে সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য যদি দশ লক্ষ টাকা হয়ে থাকে তা হলে জগৎশেঠের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।

জগৎশেঠ॥ ওরে বাবা! তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজেটাই টেনে বার করে আনুক। পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতয়ি সম্পত্তি বিক্রি করেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাইতো ওঠে না। নবাবের হাত থেকে ধন সম্পদ রক্ষার জন্যে মাসে অজস্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অধীনে দুহাজার অশ্বারোহী পুষতে হচ্ছে।

মীরজাফর॥ কাজেই আর কালক্ষেপ নয়।

রাজবল্লভ॥ আমরা প্রস্তুত। কর্মপন্থা আপনিই নির্দেশ করুন। আমরা একবাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।

মীরজাফর॥ আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় খোলসা করে নেওয়া উচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি নে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।

জগৎশেঠ॥ আমার তা'তে কোন আপত্তি নেই।

রায়দুর্লভ॥ এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?

(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে॥ ওরে বাবা কতবার করে দেখাতে হবে? দেউড়ী থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মোট একুশ বার দেখিয়েছি। এই দেখো বাবা, আর একটিবার দেখো। হলো তো?

(রাইসুল জুহালা কামরায় ঢুকলেন)

কি গেরোরে বাবা।

মীরজাফর॥ কি হয়েছে?

রাইস॥ সালাম হুজুর। ওই পাহারাওয়ালা হুজুর। সবাই হাত বাড়িয়ে আঙ্গুল নাচিয়ে বলে, দেখলাও। দেরী করলে তলোয়ারে হাত দেয়। আমি বলি আছে বাবা, আছে। খোদ নবাবের পাঞ্জা

মীরজাফর॥ (সন্ত্রস্ত) নবাবের পাঞ্জা?

রাইস॥ আলবৎ হুজুর। কেন নয়? (আবার কুর্ণিশ করে) হুজুরের নবাব হতে আর বাকি কি?

মীরজাফর॥ (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক। খবর কি তাই বলো।

রাইস॥ প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হুজুর। তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। একেবারে গর্দান সমেত।

রাজবল্লভ॥ (বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছো রাইস মিয়া।

রাইস॥ (ক্ষুব্ধ) আবোল তাবোল কি হুজুর, বলছি ত তলোয়ারের ঝাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রক্ষে। তবে এই দেখুন। (পকেট থেকে দ্বিখন্ডিত মূলার নিম্নাংশ বার করল) একটু নুন জোগাড় হলেই কাঁচা খাবো বলে মূলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম। ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে সেটাই দু'খন্ড।

জগৎশেঠ॥ এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে। ক্লাইভ সাহেব তোমাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?

রাইস॥ গেরো হুজুর। কপালের গেরো। উমিচাঁদজীর চিঠি নিয়ে তার কাছে গেলাম। তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর ওঁর কামানের মত গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো আর ইউ এ স্পাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায় তুমি গুপ্তচর? এমন এক অদ্ভুত উচ্চারণ করলেন, আমি শুনলাম তুমি ঘুফুৎচোর? চোর এ কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল। তা ছাড়া ঘুফুৎচোর? ছিঁটকে চোর থেকে আরম্ভ করে হাড়ি চোর, শাড়ি চোর, গামছা চোর, বদনা চোর, জুতো চোর, গরু চোর, সিঁদেল চোর, কাফন চোর আমাদের আপনাদের ভেতরে হুজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তার আর হিসেব নেই। কিন্তু ঘুফুৎচোর? আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না করে হুজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম, (মৃদুহাসি) একটু ইংরেজিও ত জানি, ইংরেজিতেই বললাম, ইউ শাট আপ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপ। (হেসে উঠে) অহঙ্কার করব না হুকুর, লাফটা যা দিয়েছিলোম একবারে মাপা। তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটেছে মূলোর মাথাটা।

মীরজাফর॥ কথা থামাবে রাইস মিয়া।

রাইস॥ হুজুর।

মীরজাফর॥ এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?

রাইস॥ উমিচাঁদজীর কাছ থেকে। এই যে চিঠি। (পত্র দিল)

মীরজাফর॥ (পত্র পড়ে রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখলে?

রাইস॥ অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর। ভূত ভূত চেহারা সব।

মীরজাফর॥ কারো নাম জানো না?

রাইস॥ সব তো বিদেশী নাম। এদেশী হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত, বেম্মোদত্যি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেংগে, কন্দকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলো বলতে পারতাম শাঁকচুন্নী, উলকামুখী, আঁষটেপেত্নী, কানি পিশাচী এইসব আর কি।

জগৎশেঠ॥ রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটছে।

রাইস॥ রাত-বেরাতে চলাফেরা করি, ভূত-পেত্নীর সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর।

(চিঠিখানা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার মীরজাফরের হাতে এলো।)

মীরজাফর॥ একে তা হলে বিদায় দেওয়া যাক?

রাজবল্লভ॥ চিঠির জবাব দেবেন না?

মীরজাফর॥ চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল। কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওঁৎ পেতে বসে আছে।

জগৎশেঠ॥ তাছাড়া আমাদের গুপ্তচরদেরই বা বিশ্বাস কি? তারা মূল চিঠি হয়ত আসল জায়গায় পৌছচ্ছে; কিন্তু একখানা করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের লোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।

রাইস॥ সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন হুজুর, গুপ্তচররাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।

জগৎশেঠ॥ কিছু মনে কোরো না। তোমার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করি নি।

মীরজাফর॥ তুমি তাহলে এখন এসো। উমিচাঁদজীকে আমার এই সাঙ্কেতিক মোহরটা দিও। তা'হলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে বল, দু'নম্বর জায়গায় আগামী মাসরে ৮ তারিখে সব কিছু লেখাপড়া হবে।

রাইস॥ হুজুর! (সাঙ্কেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)

মীরজাফর॥ কত কিছুই হ'তে পারে শেঠজী। আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছিনে? নবাবের মীর মুন্সী আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানীর কাছে তাতেই ত'ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবল্লভের; কিন্তু ভাবুনত'কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মীর মুন্সী।

জগৎশেঠ॥ তা ত' বটেই। গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।

মীরজাফর॥ প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কিনা?

রাজবল্লভ॥ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জাত। পয়সা ছাড়া কিছু

		বোঝে না। ওরা জানে সিরাজ-উ-দ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।
	জগৎশেঠ॥	অবশ্য টাকা ছাড়া কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।
	রাজবল্লভ॥	সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কিনা তা'ত বুঝতে পারছিনে। আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবী দু'কোটি টাকার ওপরে যাবে। কিন্তু এত টাকা সিরাজ-উ-দ্দৌলার তহবিল থেকে কোন ক্রমেই পাওয়া যাবে না।
	মীরজাফর॥	আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ওকথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবী মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ-নবাব আলিবর্দীর আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

বস্তুসংক্ষেপ

সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিকে সভায় ডেকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য সকলেই নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মীরজাফরের বাড়িতে গোপনে মন্ত্রণাসভা বসেছে। সকলের চিন্তা একই – এই মুহূর্তেই সিরাজকে গদিচ্যুত করতে হবে। সকলের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও শতকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাবের কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হওয়ায় তারা শওকতজঙ্গকে কাজে লাগাতে চাইলো, তাহলে নবাব দ্রুত সন্দেহ করতে পারবেন না। নবাবকে গদিচ্যুত করার জন্যে মীরজাফর ইংরেজদের সহযোগিতাও প্রার্থনা করলেন। তার মনে শুধু একটাই বাসনা সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সরিয়ে যদি একবারের জন্য বাংলার মসনদে বসে পারতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সিরাজের বিরুদ্ধে তার সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্ষিপ্ত হলো কেন?
২. সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের পরিচয় দাও।
৩. মীরজাফরের একান্ত ইচ্ছা কি ছিল?

উত্তর

প্রশ্ন ঃ সিরাজের বিরুদ্ধে তার সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্ষিপ্ত হলো কেন?

উত্তর ॥ প্রজাদের উপর কোম্পানীর প্রতনিধিরা নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছেন। গুপ্তচরের মাধ্যমে এ-সংবাদ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা জেনেছেন। তাই তিনি সভা ডেকে প্রকাশ্যে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তিনি প্রজাদেরও উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। প্রকাশ্য সভায় কোম্পানীর প্রতিনিধি মি. ওয়াট্‌সের বিরুদ্ধেও নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এ সব কারণে নবাবের সভাসদ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি নবাবের উপর খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। মীরজাফরের সংলাপেই তাদের এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। মীরজাফর বলেছে

না শেঠজী, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি। অগ্নিগিরির মত প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবই।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. অগ্নিগিরির মত প্রচণ্ড গর্জনের ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি।
২. এখন আমি ভাবছি, ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কিনা?
৩. একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

উত্তর

অগ্নিগিরির মত প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ শীর্ষক নাটক থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে মীরজাফর এই সংলাপ উচ্চারণ করেছেন।
প্রজাদের উপর কোম্পানীর প্রতিনিধিরা নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছেন। গুপ্তচরের মাধ্যমে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা এ সংবাদ জানতে পেরেছেন। প্রজারাও তাঁর কাছে এসে সরাসরি অভিযোগ উত্থাপন করেছে। প্রজাদের রক্ষা করার জন্যে সভা ডেকে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তিনি প্রজাদেরও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকাশ্য সভায় কোম্পানীর প্রতিনিধি মি. ওয়াট্সের বিরুদ্ধেও নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এ-সব কারনে মীরজাফরসহ নবাবের অধিকাংশ সভাসদ ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তারা একজোট হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাদের একটাই উদ্দেশ্য, যে করেই হোক, সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা। মীরজাফরের সংলাপে তাদের সে ষড়যন্ত্রের কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

আলোচ্য অংশটুকু সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটক থেকে গৃহীত হয়েছে। এই সংলাপের মাধ্যমে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে গদিচ্যুত করে বাংলার মসনদে বসার জন্যে মীর জাফরের গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ পেয়েছে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে মীর জাফর এবং তার মিত্রদের মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা। গুপ্তচরের মাধ্যমে এ সংবাদ জেনে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা সকলকে প্রকাশ্য সভায় সতর্ক করে দিয়েছেন। ফলে এরা নবাবের বিরুদ্ধে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। এই অবস্থাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে মীর জাফর। নিজের বাসভবনে সকলকে ডেকে তিনি তার মনোভাবের কথা জ্ঞান করেছেন। সকলেই নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে একমত হয়েছে। এ অবস্থায় মীর জাফরের চিত্তলোকে বেজে উঠেছে তার গোপন অভিলাষের কথা- যদি একদিন, মাত্র একদিনের জন্যেও বাংলার মসনদে বসতে পারতাম! দেশপ্রেম নয়, বরং সিংহাসন প্রেমই যে মীর জাফরের কাছে মুখ্য বিষয়, এ সংলাপের মাধ্যমে সে কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ভোগবিলাসী মীরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারবেন।
- রায়দুর্লভ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- মীরনের আবাসগৃহে সমবেত ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের পারিষদবর্গের গোপন বৈঠকের পরিবেশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রবার্ট ক্লাইভ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মীরন – পরলোকগত নবাব আলীবর্দী খাঁর ভগ্নিপতি ও নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীর জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরন। ইনিও তার পিতার মতই ছিলেন বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারী ও নিষ্ঠুর। ভোগবিলাসে মত্ত ব্যভিচারী জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন মীরন। মীরজাফরের পক্ষে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন তিনি। তারই উদ্যোগ ও নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নিষ্ঠুরভাবে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে হত্যা করে। অকালে বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হয়। **রবার্ট ক্লাইভ, কর্নেল** – মাত্র সতেরো বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন রবার্ট ক্লাইভ। সামান্য চাকুরীর ছকবাঁধা জীবনে হতাশগ্রস্ত ক্লাইভ আত্মহত্যার চেষ্টা সফল হয়নি। ভারতে ফরাসিদের সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের যুদ্ধে ক্লাইভ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এরপর মারাঠা জলসদ্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	**দ্বিতীয় অংক ॥ তৃতীয় দৃশ্য** সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ৯ই জুন। স্থান মীরনের আবাস। [চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে নর্তকীগণ, বাদকগণ, মীরন পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, ওয়াট্‌স, ক্লাইভ, রক্ষী, মোহনলাল।] (ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মীরন। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে ডান হাত সমর্পিত। অপর নর্তকী নৃত্যরতা। নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামত্ত মীরণের উল্লাসধ্বনি।] মীরন ॥ সাবাস। বহোত খুব। তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে। (নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মীরনের দিকে। পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি দিলো মীরনের হাতে। সেটা পড়ে বিরক্ত হল মীরন। তবু পরিচারিকাকে সম্মতি সূচক ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকী মীরণের ইঙ্গিতে কামরার অন্যদিকে চলে গেল। অল্প পরেই ছদ্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে কামরায় পৌছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেল।) মীরন ॥ সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবি নি। (নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল) রায়দুর্লভ ॥ আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন। মীরন ॥ তা নয়, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখুনি বুঝেছি প্রয়োজন জরুরী। তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না। রায়দুর্লভ ॥ দু'দন্ড সময় নষ্ট করে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হ'ত। অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্যে থেকে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে। মীরন ॥ আমার এখানে না করে উপায় কি? মোহনলালের গুপ্তচর জীবন অসম্ভব করে তুলেছে। আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ। কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশগুল থাকতেই ভালবাসি। রায়দুর্লভ ॥ কে কে আসছেন এখানে। মীরন ॥ প্রয়োজনীয় সবাই। তা ছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আসবেন কোম্পানীর প্রতিনিধি কেউ একজন। রায়দুর্লভ ॥ কোম্পানীর প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?

জয় করে তিনি কর্নেল উপাধি লাভ করেন। পলাশী যুদ্ধের শেষে ইনি নবাবের দখল করা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। তারই ষড়যন্ত্রে পলাশীর যুদ্ধ এক প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। ইনি নবাবের প্রদান সেনাপতি এবং প্রধান প্রধান অমাত্যকে প্রলুব্ধ করে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বনে রাজি করান। ফলে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের পূর্ব পরিকল্পিত উদাসীনতা ও অপারগতার কারণে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা পতন হয় এবং বাংলায় স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান ঘটে।

ফরাস – মেঝেতে পাতবার জন্য কাপড়ের আস্তরণ।

তাকিয়া – ঠেসান দেবার উপযোগী মোটা বালিকা।

জানালা – নারী, অন্তঃপুরাাসিনী বা পর্দানশীল নারী।

সওয়ারী – যানবাহনে আরোহী।

কমবখৎ – হতভাগ্য।

খাজাঞ্চি – কোষাধ্যক্ষ,

ফরমান – আদেশ।

খাজনার বা রাজকরের অধ্যক্ষ।

দেওয়ান – রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী।

মীরন ॥ তিনি আসবেন কাশিম বাজার থেকে।

রায়দুর্লভ ॥ সে যা হোক আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশীক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখন কি কাজে তলব করে বসবেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না পেলে তখুনি সন্দেহ জমে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগে ভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হল জানবার জন্যে।

মীরন ॥ আপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একবারে নির্দিষ্ট।

রায়দুর্লভ ॥ আমার দাবীও তাই। তবে আর একটা কথা। চারদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোন আশা নেই, তা হলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?

মীরন ॥ (ঈষৎ বিস্মিত) কি ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।

রায়দুর্লভ ॥ আতঙ্কিত নই। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতরে কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে। (পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা ॥ মেহমান।

রায়দুর্লভ ॥ আমি সরে পড়ি।

মীরন ॥ বসেই যান না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।

রায়দুর্লভ ॥ না আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। আমি পালাই। কিন্তু

(প্রস্থান)

(পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করে মীরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল। কামরায় ঢুকলেন রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর। মীরন সমাদর করে তাদের বসালো।)

মীরন ॥ একটু আগে রায়দুর্লভ এসেছিলেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিন্তু তাঁর দাবীর কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।

জগৎশেঠ ॥ তাঁকে প্রধান সেনাপতি পদ দিতে হবে এইত?

রাজবল্লভ ॥ ও সব কথা থাক রাজা। সবাই একজোটে কাজ করতে হবে। সকলের দাবীই মানতে হবে। রায়দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তিধর তার সাহায্যেই আমরা জিতব এমন কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব আছে বৈকি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা ॥ জানানা সওয়ারী।

(সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। মীরজাফর হঠাৎ পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে তাতে মন দিলেন। মীরন লজ্জিত। হঠাৎ আত্মসংবরণ করে ধমকে উঠল)

মীরন ॥ ভাগো হিঁয়াসে, কমবখৎ।

(পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)

রাজবল্লভ ॥ (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) চট করে দেখে এসো। আত্মীয়ারাই কেউ হবেন হয়ত।

(সুযোগটুকু পেয়ে মীরন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। অভাবিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশেঠ নতুন প্রসংগের অবতারণা করলেন)

জগৎশেঠ ॥ আজকের আলোচনায় উমিচাঁদ অনুপস্থিত। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে তা' আর কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।

মীরজাফর ॥ (হঠাৎ যেন পরিবেশের খেই ধরতে পেয়েছেন) আরে বাপরে, একবারে কাল কেউটে। তার দাবীই ত সকলের আগে। তানা হলে দন্ড না পেরোতেই সমস্ত খবর পৌছে যাবে নবাবের দরবারে। মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে। (দু'জন মহিলা সহ উল্লসিত মীরন কামরায় ঢুকলো)

মীরন ॥ এঁরাই জানানা সওয়ারী।

(রমনীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াট্‌স এবং ক্লাইভ মীরন বেরিয়ে গেল)

ওয়াট্‌স ॥ Sorry to disappoint you gentlemen. ইনি রবার্ট ক্লাইভ।

মীরজাফর ॥ (সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্নেল ক্লাইভ?

ক্লাইভ ॥ Are you surprised অবাক হলেন।

মীরজাফর ॥ অবাক হবারই কথা। এ সময়ে এ ভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।

ক্লাইভ ॥ বিপদ? কার বিপদ জাফর আলী খান? আপনার না আমার?

মীরজাফর ॥ দুজনেরই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।

ক্লাইভ ॥ আমার কোনো বিপদ নেই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

জগৎশেঠ ॥ নবাবের গুপ্তচরের হাতে ত' পড়োনি?

ক্লাইভ ॥ নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

রাজবল্লভ ॥ কেন পারবে না? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি! তুমি এখানে একা এসেছো। তোমাকে বস্তাবন্দী হুলো বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দু'চারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?

ক্লাইভ ॥ I do not understand your Hulo business. But am sure Nabab can cuse no hmrm to us.

জগৎশেঠ ॥ ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েচো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয়। এরি ভেতরে।

ক্লাইভ ॥ দেখো শেঠজী এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তা'ছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুদ্ধ হয়নি। যখন হবে তখন তোমারই তার ফলাফল দেখবে।

রাজবল্লভ ॥ সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?

ক্লাইভ ॥ এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।

রাজবল্লভ ॥ আমরা?

ক্লাইভ ॥ Why not? আপনারা সব পারেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু-

মীরজাফর ॥ এই সব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?

বস্তুসংক্ষেপ

বাংলার নবাবের বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের জ্যেষ্ঠপুত্র মীরনের বাসগৃহে আয়োজন করা হয়েছে নবাব বিরোধী এক গোপন বৈঠকের। দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী জীবনে অভ্যস্ত মীরন বৈঠকের পূর্বে নিজগৃহে সুরামত্ত অবস্থায় নর্তকীর নৃত্য উপভোগ করছেন। এ সময়ে, বৈঠকের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই, সেনাপতি রায়দুলৃভ ছদ্মনামে এসে উপস্থিত হন মীরনের জলসাঘরে। তিনি মীরনের কাছে জানতে চান জরুরি গোপন বৈঠক আয়োজনের কারণ। বৈঠকে কে কে আসছেন সে বিষয়েও জানতে চান রায়দুর্লভ। উত্তরে মীরন জানান যে প্রয়োজনীয় সবাই উপস্থিত থাকবেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আসবেন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি।

নবাব যে কোন সময় রায়দুর্লভকে তলব করতে পারেন এই আশঙ্কায় বেশিক্ষণ থাকার অবকাশ নেই তার। সিরাজের সন্দেহকে ভয় করেন রায়দুর্লভ, তবু তিনি এখানে এসেছেন তার সম্পর্কে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা জানার জন্য। উচ্চাভিলাষী রায়দুর্লভের একান্ত অভিলাষ- নবাবের পতনের পর তিনি হবেন নতুন নবাবের প্রধান সেনাপতি। মীরন এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন তাকে। এ সময়ে আমন্ত্রিত অন্য সদস্যরা এসে পড়লে আতঙ্কগ্রস্ত রায়দুলৃভ দ্রুত পালিয়ে যান ঘটনাস্থান থেকে। এরপর একে একে মীরনের কামরায় প্রবেশ করেন রাজবলল্লভ, জগৎশেঠ ও মীরজাফর। মীরন প্রথমেই তাদেরকে রায়দুর্লভ-এর আগমন ও প্রস্থানের খবরটি পরিবেশন করেন। তার উচ্চভিষাষের প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলেন জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ। মীরজাফর কেবল রায়দুর্লভ নন, সকলের সকল দাবি মানতে হবে বলে অভিমত দেন। তাদের এই আলাপচারিতার মধ্যে অন্তঃপরবাসিনী নারীর ছদ্মবেশে সভাস্থলে উপস্থিত হন কোম্পানীর প্রতিনিধি ওয়াট্‌স ও রবার্ট ক্লাইভ। নবাবের বিশ্বাসঘাতক পরিষদবর্গ তখন উমিচাঁদের অনুপস্থিতির প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন। ওয়াট্‌স্ ছদ্মবেশে ত্যাগ করে প্রথমেই কর্নেল ক্লাইভকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী নবাবের বিশ্বাসঘাতক পরিষদবর্গ। মীরজাফর এবং জগৎশেঠ ঝুঁকি গ্রহণ করে রবার্ট ক্লাইভের এভাবে বৈঠকে উপস্থিত হওয়াকে 'বিপজ্জনাক' আখ্যায়িত করলে, অহঙ্কারী ও ধূর্ত ক্লাইভে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, নবাবকে তার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। ক্লাইভের ক্ষতি করতে পারেন কেবল তাঁর বিশ্বাসঘাতক পরিষদ বর্গই। নবাব ক্ষমতাহীন; কেননা তাঁর প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, খাজাঞ্চি দেওয়ান ওমরাহ প্রতারক। নবাবের পতন যারা নিশ্চিত করে তুলছেন, তারাই ইংরাজদের পথে বসাবেন না, এর নিশ্চয়তা কোথায়।

তর্ক বিতর্কের এ পর্যায়ে মীরজাফর যে এ সব অপ্রিয় বিষয়ে আলোচনার জন্য সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন কীনা।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মীরন কে? তার স্বভাবের পরিচয় দিন।
২. রায়দুর্লভ কী উচ্চভিলাষ পোষণ করেন?
৩. 'আরে বাপরে, একেবারে কাল কেউটে।' -সংলাপটি কার? কাকে উপলক্ষ করে কথাটি বলা হয়েছে?
৪. 'নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।' - ক্লাইভের এ আত্মবিশ্বাসের কারণ কী?
৫. দেখো শেঠজী এক আধবার অমন হয়েই থাকে'। -কোন্ প্রসঙ্গে ক্লাইভ সংলাপটি উচ্চরণ করেছেন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ 'আরে বাপরে, একেবারে কাল কেউটে।' -সংলাপটি কার? কাকে উপলক্ষ করে কথাটি বলা হয়েছে?

উত্তর ॥ বাংলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের সংলাপ এটি। জগৎশেঠ-এর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উমিচাঁদ প্রসঙ্গে 'কাল কেউটে' বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন মীরজাফর।

শিখ বংশোদ্ভূত উমিচাঁদ ছিলেন লাহোরের অধিবাসী, কলকাতায় এসে তিনি দালালি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং মালিক হয়ে ছিলেন প্রভূত ধন-সম্পত্তির। কোটিপতি উমিচাঁদ কুশীদজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ; ধূর্তামিও অর্থলোলুপতাই তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঘন ঘন পক্ষ পরিবর্তন করে বিনা আয়েশে বাংলার নবাব ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই উভয়পক্ষ থেকেই প্রচুর অর্থবিত্ত কামাই করেন তিনি। পলাশীর যুদ্ধের অভিনয় হমড়ায় তার ছিলো এক বিশেষ ভূমিকা। উমিচাঁদের ধূর্ত স্বভাব ও অর্থলোলুপতার প্রতি ইঙ্গিত করেই মীরজাফর কাল-কেউটে অভিধায় অভিহিত করেছেন উমিচাঁদকে। তবে তার এ-সংলাপটি প্রচন্ড বিদ্রূপ হয়েই পুনরাঘাত করেছে মীরজাফরকে। তিনি যে কাল-কেউটে চেয়েও কুটিলতর- বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসই তার সাক্ষ্যবহ।

প্রশ্ন ঃ 'নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।' - ক্লাইভের এ আত্মবিশ্বাসের কারণ কী?

উত্তর ॥ সতেরো বছর বয়সে ভারতবর্ষে আগত রবার্ট ক্লাইভ ফরাসি এবং মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সঞ্চয় করেন প্রভূত অভিজ্ঞতা। সম্মুখ যুদ্ধের চেয়ে নেপথ্য যুদ্ধ যে অনেক কার্যকর ধূর্ত ক্লাইভ তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করলে। আসন্ন পলাশী যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা তাঁর পরিষদবর্গের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছেন। তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্রিটিশদের অবস্থান তাই অত্যন্ত সুবিধাজনক। এজন্যেই উৎকণ্ঠে রবার্ট ক্লাইভ ঘোষণা করতে পারেন। নিজের নির্ভয়ের কতা। তিনি জানেন পারিষদবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব শক্তিশূণ্য ও অবলম্বনহীন। এ কারণেই, নবাব নয়, বরঞ্চ নবাবের পারিষদবর্গই ক্লাইভের দুশ্চিন্তার বিষয়। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবকে ডোবাতে পারেন, তাদের প্রতি নিশ্চিন্ত আস্থা পোষণ করা যায় না- কর্ণেল ক্লাইভের এই ধারণা।

প্রশ্ন ঃ দেখো শেঠজী এক আধবার অমন হয়েই থাকে'। -কোন্ প্রসঙ্গে ক্লাইভ সংলাপটি উচ্চরণ করেছেন।

উত্তর ॥ নবাব প্রসঙ্গে ক্লাইভের ভয়শূন্যতার প্রতি রাজা রাজবল্লভ সংশয় প্রকাশ করলে রবার্ট ক্লাইভ আত্মবিশ্বাসীর দৃঢ়তায় সংলাপটি উচ্চরণ করেন। রাজবল্লভ ক্লাইভকে বলেছিলেন যে নবাবের কড়া প্রহরাধীন স্থানে তিনি একা এসেছেন, বস্তাবন্দি হুলো বেড়ালের মতো পানা পুকুরে ডুবিয়ে মারতে প্রহরীরাই যথেষ্ট, এজন্য বাদশাহ্‌র ফরমান সংগ্রহের আবশ্যক হবে না।

কূটকৌশলী যোদ্ধা ক্লাইভকে জগৎশেঠ স্মরণ করিয়ে দেন কলকাতায় তাদের নাকাল হওয়ার কথা। অতি অল্প দিনে ঐ তিক্ত স্মৃতি ভোলার কতা নয় ক্লাইভের। ক্লাইভ ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, নিবৃত্ত করেছেন মারাঠা দস্যুদের। ক্লাইভ তাই দমার পাত্র নন। তিনি স্পষ্টতই জানিয়ে দেন যে- ক্লাইভের সঙ্গে নবাব পক্ষের যুদ্ধ এখনও সংঘটিত হয়নি। যুদ্ধ সংঘটিত বলেই ক্লাইভের শক্তিমত্তা বিচার করা যাবে। যুদ্ধের ফলাফল থেকেই তার যোগ্যতা নিরূপণ করা যাবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।
২. কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র।
৩. যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।
৪. আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?

কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারিদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র।

আলোচ্য সংলাপটি বিশিষ্ট নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। মীরজাফর পুত্র মীরনের মন্তব্যের জবাবে রায়দুর্লভ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন। উদ্ধৃত সংলাপে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার রায়দুর্লভ-এর সাময়িক দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

নবাব আলীবর্দী খাঁর বিশ্বাসভাজন অমাত্য রাজা জানকীরামের পুত্র রায়দুর্ভভ। আলীবর্দী খাঁর স্নেহভাজন রায়দুর্লভ বাংলার নবাবের সেনাবাহিনীর উচ্চপদে বহাল ছিলেন। কিন্তু নবাব সিরাজ-উ-দৌলার সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে তার আর পদোন্নতি হয়নি। ফলে তিনি নবাবের বিরুদ্ধাচরণে সামিল হন এবং সিরাজের বিশ্বাসঘাতক পারিষদবর্গের পক্ষ অবলম্বন করেন। আলোচ্য দৃশ্যে রায়দুর্লভ নির্ধারিত বৈঠকের পূর্বেই মীরজাফর পুত্র মীরনের কাছে এসেছেন সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে। রায়দুর্লভ অত্যন্ত উচ্চভিলাষী। নবাব সিরাজের পতন বলে বাংলার নতুন নবাবের প্রধান সেনাপতির পদটি তার কাঙ্ক্ষিত। এ উদ্দেশ্যেই তিনি নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু চারদিকে বিস্তৃত ষড়যন্ত্র আর অবিশ্বাসের পাঁকে রায়দুর্লভ দ্বিধাগ্রস্ত, কিছুটা আতঙ্কিতও বটে। এজন্যেই গোপনে সর্বাগ্রে তিনি দাবি নিয়ে এসেছেন মীরনের কাছে। আবার দাবি পেশ মাত্র সর্বাগ্রে ঘটনাস্থান থেকে পলায়নও করেছেন তিনি। ভীরু অথচ লোভী ষড়যন্ত্রকারীর যোগ্য দৃষ্টান্ত রায়দুর্লভ চরিত্র। ভয় ও লোভের দ্বন্দ্বে তার সাময়িক দ্বিধান্বিত মানসতা নাট্য-চরিত্র হিসেবে তাকে উজ্জ্বলতা দিয়েছে।

আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়?

উদ্ধৃত সংলাপটি কবি ও নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে গৃহীত হয়েছে। রাজবল্লভের জিজ্ঞাসার উত্তরে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ বর্তমান সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

রবার্ট ক্লাইভ জানতেন যে নিজ অমাত্যবৃদ্ধ ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেওয়ায় নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা প্রকৃত অর্থেই ক্ষমতা শূণ্য ও শক্তিহীন। কাজেই নবাবকে তার ভয় নেই। যে নবাবের প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক। খাজাঞ্চি দেওয়ান আমির ওমরাহ প্রতারক ধূর্ত ক্লাইভের কাছে সে নবাব নির্ভয়। কাজেই নবাব সিরাজ ক্লাইভ কিংবা কোম্পানীর ক্ষতি করতে পারবেন না, বরঞ্চ বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গই সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। আলোচ্য অংশে ক্লাইভ এই মনোভাব অকপটে সরাসরি প্রকাশ করলে রায়বল্লভের বিস্ময়সূচক সিজ্ঞাসার জবাবে রবার্ট ক্লাইভ উদ্ধৃত সংলাপে তার বক্তব্য পুনরায় ব্যাখ্যা করেন। ক্লাইভের মতে অনুগ্রহভাজন পারিষদবর্গ যারা আজ বাংলার নবাবের পতন আসন্ন করে তুলছেন, সময়ে তারাই যে কোম্পানীর লোকদের পতে বসাতে পিছপা হবেন না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? ধূর্ত ক্লাইভ তাই নবাবের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সঙ্গে হাত মেলালেও, তাদেরকে পূর্ণ আস্থায় গ্রহণ করেননি। পলাশীর যুদ্ধোত্তর কালে পুতুল নবাবের সঙ্গে আচরণে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী হবে ক্লাইভের সংলাপে তাই যেন আভাসিত হয়েছে।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মীরনের বাসগৃহে অনুষ্ঠিত নবাব বিরোধীদের ষড়যন্ত্র বৈঠকের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- উমিচাঁদ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবেন।

- রবার্ট ক্লাইভের ধূর্ততার পরিচয় দিতে পারবেন।
- ক্ষমতালিপ্স মীরজাফর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- অসমসাহসী মোহনলালের তৎপরতার পরিচয় দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা

Compensate – ক্ষতিপূরণ করা।

scoundrel– বদমাশ, দুর্বৃত্ত।

ধড়িবাজ – ধূর্ত; ফন্দিবাজ; প্রতারক।

scoundrel – উল্লেখ।

উইট্‌নেস (Witness)– সাক্ষী; প্রত্যক্ষদর্শী।

এ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন – এ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন। ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনী প্রধান ওয়াট্‌সন ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজকীয়। নৌবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল। সিরাজ-উ-দ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা দখলের পর পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজের বহর নিয়ে ওয়াটসন কলকাতা পৌঁছান এবং ক্লাইভের বাহিনীর সঙ্গে যোগদেন। ধূর্ত ক্লাইভের তুলনায় ওয়াসন ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। নাটকে উমিচাঁদকে অর্থ ফাঁকি দেয়ার জন্য যে জাল দলিল প্রস্তুতের প্রসঙ্গ আছে, সেই জাল দলিলে ওয়াটসন স্বাক্ষরদান করেননি। ক্লাইভে লুমিংটনকে নিয়ে ওয়াটসনের স্বাক্ষর নকল করান। ওয়াটসন পলাশী যুদ্ধের পর দু'মাস যেতে না যেতেই রোগভোগে মৃত্যুবরণ করেন। সেন্ট জোনা গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

মূলপাঠ

ক্লাইভ ॥	Sorry Mr. Jafar Ali Khan. হ্যাঁ একটা জরুরী কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের প্লানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে। কলকাতা attack এর সময়ে তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা compensate করতে চেয়েছেন। Scoundrel টা আবার এক নতুন offer নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।
মীরজাফর ॥	আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।
ক্লাইভ ॥	এবং তাকে অত টাকা দেবার মত পজিশান আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেব না। কেন দেব? Why? Thirty lacs of rupees is no joke.
রাজবল্লভ ॥	কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে হয়ত অন্যরকম কিছু ষড়যন্ত্র করতে পারে। আমাদের যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা।
ক্লাইভ ॥	Don`t worry Raja। উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে। But Clive is no less আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।
মীরজাফর ॥	কি রকম?
ক্লাইভ ॥	দুটো দলিল হবে। আসল দলিলে উমিচাঁদের কোন reference থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে, নবাব হেরে গেলে কোম্পানী উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।
রাজবল্লভ ॥	কিন্তু সে যদি কোনো রকমে এ কথা জানতে পারে?
ক্লাইভ ॥	আপনারা না জানালে জানবে না। আর জানলে কারও বুঝতে বাকী থাকেবে না যে আপনারাই তা জানিয়েছেন।
জগৎশেঠ ॥	আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।
মীরজাফর ॥	দলিল সই করবে কে?
ক্লাইভ ॥	কমিটির সকলেই করেছেন। এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ থাকবেন উইট্‌নেস। নকল দলিলটায় এ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজী হন নি।
মীরজাফর ॥	উমিচাঁদ মানবে কেন তা হলে?
ক্লাইভ ॥	সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়াট্‌সনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।
জগৎশেঠ ॥	তা হলে আর দেরী কেন? আমাদের আবার এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।
ক্লাইভ ॥	Of course দলিল দুটোই তৈরী আছে। শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়। (দলিলের কপি মীরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)
মীরজাফর ॥	একটু পড়ে দেখব না?
ক্লাইভ ॥	ড্রাফটতো আগেই পড়েছেন।

Privilege secure – বিশেষাধিকার সুনিশ্চিতকরণ।	রাজবল্লভ ॥	তা হলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।
	ক্লাইভ ॥	If you want go ahead পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মত আপনাদেরও ঠকানো হয়েছে কিনা।
	মীরজাফর ॥	(দলিলটা রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন রাজা আপনিই পড়ুন।
	রাজবল্লভ ॥	(পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতন হলে কোম্পানী পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, এ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন পাবে-
	মীরজাফর ॥	ওগুলো দেখে আর লাভ কি?
	রাজবল্লভ ॥	এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দু'বার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।
	মীরজাফর ॥	বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসুন দস্তখত দিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।
	রাজবল্লভ ॥	এ সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন। কিন্তু রাজ্য চালাবেন কোম্পানী।
	ক্লাইভ ॥	(বিরক্ত) You are thinking like a fool. আমরা কেন রাজ্য চালাবো। আমরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করবার Privilege secure করে নিচ্ছি। তা আমাদের করতেই হবে।
	জগৎশেঠ ॥	আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায় আপনারা হাত দেবেন এত ভালো কথা নয়।
	ক্লাইভ ॥	(রীতিমত ক্রুদ্ধ) Then what you are going to do about it? দলিল দুটো তা হলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন। সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরী করা যাবে।
	মীরজাফর ॥	না না সেকি কথা? এমনিতেই বাজারে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোন্‌দিন সিরাজ-উ-দ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই। দিন আমি দলিল সই করে দিই। শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। (রাজবল্লভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল। কিন্তু একটু ইতস্ততঃ করে)
	মীরজাফর ॥	বুকের ভেতের হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজী?
	জগৎশেঠ ॥	না না, মরাকান্না আবার কোথায়?
	মীরজাফর ॥	আমি যেন শুনলাম।
	ক্লাইভ ॥	(উচ্চহাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি অথচ Women থেকেও coward।
	রাজবল্লভ ॥	নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়।
	মীরজাফর ॥	তাই হয়ত। (কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে আবার ইতস্ততঃ করল)
	মীরজাফর ॥	কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বল্লেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না ত?
	ক্লাইভ ॥	Oh, what nonsense আমি জানতাম coward দের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করাতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াট্‌সকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে

পারি নি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। (মীরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কি করব। আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোন ভয় নেই। your are sacrificing the Nabab and not the country. দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।

মীরজাফর ॥ আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের সম্মান দেয় না।

(দলিলে সই করল। নেপথ্যে করুণ সঙ্গীত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভও সই করল)

ক্লাইভ ॥ That's all right (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। we have done a great thing- a great thing. (ক্লাইভ এবং ওয়াট্‌স আবার রমণীর ছদ্মবেশ নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেলো। অন্যদিক দিয়ে মীরণের প্রবেশ।)

মীরন ॥ হা হা হা। আর দেরী নেই।

(হাত তালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ)

আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কি হবে? আগামী পরশু আমি শাহজাদা মীরন। শাহজাদা হা হা হা। তারপর একদিন বাংলার নবাব।

(দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী ॥ হুজুর, সেনাপতি মোহনলাল।

মীরন ॥ (আতঙ্কিত) মোহনলাল।

(ফরাসে বসে পড়ল। মোহনলালের প্রবেশ)

মোহনলাল ॥ শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে। বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন। তাই খোঁজ নিতে এলাম।

মীরন ॥ সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনি প্রবেশ করেছেন?

মোহনলাল ॥ প্রয়োজন মত যে কোনো জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে। সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছিল কিনা?

মীরন ॥ মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জানেন এর ফল কি ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে আব্বার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল। নবাব তাকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন। আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপবাদ নিয়ে। আমি এখুনি আব্বাকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাবে।

(উঠে দাঁড়ালো)

এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার।

মোহনলাল ॥ প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। (তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না। সত্য বলুন, কি হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণা সভায়?

মীরন ॥ মন্ত্রণা সভা হচ্ছিল কিনা, এবং হলে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিনে। এসব বাজে জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়।

(পরিচারককে ডেকে মীরন কিছু ইঙ্গিত করল)

যখন নাছোড় হয়েছেন তখন বে-আদবী না করে আর উপায় কি?

		(নর্তকীর প্রবেশ) এখানে কি হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন? (একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে দুলতে দুলতে নর্তকী মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেলো। মোহনলাল তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শুন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে শুন্যেই তা দ্বিখন্ডিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল)।
	মীরন ॥	মুর্তিমান বেরসিক হা হা হা-

বস্তুসংক্ষেপ

নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্র বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যকার দু'পক্ষের পরস্পর অবিশ্বাসের বিষয়টি দানা বেঁধে উঠলে সন্দেহপ্রবণ ক্লাইভই কাজের কথায় ফিরে আসেন। প্রথমেই তিনি উত্থাপন করেন চতুর বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদের প্রসঙ্গ। উমিচাঁদ নবাব-বিরোধী শিবিরের একজন হয়েও ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন পরিকল্পনা জানিয়ে দিয়েছেন নবাবকে। নবাব কর্তৃক কলকাতা বন্দর আক্রমণের সময় ক্ষতিগ্রস্ত উমিচাঁদের উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণও প্রদান করেছেন নবাব। এখন নতুন প্রস্তাব নিয়ে আবার নবাব বিরোধী শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন প্রতারক উমিচাঁদ। আসন্ন যুদ্ধে সহায়তার বিনিময়ে তার দাবি নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা। ধূর্ত ক্লাইভ এ দাবি পূরণে অসম্মত। বরঞ্চ তিনি নতুন ফন্দি এঁটেচেন উমিচাঁদকে ঠকাবার। ষড়যন্ত্র বৈঠকে কোম্পানীর প্রতিনিধি ও নবাবের বিদ্রোহী পারিষদবর্গের মধ্যে যে সমঝোতা দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে ক্লাইভ তাতে উল্লেখ করেননি উমিচাঁদের নাম মূল দলিলের আর একটি জাল দলিল তৈরি করা হয়েছে, যেখানে উল্লেখ রয়েছে উমিচাঁদের নাম।

গোপন বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন জগৎশেঠ রাজবল্লভ মীরজাফর নবাব বিরোধী শিবিরের পক্ষে। কোম্পানীর পক্ষ থেকে এসেছেন রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াট্‌স। ক্লাইভ সঙ্গে করে এনেছেন পূর্ব প্রস্তুততে সমঝোতা দলিল। মীরজাফর ব্যতীত সকলেই পূর্বে দলিলে স্বাক্ষর করেছেন। ক্লাইভ স্বাক্ষরদানের জন্য মীরজাফরের কাছে দলিলটি দিলে, মীরজাফর কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। না পড়ে দলিলে দস্তখত দিতে তিনি সংশয়ী হয়ে উঠেন। অবশেষে মীরজাফরের অনুরোদে রাজা রাজবল্লভ দলিলের শর্তাবলি পাঠ করেন। ইংরেজ পক্ষের সঙ্গে মৃদু বার বিতন্ডার এক পর্যায়ে রাজবল্লভ মন্তব্য করে বসেন যে, এ দলিল অনুসারে নবাবের পতনের পর সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন মাত্র, রাজ্য পরিচালনা করবে কোম্পনী। তার এ মন্তব্যে জগৎশেঠও সায় দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন কর্ণেল ক্লাইভ দলিল ফিরিয়ে নিয়ে নতুন শর্ত সংযোজন করে পরিবর্তিত খসড়া পেশ করার প্রস্তাব করেন তিনি। এটিও ক্লাইভের এক কূটচাল। কারণ যুদ্ধ আসন্ন, এ সময়ে কালপেক্ষপণের অবকাশ নেই ষড়যন্ত্রকারীদের। এ সত্য মীরজাফরও অনুভব করেন। ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তিনিই হবেন আপাতভাবে সর্বাধিক সুফল ভোগকারী। মীরজাফরের কাছে তাই মনে হয় শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কাজেই দলিলে দস্তখত করতে মনস্থ করেন তিনি। কিন্তু দস্তখত করার মুহূর্তে আবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন মীরজাফর। তার বুকে কেঁপে ওঠে, শুনতে পান মরাকান্নার ধ্বনি। রাজবল্লভের মন্তব্য স্মরণ করে দ্বিধান্বিত মীরজাফরের মনে হয় তারা সবাই মিলে বাংলাকে বিক্রয় করে দিচ্ছেন না ত? উচ্চারণ করে ফেলেন মীরজাফর ঐ দ্বিধামিশ্রিত মনোভাব ক্লাইভ এতে উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং সর্বসমক্ষে মীরজাফরকে কাপুরুষ অভিধায় চিহ্নিত করেন। পরিশেষে স্বাক্ষর দান করেন মীরজাফর। এর মধ্য দিয়ে পূর্ণ রূপ পায় এক কলঙ্কজনক ঐতিহাসিক চুক্তি। ক্লাইভ সন্তোষ চেপে রাখতে পারেন না; 'আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। বলে মন্তব্য করেন তিনি। অতঃপর সমাপ্তি ঘটে ষড়যন্ত্র বৈঠকের।

বৈঠক সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়ে মীরন। এই ষড়যন্ত্র ও চুক্তি বাস্তবায়িত হলে ভোগলিপ্সু ও উচ্চাভিলাষী মীরন হবে বাংলার নতুন নবাবের পুত্র 'শাহ্‌জানা'। তারপর একদিন হবে বাংলার নবাব। কিন্তু মীরনের ঐ উল্লাসমুহূর্তে আকস্মিকভাবেই তার আবাসগৃহে প্রবেশ করেন নবাব সিরাজের বিশ্বাস্ত সেনাপতি মোহনলাল। মোহনলাল গুপ্তচর মারফত সংবাদ পেয়েছেন নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্র বৈঠকের। কিন্তু তার জেরার মুখে মীরন অস্বীকার করে বৈঠকের প্রসঙ্গ। অভিনয় পটু মীরন নৃত্য গীতের উপকরণ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায় মোহনলালকে। শেষে প্রলুব্ধ করার জন্য

এক পরিচারিকাকে সামনে ঠেলে দেয় মীরন। কর্তব্যপরায়ণ মোহনলাল পরিচারিকাটিকে উপেক্ষা করে দ্রুত বেরিয়ে যান মীরনের গৃহ থেকে।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সংক্ষেপে নবাব-বিরোধী ষড়যন্ত্র বৈঠকের বর্ণনা দিন।
২. উমিচাঁদ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।
৩. ‘উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধিরাখে But Clive is no Less -কে কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন?
৪. আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কি হবে? কে কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছে?
৫. আকস্মিকভাবে মীরনের গৃহে মোহনলালের উপস্থিত হওয়ার কারণ কী?
৬. ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফর চরিত্রের দ্বিধা ও লোভের পরিচয় দিন।
৭. ষড়যন্ত্র বৈঠকে ক্লাইভ চরিত্রের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন ঃ ‘উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধিরাখে But Clive is no Less -কে কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন?

উত্তর ॥ প্রশ্নে উল্লেখিত সংলাপটি রবার্ট ক্লাইভের। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা বন্দর আক্রমণের সময় ধূর্ত উমিচাঁদ সহায়তা করেছেন নবাবকে। এ জন্যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ নবাবের কাছ থেকে প্রভূত অর্থও লাভ করেছেন। কিন্তু সুযোগসন্ধানী উমিচাঁদ নবাব পক্ষ পরিত্যাগ করে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন নবাবের বিদ্রোহী পারিষদবর্গ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধির সঙ্গে। সহায়তা প্রদানের শর্ত হিসেবে উমিচাঁদ দাবি করেছেন নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা। প্রতারক প্রতারককে চিনতে পারে সহজেই। ক্রাইভও তাই সহজেই চিনে নিয়েছেন উমিচাঁদকে। তিনি অবলম্বন করেছেন এক কূট কৌশল। ক্লাইভ উমিচাঁদের সাহায্যও নেবেন, আবার শর্তের অর্থও পরিশোধ করবেন না বলে মনস্থ করেছেন। প্রতারক উমিচাঁদের বুদ্ধির স্বীকৃতি ঘোষণা ক্লাইভ নিজে শঠতা ও ধূর্ত বুদ্ধির দিক থেকে যে কারো চেয়ে কম নন, অকপটে তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কি হবে? কে কোন্ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছে?

উত্তর ॥ প্রশ্নোক্তর সংলাপটি বাংলার নবাবের বিশ্বাসঘাতক সিপাহসালার মীরজাফরের জ্যেষ্ঠপুত্র মীরনের। মীরনের বাসগৃহতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বৈঠক। নবাবের পারিষদবর্গ এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ঐ বৈঠকে। বৈঠকে সম্পাদিত হয়েছে এক সমঝোতা চুক্তি। এই চুক্তির ফলে সিরাজের পতনের পর বাংলার মসনদের অধিকারী হবেন সিপাহীসালার মীরজাফর। উল্লিখিত ষড়যন্ত্র বৈঠক শেষ হওয়া মান উল্লসিত মীরন পরিচারিকাদের উদ্দেশ্যে এই সংলাপটি উচ্চারকণ করেছে। ঐ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে পিতা মীর জাফরের সঙ্গে সঙ্গে মীরনেরও অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটবে, সে হবে ‘শাহ্জাদা’। নবাবের পুত্র হিসেবে ভবিষ্যৎ নবাবের স্বপ্নও দেখে মীরন।

প্রশ্ন ঃ ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফর চরিত্রের দ্বিধা ও লোভের পরিচয় দিন।

উত্তর ।। বাংলার নবাবের পারিষদবর্গের একাংশ নবাবের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত। এরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধির সঙ্গেও স্থাপন করেছে যোগাযোগ নবাবের পতন নিশ্চিত করার জন্যই উভয়পক্ষের যৌথ বৈঠক ডাকা হয়েছে মীরনের বাসগৃহে। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করা হয়েছে তা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে আপাতদৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা লাভবান হবেন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। তিনিই হবেন বাংলার মসনদের নতুন নবাব। ষড়যন্ত্র বৈঠকে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে কার কী প্রাপ্য হবে সেই ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পূর্ব প্রস্তুতকৃত চুক্তিপত্রে ষড়যন্ত্রের হোতা সকলেই স্বাক্ষরদান করে ফেলেছেন, বাকি রয়েছেন শুধু সিপাহসালার মীরজাফর। ক্লাইভ মীরজাফরকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার অনুরোধ করলে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন মীরজাফর। চুক্তিপত্র পাঠ না করেই স্বাক্ষরদানে ইতঃস্তত করেন তিনি। অবশেষে রাজা রাজবল্লভ পড়ে শোনান চুক্তিপত্রের ধারা ও শর্তাবলি। সব শর্তই বাংলার বিপক্ষে যাবে এই অনুভব থেকে নবাবের বিশ্বাসঘাতক পারিষদবর্গ সাময়িক দ্বিধায় পীড়িত হন। ফলে তারা ক্লাইভের সঙ্গে বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। এই চুক্তির বলে সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা যার সেই মীর জাফর ক্লাইভের মন্তব্যের সূত্রে বুঝতে পারেন যে এ পর্যায়ে কালক্ষেপণ সুবুদ্ধির কাজ হবে না। কাজেই সাময়িক দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ক্ষমতালুব্ধ মীরজাফর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে মনস্থ করেন। তবে স্বাক্ষরদানের মুহূর্তেও তার দ্বিধানিম্ন সংশয়ী উঠে। তিনি শুনতে পান মরাকান্না, জিজ্ঞাসাতাড়িত হয়ে উঠেন এই বলে যে- ত সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না ত?

লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফরের এই দ্বিধা ও সংশয় সাময়িক ভাবাবেগ মাত্র। তবু দ্বিধা ও সংশয়ের এই আকস্মিক অনুসরণই মীরজার চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজী?
২. সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না ত?
৩. দেশের জন্য দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী।
৪. আমরা এমন কিচু করলাম যা ইতিহাস হবে।

উত্তর

সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না ত?

আলোচ্য সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত। বিশ্বাঘাতক মীরজাফরের সাময়িক দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে আলোচ্য সংলাপটিতে।

নবাব-বিরোধী চক্রান্তের চূড়ান্ত পর্যায়ে, মীরনের বাসগৃহে আয়োজিত ষড়যন্ত্র বৈঠকে নবাবের বিদ্রোহী পারিষদ-বর্গ ও কোম্পানীর প্রতিনিধির মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বাসঘাতকতার ঐ দলিল প্রণয়ন ও স্বাক্ষরদানের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা হয় নবাবের আসন্ন পতন ও বাংলার বিপর্যয়। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানের পূর্ব মুহূর্তে আকস্মিকভাবেই সাময়িক দ্বিধার শিকার হন ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফর। সংলাপটিতে দ্বিধান্বিত মীরজাফরের যে জিজ্ঞাসা ব্যক্ত হয়েছে তার উত্তর অনুচ্চারিত থাকলেও, ঐ চুক্তির ফলে বাংলাকে যে বিকিয়ে দেয়া হয়েছিলো তা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য। মীরজাফরের মনে সাময়িক ঐ দ্বিধার জন্ম হলেও তিনি জানেন যে, দেশের বিপর্যয় সত্ত্বেও চুক্তিটি বাস্তবায়িত বলে ব্যক্তিগতভাবে তিনিই হবেন সর্বাধিক লাভবান। কাজেই সাময়িক ঐ দ্বিধা অচিরেই কাটিয়ে উঠেন তিনি। অবলীলায় স্বাক্ষর দান করে ফেলেন কলঙ্কজনক ঐ চুক্তিপত্রে।

মীরজাফর আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত; ঐতিহাসিক ভাষ্যে বিশ্বাসঘাতকের প্রতিনাম রূপে মীরজাফর অভিদাটি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। নাট্যকার সিকান্‌দার আবু জাফর বিশ্বাসঘাতক এই ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে লোভও দ্বিধার স্বল্পস্থায়ী দ্বন্দ্বের আভাস দিয়ে চরিত্রটিকে সজীব করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে।

ব্যাখ্যেয় সংলাপটি বিশিষ্ট নাট্যকার সিকান্‌দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সংলাপটি রবার্ট ক্লাইভের। মীরনের গৃহে নবাব বিরোধীদের ষড়যন্ত্র বৈঠকে নিজেদের মধ্যে চুক্তির দলিল স্বাক্ষরিত হলে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ক্লাইভ সংলাপটি উচ্চারণ করেন।
মীরনের গৃহে নবাব বিরোধীদের বৈঠকে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তা নিশ্চিত করে বাংলার আসন্ন বিপর্যয় এবং নবাবের পতন। ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা কর্ণেল ক্লাইভ কূটকৌশল প্রয়োগ করে ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফর ও অন্যান্য অমাত্যকে প্রলুব্ধ করেন এবঙ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর আদায়ের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হন। চুক্তিপত্রে সকলের স্বাক্ষরদান সম্পন্ন হলে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত ক্লাইভ গর্বের সঙ্গে চুক্তিটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা ঘোষণা করেন। প্রকৃত অর্থেই চুক্তিটির রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। তবে ক্লাইভ যে দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করেছেন ইতিহাস তাকে উল্টো অর্থেই গ্রহণ করেছে। কেননা ঐ ঐতিহাসিক চুক্তি রচনা করেছে এক কলঙ্কজনক ইতিহাস। এই চুক্তির হোতা ও স্বাক্ষরকারী সকলেই আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ক্লাইভের প্রশ্নোক্ত সংলাপটি তাই বিপরিতার্থক ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, যা সংলাপ রচনায় নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয়বহ।

ইউনিট ৪

তৃতীয় অঙ্ক

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- সিরাজ-উ-দ্দৌলার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সিরাজের নবাবের দ্রুত পতনের কাহিনী জানতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ঈর্ষাপরায়ণা ঘসেটী বেগমের পরিচয় দিতে পারবেন।
- বাংলার ভাগ্যবিপর্যয় ও নবাবের পতনের পারিবারিক অন্তর্কহের বর্ণনা দিতের পারবেন।
- আমিনা বেগম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- প্রাসাদ ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার তৎপরতার পরিচয় দিতে পারবেন।
- নবাব প্রসঙ্গে বেগম লুৎফুন্নিসার ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

মূলপাঠ

মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা

রাজমাতা – রাজার মা।
শাহজাদী – বাদশাহ্‌র কন্যা
পরিহাস – ঠাট্টা; তামাশা।
চাঁদের হাট – শিশুদের বা সুন্দরীদের একত্র সবাবেশ; সুখ সম্পদপূর্ণ সংসার।
মহাপরাক্রমশালী – মহাশক্তিশালী।
হস্তক্ষেপ – হাত দেওয়া; কোনো কাজে বাধা দেওয়া।
ভূতপূর্ব নবাব – প্রাক্তন নবাব, এখানে নবাব মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দী খাঁ।
সাপিনী – স্ত্রী-সাপ। এখানে সাপিনী স্বভাবের নারী অর্থে ব্যবহৃত।
উদগার – এখানে বমন অর্থে।

মূলপাঠ

তৃতীয় অংক ॥ প্রথম দৃশ্য

স্থান ঃ লুৎফুন্নিসার কক্ষ

সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ১০ থেকে ২১ জুনের মধ্যে যে কোন একদিন।

[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে ঘসেটী, লুৎফা, আমিনা, সিরাজ, পরিচারিকা

(নবাব জননী আমিনা বেগম ও লুৎফুন্নিসা উপবিষ্ট। ঘসেটী বেগমের প্রবেশ)

ঘসেটী ॥ বড় সুখে আছো রাজমাতা আমিনা বেগম।

লুৎফা ॥ আসুন খালাম্মা।
(সালাম করল)

ঘসেটী ॥ বেঁচে থাকো। সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে দোয়া করতে পারলুম না।

আমিনা ॥ ছিঃ বড় আপা। এসো কাছে এসে বসো।

ঘসেটী ॥ বসতে আসি নি। দেখতে এলাম কত সুখে আছো তুমি। পুত্র নবাব, পুত্রবধু নবাব বেগম, পৌত্রী শাহজাদী-

আমিনা ॥ সিরাজ তোমারও তো পুত্র তুমিও তো কোলে পিঠে করে তাকে মানুষ

আক্রোশ – বিদ্বেষ; ক্রোধ।
উৎকণ্ঠিত – দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; চিন্তিত।
মাতৃ স্থানীয়া – মাতৃসম, মায়ের মত।
মতলব – অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য।
ক্ষমতাভিলাসী – ক্ষমতা লাভ করা যার ইচ্ছা।

টীকা

লুৎফুন্নিসা– নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পত্নী। তার পিতার নাম মীর্জা ইরাজ খান। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে এদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় সিরাজের বয়স ছিল তের বছর আর লুৎফুন্নিসা ছিলেন নিতান্ত বালিকা। জাঁকজমকপূর্ণ এই বিয়ের স্মৃতি দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে অক্ষুণ্ন ছিল।
লুৎফুন্নিসা রাজনীতির কুটিল পরিমন্ডল থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। সুখ-দুখকাতর সাধারণ নারীর মতই ছিল তার জীবন। ভাগ্যাবিড়ম্বিতা নারীর মতই তার জীবনের পরিণতি। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজের পলায়ন মুহূর্তের সঙ্গী ছিলেন লুৎফুন্নিসা। গন্তব্যহীন ঐ পলায়ন পথেই স্বামীসঙ্গ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সিরাজ বন্দী হলে তাকে শত্রুরা মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে, কিন্তু লুৎফুন্নিসাকে পাটিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়। সিরাজের মৃত্যুর পর ইংরেজরা তাকে মুর্শিদাবাদে পুনরায় নিয়ে এসেছিল। তিনি মীরজাফর পুত্র মীরনের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব

করেছো।

ঘসেটী ॥ অদৃষ্টের পরিহাস- তাই ভুল করেছিলাম। যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে, যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মত, তা হলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতাম না।

লুৎফা ॥ আপনাকে আমরা মায়ের মত ভালোবাসি। মায়ের মতই শ্রদ্ধা করি।

ঘসেটী ॥ থাক! যে সত্যিকার মা তার মহলেই তো চাঁদের হাট বসিয়েছো আমাকে আবার পরিহাস করা কেন? দরিদ্রা রমণী আমি। নিজের সামান্য বিত্তের অধিকারিণী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারটুকুও আমাকে দিলেন না।

আমিনা ॥ কি হয়েছে তোমার? পুত্রবধূর সামনে এ রকম রূঢ় ব্যবহার করছ কেন?

ঘসেটী ॥ কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব আমি তার প্রজা। ক্ষমতার অহঙ্কারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না। মতিঝিল থেকে আমাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারত না।

লুৎফা ॥ শুনেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি ধার নিয়েছেন। কলকাতা অভিযানের সময়ে টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তাই। কিন্তু গোলমাল মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ফেরৎ পাবেন।

ঘসেটী ॥ নবাব টাকা ফেরৎ দেবেন!

লুৎফা ॥ কেন দেবেন না? তা ছাড়া সে টাকা ত' তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেন নি। দেশের জন্যে-

ঘসেটী ॥ থামো, লম্বা লম্বা বক্তৃতা করো না। সিরাজের বক্তৃতা তবু সহ্য হয়। তাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।

আমিনা ॥ সিরাজ তোমার কোন ক্ষতি করে নি বড় আপা।

ঘসেটী ॥ তার নবাব হওয়াটাইত আমার মস্ত ক্ষতি।

আমিনা ॥ নবাবী সে কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয় নি। ভূতপূর্ব নবাবই তাকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন।

ঘসেটী ॥ বৃদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছো।

আমিনা ॥ আমরা।

ঘসেটী ॥ ভাবছো সে বিস্মিত হবার ভঙ্গী করলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব কেমন? তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও।

আমিনা ॥ তুমি অনর্থক বিষ উদগার করছো বড় আপা। তোমার এই ব্যবহারের অর্থ কিছুই বুঝতে পারছিনে।

ঘসেটী ॥ বুঝবে। সেদিন আসছে। আর বেশিদিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবী করতে হবে না।

(সিরাজের প্রবেশ)

সিরাজ ॥ সিরাজ-উ-দ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুখে নবাবী করেনি খালাআম্মা।

পর্যন্ত নবাব সিরাজের স্মৃতিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অন্তরে ধরে রেখেছিলেন।

আমিনা বেগম– বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার গর্ভধারিনী এবং প্রাক্তন নবাব আলিবর্দী খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা। আলীবর্দীর ভ্রাতুষ্পত্র জয়েনউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। জয়েনউদ্দিন যখন বিহারের সুবেদার তখন ১৭৪৮ সালে আফগান নৃপতি আহমদ শাহ দুররানী পাঞ্জাব আক্রমণ করলে বাংলার নবাবের বিদ্রোহী আফগান সেনাদল পাটনা অধিকার করে নেয়। এই বিদ্রোহীদের হাতেই আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহম্মদ ও তার পুত্র জয়েনউদ্দিনের মৃত্যু হয়। আমিনা বেগম বাংলার নবাব পরিবারের এক ভাগ্যহীনা নারী। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র এক্রামউদ্দোলা পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব সিরাজ-উ-উদ্দৌলাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর তার কনিষ্ঠপুত্র মির্জা মাহদিকেও মীরনের আজ্ঞাবাহী সৈন্যরা কাঠের পাটাতনে পিষ্ট করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আমেনা বেগমের হত্যাকান্ডও মীরজাফরের নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মীরজাফরের নির্দেশে হাত-পা বেঁধে মাঝদীতে নিক্ষেপ করে বন্দিনী আমিনা বেগমের জীবন্ত সমাধি রচনা করা হয়।

ঘসেটী ॥ এসেছো শয়তান। ধাওয়া করেছো আমার পিছু।

সিরাজ ॥ আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।

ঘসেটী ॥ কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

সিরাজ ॥ আমার প্রয়োজন আপনার সম্মতির অপেক্ষা রাখছে না খালাআম্মা।

ঘসেটী ॥ তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছো যে তোমার আরও কিছু টাকার দরকার।

সিরাজ ॥ খবর আপনার অজানা থাকার কথা না।

ঘসেটী ॥ অর্থাৎ?

সিরাজ ॥ অর্থাৎ আমি জানি যে, বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন। আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান? আমি জানি যে, সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উম্মাদ। আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে যেন কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়।

ঘসেটী ॥ তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো?

সিরাজ ॥ আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

ঘসেটী ॥ তোমার এই চোখ রাঙাবার স্পর্ধা বেশিদিন থাকবে না। নবাব। আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সিরাজ ॥ আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না খালাআম্মা। আপনার নিজের সম্বন্ধেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। নবাবের মাতৃস্থানীয়া হয়ে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্ততঃ আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।

ঘসেটী ॥ তোমার মতলব বুঝতে পারছি নে।

সিরাজ ॥ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ন রমণীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ্য রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে লক্ষ্য রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারো সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ রাখতে না পারেন।

ঘসেটী ॥ (ক্ষিপ্ত) ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব।
(দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে শুনলে ত রাজমাতা আমাকে বন্দিনী করে রাখা হল। এইবার বলত আমি তার মা, সে আমার পুত্র- তাই না? হা হা হা। (অসহায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন)

আমিনা ॥ এসব লক্ষণ ভাল নয়। (উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শুনে যাও, বড় আপা-
(বেরিয়ে গেলেন)

বস্তুসংক্ষেপ

কনিষ্ঠা ভগিনীর রাজমাতা হওয়ার সৌভাগ্যে ঈর্ষাকাতর ঘসেটী বেগম এসেছেন নবাবের মহলে অনুজা আমিনাকে ভর্ৎসা করতে। ইতোমধ্যে নবাব সিরাজ ঘসেটীর সমৃদ্ধ অর্থভান্ডার থেকে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছেন। আবার নবাবের কাছে

এটিও এখন স্পষ্ট যে, তাঁর বিরুদ্ধে ঘনীভূত প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে, ইন্ধন যুগিয়েছেন মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগম। ফলে ঘসেটী বেগমের চলাচলে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে গুপ্তচর বাহিনী। এতেই ঘসেটী বেগম আহত বাঘিনীর মত ক্রুদ্ধ হয়ে অভিযোগ জানাতে এসেছেন আমিনা বেগমরে কাছে। নিঃসন্তান ঘসেটী বেগম আমিনা বেগমের মধ্যমপুত্র এক্রামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্রই হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল পিতার জ্যেষ্ঠ কন্যার পোষ্যপুত্রই হবে বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব, কিন্তু পূর্বেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় এক্রামউদ্দৌলার। এছাড়া ঘসেটী বেগমের প্রিয়ভাজন সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁকে আলীবর্দীর নির্দেশে সিরাজ হত্যা করেছিলেন। এসব কারণে সিরাজের প্রতি তিনি ছিলেন বিরূপ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। ফলে নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রে তিনি জড়িয়ে পড়েন। এখন তার স্বরূপ নবাবের কাছে স্পষ্টভাবে উম্মোচিত হওয়ার ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এসেছেন অসমা আমিনার কাছে। সিরাজও তাঁর পুত্রের মতই, ঘসেটীর কাছেও সিরাজ পুত্রস্নেহেই বড় হয়েছেন আমিনা এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে ঘসেটী আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। সিরাজ তাঁর সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে জানলে তিনি তাকে প্রাসাদ চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতেন একথাটি তিনি নির্দ্বিধায় বলে ফেলেন আমিনাকে। ঘসেটী মনে করেন, সিরাজ যদি তাঁর পুত্র হত তাহলে সে তাঁকে তাড়িয়ে দিত না।

আমিনা ঘসেটী লুৎফার কথোপকথনের মধ্যেই আকস্মিকভাবে এসে উপস্থিত হন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। ঘসেটী নবাবকে ‘শয়তান’ অভিহিত করে তাঁকে অনুসরণ করে এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সিরাজকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু সিরাজ তাঁর সকল অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্টতই জানিয়ে দেন যে, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের প্রত্যাশাতেই ঘসেটী বেগম আজ উম্মাদ হয়ে উঠেছেন। নবাব তাঁকে সাবধান করে দেন। শত্রুদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অবাঞ্ছিত মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগমকে এ দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই নবাব ব্যবস্থা করেছেন সর্তক প্রহরার। সিরাজ জানেন যে, দেশের দুর্যোগময় মুহূর্তে ক্ষমতা লিপ্সু নারীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা দেশের জন্য অকল্যাণকর। এজন্যে বাধ্য হয়েই নবাবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে এ কথা জানিয়ে দেন সিরাজ-উ-দ্দৌলা। কর্তব্যপরায়ণ সিরাজের এ বক্তব্য শুনে ঘসেটী বেগম আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। সিরাজের বন্দীদশা অনুভব করে আমিনাকে ধিক্কার দিতে অতঃপর ঘসেটী বেগম প্রস্থান করেন। বিচলিত আমিনা বেগম এ অবস্থায় সকাতরে তাঁকে আহবান করতে করতে নাট্যমঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঘসেটী বেগম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করুন।
২. ‘বসতে আসি নি। দেখতে এলাম কত সুখে আছো তুমি’। - কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করেছে?
৩. ‘কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব আমি তার প্রজা।’ - ঘসেটী বেগমের এই আক্ষেপ ও ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৪. ‘কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়’– কে কার উদ্দেশ্যে কী কারণে এই উক্তিটি করেছে?
৫. আমিনা বেগম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।
৬. ‘অন্ততঃ আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই’– ঘসেটী বেগমের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত সিরাজের এই সংলাপটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৭. ঘসেটী বেগমের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সিরাজ কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর

প্রশ্ন ঃ 'কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব আমি তার প্রজা।' - ঘসেটী বেগমের এই আক্ষেপ ও ক্ষোভের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ।। বাংলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল রচনা করা হয়েছে, তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন নবাব জননী আমিনা বেগমের অগ্রজা ঘসেটী বেগম। নবাব আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটী ছিলেন নিঃসন্তান। এ কারণেই অনুজা আমিনার পুত্র এক্রামদ্দৌলাকে তিনি পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল অপুত্রক আলীবর্দী জ্যেষ্ঠ কন্যার পোষ্যপুত্রকেই ভবিষ্যৎ নবাব-রূপে অভিষিক্ত করবেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সিরাজের নবাব পদে অভিষিক্ত হওয়ার অনেক পূর্বে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে এক্রামউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। স্নেহান্ধ ঘসেটী এতে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তাঁর এই ক্ষোভ প্রতিহিংসার পথ অন্বেষণ করে সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁর হত্যার ঘটনায়। ঘসেটী বেগমের স্বামী ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াজিস মোহাম্মদ শাহমৎজঙ্গ ছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্বল চিত্তের মানুষ। সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁর সঙ্গে ঘসেটী বেগমের মধুর সম্পর্ককে তাই পিতা আলীবর্দী সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। ফলে ভূতপূর্ব নবাবের নির্দেশেই দৌহিত্র সিরাজ সেনাপতি হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই ঘসেটী বেগম ক্রমে হয়ে উঠেন প্রতিহিংসা পরায়ণা। নতুন নবাবের বিরুদ্ধে ঘনীভূত প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যোগাতে তাই পিছপা হননি তিনি।

জ্যেষ্ঠ বর্তমানে কনিষ্ঠা আমিনা বেগমের রাজমাতা হওয়ার সৌভাগ্য ঈর্ষার বিষে জর্জরিত হয়েছেন ঘসেটী বেগম। সিরাজ শুধু নবাব হয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁর সঞ্চিত অর্থের দিকেও তিনি হাত প্রসারিত করেছেন নবাবের বিরুদ্ধে ঘসেটীর এই অভিযোগে। এছাড়া নবাব তাঁর আবাসস্থল মতিঝিল থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে, চলাচলের ওপর আরোপ করেছেন বিধি-নিষেধ, তাঁর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত করেছেন গুপ্তচর বাহিনী। প্রতিক্রিয়াতেই ঘসেটী অনুজার কাছে এসেছেন ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাতে। সিরাজ যে ঘসেটী বেগমেরও পুত্র, লুৎফা পুত্রবধূতুল্য আমিনার এই প্রবোধ বাণী আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে ঘসেটী বেগমকে। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ঐ সম্পর্ক সূত্র। পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন অগ্রাহ্য করে ঘসেটী সিরাজের সঙ্গে তাঁর নবাব প্রজার সাধারণ সম্পর্ককেই স্বীকার করে নিয়ে নিজের বিদ্রোহী অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন ঃ 'কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়'– কে কার উদ্দেশ্যে কী কারণে এই উক্তিটি করেছে?

উত্তর ।। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বেগম লুৎফুন্নিসার উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন ঘসেটি বেগম।

নবাব আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটী আজ এক সাধারণ নারী, মীর্জা ইরাজ খানের কন্যা লুৎফুন্নিসা বাংলার নবাবের সৌভাগ্যবতী বেগম নিজের এই ভাগ্য নিপর্যয় বিয়ের জ্বালায় জর্জরিত করছিলো ঘসেটী বেগমকে। তিনি যখন নিজের অর্থ ভান্ডারে নবাবের অনধিকার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করছিলেন আমিনার কাছে, তখন লুৎফা, নবাব যে দেশের কল্যাণের জন্যই এ অর্থ ঋণ গ্রহণ করেছেন। যে কথা বিনয় সহকাররে ব্যক্ত করলে ঘসেটী বেগম ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ সংলাপটি উচ্চারণ করেন।

ঘসেটী নবাব সিরাজকে শৈশবে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। এখন সে অবাধ্য কিংবা অত্যাচারী হলেও সহনীয়। কিন্তু সাধারণ এক নারী লুৎফুন্নিসা, যে ভাগ্যের জোরে আজ নবাবের বেগম, তার মুখে নবাবের কাজের সাফাই গাইতে দেশপ্রেমের বুলি ঘসেটী বেগমের কাছে অসহ্য। এজন্যেই ক্ষমতার লোভে উন্মাদ ঘসেটী বেগম লুৎফুন্নিসার উদ্দেশে এই রূঢ় সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ আমিনা বেগম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।

উত্তর ।। আমিনা বেগম বাংলার ভূতপূর্ব নবাব আলীবর্দী খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা এবং নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার গর্ভধারিণী। ভাগ্যবিড়ম্বিতা এই নারীর জীবন ছিলো শোকগ্রস্ত। সন্তানহীনা অগ্রজা ঘসেটী বেগমকে তিনি দান করেছিলেন নিজের পুত্রধন। আমিনার মধ্যমপুত্র এক্রামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ঘসেটী বেগম। কিন্তু আমিনার এই পুত্র পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্বেই বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পলাশীর যুদ্ধ শেষে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব সিরাজকে ষড়যন্ত্রকারীরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। মীরনের নির্দেশে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা মাহদীকেও কাঠের পাটাতনে

পিষ্ট করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আমিনা বেগম হত্যাকান্ডও মীরজাফরের নিষ্ঠুরতার এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। তবু পুত্রশোকাতুরা মাতৃপ্রতিমা রূপেই আমিনা ইতিহাসে স্মরনীয়া হয়ে আছেন।
রাজমাতা হলেও নাটকে আমিনা বেগম এক স্নেহমমতাময়ী জননীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কূটচাল, রাজনীতির জটিল আবর্ত এবং পারিবারিক অন্তর্কলহ তাঁকে তেমন স্পর্শ করেনি। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়েছেন তাঁর অগ্রজা ঘসেটী বেগম। কিন্তু ঘসেটীর সঙ্গে ব্যবহারে অগ্রজের সম্মানই তিনি তাকে দিয়েছেন। ঘসেটী নবাবের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে আমিনা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সিরাজের শৈশবকালে ঘসেটী কর্তৃক মাতৃস্নেহে তাকে লালন পালনের কথা। পুত্রবধূতুল্য লুৎফার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করলে ঘসেটীর বিরুদ্ধে আমিনা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেননি, মৃদুস্বরে অনুযোগ প্রকাশ করেছেন মাত্র। সিরাজের নবাব হওয়াটাই ঘসেটীর জন্য মস্ত বড় ক্ষতি– একথাটি নির্দ্বিধায় ঘসেটী উচ্চারণ করলে আমিনা তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, সিরাজ ক্ষমতা দখল করেনি, ভূত পূর্ব নবাব পিতা আলীবর্দীই সিরাজকে মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন,। এর প্রত্যুত্তরে 'তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও' - এই বলে আমিনার উদ্দেশে বিষ উদ্‌গার করলেও আমিনা অগ্রজাকে 'বড়আপা' সম্বোধন করে নিজের বিমূঢ়তা ও অসহায়তাই প্রকাশ করেছেন।
আমিনা রাজনীতির কুটিলতা মুক্ত শাশ্বত মাতৃ হৃদয়ের অধিকারিণী এক বিশিষ্ট চরিত্র।

প্রশ্ন ঃ 'অন্ততঃ আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই'– ঘসেটী বেগমের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত সিরাজের এই সংলাপটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ॥ আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটী বেগম নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সিরাজ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মাতৃস্থানীয়া এ নারীর অর্থভান্ডার থেকে ঋণ গ্রহণ করলেও এটাই ঘসেটী বেগমের ক্ষোভের একমাত্র কারণ নয়। নবাব জানেন যে, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের প্রত্যাশাতেই প্রতিহিংসাপরায়ণা এই নারী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। পারিবারিক পরিমন্ডলের এই মাতৃস্থানীয়া সদস্য আজ বাংলার নবাবের শত্রুদের সঙ্গে অবাঞ্ছিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাজেই ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিধা লাভের দুর্নাম থেকে মাতৃস্থানীয়া এই নারীকে রক্ষা করার জন্যই নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ঘনীভূত ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা এবং পারিবারিক দুর্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার স্বার্থেই নবাবের নির্দেশে ঘসেটী বেগমের চলাচলে আরোপ করা হয়েছে বিধিনিষেধ। মতিঝিলের আবাস থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তাঁর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত করা হয়েছে গুপ্তচর বাহিনী। নবাব যে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে তৎপর ও আন্তরিক ছিলেন উদ্ধৃত সংলাপ তারই সাক্ষ্যবহ।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞ যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।
২. অদৃষ্টের পরিহাস- তাই ভুল করেছিলাম।
৩. তার নবাব হওয়াটাই ত' আমার মস্ত ক্ষতি।
৪. তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও।
৫. রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাসী, স্বার্থপরায়ণ রমণীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।

উত্তর

সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।

উদ্ধৃত সংলাপটি কবি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে বেগম লুৎফুন্নিসার কক্ষে আকস্মিকভাবে উপস্থিত ঘসেটী বেগমকে লুৎফা সালাম জানালে ঘসেটী বেগম আর্শীবাণী উচ্চারণ না করে ঐ বিষ মাখানো কথা নির্দ্বিধায় বলে ফেলেন।
ঘসেটী বেগম নবাবের অন্দর মহলে প্রবেশ করেছেন মূলত কনিষ্ঠ সহোদরা আমিনা বেগমের কাছে কিছু অভিযোগ জানাতে। অনুজা রাজমাতা আর অগ্রজা রাজরোষে বন্দিনী অদৃষ্টের এই পরিহাস ক্রোধ ও ক্ষোভে উন্মাদ করে তুলেছে ঘসেটী বেগমকে। ফলে লুৎফুন্নিসার কক্ষে প্রবেশ মুহূর্তেই ঘসেটী বেগমকে সরল লুৎফা মাতৃসম্মানে সালাম জানালে লুৎফার উদ্দেশে তিনি উল্লিখিত বিষোদ্‌গার করেন। লুৎফার জন্য দোয়া করতে হলে তার সুখ ও সৌভাগ্য লাভ ঘসেটীর নিজের পক্ষে অভিশাপতুল্য। কেননা লুৎফুন্নিসার সুখ ও সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠার অর্থই হলো ঘসেটির অনিবার্য ভাগ্য বিপর্যয়। এ কারণেই ঘসেটী বেগম নির্দ্বিধায় নিজের অন্তরের স্বরূপ উপর্যুক্ত সংলাপটিতে প্রকাশ করেছেন।

অদৃষ্টের পরিহাস- তাই ভুল করেছিলাম।

আলোচ্য সংলাপটি বিশিষ্ট নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অন্তর্গত। অনুজা আমিনা বেগমের উদ্দেশ্যে অগ্রজা ঘসেটী বেগম সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।
ঈর্ষাপরায়ণা ঘসেটী বেগম অনুজা আমিনা বেগমের সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ সংসারের অবস্থা দেখে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠেছেন। সিরাজ হোসেন কুলী খাঁকে হত্যা করেছেন, এখন তার সমৃদ্ধ অর্থ ভান্ডারের দিকে হাত প্রসারিত করেছেন। ক্ষুব্ধ ঘসেটী তাই প্রকারান্তরে লুৎফার উদ্দেশে উচ্চারণ করেছে অভিশাপ বচন। ভাগ্যের অনুকূল্যে আমিনা আজ রাজমাতা, তার পুত্রবধূ বাংলার নবাবের বেগম। পক্ষান্তরে ঘসেটী আজ রাজকীয় প্রাসাদ ‘মতিঝিল’ থেকেও বিতাড়িত। তার আক্ষেপ উক্তির জবাবে আমিনা অগ্রজাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সিরাজ তারও পুত্র, তিনিও সিরাজকে শৈশবে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। আমিনার এ কথার প্রত্যুত্তরে ঘসেটী জানিয়ে দেন যে তার জীবনকে অদৃষ্টের এ এক নির্মর্মম পরিহাস। আজ তিনি অনুভব করেন শৈশবে সিরাজকে মাতৃস্নেহে লালন করে তিনি ভুল করেছেন। ক্রোধোন্মত্তা এই নারী নির্বিকার দৃঢ়তায় আমিনাকে বলে ফেলেন যে, তিনি যদি জানতেন সিরাজ তার সৌভাগ্যের পথে অন্তরায় হবে, তাহলে শিশু সিরাজকে সে সময়েই প্রাসাদ চত্বরে আছড়ে তিনি মেরে ফেলতেন।
ক্ষমতালিপ্সু ও ঈর্ষাপরায়ণা ঘসেটী বেগম চরিত্রের অন্তরের কদর্যরূপ, তার সাপিনী স্বভাবের কুটিল মূর্তি আলোচ্য সংলাপটির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাসী, স্বার্থপরায়ণ রমণীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর।

উপস্থাপিত সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম ইন্ধদাত্রী মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগমের উদ্দেশে এই সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।
ঘসেটী বেগমের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ নবাবের কাছে উন্মোচিত হয়ে গেলে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে বাধ্য হয়েই কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সিরাজ মনে করেন নবাবের মাতৃস্থানীয়া কারও পক্ষে শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা অবাঞ্ছিত। এ কারণে নবাবের নির্দেশেই ঘসেটী বেগমের অবাধ চলাচলে আরোপ করা হয়েছে বিধি-নিষেধ, তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণে নিযুক্তি করা হয়েছে গুপ্তচর। ফলে আহতা সাপিনীর ভয়ঙ্করতা নিয়ে ঘসেটী নবাবের মুখোমুখি হয়েছেন, জানতে চেয়েছেন নবাবের হীন উদ্দেশ্যর অর্থ। কিন্তু বীরোদাত্ত সিরাজ সুস্পষ্ট দৃঢ়তায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এই গোলযোগ মুহূর্তে ক্ষমতালিপ্সু কোনো নারীর রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব রাখা দেশের জন্য অকল্যাণকর। সিরাজ জানেন, মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগম নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রের হোতা সিপাহসালার মীরজাফরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। ক্ষমতালিপ্সু ও ঈর্ষার বিষে জর্জরিত এই মাতৃতুল্য নিকটত্নীয়ার উদ্দেশ্য ও গতিবিধি অবহিত হয়েই সিরাজ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সিরাজ অকপটেই তার গৃহীত পদক্ষেপ ঘসেটীকে আলোচ্য সংলাপটিতে জানিয়ে দেন। সিরাজের দৃঢ়তা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং সত্য প্রকাশে অকুণ্ঠ স্থিরতা আলোচ্য সংলাপটিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ঘসেটী বেগম সম্পর্কে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মনোভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সিরাজ ও লুৎফার মানবিক সম্পর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিচ্ছিন্নতাবোধ ও মানসিক সংকটের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানুষ সিরাজের অন্তর্জগতের পরিচয় দিতে পারবেন।
- সিরাজ চরিত্রের কিছু ইতিবাচক গুণ শনাক্ত করতে পারবেন।

শব্দার্থ

ভরসা – আস্থা, বিশ্বাস।
কসম – শপথ, প্রতিজ্ঞা।
শারাব – মদ।
কামিয়াবী – সফলতা, কৃতকার্যতা।
দেয়াল – বাধা, প্রতিবন্ধক অর্থে এখানে প্রযুক্ত।
অস্তিত্ব – সত্তা।
স্বপ্ন – কল্পনা, অবাস্তব।
বাস্তব – প্রকৃত, যথার্থ, সত্য।
অদৃষ্ট – ভাগ্য, নিয়তি।
কল্যাণ – মঙ্গল, শুভ।
মসনদ – সিংহাসন, রাজাসন।
বেনিয়া – ব্যবসাদার।
ওয়াদা – শপথ, প্রতিজ্ঞা।
খেলাপ – ব্যতিক্রম, নড়চড়, অন্যথা।
বরদাস্ত – সহ্য করা, সহ্যকরণ।
হারেম – অন্দরমহল, অন্তঃপুর।
রসলীলা – প্রেমলীলা।

টীকা

শওকতজঙ্গ – নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার খালাত ভাই ও রাজনৈতিক শত্রু। আলীবর্দী খাঁর দ্বিতীয় কন্যা শাহ বেগম এর পুত্র। শওকতজঙ্গের

মূলপাঠ

লুৎফা ॥ খালাআম্মা বড় বেশি অপমানিত বোধ করেছেন। ওঁর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়ত উচিত হয়নি।

সিরাজ ॥ আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।

লুৎফা ॥ এ কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাবো বলো ত লুৎফা। দেখতে পাচ্ছো না, শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কি রকম মেতে উঠেছে।

লুৎফা ॥ কিন্তু খালাআম্মা-

সিরাজ ॥ আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাআম্মা খুশী হবেন সবচেয়ে বেশি।

লুৎফা ॥ অতটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ওঁর মন আপনার ওপরে যথেষ্ট বিষিয়ে উঠেছে তা ঠিক। কিন্তু-

সিরাজ ॥ থামলে কেন? বলো।

লুৎফা ॥ বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

সিরাজ ॥ বলো।

লুৎফা ॥ বিধবা মেয়েমানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা।

সিরাজ ॥ লুৎফা, তুমিও আমার বিচার করতে বসলে। করো, আমি আপত্তি করব না। নানা মরবার পর থেকে এই ক'মাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে, আমার নিকটতম তুমিও তা বুঝতে পারবেনা।

লুৎফা ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ মনে পড়ে লুৎফা নানার মৃত্যুশয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম শরাব স্পর্শ করব না। আমি তা করিনি। তুমিও জানো লুৎফা আমি তা করি নি।

লুৎফা ॥ আমি ওসব কোনো কথাই তুলছিনে জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ আমি জানি। সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার কর।

লুৎফা ॥ আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্যে কেনো কথা বলিনি জাঁহাপনা। খালাআম্মা রাগে প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন

পিতার নাম সৈয়দ আহমদ। ইনি আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী মোহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র। শওকতজঙ্গের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন কাশ্মীরের হিন্দু যুবক মোহনলাল।

আলীনগর – কলকাতা শহরের নতুন নাম। ১৭৫৬ সালের জুন মাসে কলকাতা দখল করে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা মাতামহের নামানুসারে শহরটির নামকরণ করেন আলীনগর। মানিকচাঁদ ছিলেন আলীনগরের নবাবনিযুক্ত প্রথম গভর্নর।

তাই-

সিরাজ ॥ তাই তোমার মনে হ'ল, ওর টাকা পয়সায় হাত দিয়েছি বলেই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু তুমি জানো না, কতখানি উৎসাহ নিয়ে উনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজঙ্গের কামিয়াবীর জন্যে। শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।

লুৎফা ॥ আমি মাপ চাইছি জাঁহাপনা, আমার অন্যায় হয়েছে?

সিরাজ ॥ লুৎফা এত দেয়াল কেন বল ত?

লুৎফা ॥ দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা?

সিরাজ ॥ আমার চারপাশে লুৎফা। আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়। উজীর, অমাত্য, সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, খালাআম্মা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে, আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।

লুৎফা ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ আমি এর কোনটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, কোনটি ভেংগে ফেলছি, কিন্তু তবু ত দেয়ালের শেষ হচ্ছে না লুৎফা।

লুৎফা ॥ আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে যেন দু'পায়ের দশ আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্তি আসাটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে লুৎফা।

লুৎফা ॥ সমস্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে দু'একদিন বিশ্রাম করুন।

সিরাজ ॥ কবে যে দুদন্ড বিশ্রাম পাবো তার ঠিক নেই। আবার ত যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।

লুৎফা ॥ সে কি!

সিরাজ ॥ আমার বিরুদ্ধে কোম্পানীর ইংরেজদের আয়োজন সম্পন্ন। আমি এগিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি রাজধানী আক্রমণ করবে।

লুৎফা ॥ ইংরেজদের সঙ্গে ত আপনার মিটমাট হয়ে গেল।

সিরাজ ॥ হ্যাঁ, আলনিগরের সন্ধি। কিন্তু সে সন্ধির মর্যাদা একমাস না যেতেই তারা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

লুৎফা ॥ ক'জন বিদেশী বেনিয়ার এত স্পর্ধা কি করে সম্ভব?

সিরাজ ॥ ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব লুৎফা। শুধু একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারিনে, ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ তা খেলাপ করে কি করে? নিজের স্বার্থ কি এতই বড়?

লুৎফা ॥ কোনো প্রতিকার করতে পারেন নি জাঁহাপনা?

সিরাজ ॥ পারি নি। চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পাইনি। রাজবল্লভ, জগৎশেঠকে কয়েদ করে, মীরজাফরকে ফাঁসী দিলে হয়ত প্রতিকার হত, কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কি না কে জানে?

লুৎফা ॥ থাক ও সব কথা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন।

সিরাজ ॥ আর কাল সকালেরই দেশের পথে ঘাটে লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়বে,

	যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েক শ বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রসলীলার কাহিনী।
লুৎফা ॥	মহলে বেগমের ত সত্যিই কোনো অভাব নেই।
সিরাজ ॥	ঠাট্টা করছ লুৎফা? তুমি ত জানোই মরহুম শওকতজঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়েই আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে।
লুৎফা ॥	সে যাক। আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দু'জন।
সিরাজ ॥	অনেক সময়ে সত্যই তা ভেবেছি লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিন্ত সাধারণ গৃহস্থের ছোট সাজানো সংসার আমরা পেতাম। (পরিচারিকার প্রবেশ)
পরিচারিকা ॥	বেগম সাহেবা।
লুৎফা ॥	(তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) জাঁহাপনা এখন বিশ্রাম করছেন যাও।
পরিচারিকা ॥	সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে। (পৌছোতে লাগল)
লুৎফা ॥	না। (পরিচারিকার প্রস্থান)
সিরাজ ॥	(এগিয়ে আসতে) মোহনলালের জরুরী খবরটা শুনতেই দাও লুৎফা। (লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করল)
লুৎফা ॥	(আবেগ জড়িত কণ্ঠে) না।
	(সিরাজ থামল ক্ষণকালের জন্যে। লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে দু ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুগাল বেয়ে)

বস্তুসংক্ষেপ

ক্রুদ্ধ ঘসেটী বেগমের অপমানিত হয়ে ফিরে যাওয়ার ঘটনায় বিচলিত হয়েছেন লুৎফুন্নিসা। মাতৃস্থানীয়ার প্রতি নবাবের রূঢ় আচরণ অনুচিত মনে হয়েছে তাঁর। লুৎফা নবাবের কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে ফেললে, বাইরের চাপে অসহায় সিরাজ এই প্রথম নিজ অন্তঃপুরে প্রিয়তমা বেগমের অনুযোগের মুখোমুখি হন। অনুযোগের জবাব দিতে গিয়েই আত্ম উন্মোচন ঘটে সিরাজ চরিত্রের। অসহায় এই নবাব সাধারণ মানুষের মতই নিজের সহধর্মিনীর কাছে তাঁর বিপর্যস্ত মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেন।

ব্যক্তি সিরাজের শেষ আশ্রয়, তাঁর বিশ্বাসের সর্বশেষ অবলম্বন প্রিয়তমা বেগম লুৎফুন্নিসা। লুৎফাও যখন অন্ধ হয়ে অনুযোগ করেন সিরাজকে তখন হাহাকার করে ওঠে নবাবের নিরাশ্রয়ী চিত্ত। এভাবেই আত্মউন্মোচন ঘটে ব্যক্তি তথা মানুষ সিরাজের। সিরাজ স্পষ্টতই লুৎফাকে বুঝিয়ে দিন যে, ঘসেটী বেগম নবাবের ধ্বংসের আয়োজনে মেতে উঠেছেন। তিনি লুৎফাকে স্মরণ করিয়ে দেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতামহের কাছে তাঁর মদ স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞার কথা, ঐ প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন সিরাজ। ঘসেটী বেগমের ধনভাণ্ডারে নবাবের অযাচিত নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ খন্ডন করে লুৎফাকে তিনি বুঝিয়ে দেন, ঘসেটী বেগম কীভাবে নিজের অর্থভাণ্ডার নবাবের শত্রু শওকতজঙ্গের সাফল্যের জন্য উজাড় করে দিয়েছেন। সিরাজ অনুভব করেন তাঁর চারদিকে দেয়াল আর দেয়াল। এ সব প্রতিবন্ধক লঙ্ঘন করার শক্তি যেন তিনি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছেন। অমাত্য আর তাঁর নিজের মধ্যে, দেশের শাসন ব্যবস্থা আর দেশশাসকের মধ্যে, নিজের চিন্তা আর কাজের মধ্যে, স্বপ্ন আর বাস্তব এবং অদৃষ্ট এবং কল্যাণের মধ্যে মাথা উঁচু করে

দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রতিবন্ধক। কোনো প্রতিবন্ধক তিনি অতিক্রম করেছেন, কোনোটিকে দিয়েছেন গুড়িয়ে- কিন্তু প্রতিবন্ধকের শেষ নেই। সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে প্রতিবন্ধক মোকাবেলা করতে করতে সিরাজের প্রাণশক্তি আজ বিবশ প্রায়। এখন আবার কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে লিপ্ত। এদের প্রতিরোধ না করলে রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রান্ত হবে যে কোনো সময়। আলীনগরের সন্ধি অগ্রাহ্য করেছে ইংরেজরা, তাদের মদদ দিচ্ছে। বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গ। ধর্মের নামে শপথ নিয়ে যারা নবাবের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলো সে প্রতিজ্ঞা তারা ভঙ্গ করেছে। রাজবল্লভ, জগৎশেঠ আর মীরজাফরকে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি দিলে হয়ত দেশের রাজনৈতিক সংকটের প্রতিকার হতো কিন্তু তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাবাহিনী এমন ব্যবস্থা মেনে নিতো কিনা এই সংশয় সিরাজকে শত্রু দমনে করেছে দ্বিধান্বিত।

বাংলার রাজনৈতিক জীবনের এই দুর্যোগময় অবস্থায় সহধর্মিনী লুৎফা অন্তঃপুরে নবাবকে কিছু দিন বিশ্রামের অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কর্তব্যসচেতন সিরাজ উপেক্ষা করেছেন এই আন্তরিক আহ্বান। প্রিয়তমা লুৎফার কাছাকাছি বহুদিন আসতে না পারার অপরাধ অকপটে স্বীকার করে নেন সিরাজ। ব্যক্তি সিরাজ আর লুৎফার মাঝখানেও উঠে দাঁড়িয়েছে রাজত্বের দেয়াল। ঐ দেয়াল উঠে গেলে হয়তো সিরাজ লুৎফা গৃহস্থের শান্তিময় নিভৃত সংসার লাভ করতেন- কিন্তু অদৃষ্ট মধুময় এ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে তাঁদের। মোহনলালের কাছে থেকে পাওয়া জরুরি সংবাদের সূত্রে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে অশ্রুসিক্ত লুৎফুন্নিসার নীরব আহ্বান ও প্রসারিত বহ ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়তে হলো পুনরায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ঘসেটী বেগম সম্পর্কে সিরাজের ধারণা ব্যক্ত করুন।
২. সিরাজ ও লুৎফার মানবিক সম্পর্কের পরিচয় দিন।
৩. রাজনেতিক সংকটে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থার বর্ণনা দিন।
৪. মানুষ বা ব্যক্তি সিরাজের অন্তর্জগতের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।
৫. সিরাজ-চরিত্রের ইতিবাচক কিছু গুণের উল্লেখ করুন।
৬. 'তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাবো বলো ত লুৎফা'- এই সংলাপটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৭. তুমিও আমার বিচার করতে বসলে'- কে কখন কার উদ্দেশ্যে এবং কী অর্থে সংলাপটি উচ্চারণ করেছে?

প্রশ্ন ঃ ঘসেটী বেগম সম্পর্কে সিরাজের ধারণা ব্যক্ত করুন।

উত্তর *॥* বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে কেন্দ্র করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার লাভ করেছিলো নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগম ছিলেন তার অন্যতম হোতা।

লুৎফার অনুযোগের উত্তরে সিরাজ ঘসেটী বেগম সম্পর্কে নিজের ধারণা দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারণ করেন। সিরাজের ধ্বংসের আয়োজনে ঘসেটী বেগম মেতে উঠেছেন। সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলেই ঘসেটী বেগম সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন। নবাব মাতৃস্থানীয়া এই নারীর অর্থ সম্পদে হস্তক্ষেপ করেছেন বলেই যে তিনি বিরক্ত, সিরাজ তা মনে করেন না। কেননা বিপুল উৎসাহ নিয়ে ঘসেটী বেগম প্রভূত অর্থ ব্যয় করেছেন নবাবের শত্রুদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য। সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় নিশ্চিত করার জন্য শওকতজঙ্গের পেছনে ব্যয় করেছেন অজস্র অর্থ। সিরাজের বিবেচনায় ঘসেটী বেগম তাই কুচক্রী, 'ক্ষমতাভিলাসী' ও 'স্বার্থপরায়ণ রমণী' হিসেবে চিহ্নিত।

প্রশ্ন ঃ সিরাজ ও লুৎফার মানবিক সম্পর্কের পরিচয় দিন।

উত্তর *॥* চারদিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হওয়ায় মানসিককভাবে বিপর্যস্ত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ফিরে এসেছেন তাঁর বিশ্বাসের শেষ আশ্রয় সহধর্মিনী লুৎফার কাছে। কিন্তু লুৎফার অনুযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বিপর্যস্ত নবাব যে

কথাগুলি উপস্থাপন করেন তাতে প্রেমময় ব্যক্তি সিরাজের অন্তর্জগতের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। অনুযোগ সত্ত্বেও, আপৎকালে লুৎফাই যে বিপর্যস্ত সিরাজের শেষ ভরসাস্থল, সিরাজ লুৎফা দম্পত্তির সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। নবাবের চারপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে দেয়ালের পর দেয়াল। অমাত্যবর্গ, দেশের শাসন ব্যবস্থা আত্মীয়বর্গ, স্বপ্ন-বাস্তব চিন্তা কাজ কল্যাণ আর সিরাজের মধ্যে গড়ে উঠেছে দেয়ালের ব্যবধান। এখন লুৎফা ও সিরাজের মধ্যেই তৈরি হয়েছে রাজত্বের অলঙ্ঘ্য দেয়াল। কিন্তু দুজনের মধ্যকার মানবিক সম্পর্কের অচ্ছেদ্যে নিবিড়তাকে অস্বীকার করতে পারেন না ব্যক্তি ও প্রেমিক সিরাজ। দুজনের মধ্যকার ব্যবধানের দেয়াল ও দূর হয়ে যাক- এমন প্রত্যাশাও মনে জেগেছে সিরাজের। তাঁর মনে হয়েছে রাজত্বের বৈভব ও ঐশ্বর্যের বদলে লুৎফাকে নিয়ে সাধারণ গৃহস্থের নিশ্চিন্ত শান্তিময় সাজানো সংসার তিনি পেতে পারতেন।

প্রশ্ন ঃ সিরাজ-চরিত্রের ইতিবাচক কিছু গুণের উল্লেখ করুন।

উত্তর ॥ সিকান্দার আবু জাফর অঙ্কিত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা চরিত্র বয়সে নবীন হয়েও আচরণে ধীর, ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত হয়েও কর্তব্য সচেতন, অনিবার্য পতনের আশঙ্কা-মুহূর্তেও বলিষ্ঠ চিত্তের অধিকারী। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সিরাজ চরিত্রের ইতিবাচক কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সিরাজ তাঁর মাতামহ আলবির্দী খাঁর মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি মদ স্পর্শ করবেন না। সিরাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সিরাজ দৃঢ় চিত্তের অধিকারী। পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কেও তার জ্ঞান তীক্ষ্ণ। সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গের যথাযোগ্য দন্ড হয়তো দেয়া যেতো কিন্তু তাদেরই আস্থাভাজন সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কিনা এই সন্দেহে সিরাজ দন্ডাদেশ দানে নিবৃত্ত থেকেছেন। অবসন্ন ও বিপর্যস্ত সিরাজ লুৎফা যখন অন্তঃপুরে বিশ্রাম গ্রহণের অনুরোধ করেন, তখন দেশের আপৎকালীন আস্থা ভাজন করে কর্তব্য সচেতন সিরাজ তা অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন- 'আর কাল সকালেই দেশের পথে ঘাটে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের কয়েক শ' বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রসলীলার কাহিনী।' মোহনলালের কাছ থেকে জরুরি সংবাদ পাওয়া মাত্র লুৎফার প্রসারিত হাতকে সরিয়ে সিরাজের প্রস্থানের মধ্যে কর্তব্যসচেতন সিরাজের পরিচয় বিধৃত।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।
২. শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও ওঁর দান কম নয়।
৩. আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়।
৪. আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন।
৫. আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত।

উত্তর

আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।

বক্ষ্যমান সংলাপটি বিশিষ্ট নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে গৃহীত হয়েছে। সহধর্মিণী লুৎফার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত সংলাপটিতে চারদিকের ষড়যন্ত্র জালে আবদ্ধ অসহায় সিরাজের মনস্তাপ প্রকাশিত হয়েছে।

যুগপৎ ঘরে বাইরে পাতা ষড়যন্ত্র জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন নবাব সিরাজ। জননীর সহোদরা মাতৃস্থানীয়া ঘসেটী বেগম নবাবের বিরোধিতায় এখন এক প্রকাশ্য শক্তি। স্বাভাবিকভাবেই সিরাজ তার গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। সরলা লুৎফা নবাবের এই আচরণে বিচলিত হয়ে উত্থাপন করেছেন অনুযোগ। লুৎফার অনুযোগের প্রত্যুত্তর

দিতে গিয়েই সিরাজ আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন। সিরাজের ব্যবহারে অমাত্যবর্গ ও আত্মীয়স্বজন অপমান বোধ করছেন। অথচ রাজ্যরক্ষার স্বার্থেই সিরাজকে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিস্তার ঘটানো যে দেশদ্রোহিতার নামান্তর এবং নবাবকে অপমান করার সামিল- সরলা লুৎফা পর্যন্ত তা অনুভব করতে পারেন নি। মনস্তাপদীর্ণ সিরাজ তাই আক্ষেপ করেই বলেছেন যে, তার আচরণে সবাই অপমানিত বোধ করছেন, অথচ নবাব যে প্রতিনিয়িত অপমানের মুখোমুখি হচ্ছেন সে হিসেব কেউ রাখে না। দেশের বিপর্যয় মুহূর্তে অপমানাহত নবাবের এই সংলাপে ব্যথিতচিত্ত অসহায় এক মানুষের বেদনাময় আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে।

আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত।

কবি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে উদ্ধৃত সংলাপটি চয়ন করা হয়েছে। অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সহধর্মিণী লুৎফুন্নিসার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত এ সংলাপে অসহায় সিরাজের মনোবেদনার প্রকাশ ঘটেছে।

ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। তাঁর বিশ্বাসের শেষ আশ্রয় সহধর্মিণী লুৎফা। রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন সিরাজ ধীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছেন অন্তঃপুরে, প্রিয়তমা স্ত্রী লুৎফার কাছে। সামান্য কিছু দিনের রাজ্য পরিচালনার অভিজ্ঞতার সূত্রে সিরাজ অনুভব করেছেন চারদিক থেকে অসংখ্য দেয়াল উঠে তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। দেশীয় শত্রু ও বহির্শত্রুর সঙ্গে এখন মিলিত হয়েছে নবাব অন্তঃপুরের নিকটাত্মীয় জন। ফলে চারদিক থেকে উঠে আসা প্রতিবন্ধককে লঙ্ঘন করার শক্তি যেন তিনি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছেন। প্রিয়তমা পত্নী লুৎফা যখন পরম আন্তরিকতায় বিশ্রামের জন্য নবাবকে আহ্বান জানিয়ে বলেন- ‘আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন’ - তখন বঞ্চিতা লুৎফার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও সিরাজ অকপটে স্বিকার করে নেন তাঁদের দুজনের মধ্যখানে বেড়ে ওঠা রাজত্বের দেয়ালের কথা। কখনো কখনো সিরাজ প্রত্যাশা করেছেন ব্যবধান বা দূরত্বের এই দেয়াল উঠে যাক। হয়তো এর বিনিময়ে সাধারণ গৃহস্থের শান্তি ও সুখের সাজানো সংসার তারা লাভ করতেন।

আলোচ্য সংলাপের মাধ্যমে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার অন্তর্জগতের প্রকৃত পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- আসন্ন যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় চিন্তিত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মনোজগতের পরিচয় দিতে পারবেন।
- যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব সৈন্যের অবস্থানগত পরিকল্পনার পরিচয় দিতে পারবেন।
- যুদ্ধ জয়ে নবাবের একমাত্র ভরসা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যুদ্ধের গোপন সংবাদ সংগ্রহে ক্লাইভ ও মীরজাফরের তৎপরতার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ

প্রহর – তিন ঘন্টা কাল; দিন রাতের আটভাগের একভাগ সময়।
কুর্নিশ – নবাবকে সম্মান দেখাবার জন্য পিছনে হটে গিয়ে অবনত মস্তকে সালাম।
রাজদ্রোহ – রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্রোহ।
প্রবৃত্তি – স্পৃহা; অভিরুচি।
মতলব – অভিসন্ধি।
হাসিল – বুদ্ধি ও কৌশলে কার্য উদ্ধার।
ফৌজ – সৈন্য।
ছাউনী – শিবির।
গড়বন্দী – এখানে পরিখা অর্থে।
ঢিপি – উঁচু স্থান।
দু'কদম – দু'পা, দুই পদক্ষেপ সমান।
রৌশনি – আলোক সজ্জা।
তল্লাসী – খোঁজ, অনুসন্ধান।
গুপ্তচর – গোপন সংবাদ সংগ্রহকারী।
কদমমুবারক – পাদমঙ্গল।
কদম – পা।
ফরিয়াদ – নালিশ।
মৃত্যুবিধান – মৃত্যুর আদেশ।
মেহেরবান – দয়ালু।
সোরাহী – জলের কুঁজো।
উৎকর্ণ – শুনবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র।
রেহেল – যার উপর পবিত্র কুরআন শরীফ বা যে কোন বই রেখে পড়া হয়।
মোনাজাত – প্রার্থনা।
তুর্যনাদ – বর্ণবাদ্যের শব্দ।

টীকা
ইয়ার লুৎফ খাঁ – পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফরের সহযোগী সেনাপতি।
সাঁফ্রে – পলাশীর যুদ্ধে নবাব

তৃতীয় অংক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ২২শে জুন। স্থান ঃ পলাশীতে সিরাজের শিবির।

[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে সিরাজ, মোহনলাল, মীরমর্দান, প্রহরী, বন্দী কমর]

(গভীর রাত্রি। শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তাগ্রস্তভাবে পায়চারী করছেন। দূর থেকে শৃগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।)

সিরাজ ॥ দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হল। শুধু ঘুম নেই। শেয়াল আর সিরাজ-উ-দ্দৌলার চোখে। (আবার নীরব পায়চারী) ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই-)
(মোহনলালের প্রবেশ। কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই)

সিরাজ ॥ সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি। তারা শৃঙ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে। কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে ত স্পষ্ট রাজদ্রোহ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছে। আশ্চর্য!

মোহনলাল ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ হ্যাঁ বল মোহনলাল কি খবর।

মোহনলাল ॥ ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না। অবশ্য তারা অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত। নবাবের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে ওদের কামান হবে গোটা দশেক। আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি।

সিরাজ ॥ এখন প্রশ্ন হল আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কিনা।

মোহনলাল ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছ ত? মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজের নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে।

মোহনলাল ॥ সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে। (নবাবের হাতে পত্র দান। নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন।)

সিরাজ ॥ বেঈমান।

মোহনলাল ॥ ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে। সে সিপাহসালারের জবাবের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ ॥ সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ। মতলব হাসিল করার জন্যে যে কোন অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কাছে সব কিছুই যেন একটা বড় রকমের জুয়ো খেলা। (মীরমর্দানের প্রবেশ। যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল।)

সিরাজ ॥ বলো মীরমর্দান।

মীরমর্দান ॥ ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোটো বাড়িটায়। এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে।

সিরাজ ॥ তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে ত?

মীরমর্দান ॥ (একটা প্রকান্ড নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে) আমরা সব গুছিয়ে

সিরাজ-উ-দ্দৌলার পক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যতম বিশ্বস্ত ফরাসি সেনাপতি।
বদ্রী আলী খাঁ – পলাশীর যুদ্ধে নবাব পক্ষের অন্যতম যোদ্ধা ও সেনাপতি, মীর মর্দান এর জামাতা।
নৌবেসিং হাজারী – নবাব পক্ষের অন্যতম সেনাপতি।
পলাশী – এ গ্রামেরই প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন তারিখে ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
উমর বেগ জমাদার – মীর জাফরের বিশ্বস্ত গুপ্তচর।

ফেলেছি। (নকশা দেখাতে দেখাতে) আপনার ছাউনীর সামনে গড়বন্দী হয়েছে। ছাউনীর সামনে মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমি। আরও ডানদিকে গঙ্গার ধারে এই টিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্রীআলী খার অধীনে যুদ্ধ করবে। তাদের ডান পাশে গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবেসিং হাজারীর বাহিনী। বা দিক দিয়ে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধ চন্দ্রাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহসালার, রায়দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁ।

সিরাজ ॥ (নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারী করলেন) কত বড় শক্তি তবু কত তুচ্ছ মীরমর্দান।

মীরমর্দান ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ আমি কি দেখছি জানো? কেমন যেন অঙ্কের হিসেবে ওদের সুবিধার পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে।

মীরমর্দান ॥ ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল, সাঁফ্রে আর আমার বাহিনীই যথেষ্ট।

সিরাজ ॥ ঠিক তা নয় মীরমর্দান। আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোড় সওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে। তারা জান দিয়ে লড়বে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে, এসো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি।

মোহনলাল ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ মীরজাফরদের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষবাগের অর্ধেকটা ঘিরে। যুদ্ধে তোমাদের হারতে থাকলে ওরা দু'কদম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়। যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে।

মীরমর্দান ॥ কিন্তু আমরা হারব কেন?

সিরাজ ॥ না হারলে ওরা যে তোমাদের ওপরেই গুলী চালাবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যাক শিবিরের কাছে ওদের ফৌজ রাখবার কথা আমরাও ভাবিনা। কারণ, সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে, ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরী করবে না।

মোহনলাল ॥ ওদের সেনা বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয়-

সিরাজ ॥ এনেছি চোখে চোখে রাখার জন্যে। পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করতো।

মীরমর্দান ॥ এত চিন্তিত হবার কারণ নেই জাঁহাপনা। আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না।

সিরাজ ॥ আমি জানি, তাই আরও বেশি করে ভরসা হারিয়ে ফেলছি। তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে।

মোহনলাল ॥ আমরা জয়ী হবো জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ পরাজিত হবে, আমিই কি তা ভাবছি। আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মত খুটিয়ে বিচার করে দেখছি। আগামিকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মীরজাফর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব সিপাহসালারকে দিতেই হবে। কি হবে কে জানে। আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছিনে, কিন্তু কেন যে পারছিনে আশা করি তোমরা বুঝছো।

মীরমর্দান ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয় মোহনলাল। আমার একমাত্র ভরসা, আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মীরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু। (কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে। দু'জন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো)

প্রহরী ॥ হুজুর, এই লোকটা নবাবের ছাউনীর দিকে এগোবার চেষ্টা করেছিল। (সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দীর কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন আড়াল করে দাঁড়াল। নবাব দু'প এগিয়ে এলেন। অপর দিক দিয়ে মীরমর্দান বন্দীর আর এক পাশে দাঁড়াল)

বন্দী ॥ (সকাতর ক্রন্দনে) আমি পলাশী গ্রামের লোক হুজুর। রৌশনি দেখতে এখানে এসেছি।

মোহনলাল ॥ (প্রহরীকে) তল্লাসী করো।
(প্রহরী তল্লাসী করে কিছুই পেল না)
কিন্তু একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না জাঁহাপনা।

মীরমর্দান ॥ (প্রহরীকে) বাইরে নিয়ে যাও। কথা আদায় করো। (হঠাৎ দেখি দেখি। এ তো কমর বেগ জমাদার। মীরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই। এ ও গুপ্তচর।

কমর ॥ (সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) জাঁহাপনার কাছে বিচারের জন্যে এসেছি। আমাকে আসতে দেয় না, তাই চুরি করে হুজুরের কদম মোবারকে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম।

সিরাজ ॥ (কাছে এগিয়ে এসে) কি হয়েছে তোমার?

কমর ॥ আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে হুজুর।

সিরাজ ॥ মোহনলাল।

মোহনলাল ॥ গুপ্তচর উমর বেগ জামাদার হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জাঁহাপনা। ক্লাইভের চিঠি ছিল তার কাছে। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে।
(সিরাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন)

মোহনলাল ॥ (যেন দোষ ঢাকার চেষ্টায়) সে চিঠি জাঁহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে।

সিরাজ ॥ (মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু পায়চারী করে চিন্তিতভাবে) কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল।

কমর ॥ জাঁহাপনা মেহেরবান।

সিরাক ॥ (প্রহরীদের) একে নিয়ে যাও। কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে।

কমর ॥ (রুদ্ধস্বরে) এই কি জাঁহাপনার বিচার?

সিরাজ ॥ আমি জানি, এখানে এই অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এতটা নির্বোধ তুমি নও। (কঠোর স্বরে প্রহরীদের) নিয়ে যাও।
(বন্দী নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান) শৃগালের প্রহর ঘোষণা)

	সিরাজ ॥ তোমরাও এখন যেতে পারো। আজ রাতে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। (মোহনলাল ও মীরমর্দান বেরিয়ে গেল। সিরাজ পায়চারী করতে লাগলেন। সোরাহী থেকে পানি ঢেলে খেলেন। কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সিরাজ উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলেন। কি যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরান শরীফের কাছে গিয়ে জায়নামাজে বসলেন। কোরান শরীফ তুলে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে রেহেলের ওপর রেখে পড়তে লাগলেন। দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। সিরাজ কোরান শরীফ মুড়ে রাখলেন। "আসসালাতো খায়রুম মিনান্‌নাওম' এর পর মোনাজাত করলেন। আস্তে আস্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগল। হঠাৎ সুতীব্র তুর্যনাদ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান করে দিল।)

বস্তুসংক্ষেপ

পলাশীর প্রান্তরের আসন্ন যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা গভীর রাতে নিদ্রাহীন সময় অতিবাহিত করছেন। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলে সেনাপতি মোহনলাল উপস্থিত হন নবাবের কাছে, উদ্বিগ্ন নবাব ইংরেজদের আচরণে একাধারে ক্ষুব্ধ বিস্মিত। সভ্য জাতি হিসেবে ইংরেজদের জগৎজোড়া সুনাম, কিন্তু বাংলাদেশে তাদের আচরণ বেআইনি ও রাজদ্রোহমূলক। মোহনলাল আসন্ন যুদ্ধে নবাব পক্ষের প্রভূত শক্তির বর্ণনা দিলে আশাহত সিরাজ তাঁর সংলাপে অনিবার্য পতনের আশঙ্কাকেই মূর্ত করে তোলেন। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ প্রমুখ সেনাপতি নবাবের পক্ষ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবেন – এমন প্রত্যয় লালন করার অভিরুচি আজ আর সিরাজের নেই। লর্ড ক্লাইভ ও মীরজাফরের একাধিক গোপন চিঠি ইতোমধ্যে মোহনলালের হস্তগত হয়েছে, ধরা পড়েছে বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের দল। শত্রুপক্ষের এমন আচরণ সিরাজের বিশ্বাসের ভিতকে করেছে বিচলিত। এ সময়েই সিরাজের শিবিরে এসে উপস্থিত হন নবাবের অন্যতম বিশ্বাসভাজন সেনাপতি মীরমর্দান। মীরমর্দান। মীরমর্দান পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব পক্ষের কৌশল প্রণয়ন করেছেন। এ কৌশল অনুসারে নবাবের ছাউনির সামনে তৈরি হয়েছে 'গড়বন্দী'। নবাবের ছাউনির সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন মোহনলাল, সাঁফ্রে আর মীরমর্দান। পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে উঁচু স্থানে অবস্থান নেবেন বদ্রীআলী খাঁ, গঙ্গার খুব কাছাকাছি জায়গায় প্রস্তুত থাকবেন নৌবেসিং হাজারী তার সৈন্যবাহিনী সমেত। অন্যদিকে বামপ্রান্তে, গঙ্গার পূর্বে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধচন্দ্রাকারে সেনাবিন্যাস করেছেন সিপাহসালার মীরজাফর, রায়দুর্লভ আর ইয়ার লুৎফ খাঁ। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশের এই পরিকল্পনার ফাঁকটুক দৃষ্টি এড়ায় না সিরাজের। তাঁর আশঙ্কা হয়, যুদ্ধে নবাব পক্ষ হারতে থাকলে হয়ত বিশ্বাসঘাতকরা এগিয়ে গিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকদের না রাখার পক্ষে মোহনলাল অভিমত ব্যক্ত করলে সিরাজ এদের চোখে চোখে রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেন, নতুবা এরা হয়ত সুযোগ পেয়ে রাজধানীই দখল করে ফেলবে। এই আলাপচারিতার সূত্র ধরেই অসহায় সিরাজ দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। যুদ্ধে অনেক দেশপ্রেমিকের প্রাণ বিপন্ন হবে, অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না– এই দু:শ্চিন্তাই বেশি করে পীড়া দেয় সিরাজকে। আগামীকালের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্য সিপাহসালার মীরজাফরকেই দিতে হবে সর্বময় কর্তৃত্ব যিনি বিভিন্নভাবে চিহ্নিত বিশ্বাসঘাতক। কর্তব্য নিরূপণে দ্বিধাগ্রস্ত সিরাজ নিজের হতবুদ্ধি মানসিকতা অকপটে স্বীকার করে নেন মোহনলালের কাছে আসন্ন যুদ্ধে সিরাজরে ভরসা তাই নিজের বিপুল সেনাবাহিনীর শৌর্য-বীর্য ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাঁর সর্বশেষ ভরসা আগামীকাল পলাশীর 'যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মীরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু'।

শত্রুপক্ষের এক গুপ্তচরকে হাজির করে সিরাজের সামনে। সেনাপতি মীরমর্দান সহজেই চিনে ফেলেন কমরবেগ জমাদার নামক এই গুপ্তচরকে। এরই ভাই উমরবেগ জমাদার ক্লাইভের চিঠি সমেত ধরা পড়ে পালানোর মুর্হর্তে প্রহরীদের তলোয়ারের আঘাতে মারা যায়। সিরাজ তথ্যটি অবগত হন এবং চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে শুরু করেন। কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে সিরাজ যে নিঃসন্দেহ নন একথা

জানিয়ে দেন তিনি মোহনলালকে। এ পর্যায়েই বন্দি গুপ্তচরকে কাল যুদ্ধ শেষে মুক্তি দেবার আদেশ দিয়ে মোহনলাল ও মীরমর্দানকে বিদায় জানান নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা।
রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন। অমঙ্গলসূচক প্যাঁচা কোথাও ডেকে ওঠে। কুঁজো থেকে পানি ঢেলে পান করেন সিরাজ। পবিত্র কোরাণ শরীফ রেহেলে রেখে পাঠ করতে শুরু করেন তিনি। দূর থেকে ভেসে আসে আজানের ধ্বনি। সিরাজ প্রার্থনা করেন, ক্রমশ পাখির ডাক জেগে ওঠে বাইরে। এ সময়েই আকস্মিকভাবে সুতীব্র তুর্যনিনাদ প্রভাতী নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দেয় খান খান করে।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পলাশীর যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় চিহ্নিত সিরাজের মনোজগতের পরিচয় দিন।
২. যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের অনুগত সৈন্যদের কৌশলগত অবস্থানের যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিলো তার বিবরণ দিন।
৩. গোপন তথ্য সংগ্রহে ক্লাইভ ও মীরজাফরের তৎপরতার বর্ণনা দিন।
৪. পলাশীর যুদ্ধ জয়ে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার একমাত্র ভরসা সম্পর্কে ধারণা দিন।
৫. ‘কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে’এক কার উদ্দেশ্যে কেন সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?
৬. ‘কত বড় শক্তি তবু কত তুচ্ছ মীরমর্দান’। - সিরাজের এই সংলাপের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ গোপন তথ্য সংগ্রহে ক্লাইভ ও মীরজাফরের তৎপরতার বর্ণনা দিন।

উত্তর ॥ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তৃত হয়েছে তার প্রধান হোতা সিপাহসালার মীরজাফর আলী খাঁ। ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ করেও মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিয়েছেন,

তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছেন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ধূর্ত ক্লাইভের সঙ্গে। আসন্ন পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ক্লাইভ ও মীরজাফর নবাব পক্ষের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযোগ করেছেন গুপ্তচরবর্গ। ইতোমধ্যে সেনাপতি মোহনলালের অনুচরদের হাতে ধরা পড়েছে মীরজাফর এর উদ্দেশ্যে লেখা লর্ড ক্লাইভের তিনখানা চিঠি। মীরজাফরের অনেক গুপ্তচরের একজন উমর বেগ জমাদার কিছুদিন পূর্বে নবাব সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে এবং পালানোর চেষ্টা কালে প্রহরীদের তলোয়ারের আঘাতে মারা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব রাত্রের মীর জাফরের এক গুপ্তচর নবাবের ছাউনির অত্যন্ত কাছাকাছি এলাকায় ধরা পড়ে। ধৃত এই গুপ্তচর উমরবেগ জমাদারেরই ভাই কমরবেগ জমাদার। মীরজাফর ক্ষমতালিপ্স বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু লর্ড ক্লাইভ তারও চেয়ে ধূর্ত। এই দুয়ের সংযোগ ও নবাব পক্ষের গোপন তথ্য সংগ্রহে কূট তৎপরতা পলাশীর যুদ্ধের সাজানো নাটকের মহড়ারই অংশবিশেষ।

প্রশ্ন ঃ পলাশীর যুদ্ধ জয়ে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার একমাত্র ভরসা সম্পর্কে ধারণা দিন।

উত্তর ॥ পলাশী প্রান্তরের আসন্ন যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা চিন্তান্বিত। চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হওয়ায় সিরাজ ক্রমে ক্রমে অনিবার্য ভবিতব্যকেই যেন প্রত্যক্ষ করে চলেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবপক্ষের সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত। কিন্তু সংশয়াচ্ছন্ন সিরাজের এ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওই বিশ্বাসঘাতকের দল ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে। অথচ যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব বাধ্য হয়েই সিপাহসালার মীরজাফর আলী খাঁকে দিতে হবে। এর ফল কী পরিণাম বহন করে আনবে সিরাজ তা জানেন না। দেশের এই দুর্যোগ মুহূর্তে কর্তব্য নির্ধারণ করাও তার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় তাঁর ভরসা নিজের অধীন বিশাল সেনাবাহিনী নয়। বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার আশঙ্কায় যদি মীরজাফর, দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অন্তরে দেশপ্রেমের চেতনা শেষ মুহূর্তেও জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকটুই দেশের দুর্যোগঘন অবস্থায় সিরাজের একমাত্র ভরসা।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশী করে পীড়া দিচ্ছে।
২. আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেব মীরজাফর।
৩. আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মীরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু।
৪. কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল।

উত্তর

তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশী করে পীড়া দিচ্ছে।

কবি ও নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে বক্ষ্যমাণ সংলাপটি উদ্ধৃত হয়েছে। সেনাপতি মীরমর্দানের উক্তির জবাবে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন তারিখ পলাশীতে সিরাজের শিবিরে নিদ্রাহীন সময় অতিবাহিত করছেন নবাব সিরাজ। শলা পরামর্শের জন্য সিরাজের শিবিরে উপস্থিত সেনাপতি মোহনলাল ও সেনাপতি মীরমর্দান।

মীরমর্দান নবাবের সামনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রণকৌশলের নকশা উপস্থাপন করে বুঝানোর চেষ্টা করছেন যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনার কথা। কিন্তু ষড়যন্ত্রের জালে আবৃত সিরাজ সংশয়াচ্ছন্ন। মীরজাফর এবং তার সহযোগী সেনাপতিরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করে যে কোন মুহূর্তে ক্লাইভের সঙ্গে মিলিত হতে পারে এ আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে পারেন না তিনি। মোহনলাল সিরাজকে আশ্বস্ত করার জন্য যখন বলেন তাদের প্রাণ অক্ষুণ্ন থাকতে নবাবের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না, তখন বিপন্ন সিরাজ তার আস্থাশূন্যতার কথা অকপটে স্বীকার করে নেন। তিনি জানেন মোহনলাল মীরমর্দানের মতো আস্থাভাজন সেনাপতিরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে পিছপা হবেন না। কিন্তু অনিবার্য ভবিতব্য যেন প্রত্যক্ষগোচর করতে পারছেন সিরাজ-উ-দ্দৌলা। তাঁর বিশ্বাসভাজন সেনাপতিরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন, অথচ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না- এমন আশঙ্কাই আজ অসহায় সিরাজকে ব্যাকুল করে তুলেছে।

অনিবার্য পতনের মুখে ভবিষ্যৎ সৃষ্টার মতই যুদ্ধের ফলাফল অনুমান করে মনস্তাপে দীর্ঘ সিরাজের পরিচয় আলোচ্য ব্যাখ্যাংশে উন্মোচিত হয়েছে।

কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল।

আলোচ্য সংলাপটি সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। নবাব সিরাজ সেনাপতি মোহনলালের উদ্দেশে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বরাত্রে পলাশীতে নবাবের শিবিরের নিকটে মীরজাফর নিযুক্ত গুপ্তচর নবাবের প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছে শলা পরামর্শের শিবিরে এ সময়ে উপস্থিত আছেন সেনাপতি মীরমর্দান ও সেনাপতি মোহনলাল। ধৃত বন্দীকে নবাবের সামনে হাজির করলে সেনাপতি মীরমর্দান মীরজাফরের গুপ্তচরটিকে শনাক্ত করেন। ইতঃপূর্বে ধৃত ও পালানোর মুহূর্তে প্রহরীদের তলোয়ারের আঘাতে নিহত উমরবেগ জমাদারের ভাই এই গুপ্তচরটির নাম কমরবেগ জমাদার। কমরবেগ প্রথমে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নবাব শিবিরের আলোকসজ্জা দেখতে এসেছে বললেও, পরবর্তীতে তার পরিচয় প্রকাশিত হলে সে নবাবের কাছে ভাই হত্যার বিচার চাইতে এসছে বলে জানায়। নবাব সন্দেহের চোখে মোহনলালের দিকে তাকালে মোহনলাল অনেকটা যেন দোষ ঢাকার চেষ্টায় ক্লাইভের চিঠি সমেত উমরবেগের ধরা পড়ার কথা বলেন। বাজেয়াপ্ত করা চিঠিটি ইতঃপূর্বে নবাবের কাছে দাখিল করা হয়েছে, এ তথ্যও মোহনলাল পরিবেশন করেন। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ অথচ জনদরদী নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার কাছে মোহনলালের দেয়া কৈফিয়ৎ পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে না। সিরাজ তাই স্পষ্টতই জানিয়ে দেন যে, যখন তখন মৃত্যুবিধান করাটা ক্ষমতাধর শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহমুক্ত নন। এই সংলাপ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সুশাসক ও জনদরদী নবাবের চরিত্রের একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- যুদ্ধে নবাবপক্ষের পরাজয়ের কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- যুদ্ধের সংবাদ শুনে বিচলিত সিরাজের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাইসুল জুহালা হত্যাকান্ডের বর্ণনা দিতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
মহড়া – আড়ম্বরের সঙ্গে	তৃতীয় অংক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

প্রদর্শন।
ঘায়েল – নিহত অর্থে।
বাদরু – বিস্ফোরক চূর্ণ যা দিয়ে কামান বন্দুক ইত্যাদির গুলি প্রস্তুত হয়।
হাতাহাতি – হাতে হাতে লড়াই।
দূরবীণ – দূরের বস্তু স্পষ্ট রূপে দেখার যন্ত্র।
Excellency – সম্রাট, গভর্নর, রাষ্ট্রদূত প্রমুখের পদবি।
Standing like pollar – স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে, স্থানুর মতো দাঁড়ানো অর্থে।
The bravest soldier বীরশ্রেষ্ঠ সৈনিক।
আত্মাভিমান – নিজের উপর নিজের অভিমান।
রাজধানীতে – এখানে মুর্শিদাবাদে অর্থে প্রযুক্ত।
কৈফিয়ৎ – দোষের কারণ প্রদর্শন; জবাবদিহি।
দেহরক্ষী অশ্বারোহী – দেহ রক্ষায় নিযুক্ত অশ্বে আরোহনকারী সৈনিক।
ঘোড়সওয়ার – অশ্বারোহী।
পরচুলা – নকল চুল।
পিঠমোড়া – দুই হাত পিঠের দিকে নিয়ে বাঁধা হয়েছে এমন।
হেফাজত – জিম্মাদারি; রক্ষণাবেক্ষণ।
গোরা – ইংরেজ অর্থে; গৌরবর্ণ সৈনিক।
বেঈমানী – বিশ্বাসঘাতকতা।
মোনাফেকী – প্রতারণা, শঠতা।
Idiot – নির্বোধ।

সময় ১৭৫৭ সাল ২৩শে জুন। স্থান ঃ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে।

[চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে সিরাজ, প্রহরী, সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক, তৃতীয় সৈনিক, সাঁফ্রে, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, ইংরেজ সৈনিকগণ]

(গোলাগুলির শব্দ, যুদ্ধ কোলাহল। সিরাজ নিজের তাঁবুতে অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন। সৈনিকের প্রবেশ।

সিরাজ ॥ (উৎকণ্ঠিত) কি খবর সৈনিক?

সৈনিক ॥ যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানীর ফৌজ পিছু হটে গিয়ে লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। সিপাহসালার, সেনাপতি রায় দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি।

সিরাজ ॥ মীরমর্দান, মোহনলাল?

সৈনিক ॥ ওরা শত্রুদের পিছু হটিয়ে লক্ষবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ ॥ আচ্ছ যাও।
(সৈনিকের প্রস্থান। কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)

২য় সৈনিক ॥ দুঃসংবাদ জাঁহাপনা। সেনাপতি নৌবেসিং হাজারী ঘায়েল হয়েছেন।

সিরাজ ॥ (কঠোর স্বরে) যাও।
(প্রস্থান। একটু পড়ে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

৩য় সৈনিক ॥ সেনাপতি মীরমর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়বার জন্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

সিরাজ ॥ আর কোম্পানীর ফৌজ যখন কামান ছুঁড়বে?

৩য় সৈনিক ॥ শত্রুদের সময় দিতে চান না বলেই সেনাপতি মীরমর্দান শুধু তলোয়ার নিয়েই সামনে এগোচ্ছেন।
(দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিকি ॥ সেনাপতি বদ্রীআলী খাঁ নিহত জাঁহাপনা। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ?

সিরাজ ॥ না! যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়না বদ্রীআলী ঘায়েল হলে। মীরমর্দান, মোহনলাল আছে। কোন ভয় নেই, যাও।
(প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান। হঠাৎ যুদ্ধকোলাহল কেমন যেন আর্তচীৎকারে পরিণত হলো।)

সিরাজ ॥ কি হলো? (টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা)

সিরাজ ॥ (দ্রুত এগিয়ে এসে) কি খবর সাঁফ্রে? আমাদের পরাজয় হয়েছে?

সাঁফ্রে ॥ (কুর্নিশ করে) এখনও হয়নি You Excellency কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে।

সিরাজ ॥ শক্তিমান বীর সেনাপতি, তোমরা থাকতে যুদ্ধে হারতে হবে কেন? যাও, যুদ্ধে যাও সাঁফ্রে। জয়লাভ করো।

সাঁফ্রে ॥ আমি ত ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছি জাঁহাপনা। দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব। কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে standing like pillars.

সিরাজ ॥ মীরজাফর, রায়দুর্লভকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ের জিতবে। আমি জানি তোমরা জিতবেই।

সাঁফ্রে ॥ আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানীর ফৌজ পিছু হটে লক্ষবাগে আশ্রয় নিচ্ছিল। এমন সময়ে এলো বৃষ্টি। হঠাৎ জাফর আলী খান

	আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না। মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না। কিন্তু সিপাহসালারের আদেশ পেয়ে tired soldiers যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল। সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করেছে। মীরমর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ অকেজো হয়ে গেছে। তাঁকে এগোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। And that is dangerous.
	(২য় সৈনিকের প্রবেশ। কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল)
সিরাজ ॥	কি সংবাদ?
	(কিছু বলবার চেষ্টা করেও পারল না)
সিরজা ॥	(অধৈর্য হয়ে কাছে এসে প্রহরীকে ঝাঁকুনি দিয়ে) কি খবর, বলো কি খবর?
২য় সৈনিক ॥	সেনাপতি মীরমর্দানের পতন হয়েছে জাঁহাপনা।
সাঁফ্রে ॥	What? Mir Mardan killed?
সিরাজ ॥	(যেন আচ্ছন্ন) মীরমর্দান শহীদ হয়েছে?
সাঁফ্রে ॥	The bravest soldier is dead.
	আমি যাই your excellency। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে। (প্রস্থান)
সিরাজ ॥	ঠিক বলেছো সাঁফ্রে, শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বীর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে এখন তা'হলে কি করতে হবে? সাঁফ্রে, মোহনলাল...
২য় সৈনিক ॥	সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে জাঁহাপনা?
সিরাজ ॥	মোহনলাল? না। নৌবেসিং বদ্রীআলী, মীরমর্দান সবাই নিহত। এখন কি করতে হবে? (পায়চারী করতে করতে হঠাৎ) হ্যাঁ আলীবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমিই ত ঘুরেছি। বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে ত আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। (সৈনিককে লক্ষ্য করে) আমার হাতিয়ার নিয়ে এসো। আমি যুদ্ধে যাবো। আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।
	(মোহনলালের প্রবেশ)
মোহনলাল ॥	না জাঁহাপনা।
	(সৈনিক বেরিয়ে গেল)
সিরাজ ॥	মোহনলাল!
মোহনলাল ॥	পলাশীতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে জাঁহাপনা। এখন আর আত্মভিমানের সময় নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে।
সিরাজ ॥	মীরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ৎ চাইব না?
মোহনলাল ॥	মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল বলে। আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না জাঁহাপনা। মুর্শিদাবাদে ফিরে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।
সিরাজ ॥	আমি একাই ফিরে যাবো?
মোহনলাল ॥	আমার শেষ যুদ্ধ পলাশীতেই। আমি যাই জাঁহাপনা। সাঁফ্রে আর আমার যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। (নতজানু হয়ে নবাবের পদস্পর্শ করল। তারপর দ্বিতীয় কথানা বলে বেরিয়ে গেল।)
সিরাজ ॥	(আত্মগতভাবে) যাও মোহনলাল। আর দেখা হবে না। আর কেউ রইল না। শুধু আমি রইলাম নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে, মোহনলাল বলে গেল।

	(২য় সৈনিকের প্রবেশ)
সৈনিক ॥	দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রস্তুত জাঁহাপনা। আপনার হাতিও তৈরী।
সিরাজ ॥	চলো।
	(যেতে যেতে কি মনে করে দাঁড়ালেন)
সিরাজ ॥	কে আছ এখানে?
	(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)
সিরাজ ॥	সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের হেফাজতে মীরমর্দানের লাশ যেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে মীরমর্দানের লাশ দাফন করতে হবে।
	(বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপত্র গুছোতে লাগলো। রাইসুল জুহালার প্রবেশ)
রাইস ॥	জাঁহাপনা তা হলে চলে গেছেন? রক্ষা।
প্রহরী ॥	আমরা সবাই চলে যাচ্ছি।
রাইস ॥	তার বোধ হয় সময় হবে না।
	(বাইরে তুমুল কোলাহল)
রাইস ॥	মীরজাফর ক্লাইভের দলবল এসে পড়ল বলে।
প্রহরী ॥	তা হলে আর দেরী নয়, চলো সরে পড়া যাক।
	(বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দী হল। সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে এলো ক্লাইভ,মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ।
ক্লাইভ ॥	He has fled away. আগেই পালিয়েছে। (বন্দীদের কাছে এসে) কোথায় গেছে নবাব?
	(বন্দীরা নিরুত্তর)
ক্লাইভ ॥	(রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারল) কোথায় গেছে নবাব? Say quickly if you want to live বাঁচতে হলে জলদি করে বল।
রাইস ॥	(হেসে উঠে মীরজাফরকে দেখিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? যুদ্ধে বাংলাদেশের জয় হয়েছে ত হুজুর?
রাজবল্লব ॥	যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে?
ক্লাইভ ॥	No time for fun, Come on, say, where is shiraj?
	(আবার লাথি মারল)
রাইস ॥	নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা এখনও জীবিত। এর বেশি আর কিছু জানিনে।
রাজবল্লভ ॥	চিনেছি, এত সেই রাইসুল জুহালা।
ক্লাইভ ॥	He must be a spy.
	(টান মেরে পরচুলা খুলে ফেললো)
মীরজাফর ॥	নারানসিং। সিরাজ-উ-দ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর।
ক্লাইভ ॥	গুলী করো ওকে here and now.
	(দু'জন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠমোড়া করে নারান সিংকে বাঁধতে লাগলো)
ক্লাইভ ॥	(মীরজাফরকে) এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ করুন। বিশ্রাম করা চলবে না। সিরাজ-উ-দ্দৌলা যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায়।
	(ক্লাইভ কথা বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দু'জন নারান সিংকে গুলি করল। মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ নিদারুণ শঙ্কিত। ক্লাইভ অবিচল। গুলিবিদ্ধ নারান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সহজ কণ্ঠে বললো)

	ক্লাইভ ॥	গুপ্তচরকে এই ভাবেই সাজা দিতে হয়।
	নারান ॥	(মৃত্যুস্তিমিত কণ্ঠে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেঈমানীর চেয়ে খারাপ? মোনাফেকীর চেয়ে খারাপ? (ঝিমিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ একটু সতেজ হয়ে) তবু ভয় নেই, সিরাজ-উ-দ্দৌলা বেঁচে আছে।
	ক্লাইভ ॥	(গোরা সৈন্য দুটিকে) How do you kill? Idiots যখন মারবে shoot straight into the heart. এমন মারবে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে। (পিস্তল বার করল)
	নারান ॥	ভগবান সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে রক্ষা... (ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হলো)

বস্তুসংক্ষেপ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলার নবাবের অনুগত বাহিনী মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পড়েছে। নিজের তাঁবুতে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। এ সময়ে একজন সৈনিক এসে সংবাদ দেয় যে যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির সৈন্য মীরমর্দান ও মোহনলালের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর আক্রমণে বাধ্য হয়ে পিছু হটেছে ববং লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। সৈনিকটি এই তথ্যও পরিবেশন করে যে যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর এবং সেনাপতি রায়ুর্লভ ও ইয়ার লুৎফ খাঁর সেনাবাহিনী যোগ দেয়নি। এরপর ক্রমান্বয়ে আরও দুজন সৈন্য এসে দুঃসংবাদ দেয় যে যুদ্ধে নৌবেসিং হাজারী নিহত হয়েছেন এবং কিছুক্ষণ আগে হওয়া বৃষ্টিতে নবাব পক্ষের বারুদ অকেজো হয়ে পড়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সেনাপতি মীরমর্দান কামানের অকেক্ষা না থেকে হাতাহাতি লড়াইয়ে অংশ নেয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। তৃতীয় সৈনিকটির কথা শেষ হতে না হতেই প্রথম সৈনিক আবার ফিরে আসে দুঃসংবাদ নিয়ে। সে জানায় সেনাপতি বদ্রীআলী খাঁর মৃত্যুসংবাদ। বিপদগ্রস্ত ও শঙ্কিত নবাব সৈনিকদেরকে অভয় দেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে শেষ অবলম্বন মোহনলাল ও মীরমর্দান এর নামোল্লেখ করে যুদ্ধের ময়দানে তাদের ফিরে যেতে বলেন। এরপর তাবুর মধ্যে থেকেই দুরবিন এর সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন সিরাজ-উ-দ্দৌলা। এ সময়ে নবাবের তাঁবুতে প্রবেশ করেন ফরাসি সেনাপতি সাঁফ্রে। তিনিও নবাবের কাছে হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির বর্ণনা নেন। সিরাজ-সাঁফ্রে আলাপচারিতার মাঝেই আর এক সৈনিক বহন করে আনে মীরমর্দানের মৃত্যু সংবাদ। একে একে আসা দুঃসংবাদে উদ্বেগ আকুল বিরাজ সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়ার। মাতামহ আলীবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্মৃতি জেগে ওঠে তাঁর মনে। সিরাজ এই উপলব্ধি করেন যে, এতদিনকার ভুল সংশোধনের শেষ সুযোগ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। কিন্তু সিরাজের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তেই যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের সংবাদ বহন করে সশরীরে উপস্থিত হন সেনাপতি মোহনলাল। রাজধানী মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য সিরাজকে দ্রুত স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। সিরাজ প্রত্যুত্তরে সিপাহসালার মীরজাফরকে জবাবদিহি করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে মোহনলাল সময়ক্ষেপণ না করার বিনীত অনুরোধ জানান। এবং পলাশীর প্রান্তরেই যে তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ সে কথা বলে অবনত মস্তকে প্রস্থান করেন।

স্থানান্তরের জন্য নবাবের দেহরক্ষী অশ্বরোহীবৃন্দ যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন নবাবের তাঁবুতে প্রবেশ করে সিরাজরে বিশ্বস্ত গুপ্তচর রাইসুল জুহালা। সে এসেই বুঝতে পারে নবাব সিরাজ ইতোমধ্যে স্থানান্তরে গেছেন। ইত্যবসরে রাইসুল জুহালার উপস্থিতিতেই নবাবের শিবিরে হানা দেন লর্ড ক্লাইভ ও সিপাহসালার মীরজাফর। এরা এসেই বুঝতে পারেন নবাবকে ধরার উদ্দেশ্য তাদের ব্যর্থ হয়েছে। তাদের নির্দেশে রাইসুল জুহালাসহ অন্যান্য সৈন্যকে বন্দী করে ফেলে ইংরেজদের অনুগত সৈন্যরা। রাইসুল জুহালা ক্লাইভের বুটের আঘাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। ক্লাইভ টান মেরে তার পরচুলা খুলে ফেললে মীরজাফর রাইসুল জুহালাকে সিরাজের বিশ্বস্ত গুপ্তচর নারানসিং হিসেবে শনাক্ত করেন। ক্লাইভের নির্দেশে নারান সিংহকে গুলি করে সৈন্যরা। মৃত্যুর পূর্বে স্তিমিত কণ্ঠে নারাণ এই স্বগতোক্তি করে যে গুপ্তচরের কাজ সে করেছে দেশের স্বাধীনতার স্বার্থে, সে বেইমান কিংবা মোনাফেক নয়। ক্লাইভ তখন তার হৃৎপিন্ড লক্ষ করে পুনরায়গুলি ছুঁড়লে মৃত্যু ঘটে নবাবের বিশ্বস্ত গুপ্তচর নারান সিং-এর।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. পলাশীর যুদ্ধে নবাব পক্ষের পরাজয়ের কারণ কী?
৩. যুদ্ধের সংবাদ শুনে বিচলিত সিরাজের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করুন।
৪. ফরাসি সেনাপতি নবাবের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কেন?
৫. রাইসুল জুহালা হত্যাকান্ডে ক্লাইভের কী ভূমিকা ছিলো?
৬. ‘আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।’ কে কী উদ্দেশ্যে এই সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ ফরাসি সেনাপতি নবাবের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কেন?

উত্তর ॥ ভাগ্যান্বেষণে আগত ফরাসি বণিকরাও ভারতবর্ষে এসেছিলো নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রত্যাশায়। ইংরেজদের মতো তাদের মধ্যেও একসময় জেগে ওঠে রাজ্যজয়ের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাপূরণের সূত্রেই প্রতিপক্ষ ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ফরাসিরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরি বাংলায় আসার পূর্বে ক্লাইভ বেশ কবার ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের সময় বাংলায় বসবাসকারী ফরাসি বণিকেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নবাব পক্ষে অংশগ্রহণ করে। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিলো না তাদের। মূলত প্রতিপক্ষ ইংরেজকে ঘায়েল করে ব্যবসায় জগতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিলো পলাশীযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণের লক্ষ্য। সেনাপতি সাঁফ্রে ঐ সূত্রেই নবাব পক্ষের সহযোগী হিসেবে পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাংলার নবাবের এবং ফরাসি বণিকদের শত্রুপক্ষ অভিন্ন হওয়ায় সেনাপতি সাঁফ্রের নবাবের হয়ে যুদ্ধে করাটা ছিলো স্বাভাবিক ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন ঃ ‘আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।’ কে কী উদ্দেশ্যে এই সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

উত্তর ॥ একজন সৈনিক উপস্থিত থাকলেও অনেকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতেই আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ভাগ্যাহত সিরাজ-উ-দ্দৌলা। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন তারিখে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ ও তাদের তাবেদার বাহিনীর সঙ্গে নবাব পক্ষের যুদ্ধমান অবস্থায় সিরাজের কাছে যখন একে একে পরাজয়ের দুঃসংবাদ

এসে পৌঁছাচ্ছিলো, তখন বিপন্নপ্রায় সিরাজ বুঝতে পারছিলেন যে যুদ্ধ জয়ে তাঁর ভরসার স্তম্ভসমূহ একে একে ধ্বংস হয়ে গেছে। নৌবেসিং হাজারী, বদ্রী আলী খাঁ আর মীরমর্দানের মত বীর সেনাপতি যখন নিহত হয়েছেন, তখন যুদ্ধ জয়ের প্রত্যাশা করা আর চলে না। ভরসার সর্বশেষ স্তম্ভ সেনাপতি মোহনলাল এখনও যুদ্ধরত। কিন্তু তিনি একাকী কীভাবে ইংরেজ ও মীরজাফরের যৌথ বাহিনীর মোকাবেলা করবেন? মানসিক বিপর্যয়ের এ অবস্থায় সিরাজ সিদ্ধান্ত নেন, তিনি সশরীরে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করবেন। মাতামহ আলীবর্দী খাঁর সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে ময়দানে কেটেছে তাঁর শৈশব। কাজেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা তাঁর কাছে নতুন কোনো বিষয় নয়। আজ দেশের স্বাধীনতার বিপর্যয় মুহূর্তে তাই তাঁর তাঁবুতে বসে থাকার অবকাশ নেই। শত্রুদশের কৌশল নিরূপণে ইতোমধ্যে তিনি অনেক ভুল করেছেন। এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আজ আর হাতছাড়া করতে চান না নবাব সিরাজ।
তবে, এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, সিরাজের যুদ্ধে অংশগ্রহণের এই সিদ্ধান্ত নাটকে কার্যকর হয়নি। মোহনলালের পরামর্শে রাজধানী মুর্শিদাবাদ রক্ষার স্বার্থে শিবির ত্যাগ করে দ্রুত স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হন তিনি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে ত’ আমি।
২. মীরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ৎ চাইব না?
৩. আমার শেষ যুদ্ধ পলাশীতেই।
৪. এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে।
৫. Idiots যখন মারবে shoot straight into the heart।

নমুনা উত্তর

মীরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ৎ চাইব না?

আলোচ্য সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে সংলাপটিতে মোহনলালের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা ব্যক্ত হলেও, এই জিজ্ঞাসার তাৎপর্য বহুমাত্রিক। সিরাজের এই জিজ্ঞাসা অনাগত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যেও যেনো ধ্বনিত হয়েছে।
১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩জুন তারিখে নবাব শিবিরে উপস্থিত হয়ে সেনাপতি মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে নবাব পক্ষের চূড়ান্ত পরাজয়ের দুঃসংবাদ জানিয়ে নবাবকে রাজধানী মুর্শিদাবাদ রক্ষার স্বার্থে দ্রুত স্থানান্তরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। সিরাজ জানেন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়ের মূল কারণ সিপাহসালার মীর জাফর আলী খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা। কাজেই মীরজাফর আলী খাঁকে জবাবদিহি না করে কীভাবে স্থানান্তরে যাবেন নবাব সিরাজ? দেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিয়ে যে অপরাধ মীরজাফর করেছে তা ক্ষমাহীন। সিরাজের এই জিজ্ঞাসা তাই মোহনলালের উদ্দেশ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অনাগত ভবিষ্যতের কাজেও এই জিজ্ঞাসার আর্তি পৌঁছে যায়। সিকান্দার আবু জাফর সিরাজের সংলাপে এই জিজ্ঞাসা গ্রথিত করে দিয়ে নিজের সুদক্ষ নাট্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

আমার শেষ যুদ্ধ পলাশীতেই।

উদ্ধৃত সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত এ সংলাপ সেনাপতি মোহনলালের।
পলাশীর যুদ্ধে অস্তমিত হয়েছে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। যুদ্ধ ক্ষেত্রে একে একে নিহত হয়েছেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের আস্থাভাজন সেনাপতিরা। এদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছেন সেনাপতি মোহনলাল। সিরাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন সেনাপতি মোহনলাল যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছেন নবাবের কাছে। তিনি নবাবকে

পরামর্শ দিয়েছেন রাজধানী মুর্শিদাবাদকে রক্ষার জন্য দ্রুত স্থানান্তরে যেতে। এই পরামর্শের উত্তরে সিরাজ প্রশ্ন করেছেন তিনি একাই মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবেন কিনা। প্রত্যুত্তরে অকুতোভয় যোদ্ধা মোহনলাল পলাশীর প্রান্তর পরিত্যাগে নিজের অনীহার কথা বিনীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধে পলাশীতেই হবে মোহনলাল– এভাবেই নিজের প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন নবাব সিরাজ উ-দ্দৌলার কাছে। সেনাপতি মোহনলালের বীরোচিত এই সংলাপের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ এক দেশ প্রেমিকের ইস্পাতকঠিন প্রত্যয় অভিব্যক্তি পেয়েছে।

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- রাজধানীবাসী জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পরাজিত নবাবের আপ্রাণ প্রচেষ্টার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মুর্শিদাবাদের ভীতসন্ত্রস্ত জনতার পলায়নের বিবরণ দিতে পারবেন।
- দেশের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে শহীদ বীরদের প্রসঙ্গে নবাব সিরাজের মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

স্তিমিত – অনুজ্জ্বল।
ছারখার – ধ্বংস।
অভয় – আশ্বাস; সাহস।
রাজকোষ – রাজার বা রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার।
জমাদার – ইংরেজ আমলে উচ্চপদস্থ ভারতীয় সৈনিক বিশেষ হেড কনস্টেবল।
খাজাঞ্চী – কোষাধ্যক্ষ।
ঠিকা – অল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত; নির্ধারিত শর্তযুক্ত।
শাঠ্য – শঠতা; ধূর্ততা।
সংঘবদ্ধ – দলবদ্ধ।
হতবল – বলহীন।
জৈন – মহাবীর-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়।
ফিরিঙ্গি – ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণসঙ্কর জাতি।
খাদেম – সেবক; ভৃত্য।
লালায়িত – লোলুপ, অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

টীকা

নাটোরের মহারাণী – জন্ম ১১২১-১২০০(?) বঙ্গাব্দ। নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়ের স্ত্রী।

মূলপাঠ

তৃতীয় অংক ৷৷ চতুর্থ দৃশ্য

সময় ঃ ১৭৫৭ সাল ২৫শে জুন। স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।

(চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে সিরাজ, ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তাবাহক, জনতা ও লুৎফা।)

(দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। স্তিমিত আলোয় সিরাজ বক্তৃতা করছেন। ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে।)

সিরাজ ৷৷ পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে কথা গোপন ক'রে এখন আর কোন লাভ নেই। কিন্তু-

ব্যক্তি ৷৷ প্রাণের ভয়ে কে না পালায় হুজুর?

সিরাজ ৷৷ আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে, প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি? (জনতা নীরব)

সিরাজ ৷৷ না, প্রাণের ভয়ে আমি পালাই নি। সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পন করি নি। ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করবো বলে।

ব্যক্তি ৷৷ কিন্তু রাজধানী খালি করে ত'সবাই পালাচ্ছে জাঁহাপনা!

সিরাজ ৷৷ আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন তা না করেন। এখনও আশা আছে। এখনও আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারলে শত্রু মুর্শিদাবাদের ঢুকতে পারবে না।

ব্যক্তি ৷৷ তা কি করে হবে হুজুর? অতবড় সেনাবাহিনী যখন ছারখার হয়ে গেল।

সিরাজ ৷৷ তারা যুদ্ধ করে নি। তারা দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল, মুষ্টিমেয় সেই ক'জনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে। এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেবো না।

ব্যক্তি ৷৷ পরাজয়ের খবর বাতাসের বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে জাঁহাপনা। ঘরে

দীনদুঃখীর দুর্দশা মোচন ও সমাজকল্যাণের জন্য নাটোরের মহারানী ভবানী স্বনামধন্য। ১১৫৩ বঙ্গাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। নাটোর জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। নবাব সরকারের কোষাগারে রানী ভবানী বাৎসরিক ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব জমা দিতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নাাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ইংরেজ পক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের ভৎর্সনা করেছিলেন।

মুহম্মদ ইরিচ খাঁ – মীর্জা ইরাজ খান নামেও পরিচিত। লুৎফুন্নিসার পিতা এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার শ্বশুর। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার বালিকা কন্যা লুৎফুন্নিসাকে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ দৌহিত্র সিরাজের সঙ্গে বিয়ে দেন।

ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুঠতরাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামী জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে কোন দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ ॥ আপনারা ওদের বাধা দিন। ওদের অভয় দিন। শত্রু সৈন্যদের হাতে পড়বার আগেই সাধারণ চোর-ডাকাত ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে।

ব্যক্তি ॥ কেউ মানে না হুজুর। সবাই প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে।

সিরাজ ॥ কোথায় পালাবে? পেছনে থেকে আক্রমণ করার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না। আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না। সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন। এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা বার বার করে বলছি। ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হ'লে এ দেশের স্বাধীনতা চিরকালের মত লুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্যক্তি ॥ জাঁহাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশী সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয় ব্যবস্থা!

সিরাজ ॥ দু'এক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য আসবে। নাটোরের মহারাণীর কাছ থেকে ও সৈন্য সাহায্য আসবে। অর্থের অভাব নেই। সেনাবাহিনীর খরচের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলুন কার কি প্রয়োজন।

সৈনিক ॥ ইয়ার লুৎফ খার সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাঁহাপনা। আমার অধীনে দুশ সিপাই। আমরা হুজুরের জন্যে প্রাণপণ্যে লড়তে প্রস্তুত।

সিরাজ ॥ বেশ, খাজাঞ্চীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। আপনার সিপাইদের তৈরী হতে আদেশ দিন। মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে অন্ততঃ দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে। জমিদারদের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়েই আমরা শত্রর মোকাবেলা করতে পারবো।

অপর সৈনিক ॥ আমি রাজা রাজবল্লভের অশ্বারোহী বাহিনীতে ঠিকা হারে কাজ করি। আমার মত এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে। জাঁহাপনার হুকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরে খাড়া করতে পারি।

সিরাজ ॥ এখুনি চলে যান। খাজাঞ্চীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন, যত দরকার।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তাবাহক ॥ শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে জাঁহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ খাঁ সাহেব এইমাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

সিরাজ ॥ (বিস্ময় বিমূঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন। সিরাজ-উ-দ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ।

বার্তাবাহক ॥ জাঁহাপনা।

সিরাজ ॥ আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্যে।

ব্যক্তি ॥ তা'হলে আর আশা কোথায়?

সিরাজ ॥ তা হলেও আশা আছে।

(দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ)

২য়বার্তাবাহক ॥ জাঁহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে যারা টাকা নিয়েছে তাদের

	অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।
সিরাজ ॥	তা'হলেও আশা। ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মীরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রী আলী, নৌবেসিং। তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি। এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।
	(জনতা নীরব। সিরাজের অস্থির পদচারণা)
সিরাজ ॥	সাধারণ মানুষ ত যুদ্ধ কৌশল জানে না হুজুর।
সিরাজ ॥	তবু তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না। বিক্রম দিয়েই আমরা শত্রুকে হতবল করতে পারব। তা না হলে, ভবিষ্যতে বছরের পর বছর, দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশী দস্যুর হাতে যেভাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন, কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান মীরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিঙ্গি খৃষ্টান ওয়াটসন, ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে কিসের জন্যে? সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি? তারা চায় মসনদের অধিকার। কারন, তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না। দেশের ওপরে অবাধ লুণ্ঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজ-উ-দ্দৌলা বর্তমান থাকতে। একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন। বাংলার ঘরে ঘরে হাহাজারের বন্যা বইয়ে দেবে মীরজাফর ক্লাইভের লুণ্ঠন অত্যাচার। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান। আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন।
ব্যক্তি ॥	কিন্তু জাঁহাপনা, সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও ত' আমাদের নেই।
সিরাজ ॥	আছে। সেনাপতি মোহনলাল বন্দী হননি। তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তা'ছাড়া আমি আছি। মরহুম আলবির্দীর আমল থেকে এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধে আমি শরীক হই নি? পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশীতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। আবার যুদ্ধ হবে, আর সৈন্য পরিচালনা করবো আমি নিজে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসী বীর মসিয়ে ল।
	(বার্তাবাহকের প্রবেশ)
বার্তাবাহক ॥	সেনাপতি মোহনলাল বন্দী হয়েছেন জাঁহাপনা।
সিরজজ ॥	(কিছুটা হতাশ) মোহনলাল বন্দী হয়েছে?
জনতা ॥	তাহলে আর কোন আশা নেই। কোন আশা নেই।
	(জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগলো)

সিরাজ ॥ মোহনলাল বন্দী? (কতকটা যেন আত্মসংবরণ করে) তা হলেও কোনো ভয় নেই। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না।
(সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনতা তাতে কান না দিয়েই পালাতেই লাগলো)

সিরাজ ॥ আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা শত্রুকে অবশ্যই রুখবো।
(সবাই বেরিয়ে গেল। অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো। লুৎফার প্রবেশ। মাথায় হাত রেখে ডাকলেন)

লুৎফা ॥ নবাব।

সিরাজ ॥ (চমকে উঠে) লুৎফা! তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন লুৎফা?

লুৎফা ॥ অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।

সিরাজ ॥ (রুদ্ধ কণ্ঠে) কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা, দরবার ফাঁকা হয়ে গেল।

লুৎফা ॥ (কাঁধে হাত রেখে) তবু ভেঙ্গে পড়া চলবে না জাঁহাপনা। এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্ধুরা আছেন, সেখানে থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে।

সিরাজ ॥ যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন ? হ্যাঁ, আপাততঃ পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে।

লুৎফা ॥ তা হলে আর বিলম্ব নয় জাঁহাপনা। এখুনি প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার।

সিরাজ ॥ হ্যাঁ, তাই যাই।

লুৎফা ॥ আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি।

সিরাজ ॥ কি আর আয়োজন লুৎফা। দু'তিন জন বিশ্বাসী খাদেম সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। তোমরা প্রাসাদেই থাকো আবার যদি ফিরি, দেখা হবে।

লুৎফা ॥ না, আমি যাবো আপনার সঙ্গে।

সিরাজ ॥ মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে। সে কষ্ট তুমি সইতে পারবে না লুৎফা।

লুৎফা ॥ পারবো। আমাকে পারতেই হবে। বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহঙ্কার? মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মত তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট? আমি যাবো, আমি সঙ্গে যাবো। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সিরাজ তাঁকে দু'হাতে গ্রহণ করলেন)

বস্তুসংক্ষেপ

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা রাজধানী রক্ষা করার জন্য সেনাপতি মোহনলালের পরামর্শে পালিয়ে এসেছেন মুর্শিদাবাদ। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খলার। লুঠতরাজ ও লাঞ্ছনার ভয়ে নাগরিকরা নিজেদের মূল্যবান সামগ্রীসহ শহর থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করেছেন। এ হেন অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে মুষ্টিমেয় কিছু নাগরিকের উপস্থিতিতে দরবারে অবস্থান করছেন উদ্বিগ্ন নবাব। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাগরিকরের অভয়দান করে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে, পলাশীর যুদ্ধে পরাজয় চূড়ান্ত ব্যর্থতা নয়। এখনও যদি সম্মিলিত জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং হিতৈষী জমিদারবর্গ যদি প্রতিশ্রুত সেনাদল প্রেরণ করেন তাহলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ররা সম্ভব। নবাব তাই জনতার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছেন এবং তাদের মধে দেশপ্রেম চেতনা ও মনোবল সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। কিন্তু নবাবের অভয়বাণীতে ভরসা পাচ্ছেনা দরবারে উপস্থিত জনতা। তাদের মধ্য থেকে একজন স্পষ্টতই বলেছে যে অতবড় সেনাবাহিনী যখন যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেছে তখন নিরস্ত্র জনতা কীভাবে শত্রুপক্ষকে মোকাবেলা করব। সিরাজ তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, পলাশীতে যুদ্ধ সংঘটিতে হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়,

ষড়যন্ত্রকারীদের প্ররোচনায় সেনাবাহিনীর অধিকাংশই দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আর যারা দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখেছিলো, মুষ্টিমেয় সেই কজনই দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে। কাজেই এখনও যদি সশস্ত্র প্রতিরোধ বর্ণনা করা যায় তাহলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। নবাব জনতাকে আশ্বস্ত করার জন্য জানিয়ে দেন যে, নাটোরের মহারানীর কাছ থেকে আসবে সৈন্য সাহায্য। সেনাবাহিনী সংঘটিত করার জন্য ইতোমধ্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে রাজকোষ। নবাবের আশ্বাসে সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত দুজন সৈনিক নিজেদের আত্মপরিচয় দিয়ে দুটি ছোট সেনাদল সংগঠিত করার প্রস্তাব দেয় এবং অনুমোদন পায়। কিন্তু এ সময়েই এক বার্তাবাহক এসে সংবাদ দেয় নবাবের শ্বশুর মুহম্মদ ইরিচ খাঁ, যিনি নবাবের কাছ থেকে কিছুক্ষণ আগে অর্থ শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। এরপর নিয়েছেন তিনি দ্বিতীয় বার্তাবাহক এসে জানায় যারাই নবাবের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে, তাদের সকলেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রবল জলস্রোতে ভেসে যাওয়ার সময় খড়কুটোকে আশ্রয় করে মানুষ যেমন বাঁচতে চায়, নবাব তেমন করেই আশাবাদকে আঁকড়ে ধরে পলায়নপর জনতাকে উদ্দীপিত করার প্রয়াস চালিয়ে যান। উপস্থিত জনতা নিরাশার কথা বললে, নবাব বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। আর যারা বীর তারা মনোবল অক্ষুণ্ন রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সিরাজ দৃষ্টান্ত দেন মীরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রী আলী খাঁ আর নৌবেসিং হাজারীর। এই বীরেরা শত্রুর অনুগ্রহ প্রভূত সম্পদ ও সম্মান উপেক্ষা করে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, এই বিপদের দিনে জনতার হাতে হয়ত অস্ত্র নেই, কিন্তু তাদের রয়েছে দেশপ্রেম ও দেশরক্ষার সংকল্প। সিরাজ ভীরু ও দ্বিধান্বিত জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা না গেলে দেশের সাধারণ মানুষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য দেশদ্রোহী ও বিদেশী দস্যুর হাতে উৎপীড়িত হতে থাকবে। মুসলমান মীরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিক উমিচাঁদ, আর ফিরিঙ্গি খ্রিস্টান ওয়াটসন ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ হাসিলের প্রয়োজনে সিরাজ বাংলার মসনদের অধিকারী থাকা অবস্থায় লুঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার পাবেনা জেনেই দৃষ্টান্ত বিরল এক জোট প্রতিষ্ঠা করেছে তারা। এই আপৎকালে যোগ্য সেনাপতির অভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে নবাব সেনাপতি মোহনলালের কথা বলেন, যিনি এখনও জীবিত ও মুক্ত। এছাড়া, জনতাকে উদ্দীপিত করার জন্য সিরাজ মাতামহ আলীবর্দীর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, একমাত্র পলাশী ব্যতীত, আর কোনো যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন নি। পলাশীতে পরাজিত হয়েছেন এই কারণে যে, এতে প্রকৃত যুদ্ধে হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। কিন্তু এ সময়েই মোহনলালের বন্দী হওয়ার দুঃসংবাদ বহন করে আনে বার্তাবাহক। আশার শেষ বিন্দুটুকু নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় নবাবের উপস্থিতিতেই জনাত দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করতে শুরু করে। নবাব গমনোদ্যত জনতার কাছে আকুল আবেদন জানান তাঁর পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু নবাবের আহ্বান ও অভয়বাণীতে কেউ সাড়া দেয় না, সবাই একে একে দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যায়।

দুহাতে মুখ ঢেকে অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়েন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে। এই বিপর্যয় মহূর্তে প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হন বেগম লুৎফুন্নিসা। নবাব আশ্চর্য হন এতে লুৎফা নবাবের যোগ্য সহধর্মিনীর মতই নবাবকে পরামর্শ দেন মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার। রাজধানীতে থেকে যেহেতু শত্রুদমন সম্ভব হলো না, তখন হিতৈষি বন্ধুবর্গের আশ্রয়ে থেকে তাদের সহায়তায় বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে নবাবকে অনুরোধ জানান লুৎফা। নবাব বেগমের এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং বেগমও পরিজনদেরকে রেখে কয়েকজন খাদেম সহ রাজ্য ত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানালে লুৎফুন্নিসা প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করেন এবং নিজে নবাবের অনুগামিনী হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। সিরাজ সহধর্মিনীর আচরণে আবেগপ্রবল হয়ে পড়েন এবং রোরুদ্যমান অবস্থায় দুহাতে লুৎফাকে গ্রহণ করেন।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পলায়নপর জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে নবাবের আকুল প্রয়াসের বর্ণনা দিন।
২. মুর্শিদাবাদের ভীতসন্ত্রস্ত নাগরিকের পলায়নের বিবরণ দিন।
৩. দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীরদের প্রসঙ্গে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন।
৪. প্রাণের ভয়ে কে না পালায়? কে কার উদ্দেশে কেন সংলাপটি উচ্চারণ করেছে?
৫. ‘এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেবো না’। সংলাপটি কার? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৬. ‘সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প।’ কোন প্রসঙ্গে সিরাজ এই মন্তব্যটি করেছেন? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৭. ‘অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।’ কে কী উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীরদের প্রসঙ্গে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ॥ পলাশীর যুদ্ধে নবাবপক্ষের অধিকাংশ সৈন্যই বিশ্বাসঘাতকদের নির্দেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছে। পক্ষান্তরে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে নবাবের অনুগত কিছু দেশপ্রেমিক সেনাপতির নেতৃত্বে সামান্য সংখ্যক অকুতোভয় সৈনিক জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সেনাপতি ও সৈনিকদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দানে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করে শহীদ হয়েছেন। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দৃষ্টিতে এই সব আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এদের প্রাণদান তাই ব্যর্থ হবে না। সেনাপতি মোহনলাল, বদ্রী আলী খাঁ, নৌবেসিং হাজারী প্রমুখ সেনাপতি বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাননি। দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড়ালে তাঁরা লাভ করতেন শত্রুর অপার আনুকূল্য, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তাঁরা এবং তাঁদের অনুগত বাহিনী লোভের বশবর্তী হয়ে অবস্থান নেননি দেশের বিপক্ষে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। এই সব বীরশ্রেষ্ঠের সংকল্পকে টলাতে পারেনি স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা। সিরাজ মনে করেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীর বীরোচিত আদর্শ যাতে লাঞ্ছিত না হয় সে চেষ্টা করতে হবে। দেশপ্রেমিকের রক্ত যাতে আবর্জনার স্তূপে ঢাকা না পড়ে তার জন্য নিতে হবে সযত্ন প্রয়াস।

প্রশ্নঃ ‘সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প।’ কোন প্রসঙ্গে সিরাজ এই মন্তব্যটি করেছেন? এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ॥ পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর, মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে উপস্থিত ভীতসন্ত্রস্ত ও পলায়নপর জনতাকে দেশরক্ষার সংগ্রামে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে সিরাজ-উ-দ্দৌলা সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন। সেনাপতি মোহনলালের পরামর্শে রাজধানী মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করার জন্য পলাশী থেকে পালিয়ে এসেছেন সিরাজ। কিন্তু যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের সংবাদ বাতাসের বেগে পৌঁছে গেছে রাজধানীতে। মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে ভীতি। শহরবাসী অনেকেই নিজেদের মূল্যবান সামগ্রীসহ শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। যারা সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের জন্য নবাবের কোষাগার থেকে অর্থগ্রহণ করেছেন, তারাও শামিল হয়েছেন পলায়নকারীর দলে। মুষ্টিমেয় কজন ব্যক্তি বিষণ্ন বিপদগ্রস্ত নবাবের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে শঙ্কা, অন্তরে অবিশ্বাস। যুদ্ধে নবাব বাহিনীর পরাজয় নিঃশেষিত করে দিয়েছে তাদের প্রত্যয় ও ভরসা। এখন রাজধানী রক্ষার প্রয়োজনে সিরাজ যখন সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তখন অধিকাংশই ভয়ে এবং হুজুগে শহরত্যাগীদের কাতারে শামিল হয়েছে, কেউ কেউ সৈন্য সংগ্রহের জন্য

নবাবের দেয়া অর্থ নিয়েও পালিয়ে গেছে। কিন্তু এই বিপর্যস্ত অবস্থায়ও সিরাজ নিজের মনোবল রক্ষা করে শঙ্কিত জনতাকে উদ্দীপিত করার প্রয়াস নিয়েছেন। প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকদের লক্ষ করে সিরাজ বলেছেন যে যারা নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শত্রুপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করেছে, তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মাত্র। তবে তাদের হাতে রয়েছে অস্ত্র, 'আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য'। পক্ষান্তরে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে নেমেছে, তাদের অস্ত্র তো আছেই, অধিকন্তু রয়েছে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। সিরাজ মনে করেন দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্পের শক্তি অস্ত্রশক্তির চেয়েও মূল্যবান। সিরাজ বিশ্বাস করেন অস্ত্র ও দেশপ্রেমের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে দেশদ্রোহীদের দমন করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ 'অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।' কে কী উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

উত্তর ॥ নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন তাঁর সহধর্মিনী বেগম লুৎফুন্নিসা। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত সিরাজ সেনাপতি মোহনলালের পরামর্শে রাজধানী রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে পালিয়ে এসেছেন। দরবারে সমাগত নাগরিকবৃন্দকে দেশরক্ষার সংগ্রামে শামিল হওয়ার জন্য জানিয়েছেন আকুল আবেদন। দেশপ্রেম চেতনায় তাদেরকে উজ্জীবিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু ভীতিগ্রস্ত মানুষ ভরসা পায়নি নবাবের কথায় বদ্ধমূল সংশয় ও অবিশ্বাসের কারণে সমাগত এই সব ব্যক্তি বিশেষে পলায়নপর মানুষেরই কাতারবন্দী হয়েছে। অসহায় নবাবকে ফেলে রেখে তারা একে একে সবাই নবাবের দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেছে। দুহাতে মুখ ঢেকে বিপন্ন ও অবসাদগ্রস্ত নবাব যখন বসে আছেন নিজ আসনে, তখন সেখানে সহসা উপস্থিত বেগম লুৎফুন্নিসাযোগ্য সহধর্মিনীর মতই সিরাজকে উপর্যুক্ত পরামর্শ দিয়েছেন। লুৎফা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন যে, দেশের ও নবাব পরিবারের এই বিপযুয় মুহূর্তে সমগ্র শহরে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে পারে এমন মানুষ কেউ অবশিষ্ট নেই। হতবিহ্বল নবাবকে তিনি তাই অন্ধকার ফাঁকা দরবারে বসে না থেকে অন্য স্থানে গিয়ে রাজ্য পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। লুৎফা পরামর্শ দিয়েছেন রাজধানী অথবা বাংলার বাইরে নবাবের হিতৈষী যাঁরা আছেন, তাঁদের আশ্রয়ে থেকে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে নবাবকে। বেগম লুৎফুন্নিসা নবাবকে আত্মসমর্পণের প্ররোচনা দেননি, নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার যোগ্য সহধর্মিনীর মতোই তাঁতে দেশের স্বাধীনতা পুন:প্রতিষ্ঠার কর্তব্যে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ন হয় না।
২. স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি।
৩. দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।
৪. পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশীতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়।
৫. কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা।
৬. বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহঙ্কার?
৭. মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মত তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট?

নমুনা উত্তর

পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশীতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়।

আলোচ্য সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের অন্তর্গত। রাজধানীর দরবারে সমাগত নাগরিকবৃন্দের উদ্দেশ্যে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ে নবাবের দেয়া কৈফিয়ৎ সংলাপটিতে প্রকাশিত হয়েছে।
পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার মুর্শিদাবাদবাসীদের উদ্দেশ্যে দেশরক্ষার সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। নাগরিকরা জানে যুদ্ধে নবাবপক্ষের বীর সেনাপতিরা নিহত হয়েছেন। কাজেই ভবিষ্যৎ যুদ্ধে যোগ্য সেনাপতির অভাবের কথা তারা উত্থাপন করে। নবাব জবাবে সেনাপতি মোহনলালের নাম উচ্চারণ করেন, যিনি বন্দী হননি এখনও। এরপর নাগরিকদের উদ্দীপ্ত ও আশ্বস্ত করার জন্য সিরাজ মাতামহ নবাব আলবির্দীর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে নিজের অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, একমাত্র পলাশী ব্যতীত আর কোন যুদ্ধেই তিনি পরাভূত হননি। পলাশীতে পরাজয়ের কারণ শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব নয়। ঐ যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ অনুগত সেনাপতিবর্গ ও তাদের অনুগত বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই পলাশীর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে যুদ্ধের বদলে যুদ্ধের অভিনয়।
এই সংলাপে পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত প্রসঙ্গে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা।

উপর্যুক্ত সংলাপটি কবি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত চার অঙ্কের নাটক ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলার তৃীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য থেকে সংকলিত হয়েছে। বিপন্ন ও অবসাদগ্রস্ত নবাব বেগম লুৎফুন্নিসা উদ্দেশ্যে আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।
রাজধানী রক্ষার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান উপেক্ষা করে দরবারে সমাগত নাগরিকবৃন্দ নবাবকে ফেলে রেখে একে একে চলে গেছে। হাতে মুখ ঢেকে হতাশাবিহ্বল নিঃসঙ্গ নবাব দরবারে নিজ আসনে বসে আছেন। এ সময়েই প্রথা লঙ্ঘন করে প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হয়েছেন নবাবের সহধর্মিনী লুৎফুন্নিসা। বাল্য বিবাহের পর থেকেই লুৎফা সিরাজরে বিশ্বাস ও প্রেমের আশ্রয়। আপৎকালে বিপন্ন নবাবের কাছে যখন কেউ দাঁড়ালো না তখন সেখানে আকস্মিকভাবে লুৎফার আগমন নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত নবাবকে করেছে সচকিত। উপর্যুক্ত সংলাপের মাধ্যমে প্রিয় এই মানুষের কাছে নবাব ও ব্যক্তি সিরাজ নিজের ব্যর্থতার ও নৈঃসঙ্গের হাতাকার ধ্বনিত করে তুলেছেন।

বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহঙ্কার?

কবি-নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য থেকে আলোচ্য সংলাপটি চয়ন করা হয়েছে। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত এ সংলাপে নবাবের সহধর্মিনী লুৎফন্নিসার আত্মোপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।
পলাশীর যুদ্ধে পরাভূত নবাব সিরাজ ফিরে এসেছেন রাজধানীতে। রাজধানী ছেড়ে যাওয়া ভীত-সন্ত্রস্ত জনস্রোতকে অভয়বাণী উচ্চারণ করেও আটকাতে পারেন নি ভাগ্যাহত নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা, এখন তিনি জনবিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। একমাত্র প্রিয়তমা সহধর্মিনী লুৎফুন্নিসা পরিত্যাগ করে যাননি নবাবকে। বরঞ্চ নবাবকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন স্থানান্তরে গিয়ে এবং হিতৈষীদের আশ্রয়ে থেকে শত্রুদমনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে। লুৎফার এই পরামর্শ মান্য করেই নবাব একাকী রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে মনস্থ করেছেন। কিন্তু লুৎফা এতে সম্মত নন। তিনি নবাবের অনুগামী হতে চান। বিপদকালে প্রিয়তমকে একাকী ছেড়ে দিতে পারবেন না লুৎফা। সিরাজ যখন পথের কষ্ট ও বিপদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লুৎফাকে নিবৃত্ত করতে প্রয়াস পান, তখন লুৎফা অকাতরে পথের কষ্ট ও বিপদকে বরণ করে নেয়ার কথা বলেন। বাংলার নবাব যখন অপরের সাহায্যপ্রার্থী, তখন তাঁরই সহধর্মিনীর অহঙ্কার লালন করা সাজে না। লুৎফা তাই সকল কষ্ট ও দুর্ভোগ বরণ করেই প্রিয়তম নবাবের সঙ্গী হতে চান।

চতুর্থ অঙ্ক

ইউনিট ৫

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- মীরজাফরের ক্ষমতারোহণের কথা জানবেন।
- নবাব সিরাজের পরিণতির কথা জানবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মীরজাফর কর্তৃক বাংলার মসনদে বসার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- প্রতারিত হওয়ার পর প্রতারক উমিচাঁদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- মীরজাফর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবেন।
- সিরাজ-উ-দ্দৌলা হত্যা পরিকল্পনার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নকীব – এখানে ঘোষক অর্থে। **আমীর ওমরাহ** – বাদশাহি দরবারের সভাসদ। **মজলিস** – সভা; বৈঠক। **জুড়িয়ে** – শান্ত হয়ে। **ঢাল** – অস্ত্রের আঘাত নিবারক চর্ম। **লেবাস** – পোশাক। **খেজাতপ** – কলস; সাদা চুল লাল বা কালো করার রং। **সুর্মা** – চোখে লাগানোর হালকা নীল গুঁড়া বিশেষ।	**চতুর্থ অংক ॥ প্রথম দৃশ্য** সময় ঃ ১৭৫৭ সাল, ২৯শে জুন। স্থান ঃ মীরজাফরের দরবার। [চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, নকীব, মীরজাফর, ক্লাইভ, ওয়াট্স, কিলপ্যাট্রিক, উমিচাঁদ, প্রহরী, মীরণ, মোহাম্মদী বেগ] (রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রায়দুর্লভ সহ অন্যান্য আমীর ওমরাহরা দরবারে আসীন। দরবার কক্ষ এমন আনন্দ কোলাহলে মুখর যে সেটা রাজ দরবারের পরিবর্তে নাচ গানের মজলিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে। রাজবল্লভ ॥ কই আসর জুড়িয়ে গেল যে। নতুন নবাব সাহেবের দরবারে আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন? জগৎশেঠ ॥ ঢাল তলোয়ার ছেড়ে নবাবী লেবাস নিচ্ছেন খাঁ সাহেব, একটু দেরী ত হবেই। তা ছাড়া চুলে নতুন খেজাব, চোখে সুর্মা, দাড়িতে

আতর – সুগন্ধি; ফুলের নির্যাস।

হারেম – অন্তঃপুর।

বে-শুমার – অসংখ্য।

হুর গেলমান – ইসলামি বিশ্বাস মতে বেহেশ্‌তের সেবক সেবিকাবৃন্দ।

ওড়না – চাদর জাতীয় গাত্রাবরণ, বিশেষ; অবগুণ্ঠন।

খতম – শেষ।

সালামত – নিরাপত্তা; শান্তি।

জিম্মাদার – হেফাজতকারী; তত্ত্বাবধানকারী।

তশরীফ – উপস্থিত, পদার্পণ; হাজির।

হুঁশিয়ার – সাবধান।

সসম্ভ্রমে – সসম্মানে।

আড়াআড়ি – কোনাকুনি।

সুবে – বাদশাহি আমলে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ।

কুর্নিশ – মুসলমানি কায়দায় অভিবাদন; বাদশাহ ও আমিরকে সম্মান দেখাবার জন্য পিছনে হটে গিয়ে অবনত মস্তকে সালাম।

নজরানা – উপঢৌকন; উপহার; ভেট।

সন্ত্রস্ত – অতিশয় ভীত।

fentestic – এখানে উদ্ভট অর্থে প্রযুক্ত।

রাইয়াৎ – প্রজা, যে প্রজা জমি নিজে চাষ করার জন্য ভূমিস্বত্ব লাভ করে।

clown ভাঁড়; বিদূষক।

overwhlmed – অভিভূত।

তোড়া – মোড়ক।

খাপ – চামড়ার তৈরি তলোয়ার রাখার পাত্র।

mad – পাগল; উন্মাদ।

silly – বোকাটে; দুর্বলচেতা।

বাটোয়ারা – বন্টন; ভাগ।

খোয়াব – স্বপ্ন।

আতর, এ সব তাড়াহুড়ার কাজ নয়।

রাজবল্লভ ॥ দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছেচে কিনা কে জানে।

জগৎশেঠ ॥ না না সে ভাবনা নেই। নবাব আলীবর্দী ইন্তেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটা তৈরী। আমি ভাবছি সিংহাসনে বসবার আগেই খাঁ সাহেব সিরাজ-উ-দ্দৌলার হারেমে ঢুকে পড়লেন কিনা।

রাজবল্লভ ॥ তবেই হয়েছে। বেশুমার হুর গেলমানদের বিচিত্র ওড়নার গোলক ধাঁধা এড়িয়ে বার হয়ে আসতে খাঁ সাহেবের বাকী জীবনটাই না খতম হয়ে যায়।

(নকীবের ঘোষণা)।

নকীব ॥ সুবে বাংলার নবাব, দেশবাসীর ধন দওলত, জান সালামতের জিম্মাদার মীর মুহম্মদ জাফর আলী খান দরবারে তশরীফ আনছেন। হুঁশিয়ার ....

(মীরজাফর ধীরে ধীরে প্রবেশ, সঙ্গে মীরণ। সবাই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। মীরজাফর ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে গেলেন। একবার আড়াআড়িভাবে সিংহাসনটা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর।

তারপর একপাশে গিয়ে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালেন। দরবারের সবাই কিছুটা বিস্মিত।)

রাজবল্লভ ॥ (সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে) আসন গ্রহণ করুন সুবে বাংলার নবাব। দরবার আপনাকে কুর্নিশ করবার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

মীরজাফর ॥ (চারিদিকে তাকিয়ে) কর্নেল সাহেব এসে পড়লেন বলে।

জগৎশেঠ ॥ কর্নেল সাহেব এসে কোম্পানীর পক্ষ থেকে নজরানা দেবেন সে ত দরবারের নিয়ম।

মীরজাফর ॥ হ্যাঁ, উনি এখুনি আসবেন।

রাজবল্লভ ॥ (ঈষৎ অসহিষ্ণু) কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

(নকীবের ঘোষণা)

নকীব ॥ মহামান্য কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বাহাদুর দরবার হুঁশিয়ার.....

(ক্লাইবের প্রবেশ। সঙ্গে ওয়াট্‌স, কিলপ্যাট্রিক গোটা দরবার সন্ত্রস্ত। মীরজাফরের মুখ আনন্দে ভরে উঠল)

ক্লাইভ ॥ Long live Nabab Jafar Ali Khan. But what is this? নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফকীর?

মীরজাফর ॥ (বিনয়ের সঙ্গে) কর্নেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে বসবোনা।

ক্লাইভ ॥ (প্রচন্ড বিস্ময়ে) What? This is fantastic I must say আপনি নবাব, এ মসনদ আপনার। আমি তো আপনার রাইয়াৎ আপনাকে নজরানা দেবো।

মীরজাফর ॥ মীরজাফর বেইমান নয় কর্নেল ক্লাইভ। বাংলার মসনদের জন্যে

তীর্থ – পুণ্যস্থান।

forgive – ক্ষমা; মার্জনা।

শুকরিয়া – কৃতজ্ঞতা।

ইনাম – পুরস্কার।

নিষ্কৃতি – মুক্তি।

বিঘ্ন – ব্যাঘাত, বাধা।

উল্লসিত – আনন্দিত; উৎফুল্ল।

কয়েদখানা – জেলখানা; ফাটক।

গর্দান – ঘাড়সহ মাথা।

ওয়ার ক্রিমিন্যাল – যুদ্ধাপরাধী।

sympathy– সহানুভূতি।

traitor– বিশ্বাসঘাতক।

soldier– সৈনিক।

ordinemy public– সাধারণ জনতা।

spit– থুতু ফেলা।

terror ভীতি।

granite foundation কঠিন পাথরে তৈরি ভিত্তি; সুদৃঢ় ভিত্তি।

প্রেক্ষাগৃহ – রঙ্গালয়; নাট্য-মিলনায়তন।

princess এখানে বেগম অর্থে।

Hired killer – ভাড়াটে খুনী।

butcher – কশাই।

trouble – অসুবিধা, ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাটে ফেলা।

ফতে সিদ্ধি; সফলতা।

টীকা

মোহাম্মদী বেগ – বাংলার ইতিহাসের এক ঘৃণ্য চরিত্র মোহাম্মদী বেগ। কৃতঘ্ন এবং অতিশয় হিংস্র চরিত্রের মানুষ হিসেবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে মোহাম্মদী বেগের স্থান। ক্লাইভ কারারুদ্ধ সিরাজকে হত্যার

আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসবো, তা না হলে নয়।

ক্লাইভ ॥ (ওয়াট্‌সকে নীচু স্বরে) No clown will ever beat him. (দরবারের উদ্দেশ্যে) আমাকে লজ্জায় ফেলেছেন নবাব জাফর আলীখান। I am completely overwhelmed. বুঝতে পারছিনে কি করা দরকার। (এগিয়ে গিয়ে মীরজাফরের হাত ধরলো। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দিতে Gentlemen, I present you the new Nabab His excellence Jafar Ali Khan. আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলী খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম। May God help him and help you as well.

ওয়াট্‌স ॥ Hip Hip Hurry.

কিল্‌প্যাট্রিক ॥ (মীরজাফর মসনদে বসলেন। দরবারের সবাই কুর্নিশ করল)

ক্লাইভ ॥ আপনাদের দেশে আবার শান্তি আসলো।

(কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্যতোড়া নিয়ে নবাবের পায়ের কাছে রাখলো।

ক্লাইভ ॥ কোম্পানীর তরফ থেকে আমি নবাবের নজরানা দিলাম।

ওয়াট্‌স ॥ Long live Nabab Jafar Ali Khan.

(একে একে অন্যেরা নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করতে লাগলো পাগলের মত চীৎকার করতে করতে উমিচাঁদের প্রবেশ। দৌড়ে ক্লাইভের কাছে গিয়ে।)

উর্মিচাঁদ ॥ আমাকে খুন করে ফেল আমাকে খুন করে ফেল। (ক্লাইভের তলোয়ারের খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুকতে ঠুকতে) খুন কর, আমাকে খুন কর।

মীরজাফর ॥ কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

উর্মিচাঁদ ॥ ওহ্ সব বেঈমান বেঈমান! না আমি আত্মহত্যা করব। (নিজের গলা সবলে চেপে ধরলো। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগলো। ক্লাইভ সবলে তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে)

ক্লাইভ ॥ Have you gone mad?

উর্মিচাঁদ ॥ ম্যাড বানিয়েছ এখন খুন করে ফেল। দয়া করে খুন কর কর্নেল সাহেব।

ক্লাইভ ॥ Don't be silly. কি হয়েছে তা তো বলবে?

উর্মিচাঁদ ॥ আমার টাকা কোথায়?

ক্লাইভ ॥ কিসের টাকা?

উর্মিচাঁদ ॥ দলিলে সই করে দিয়েছিলে, সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেরে গেলে আমাকে বিশলক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

ক্লাইভ ॥ কোথায় সে দলিল?

উর্মিচাঁদ ॥ তোমরা জাল করেছ। (দৌড়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) আপনি বিচার করুন। আপনি নবাব, সুবিচার করুন।

সিদ্ধান্ত নিলে সিরাজের প্রাণহরণে একে একে সবাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে মীরজাফর পুত্র মীরনের মধ্যস্থতায় মোহম্মদী বেগ রাজি হয় সিরাজকে হত্যা করতে। তার এই সম্মতির পেছনে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিলো না, নিতান্তই অর্থের লোভে মোহম্মদী বেগ সিরাজ হত্যার মত নৃশংস কাজের দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করে নেয়। সিরাজের পিতা জয়েনউদ্দিন আহমদ অনাথ মোহাম্মদী বেগকে সস্নেহে লালন পালন করেছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সিরাজ জননী আমেনা বেগম তার বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। নিহত হওয়ার পূর্বে সিরাজ তাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন কিন্তু কৃতঘ্ন মোহম্মদী বেগ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুলাই সিরাজকে শেষ প্রার্থনার সময় পর্যন্ত না দিয়ে নিষ্ঠুর জল্লাদের মত নৃশংসভাবে হত্যা করে।

ক্লাইভ ॥ আমি এর কিছুই জানিনে।

উর্মিচাঁদ ॥ াা জানবে কেন সাহেব। নবাবের রাজকোষ বাটোয়ারা করে তোমার ভাগে পড়েছে একুশ লাখ টাকা। সকলের ভাগেই অংশ মত কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু আমার বেলাতে ....

(ক্রন্দন)

ক্লাইভ ॥ (সবলে উর্মিচাঁদের বাহু আকর্ষণ করে) You are dreaming Omichadnd. তুমি খোয়াব দেখছো।

উর্মিচাদ ॥ খোয়াব দেখছি? দলিলে পরিষ্কার লেখা বিশ লক্ষ টাকা পাবো। তুমি নিজেই সই করেছো।

ক্লাইভ ॥ আমি সই করলে আমার মনে থাকতো। তোমার বয়স হয়েছে মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ করো ঈশ্বরকে ডাকো। মন ভালো হবে। (উর্মিচাঁদকে কিল্‌প্যাট্রিকের হাতে দিয়ে দিল। সে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেলো। উর্মিচাঁদ চীৎকার করতে লাগলো (আমার টাকা, আমার টাকা)

ক্লাইভ ॥ উর্মিচাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে। Your Excellency may fogive us.

জগৎশেঠ ॥ এমন শুভদিনটা থমথমে করে দিয়ে গেলো।

ক্লাইভ ॥ ভুলে যান। ও কিছু নয়। (নবাবের কিছু বলা উচিত।

রাজবল্লভ ॥ নিশ্চয়ই। প্রজাসাধারণ আশ্বাসে আবার নতুন ক'রে বুক বাঁধবে। রাজকার্য পরিচালনায় কা'কে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তাও মোটামুটি তাদের জানানো দরকার।

মীরজাফর ॥ (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে পাগড়ি ঠিক করে) আজকের এই দরবারে আমরা সরকারী কাজ আরম্ভ করার আগে কর্নেল ক্লাইভকে শুকরিয়া জানাচ্ছি তাঁর আন্তরিক সহায়তার জন্যে। বিনিময়ে আমি তাঁকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী ২৪ পরগনার স্থায়ী মালিকানা।

(ওয়াট্‌স ও কিল্‌প্যাট্রিক এক সঙ্গে হুর্‌রে। ক্লাইভ হাসিমুখে মাথা নোয়ালো।)

মীরজাফর ॥ দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সিরাজ-উ-দ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন থেকে কারও শান্তিতে আর কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী ॥ সেনাপতি মীর কাসেমের দূত।

মীরজাফর ॥ হাজির করো।

(বসলেন। দূতের প্রবেশ। মীরন দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এলো। মীরনের হাতে পত্র প্রদান। মীরন খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠলো।)

মীরন ॥ পলাতক সিরাজ-উ-দ্দৌলা মীর কাসেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দী হয়েছে। তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

(মীরজাফরের হাতে পত্র প্রদান)

ক্লাইভ ॥ ভালো খবর। You can fell really safe now.

মীরজাফর ॥ কিন্তু তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কি দরকার? বাইরে যে কোন জায়গায় আটকে রাখলেই ত চলতো।

ক্লাইভ ॥ (রুখে উঠলো) No Your Honour এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না। আপনি যে শাসন করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, দেশের লোকের মনে সে কথা জাগিয়ে রাখতে হবে every moment. কাজেই সিরাজ-উ-দ্দৌলা শিকল বাঁধা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোখের সামনে দিয়ে আসবে জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায়। কোনো লোক তার জন্যে এতটুকু দয়া দেখালে তার গর্দান যাবে। এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর আলী খান। সিরাজ-উ-দ্দৌলা এখন কয়েদী, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে Sympathy দেখাবে সে traitor। আর আইনে traitor এর শাস্তি মৃত্যু। And that is how you must rule.

মীরজাফর ॥ আপনারা সবাই শুনেছেন আশা করি। সিরাজকে বন্দী করা হয়েছে। যথাসময়ে তার বিচার হবে। আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।

ক্লাইভ ॥ Yes । তা ছাড়া মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যখন তাকে soldier রা টানতে টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দু'ধার থেকে ordinary public তার মুখে থুথু দেবে they must spit on his face.।

মীরজাফর ॥ অতটা কেন?

ক্লাইভ ॥ আমি জানি He is a dead horse। কিন্তু না করলে লোকে আপনার ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে কেন? Public এর মনে terror) জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার granite foundation.

(মীরজাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দরবারের কাজ শেষ হলো। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছনে অন্য সকলে। মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেলো; কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো। কথা বলতে বলতে ক্লাইভ এবং মীরনের প্রবেশ।)

ক্লাইভ ॥ আজ রাত্রেই কাজ সারতে হবে। এ সব ব্যাপারে chance নেওয়া চলে না।

মীরন ॥ কিন্তু হুকুম দেবে কে? আব্বা রাজী হলেন না।

ক্লাইভ ॥ রাজবল্লভকে বলো।

মীরন ॥ তিনি নাকি অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাই করা গেলো না।

ক্লাইভ ॥ Then?

মীরন ॥	রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ-ওরাও রাজী হলেন না।
ক্লাইভ ॥	তা হলে তোমাকেই সেটা করতে হবে।
মীরন ॥	প্রহরীরা আমার হুকুম শুনবে কেন?
ক্লাইভ ॥	তোমার নিজের হাতেই সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে মারতে হবে, in your own interest সে বেঁচে থাকতে তোমার কোনো আশা নেই। নবাবী মসনদ ত' পরের কথা আপাততঃ what about the lovely princess? লুৎফুন্নিসা তোমার কাছে ধরা দেবে কেন সিরাজ-উ-দ্দৌলা জীবিত থাকতে।
মীরন ॥	আমি একজন লোক ব্যবস্থা করেছি। সে কাজ করবে, কিন্তু তোমার হুকুম চাই।
ক্লাইভ ॥	What pity. Hired kiler রা পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে না। any way ডাকো তাকে। (মীরন বেরিয়ে গেল এবং মোহাম্মদী বেগকে নিয়ে ফিরে এলো।)
ক্লাইভ ॥	এ কে? looks like a real butcher.
মীরন ॥	মোহাম্মদী বেগ।
ক্লাইভ ॥	তুমি রাজী আছো?
মোহাম্মদী বেগ॥	দশ হাজার টাকা দিতে হবে। পাঁচ হাজার অগ্রিম।
ক্লাইভ ॥	Agreed. (মীরনকে) ওকে টাকাটা এখুনি দিয়ে দাও। (মীরন এবং মোহাম্মদী বেগ বেরুবার উপক্রম করলো)
ক্লাইভ ॥	There may be trouble অবস্থা বুঝে কাজ করো। Be careful কাজ ফতে হলেই আমাকে খবর দেবে, যাও। (ওরা বেরিয়ে গেলো। ক্লাইভের মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করে বললো) it is must।

বস্তুসংক্ষেপ

পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে জয়লাভ করে ১৭৫৭ সনের ২৯ জুন তারিখে সপরিষদ দরবারের আয়োজন করেছেন মীর জাফর। ষড়যন্ত্রের হোতা প্রায় সকলেই মীরজাফর আহূত দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। মীরজাফর এবং ক্লাইভ এর আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন আমীর ওমরাহ্‌রা। দরবার কক্ষ আনন্দ কোলাহলে মুখর। বাংলার মসনদের নতুন দাবিদার মীরজাফরের দরবারে উপস্থিত হতে বিলম্ব ঘটায় রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ নতুন নবাবকে নিয়ে কৌতুকালাপে লিপ্ত। নবাবের প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা বোধ উন্মোচিত হয়ে পড়ে স্থুল ঐ কৌতুকালাপের মধ্য দিয়ে।

দরবার কক্ষে মীর জাফরের প্রবেশ মাত্র সসম্ভ্রমে সকলে উঠে দাঁড়ান। বাংলার নতুন নবাব মীরজাফর যেহেতু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিংহাসন কুক্ষিগত করেছেন, সেজন্যেই তার মধ্যে উদ্বেগ ও আড়ষ্টতা বিদ্যমান। সিংহাসনকে কোনাকুনিভাবে প্রদক্ষিণ করেও আসন গ্রহণ করতে তিনি ইতঃস্তত করেন। পারিষদবর্গ তাকে সিংহাসনে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আড়ষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত মীরজাফর সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। তার ঐ অপেক্ষার অবসান ঘটে দরবার কক্ষে কর্ণেল ক্লাইবের আগমনের পর। ক্লাইভও দরবার কক্ষে প্রবেশ করে বিস্মিত হন নবাবকে সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ক্লাইভের ব্যঙ্গাত্মক উক্তির জবাব দিতে গিয়ে মীরজাফর তার আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেন প্রভুভক্তির বদান্যতার বদৌলতে। তিনি স্পষ্টতই জানিয়ে দেন যে, কর্ণেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে তিনি সিংহাসনে আসন গ্রহণ করবেন না। নবাবের এই উদ্ভট আবদার শুনে ক্লাইভ বিস্মিত হন। ক্লাইভ প্রত্যুত্তরে জানান যে,

তিনি নবাবের রাইয়ৎ এবং নবাবের মসনদে আরোহণ উপলক্ষে নজরানা দেয়ার অধিকারী। কিন্তু স্বভাষ্যে মীরজাফর বেঈমান নন; যার আনুকূল্যে বাংলার মসনদ আজ তার অধিকৃত, সেই ক্লাইভের ঋণ তিনি অস্বীকার করবেন কীভাবে? কাজেই মীরজাফর পুনর্ব্যক্ত করেন তার ইচ্ছা। মীরজাফরের এই ভাঁড়ামি উপলব্ধি করে ক্লাইভ অবশেষে তার হাত ধরে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে লোকদেখানো নজরানাও প্রদান করেন। তাকে অনুসরণ করে উপস্থিত অমাত্যরাও নজরানা দিয়ে অভিবাদন জানান। নতুন নবাবের সিংহাসনে আরোহণের এই আনন্দময় মুহূর্তে আকস্মিকভাবে দরবার কক্ষে প্রবেশ করে উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদ। উমিচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা। অর্থলিপ্সু উমিচাঁদের সঙ্গে ক্লাইভ ও মীরজাফরসহ অন্যান্যের একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন হলে ক্লাইভ উমিচাঁদকে বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করবেন। কিন্তু পূর্বেই আসল চুক্তিপত্র নষ্ট করে নকল চুক্তিপত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল ধূর্ত ক্লাইভ। উমিচাঁদ এই প্রতারণার শিকার হয়েই এখন উন্মাদ। দরবার কক্ষে উমিচাঁদের প্রবেশমাত্র স্বাভাবিক আনন্দ অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটে। উপস্থিত সকলেই জানেন যে, তারা নিজেরাও উমিচাঁদকে ঠকানোর ষড়যন্ত্রের অংশীদার। উমিচাঁদের সামনে ক্লাইভ সুস্পষ্টভাবে ঐ চুক্তিপত্রের কথা অস্বীকার করেন এবং উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদের মতিভ্রম নিয়ে উপহাস করেন। অবশেষে ক্লাইভ ধৃত উমিচাঁদকে কিল্‌প্যাট্রিকের হাতে ন্যস্ত করেন। কিন্‌প্যাট্রিক টেনে হিঁচড়ে তাকে দরবার কক্ষের বাইরে নিয়ে যায়।

উপর্যুক্ত ঘটনায় দরবার কক্ষের পরিবেশ থমথমে হয়ে পড়লে ক্লাইভ সামান্য এ ঘটনা ভুলে যেতে সবাইকে অনুরোধ করেন এবং পারিষদবর্গের উদ্দেশ্যে নতুন নবাবের কিছু বলা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজবল্লভ ক্লাইভের কথায় সায় দিলে মীরজাফর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান এবং প্রথমেই কর্নেল ক্লাইভের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তার আন্তরিক সহায়তার জন্য পুরস্কার হিসেবে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি ২৪ পরগণার স্থায়ী মালিকানা দান করেন। মীর জাফরের এ ঘোষণায় ক্লাইভ ও কিলপ্যাট্রিক উল্লসিত হয়ে উঠেন। এরপর নতুন নবাব দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে তাদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে, কেননা তারা সিরাজ-উ-দ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এখন থেকে দেশবাসী কারুরই শান্তিতে কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না। মীরজাফরের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরবার কক্ষে মীর কাসেমের দূতের আগমন ঘটে। দূত মীরনের কাছে একটি পত্র প্রদান করে। পত্রপাঠ করে মীরন উল্লসিত হয়ে উঠেন এবং মীর কাসেমের সৈন্যদের হাতে ভগমান গোলায় সিরাজ-উ-দ্দৌলার বন্দী হওয়ার এবং দ্রুত রাজধানীতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের সংবাদ পরিবেশন করেন। সংবাদটি শুনে ক্লাইভ আনন্দিত হলেও মীরজাফর কিছুটা বিব্রত বোধ করেন। তার মনে হয় পরাজিত নবাবকে রাজধানীতে না এনে বাইরে কোথাও আটকে রাখা যেতো। কিন্তু ক্লাইভ এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বুঝিয়ে দেন যে, নতুন নবাবকে তার ক্ষমতা প্রয়োগে কঠোর হতে হবে, জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে নবাব শাস্তি দিতে জানেন। ক্লাইভ প্রস্তাব করেন সিরাজ উ-দ্দৌলাকে শিকল বাঁধা অবস্থায় হাঁটিয়ে সবার চোখের সামনে জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায় নিয়ে আসার তাঁর ভাষায় কয়েদী সিরাজ যুদ্ধাবপরাধী, কাজেই তার জন্য কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করলে তিনি হবেন বিশ্বাসঘাতক। আর বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। অবশেষে মীরজাফরও ক্লাইভের কথায় সায় দেন এবং সিরাজের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে নিজের বিপদ ডেকে না আনার জন্য সকলকে পরামর্শ দেন। মীরজাফরের সম্মতিতে উল্লসিত ক্লাইভ বেপরোয়া হয়ে বলেন মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে সৈন্যরা যখন সিরাজকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুধার থেকে সাধারণ জনতা তার মুখে থুতু ছিটাবে। এ যদি না করা হয় তাহলে জনগণ মীরজাফরের ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে না। জনগণের মনে ভীতি জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার সুকঠিন ভিত্তি প্রস্তুত করে বলে ধূর্ত ক্লাইভ মনে করেন। ক্লাইভের এই মনোভাব ব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মীর জাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়ান এবং দরবারের কাজও সমাপ্ত হয়। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলে অমাত্যরাও তাকে অনুসরণ করে দরবার কক্ষ ত্যাগ করেন। এরপর মঞ্চের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে এবং পরে আবার মঞ্চে ধীরে ধীরে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠে। স্বল্পালোকে মঞ্চে প্রবেশ করেন ক্লাইভ ও মীরন। তারা দুজনে সিরাজ হত্যা পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্লাইভ চান দ্রুত সিরাজ হত্যার বাস্তবায়ন। কিন্তু সিরাজ হত্যার আদেশ দিতে সকলেই কুণ্ঠিত। মীরজাফর সম্মতি দিতে রাজি হন নি, রাজবল্লভ অসুস্থতার ভান করে মীরনকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পর্যন্ত দেননি। রায়দুর্লভ ইয়ার লুৎফ খাঁ পর্যন্ত সিরাজ হত্যার আদেশ দিতে অপারগতা জানান। ক্লাইভ এ সব শুনে মীরনকেই সিরাজ হত্যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। ক্লাইভ ভবিষ্যৎ মসনদ এবং পরাভূত নবাবের বেগম লুৎফুন্নিসার লোভ দেখিয়ে মীরনকে মোহের ফাঁদে আটকে ফেলেন। অবশেষে মীরন জানায় যে, সে একজন লোকের ব্যবস্থা করেছে যে হত্যাকান্ড পরিচালনায়

সম্মত হয়েছে। কিন্তু তার আগে ঐ লোকের কাছে হত্যার আদেশ দিতে হবে স্বয়ং ক্লাইভকে। ক্লাইভের নির্দেশে মীরন দ্রুত ভাড়াটে হত্যাকারী মোহাম্মদী বেগকে ক্লাইভের সামনে হাজির করে। প্রকৃত কশাই এর মত দেখতে মোহাম্মদী বেগকে প্রত্যক্ষ করে ক্লাইভ খুশি হন। অগ্রিম পাঁচ হাজার সহ সর্বমোট দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির শর্তে মোহাম্মদী বেগ সিরাজ হত্যাকান্ড বাস্তবায়নে নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মীরজাফর কর্তৃক বাংলার মসনদে বসার কৌতুককর ঘটনার বর্ণনা দিন।
২. দরবারে মীরজাফরের উপস্থিত হতে বিলম্ব দেখে অমাত্যরা কী কী নিয়ে কৌতুক করেছিলেন?
৩. ‘কর্ণেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?’ কে কোন্ প্রসঙ্গে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?
৪. ‘ইনি কি নবাব না ফকীর? সংলাপটি কোন্ প্রসঙ্গে কে উচ্চারণ করেছেন?
৫. 'No clown will cver leeat him`- কে কোন্ প্রসঙ্গে কেন সংলাপটি ব্যক্ত করেছেন?
৬. ‘এমন শুভদিনটা থমথমে করে দিয়ে গেলো’। কে কার উদ্দেশ্যে কোন প্রসঙ্গে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?
৭. প্রতারিত হওয়ার পর প্রতারক উমিচাঁদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৮. মীর জাফর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।
৯. ক্লাইভ ও মীরনের সিরাজ-উ-দ্দৌলা হত্যা পরিকল্পনার বিবরণ দিন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ দরবারে মীরজাফরের উপস্থিত হতে বিলম্ব দেখে অমাত্যরা কী কী নিয়ে কৌতুক করেছিলেন?

উত্তর ।। পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে জয়লাভ করে মীরজাফর বাংলার মসনদের অধিকারী হয়েছেন। ষড়যন্ত্রের হোতা প্রায় সকলেই মীরজাফরের দরবার কক্ষে উপস্থিত হয়েছেন। ক্লাইভ তখনও দরবারে এসে পৌঁছান নি, অন্যদিকে নতুন নবাবেরও দরবার কক্ষে প্রবেশ বিলম্বিত হচ্ছে। নবাবের বিলম্ব দেখে সমাগত আমীর ওমরাহ্‌রা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। প্রথা অনুযায়ী নতুন নবাব সর্বসমক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করবেন এবং সমাগত অমাত্যবর্গ ও রাইয়ৎরা কুর্নিশ জানিয়ে যথাযোগ্য নজরানা প্রদান করবেন নবাবকে। কিন্তু দরবার কক্ষে প্রবেশে বিলম্ব ঘটছে নতুন নবাবের। অধৈর্য অমাত্যরা এই সুযোগে কৌতুক আলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তাদের এই আলাপের মধ্য দিয়ে বাংলার নবাবের প্রতি প্রচণ্ড অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। নবাবের দরবার কক্ষে আসতে দেরী হচ্ছে কেন রাজবল্লভ এই প্রশ্ন করলে জগৎশেঠ জবাবে জানান যে, খাঁ সাহেব নতুন লেবাস ধারণ করেছেন, কাজেই তার কিছুটা দেরী হওয়াই স্বাভাবিক। এছাড়া চুলে নতুন কলপ মাখা, চোখে সুর্মা ও দাড়িতে আতর মাখার কাজ দ্রুত করা চলে না। এই সংলাপে প্রচ্ছন্ন কৌতুক অনুভব করেই রাজবল্লভ জানতে চান দর্জি নবাবের নতুন পোশাক নিয়ে যথাসময়ে পৌঁচেছে কিনা। জগৎশেঠ প্রত্যুত্তরে তীব্র শ্লেষ মিশ্রিত অথচ কৌতুকপ্রদ মন্তব্য করেন। তিনি জানান যে নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর আগের দিন থেকেই পোশাকটা তৈরি হয়ে আছে। অর্থাৎ মীরজাফরের উচ্চাভিলাষ যে কত সুপরিকল্পিত– ঐ মন্তব্যে যে কথাই অভিব্যক্তি পেয়েছে। তবে জগৎশেঠ দর্জির পোশাক নিয়ে তেমন ভাবছেন না, তার ভাবনা সিংহাসনে বসার পূর্বেই মীরজাফর সিরাজ-উ-দ্দৌলার অন্ত:পুরে ঢুকে পড়েছেন কিনা সেই নিয়ে তার এই দু:শ্চিন্তার কথা ব্যক্ত হওয়া মাত্রই অপেক্ষাকৃত স্থুল রসিকতায় পটু রাজবল্লভ কথাটি প্রায় কেড়ে নিয়েই এক নতুন কৌতুকাবহ তৈরি করে নিজের উচ্চারিত সংলাপে। তার মতে, নতুন নবাব যদি প্রাক্তন নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেই থাকেন, তাহলে হুর পরীর মত অসংখ্য নারীর বিচিত্রিত ওড়নার গোলক ধাঁধা অতিক্রম করে বাইরে আসতে নবাবের না অবশিষ্ট জীবনটাই শেষ হয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ 'No clown will cver beat him`- কে কোন্ প্রসঙ্গে কেন সংলাপটি ব্যক্ত করেছেন?

উত্তর ॥ দরবার কক্ষে সকলের অগোচরে সহকর্মী ওয়াট্‌সের উদ্দেশ্যে এবং নতুন নবাব মীর জাফরকে উপলক্ষ করে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি কর্নেল ক্লাইভ। পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজের দরবার কক্ষে অমাত্যবর্গের সভা আহ্বান করেছেন নতুন নবাব মীরজাফর আলী খাঁ। প্রথানুযায়ী সর্বসমক্ষে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন এ উপলক্ষ্যে উপস্থিত আমীর ওমরাহরা যথাযোগ্য নজরানা দিয়ে নতুন নবাবকে অভিবাদন জানাবেন। মীরজাফর দরবার কক্ষে প্রবেশ করে প্রথমেই কোনাকুনিভাবে সিংহাসন প্রদক্ষিণ করেন এবং বসতে গিয়েও আড়ষ্টতার কারণে সিংহাসনে আরোহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। নতুন নবাব মীরজাফর সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। ক্লাইভের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের কারণেই তার অবর্তমানে সিংহাসনে আসন গ্রহণ করা মীরজাফরের কাছে স্বস্তিকর মনে হয় না। কাজেই তিনি সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়েই থাকেন। ক্লাইভ দরবার কক্ষে পৌঁছে এ রকম একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হন এবং জিজ্ঞাসা করেন মসনদের পাশে দাঁড়ানো নবাব কি প্রকৃত নবাব না ফকীর? আনুগত্যে বিগলিত মীরজাফর প্রত্যুত্তরে জানান যে কর্নেল ক্লাইভ হাত ধরে তুলে না দিলে তিনি মসনদে আসন গ্রহণ কবেন না। এই অদ্ভুত আবদার কৌতুকানুভূতির সৃষ্টি করে ক্লাইভের মনে। ক্লাইভ নীচু স্বরে সহকর্মী ওয়াট্‌সের উদ্দেশে মীরজাফরের এই ভাঁড়ামি প্রসঙ্গে তীব্র বিদ্রুপূর্ণ মন্তব্য করেন। তার মতে কোন ভাড়ই বাংলার নবাব মীরজাফরের এই ভাঁড়ামিকে পরাস্ত করতে পারবে না। ক্লাইভ এর এ সংলাপ সূত্রে হীনবল ও ব্যক্তিত্বশূন্য মীরজাফর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ 'এমন শুভদিনটা থমথমে করে দিয়ে গেলো'। কে কার উদ্দেশ্যে কোন প্রসঙ্গে সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

উত্তর ॥ বাংলার নতুন নবাব মীর জাফর আলী খাঁর দরবার কক্ষে আহূত প্রথম সভায় উপস্থিত অন্যান্য অমাত্যের উদ্দেশ্যে উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদকে উপলক্ষ করে জগৎশেঠ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

মীরজাফরের বাংলার মসনদে আরোহণ উপলক্ষে পলাশী যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের হোতা সকল কুচক্রী সমবেত হয়েছেন নতুন নবাবের দরবার কক্ষে। নবাবের মসনদে আরোহণ দরবারের উপলক্ষ হলেও, সমবেত সকল অমাত্যেরই লক্ষ্য রাজকোষের পূর্ব নির্ধারিত বখরা আদায় সুনিশ্চিত করা। পলাশীর যুদ্ধের ষড়যন্ত্র কার্যকর হলে কুচক্রী অমাত্যরা সকলেই নির্ধারিত অর্থ লাভ করবেন এ রকম এক লিখিত চুক্তি প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হয়েছিল কর্ণেল ক্লাইভের তত্ত্বাবধানে। তবে অর্থলোলুপ উমিচাঁদকে ঠকানোর জন্য ক্লাইভের তৎপরতায় দুটি দলিল প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর একটি আসল, অপরটি নকল। ক্লাইভ সচেতন ভাবেই আসল দলিলে উমিচাঁদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন নি। যুদ্ধশেষে ষড়যন্ত্রের হোতা সকলেই যখন নিজেদের প্রাপ্য কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে নবাবের দরবার কক্ষে সমবেত হয়েছেন, তখন প্রতারিত হয়ে উন্মাদ উমিচাঁদ অনাহূতভাবে মীরজাফরের দরবারকক্ষে উপস্থিত হয়। উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদ ক্লাইভ ও মীরজাফরের কাছে পূর্ব প্রতিশ্রুত ২০ লক্ষ টাকা দাবি করলে ক্লাইভ তাকে 'ম্যাড' আখ্যায়িত করে ঐ চুক্তি পত্র প্রসঙ্গে নিজের অজ্ঞানতার দোহাই দেন। অবশেষে তাকে তীর্থ ভ্রমণের পরামর্শ দিয়ে সহকর্মী কিল্‌প্যাট্রিকের হাতে সোপর্দ করেন। কিল্‌প্যাট্রিক টেনে হিচড়ে বিকারগ্রস্ত উমিচাঁদকে বাইরে নিয়ে যায়। দরবার কক্ষে উমিচাঁদের আগমন ও অপসারণ কুচক্রীদের আনন্দ ঘন পরিবেশকে ভারি করে তুলে। জগৎশেঠ বাঙালি কুচক্রীদের উপর্যুক্ত মনোভাব সংলাপটিতে প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন ঃ মীর জাফর চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

উত্তর ॥ মীরজাফর বাংলার নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রে প্রধান হোতা। বিশ্বাসঘাতক ও ব্যক্তিত্বহীন কুচক্রী হিসেবে মীরজাফরের স্থান ইতিহাসে নির্ধারিত। নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর তাঁর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকে মীরজাফর চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্যের সম্পূরক আরও কিছু বৈশিষ্ট্য সন্নিবেশ করেছেন। আলোচ্য চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশে মীরজাফর চরিত্রের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি যা মীরজাফরের মৌল চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে করেছে পরিপুষ্ট। যে সব অমাত্যকে নিয়ে মীরজাফর নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কুচক্র সৃজন করেছেন, সে সব কুচক্রীদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই মীরজাফর চরিত্রের উচ্চাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির দিকটি আলোচ্য দৃশ্যে উন্মোচিত হয়েছে। সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় মীরজাফরের উপস্থিত হতে বিলম্ব দেখে জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ বিদ্রুপমিশ্রিত যে সব সংলাপ বিনিময়

করেছেন তার মধ্য দিয়ে মীরজাফর চরিত্রের কয়েকটি বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। নবাবের বিলম্ব দেখে রাজবল্লভ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

দর্জি নবাবের নতুন পোশাক যথাসময়ে সরবরাহ করেছে কিনা এই ভেবে প্রত্যুত্তরে জগৎশেঠ জানিয়েছেন যে, নবাব আলবির্দীর মৃত্যুর পূর্ব দিন থেকেই মীরজাফর ভবিষ্যৎ নবাবের পোশাকটি তৈরি করে রেখেছেন। এ সংলাপের মধ্য দিয়ে কুচক্রী মীরজাফরের দুরভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। অন্যদিকে এই দুজন অমাত্য উন্মোচন করেছেন মীরজাফর চরিত্রের ভিন্ন এক প্রান্ত। দরবার কক্ষে উপস্থিত হতে মীর জাফরের বিলম্ব দেখে জগৎশেঠ, এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, নতুন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার হারেমে বা অন্তঃপুরে ঢুকে পড়লেন কিনা। এ জবাবে কৌতুকের আবরণে রাজবল্লভ মহাশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন– এ আশঙ্কা যদি সত্য হয় তাহলে হারেমের অসংখ্য হুরপরীর বিচিত্র ওড়নার গোলকধাঁধা অতিক্রম করে আসতে নবাবের না অবশিষ্ট জীবনটাই শেষ হয়ে যায়। নবাবের ইন্দ্রিয় পরায়ণতা সম্পর্কে এই ইঙ্গিত মীরজাফর চরিত্রের এক নতুনতর বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে।

এতদ্ব্যতীত মীরজাফর চরিত্রের ব্যক্তিত্বহীনতা ও অন্তঃসার শূন্যতার দিকটিও আলোচ্য দৃশ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার প্রতিনিধি কর্ণেল ক্লাইভের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরই মীরজাফরের নবাবি নির্ভরশীল এটি উপলব্ধি করেই মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে বংশবদের মত আচরণ করেছেন। ক্লাইভ হাত ধরে তুলে না দেয়া পর্যন্ত তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে পর্যন্ত সম্মত হন নি। উমিচাঁদকে ঠকানোর জন্য ক্লাইভ যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন– মীরজাফরের তাতে সম্মতি ছিলো, এজন্যেই আলোচ্য দৃশ্যে উমিচাঁদ যখন ক্লাইভ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে নবাবের কাছে আর্জি পেশ করেছে। মীরজাফর তখন সুদক্ষ অভিনেতার মত নীরবতা পালন করেছেন। বর্তমান দৃশ্যের মধ্য পর্যায়ে যখন পূর্বতন নবাব নিরাজের বন্দী হওয়ার ও তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসার সংবাদ দরবার কক্ষে এসে পৌঁছেছে তখনও মীরজাফর বন্দী নবাবকে ভীতিকর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে তাকে রাজধানীতে না এনে অন্য কোথাও কয়েদ করে রাখার প্রস্তাব করেছেন। এভাবেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে দুর্বলচিত্ত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ষড়যন্ত্র পটু মীর জাফরের চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. নানা সে ভাবনা নেই। নবাব আলীবর্দী ইন্তেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটা তৈরী।

২. বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসবো, তা না হলে নয়।

৩. সিরাজ-উ-দ্দৌলা এখন কয়েদী, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে sympathy।

৪. Public এর জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার granite foundation

নমুনা উত্তর

বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসবো, তা না হলে নয়।

উদ্ধৃত সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত ‘সিরাজ-উ-দ্দৌলা’ নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে চয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য সংলাপে কর্নেল ক্লাইভের প্রতি বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নির্লজ্জ আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে।

পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত প্রহসনমূলক যুদ্ধে কর্ণেল ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন কোম্পানির সৈন্যরা বংশদর মীরজাফরের সহায়তায় জয়লাভ করে। যুদ্ধের সূত্রে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতন ঘটলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ক্লাইভ মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণ নিশ্চিত করেন। মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে আয়োজিত অমাত্যবর্গের

সভায় নতুন নবাব কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের কারণে ক্লাইভের অনুপস্থিতিতে মসনদে বসতে অস্বীকৃতি কিছুটা বিলম্বে উপস্থিত ক্লাইভও মীরজাফরকে সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও বিদ্রূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যে বিগলিত মীরজাফর বাংলার মসনদে বসার অধিকার লাভ করেছেন যার কারণে সেই ক্লাইভের প্রতি নিজের ঋণ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন এবং মসনদে বসতে হলে তার হাত ধরে বসার মনোবাসনা স্বয়ং ক্লাইভের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেন। উপর্যুক্ত সংলাপটির মাধ্যমে একদিকে পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধের পরিণতিতে সর্বাধিক সুবিধাভোগী হিসেবে মীরজাফরের অবস্থান এবং অন্যদিকে তাঁবেদার মীরজাফরের প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা উন্মোচিত হয়েছে।

সিরাজ-উ-দ্দৌলা এখন কয়েদী, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে sympathy।

কবি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে বক্ষ্যমান সংলাপটি উদ্ধৃত হয়েছে। বাংলার নতুন নবাব মীরজাফরের উদ্দেশ্যে কর্নেল ক্লাইভ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।
মীরজাফর কর্তৃক বাংলার মসনদে আরোহণ উপলক্ষে আয়োজিত প্রথম সভায় ইনাম ও নজরানা আদান প্রদানের আনন্দ ঘন মুহূর্তে মীর কাসেমের দূত মারফত এই সংবাদ এসে পৌঁছায় যে, ভগবানগোলার কাছে পলাতক নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়েছেন এবং তাকে রাজধানীতে প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই সংবাদ কর্নেল ক্লাইভসহ অন্যান্যকে আশ্বস্ত করলেও, পরাজিত নবাবকে রাজধানীতে নিয়ে আসার সংবাদ মীরজাফরকে দ্বিধা ও শঙ্কায় ফেলে। সিরাজকে অন্য কোথাও আটকে রাখা ভালো হতো বলে মীরজাফর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নতুন শাসক মীরজাফরের এই দুর্বলতা ক্লাইভের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তার বিবেচনায় নতুন নবাবকে প্রতিমুহূর্তে মানুষের মনে এমন মনোভাব জাগিয়ে রাখতে হবে যাতে তারা মীরজাফরের শাসন শক্তি সম্পর্কে সতর্ক ও ভীত থাকে। এই ভীতি সৃষ্টির জন্যই সৈন্যরা সিরাজকে শিকল বাঁধা অবস্থায় সর্বসমক্ষে পায়ে হাঁটিয়ে জাফরগঞ্জের কয়েদখানায় নিয়ে আসবে। ক্লাইভের বিচারে সিরাজ-উ-দ্দৌলা যুদ্ধাপরাধী কয়েদী। কাজেই যারা তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে, তারা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হবে মৃত্যুদন্ড।
আলোচ্য অংশে যারা প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক ও চক্রান্তকারী, তাদেরই প্রধান হোতার মুখে দেশপ্রেমিক সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করে নাট্যকার নাট্যিক পরিহাস সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সিরাজ হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করতে পারবেন।
- মীরন চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- মৃত্যুর পূর্বে মোহাম্মদী বেগের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত সিরাজের আকুতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
নিরাবরণ – আবরণহীন। **খাটিয়া** – ক্ষুদ্রখাট; সাধারনত দড়ি দিয়ে ছাওয়া। **শাস্ত্রী** – সশস্ত্র প্রহরী।	**চতুর্থ অংক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য** সময় ঃ ২রা জুলাই ঃ স্থান ঃ জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা। [চরিত্রবৃন্দ ঃ মঞ্চে প্রবেশের পর্যায় অনুসারে কারাপ্রহরী, সিরাজ, মীরন, মোহাম্মদী বেগ।] (প্রায়ান্ধকার কারাকক্ষে সিরাজ-উ-দ্দৌলা। এক কোণে একটি নিরাবরণ দড়ির খাটিয়া।

নাতিদীর্ঘ – অনতি দীর্ঘ।
মোনাজাত – প্রার্থনা।
আলহামদুলিল্লাহ – সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র।
শয়তান – অধম প্রভৃতির প্রেরণদাতা; ইবলিশ।
দণ্ডাজ্ঞা – শাস্তির আদেশ।
পদস্থ – উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।
তামিল – মান্য, পালন।
ফিনকি – বেগে নির্গত সূক্ষ্ম রক্তধারা।
স্খলিত কণ্ঠে – নিস্তেজ কণ্ঠে।
লুণ্ঠিত – ভূমিতলে পতিত।
আকুঞ্চন – সঙ্কোচন।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ – আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই।
আক্ষেপ – হাত পা খিঁচুনি; মনস্তাপ।
নিস্পন্দ – স্পন্দন শূন্য; স্থির; নিঃসাড়।

অন্যপ্রান্তে একটি সোরাহী এবং পাত্র। সিরাজ অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন আর বসছেন। কারাকক্ষের বাইরে প্রহরারত শান্ত্রী। মীরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদীবেগের প্রবেশ। তার দু'হাত বুকে বাঁধা। ডান হাতে নাতি দীর্ঘ মোটা লাঠি। প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটু খানি আলো প্রতিফলিত হলো।)

সিরাজ ॥ (খাটিয়ায় উপবিষ্ট, আলো দেখে চমকে উঠে) কোথা থেকে আলো আসছে বুঝি প্রভাত হয়ে এলো।

(খাটিয়া থেকে উঠে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলো মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো মীরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদী বেগ।)

সিরাজ ॥ (মোনাজাতের ভঙ্গীতে হাত তুলে) এ প্রভাত শুভ হোক তোমার জন্যে লুৎফা। শুভ হোক আমার বাংলার জন্যে। নিশ্চিত হোক বাংলার প্রত্যেকটি নরনারী। আলহামদুলিল্লাহ।

মীরন ॥ আল্লার কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।

সিরাজ (চমকে উঠে) মীরন। তুমি এ সময়ে এখানে? আমাকে অনুগ্রহ দেখাতে এসেছো, না পীড়ন করতে?

মীরন ॥ তোমার অপরাধের জন্যে দন্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি।

সিরাজ ॥ নবাবের দন্ডাজ্ঞা?

মীরন ॥ বাংলার প্রজাসাধারণকে পীড়নের জন্যে দরবারের পদস্থ আমীর ওমরাহদের মর্যাদা হানির জন্যে বাংলাদেশে ইষ্ট ইন্ডয়া কোম্পানীর আইন সঙ্গত বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তুমি অপরাধী। নবাব জাফর আলী খান এই অপরাধের জন্যে তোমাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন।

সিরাজ ॥ মৃত্যুদন্ড? জাফর আলী খান স্বাক্ষর করেছেন? কই দেখি।

মীরন ॥ আসামীর সে অধিকার থাকে নাকি? (পেছনে ফিরে মোহাম্মদী বেগ)

মোহাম্মদী বেগ ॥ জনাব।

মীরন ॥ নবাবের হুকুম তামিল করো।

(সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মোহাম্মদী বেগ লাঠিটা মুঠো করে ধরে সিরাজের দিকে এগোতে লাগলো।)

সিরাজ ॥ প্রথমে মীরন তারপর মোহাম্মদী বেগ। মীরন তবু মীর জাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদী বেগ, তুমি আসছো আমাকে খুন করতে?

(মোহাম্মদী বেগ তেমনি এগোতে লাগলো। সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে)

সিরাজ॥ আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরী। কিন্তু, তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদী বেগ।

(মোহাম্মদী বেগ তবু এগোচ্ছে। সিরাজ আরও ভীত)

সিরাজ ॥ তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদী বেগ। অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো। আমার আব্বা আম্মা পুত্রস্নেহে তোমাকে পালন করেছেন। তাঁদেরই সন্তানের রক্তে সে স্নেহের ঋণ আঃ....

(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচন্ড আঘাত করলো। সিরাজ লুটিয়ে পড়লো। মোহাম্মদী বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে

		রক্ত বার হচ্ছে। ডান হাতের কনুই এবং বাঁহাতের তালুতে ভর দিয়ে সিরাজ কিছুটা মাথা তুললেন।)
	সিরাজ ॥	(স্খলিত কণ্ঠে) লুৎফা, খোদার কাছে শুকরিয়া এ পীড়ন তুমি দেখলে না।
		(মোহাম্মদী বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের লুণ্ঠিত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার পিছে পরপর কয়েকবার ছোরার আঘাত করলো। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আকুঞ্চন। মোহাম্মদী বেগ উঠে দাঁড়ালো।
	সিরাজ ॥	(ঈষৎ মাথা নাড়বার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু নিস্তেজ কণ্ঠে)
		লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্......
		(মোহাম্মদী বেগ লাথি মারলো। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের জীবন শেষ হলো। শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের মত নিস্পন্দ হয়ে গেলো।
	(যবনিকা)	

বস্তুসংক্ষেপ

জাফরাগঞ্জের কয়েদ খানার প্রায়ান্ধকার কক্ষে বন্দী নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা অস্থিরভাবে কখনও পায়চারী করছেন, কখনও দড়ির খাটিয়ায় বসছেন। এমন সময়েই কারাকক্ষে প্রথমে মীরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদী বেগ প্রবেশ করে। সেই মুহূর্তে খাটিয়ায় উপবিষ্ট নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ঘরে আলো প্রবেশ করতে দেখে চমকে উঠেন। প্রভাত হয়েছে মনে করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত তুলে সিরাজ সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে প্রশংসার জ্ঞাপন করেন। সহধর্মিনী লুৎফার জন্য এবং স্বদেশ বাংলার জন্য এই প্রভাত শুভ হোক বলে আশাবাদও উচ্চারণ করেন সিরাজ। কিন্তু মীরন সেই মুহূর্তেই সিরাজকে শয়তান আখ্যায়িত করে শেষবারের মত সৃষ্টিকর্তার কাছে মাফ চাইতে নির্দেশ দেয়। তৎক্ষণাৎ স্বপ্নভঙ্গ ঘটে সিরাজের। মীরনকে কারাকক্ষে দেখে চমকে উঠেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেন, মীরন অনুগ্রহ দেখাতে নাকি পীড়ন করতে এখানে এসেছে ? মীরন প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দেয় যে, সে অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা শোনাতেই এখানে উপস্থিত হয়েছে। সিরাজ এতে জিজ্ঞাসাসূচক বিস্ময় প্রকাশ করলে ক্ষমতার গর্বে অন্ধ কুচক্রী মীরন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে প্রজাপীড়নের জন্য, পদস্থ অমাত্যবর্গের মর্যাদাহানির জন্য ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের বৈধ অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্য এবং দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য সিরাজ অপরাধী। আর এই অপরাধসমুহের শাস্তি হিসেবেই নবাব জাফর আলী খান সিরাজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। সিরাজ নবাবের স্বাক্ষর করা ফরমান দেখতে চাইলে মীরন আসামীর অধিকারের অজুহাত তুলে এবং সঙ্গী মোহাম্মদী বেগকে নবাবের আদেশ কার্যকর করার আহ্বান জানিয়ে দ্রুত কারাকক্ষ থেকে প্রস্থান করে। প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোহাম্মদী বেগ লাঠিহাতে সিরাজের দিকে এগোতে থাকে। বিস্ময়ে বিমূঢ় সিরাজ মোহাম্মদী বেগের উদ্দেশে এই প্রশ্ন রাখেন যে, মীরন না হয় মীরজাফরের পুত্র, কিন্তু মোহাম্মদী বেগ কোন যোগ্যতায় সিরাজকে খুন করতে এসেছে? সিরাজের কথায় কান না দিয়ে মোহাম্মদী বেগ দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকলে সিরাজ ভয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন যে, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মোহাম্মদী বেগ যেন এমন কাজটি না করে। ভীত সন্ত্রস্ত্র সিরাজ মোহাম্মদী বেগকে স্মরণ করিয়ে দেন তার অতীত জীবনের কথা সিরাজের পিতা মাতার শৈশবে পুত্রস্নেহে লালন পালন করেছিলেন মোহাম্মদী বেগকে। কিন্তু ঘাতক মোহাম্মদী বেগম তাঁর কথা সমাপ্ত করতে না দিয়েই সিরাজের মাথায় লাঠির প্রচণ্ড আঘাত করে। ফিনকি দিয়ে রক্তধারা বয়ে যায়। আঘাতে মৃতপ্রায় সিরাজ বহুকষ্টে মাথা তুলে নিস্তেজ কণ্ঠে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান, সহধর্মিনী লুৎফাকে এই পীড়ন দেখতে হলো না বলে। এই অবস্থায় সিরাজের মৃত্যু নিশ্চিত করতে পাষণ্ড ঘাতক মোহাম্মদী বেগ খাপ থেকে ছোরা বের করে সিরাজের ভূমিতলে পতিত দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকবার ছুরিকাঘাত করে। সিরাজের দেহে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠলে মোহাম্মদী

বেগ উঠে দাঁড়ায়। 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' এই সুরা তেলওয়াৎরত অবস্থায় বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা জীবনাবসান ঘটে।

প্রয়োজনীয় নোট রাখুন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।' - কে কখন কার উদ্দেশ্যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছে?

২. 'আমি মৃত্যুর জন্য তৈরী।' কোন প্রকাশের ভূমিকা হিসেবে সিরাজ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

৩. সিরাজ হত্যাকান্ড বর্ণনা করুন।

৪. মীরন চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

৫. মোহাম্মদী বেগের উদ্দেশে সিরাজ যে নিষ্ফল আবেদন করেছিলেন তার পরিচয় দিন।

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন ঃ 'আমি মৃত্যুর জন্য তৈরী।' কোন প্রকাশের ভূমিকা হিসেবে সিরাজ সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন?

উত্তর ॥ ঘাতক মোহাম্মদী বেগ কারাকক্ষে বন্দী সিরাজের দিকে লাঠি হাতে এগিয়ে আসতে থাকলে সিরাজ যুগপৎ ভীতি ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন। মোহাম্মদী বেগের মত ব্যক্তি, যে শৈশব থেকে উপকার পেয়েছে সিরাজের পিতামাতার কাছ থেকে, সে সিরাজকে হত্যা করতে আসবে এটি তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তবু, ঘাতকের আচরণে ভীতিগ্রস্ত সিরাজ আসন্ন মৃত্যুর জন্য নিজের প্রস্তুতি কথা জানিয়ে মোহাম্মদী বেগের পাষাণ হৃদয়ে করুণা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় উদ্ধৃত সংলাপটি উচ্চারণ করেন। তিনি মোহাম্মদী বেগকে তার ফেলে আসা জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

শৈশবে অনাথ মোহাম্মদী বেগকে সন্তান স্নেহে লালন-পালন করেছিলেন সিরাজের পিতা-মাতা, ঐ স্নেহ ঋণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কৃতঘ্নদের কাতারে শামিল না হবার আহ্বান জানিয়ে সিরাজ মোহাম্মদী বেগের প্রাণের জন্য নিষ্ফল আহ্বান জানান।

প্রশ্ন ঃ মীরন চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

উত্তর ॥ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত প্রধান হোতাদের অন্যতম সহযোগী মীরন। মীরন সিপাহ সালার মীরজাফর আলী খাঁর চরিত্রভ্রষ্ট, কুচক্রী ও উচ্চাভিলাষী পুত্র। মীরন চরিত্র তার নৃশংস কর্মকান্ডের জন্য ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে স্থান করে নিয়েছে। আলোচ্য চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে মীরনের ভূমিকা সিরাজ হত্যা বাস্তবায়নের হোতা হিসেবে। সিরাজের মত দেশ ব্যক্তিত্বকে সরাসরি হত্যা করার সাহস ও মনোবল মীরনের নেই। এ জন্যেই ভাড়াটে খুনী মোহাম্মদী বেগকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগ করেছে মীরন। প্রায়ান্ধকার কারাকক্ষে ঘাতকসহ প্রবেশ করে মীরন বন্দী সিরাজকে নবাবের মিথ্যা দণ্ডাদেশ অবগত করেছে এবং 'শয়তান' সম্বোধন করে

সিরাজকে শেষবারের মত স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছে। সিরাজ মীর জাফরের স্বাক্ষর করা ফরমান দেখতে চাইলে আসামীর অধিকারের সীমাবদ্ধতার অজুহাত দেখিয়ে মীরন মিথ্যাকে আড়াল করতে চেয়েছে এবং শেষে ঘাতক মোহাম্মদী বেগকে নবাবের তথাকথিত হুকুম তামিল করার নির্দেশ দিয়েছে। লক্ষণীয় যে, কুচক্রী অথচ দুর্বল চিত্ত মীরন হত্যাকান্ড কার্যকর করার নির্দেশ দান করেই দ্রুত কারাকক্ষ থেকে প্রস্থান করেছে। নাট্যকার এমনভাবে এখানে মীরন চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন যাতে বোঝা যায়, কূট পরিকল্পনা প্রণয়নের সামর্থ্য থাকলেও, সিরাজ হত্যাকান্ডের মত ঘটনার সরাসরি বাস্তবায়নের শক্তি অথবা হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করার মানসিক দৃঢ়তা মীরন চরিত্রে অনুপস্থিত। আলোচ্য দৃশ্যে মীরন দুর্বলচিত্ত কুচক্রী এবং উচ্চভিলাষী রূপেই অঙ্কিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এলো।
২. মীরন তবু মীরজাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদী বেগ, তুমি আসছো আমাকে খুন করতে?
৩. অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো।

নমুনা উত্তর

কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এলো।

আলোচ্য সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত। সংলাপটি কারাবন্দী নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার স্বগতোক্তি।

জাফরাগঞ্জের প্রায়ান্ধকার কারাকক্ষে বন্দী সিরাজ বিনিদ্র সময় অতিবাহিত করছেন। এ সময়ে সিরাজের অলক্ষ্যে মীরন ও মোহাম্মদী বেগ কক্ষে প্রবেশ করে। তাদের প্রবেশ মাত্র কক্ষে কিছু আলো প্রতিফলিত হয়। দু:শ্চিন্তায় বিহ্বল সিরাজ আলো দেখে বিভ্রান্ত হন, তাঁর মনে হয় হয়তো প্রভাত হয়েছে। স্বগতোক্তির মাধ্যমে সিরাজের এই মনোভাবই আলোচ্য সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে প্রভাত নতুন দিনের আগমন বার্তা প্রকাশ করে। নতুন প্রভাত সহধর্মিনী লুৎফা ও বাংলার জন্য আশার বার্তাবহ হয়ে আবির্ভূত হবে এই আন্তরিক আশাবাদ লালন করেন বলেই সামান্য আলোক প্রক্ষেপণে সিরাজ বিভ্রান্ত হয়েছেন।

অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো।

বক্ষ্যমান সংলাপটি নাট্যকার সিকান্দার আবু জাফর রচিত 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে সংগ্রহীত হয়েছে। ভীতবিহ্বল কারাবন্দী সিরাজ ঘাতক মোহাম্মদী বেগ-এর উদ্দেশে আলোচ্য সংলাপটি উচ্চারণ করেছেন।

নিজের দরবারের অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে রাজ্যহারা সিরাজ আজ কারাবন্দী। ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা সিপাহসালার মীরজাফরের পুত্র মীরন অল্পক্ষণ আগে সিরাজের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জানিয়ে কারাকক্ষ থেকে প্রস্থান করেছে এবং প্রস্থানের পূর্বে তার সঙ্গে আগত ঘাতক মোহাম্মদী বেগকে দ্রুত দণ্ডাদেশ কার্যকর করার হুকুম করে গেছে। লাঠি হাতে পাষণ্ড মোহাম্মদী বেগ সিরাজের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে সিরাজ যুগপৎ ভীত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন। মীরন না হয় মীর জাফরের পুত্র, কিন্তু মোহাম্মদী বেগ কোন্ যোগ্যতায় সিরাজ হত্যায় উদ্যত হয়েছে। এই বিমূঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ভীতিও জাগে সিরাজের মনে। ক্রমে ধাতস্থ সিরাজ আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই মোহাম্মদী বেগের নির্দয় চিত্তে করুণা জাগাতে প্রয়াসী হন। তিনি আকুতি জানিয়ে মোহাম্মদী বেগকে তার অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে বলেন।

শৈশবে অনাথ মোহাম্মদী বেগকে সিরাজের পিতা-মাতা অপত্য স্নেহে লালন পালন করেছিলেন। মোহাম্মদী বেগের বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সিরাজ জননী আমেনা বেগম। সেই সব অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সিরাজ মোহাম্মদী বেগকে সিংস্র কৃতঘ্নদের কাতারে শামিল না হবার আহ্বান জানিয়েছেন উদ্ধৃত সংলাপটিতে। কিন্তু দয়াহীন ভাড়াটে ঘাতক মোহাম্মদী বেগ কর্ণপাত করেনি সিরাজের কথায়। মৃত্যুর পূর্বে সিরাজের ঐ আকুতির মধ্য দিয়ে নাট্যকার জীবনপিপাসু সিরাজ চরিত্রকে আলোকিত করেছেন।

পত্র লিখন

ইউনিট ৬

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- পত্র কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার পত্ররচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

মূলপাঠ

☞	মূল পাঠটি কয়েকবার পড়ুন ও বুঝবার চেষ্টা করুন। আপনার বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে চায়। এ ভাব বিনিময়ের কাজটি চলে কথার মাধ্যমে। কিন্তু যে মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই, সে যদি থাকে দূরে তবে তাকে চিঠি পত্র লিখতে হয়। কথা ও লেখা দুটো কাজই ভাষার। তবে প্রথমটি হচ্ছে ভাষার স্বাভাবিক রূপ দ্বিতীয়টি হচ্ছে লিখিত রূপ। একালে কেজো কথার চিঠিই বেশি। তবে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে যেখানে ব্যক্তিগত অনুভব উপলব্ধির সুযোগ বেশি তা চিরন্তন সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে যায়।

পৃথিবীতে কবে থেকে চিঠিপত্র লেখা শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে প্রয়োজনের তাগিদেই যে চিঠিপত্রের রচনা শুরু, তা অনুমান করা যায়। তবে ইতিহাসের নানা ঘটনায় চিঠিপত্রের উল্লেখ এবং প্রাচীনকালে কাব্য ও নাটকে চিঠিপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে অনুমান করা যায় চিঠিপত্র রচনার সূত্রপাত বেশ প্রাচীন কালেই।

চিঠিপত্র প্রেরণের যে ডাক ব্যবস্থা তা অবশ্য নিতান্তই আধুনিক কালের। অতীতকালে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সৈনিক, গোষ্ঠী নেতা বা সর্দার এদের মারফতে সরকারী ফরমান ইত্যাদি পাঠানো হত। প্রাচীন কাব্যে কপোত, হংস ইত্যাদির পায়ে বেঁধে পত্র পাঠানোর রীতির কথার উল্লেখ আছে। ডাকঘরের মাধ্যমে বর্তমানে চিঠিপত্র প্রেরণের যে বিশাল Net work পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত তা নিতান্তই আধুনিক কালের উদ্ভাবন।

সাধারণভাবে চিঠিপত্রকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ব্যক্তিগত পত্র (Personal letters)

২. সামাজিক পত্র (Social letters)

৩. ব্যবহারিক পত্র (Official letters)

৪. ব্যবসায়িক পত্র (Commercial/Business letter)

বিভিন্ন প্রকার পত্রের কাঠামোগত পার্থক্য আছে। ভাষাগত পার্থক্যও লক্ষ্য করবার মত। ব্যক্তিগত পত্রে নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশে নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অন্য তিন প্রকারের পত্রে ভাষাভঙ্গি প্রায় নির্দিষ্ট। তবে সব ধরনের চিঠিপত্রেই ভাষার সহজবোধ্যতা ও স্পষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

১. ব্যক্তিগত পত্র (Personal letters) ঃ ব্যক্তিগত বা নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে যে পত্র রচনা করা হয় তাই ব্যক্তিগত পত্র। পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে লেখা চিঠিপত্র ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। এ শ্রেণীর চিঠিপত্রে কখনও অনুভূতি উপলব্ধি, কখনও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনের কথা থাকে।

ব্যক্তিগত পত্র

ব্যক্তিগত বা নিজস্ব ব্যাপার নিয়ে লেখা পত্র। পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে লেখা চিঠিপত্র।

২. সামাজিক পত্র (Social letters) ঃ সামাজিক প্রয়োজনে যে চিঠিপত্র লেখা হয় তাই সামাজিক পত্র। সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি এ পর্যায়ের চিঠিপত্র।

সামাজিক পত্র

সমাজের প্রয়োজনে লেখা সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি।

৩. ব্যবহারিক পত্র (Official letters) ঃ অফিসের নানাবিধ কাজকর্মে আমাদের চিঠিপত্র লিখতে হয়। অফিসের কর্তাব্যক্তিদের নিকট নানা রকমের আবেদন-নিবেদন করে চিঠি লিখতে হয়। তাছাড়া চাকুরি, ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখতে হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রেও আমরা চিঠি লিখি। সংবাদপত্রে চিঠি লেখার উদ্দেশ্য সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট বিভাগে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কোন বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা সচেতনতা সৃষ্টির জন্যও সংবাদপত্রে আমরা চিঠি লিখি। এ ধরনের পত্রকেই বলে ব্যবহারিক পত্র।

ব্যবহারিক পত্র

ব্যবহারিক ও বৈষয়িক প্রয়োজনে লিখিত অফিসের বিভিন্ন প্রয়োজন, আবেদন নিবেদন, সংবাদপত্রে লিখিত চিঠি এ পর্যায়ে পড়ে।

৪. ব্যবসায়িক পত্র (Business letters) ঃ ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন চিঠিপত্র লেখা প্রয়োজন হয়। যেমন বিভিন্ন ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ, মালপত্রের সরবরাহের অর্ডার, লেন-দেন, চুক্তি ইত্যাদি ব্যবসা সংক্রান্ত সকল পত্র ব্যবসায়িক পত্র হিসাবে গণ্য।

ব্যবসায়িক পত্র

ব্যবসায়িক প্রয়োজনে লিখিত ক্রেতা বিক্রেতা সংক্রান্ত চিঠি, লেন-দেন, কোন দ্রব্যের অর্ডার প্রদান ইত্যাদি ব্যবসায়িক পত্র।

পাঠ ২

চিঠিপত্রের নিজস্ব আঙ্গিক বা কাঠামো আছে। এ আঙ্গিক বা কাঠামোকে অনুসরণ করলে তবেই চিঠি বা পত্র পূর্ণতা পায়। চিঠিপত্র একটি রেকর্ড বিশেষ। তাই প্রাপক ও প্রেরকের যোগসূত্র, তারিখ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কতিপয় শর্তপূরণ করতে হয়। প্রচলিত কাঠামোতে ৫টি অংশ থাকে। সেগুলো হচ্ছে–

১. নাম ও ঠিকানা
২. সম্ভাষণ
৩. মূলপত্র
৪. বিদায় সম্ভাষণ
৫. স্বাক্ষর

১. নাম ও ঠিকানা ঃ পত্রের ডান দিকে পত্রলেখকের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। প্রথমেই লেখকের ঠিকানা থাকবে এবং তার নিচেই থাকবে তারিখ। নিচে লেখকের ঠিকানাটি লক্ষ্য করুন–

পূর্বরাগ
১২৬/১ আজিমপুর
ঢাকা-১২০৫
১লা অক্টোবর ১৯৯৮

অন্য একটি উদাহরণ

গ্রাম রতনপুর
ডাক - শাহজাদপুর
জেলা - সিরাজগঞ্জ
১২ই জুন, ১৯৯৮

২. সম্ভাষণ ঃ যাকে উদ্দেশ্য করে পত্রটি লেখা হচ্ছে, প্রথমেই তাকে সম্ভাষণ জানাতে হয়। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্মান, মর্যাদা ও পত্র লেখকের সঙ্গে তার সম্পর্কের নিরিখে সম্ভাষণের ভাষা নির্ধারিত হয়। যেমন বয়সে বড় অথবা গুরুজনস্থানীয়কে যে ভাষায় সম্ভাষণ জানান হয়, বয়সে ছোট অথবা সমবয়স্ক অথবা বন্ধু বান্ধবকে অন্যভাষায় সম্ভাষণ জানাতে হয়। যেমন পিতা-মাতার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় আব্বা অথবা শ্রদ্ধেয় আম্মা, শ্রদ্ধাভাজনেষু, পরম শ্রদ্ধাভাজন বাবা অথবা পরম শ্রদ্ধাভাজন মা ইত্যাদি লেখা হয়। ছোটদের স্নেহাস্পদ, স্নেহভাজনেষু, বন্ধুকে পরম প্রিয় বন্ধু, বন্ধু বরেষু, প্রিয়, প্রিয়ভাজনেষু, প্রিয়বরেষু ইত্যাদি লেখা যায়।

মনে রাখতে হবে ভাষা পরিবর্তনশীল। চিঠিপত্রের ভাষাও বদলে যাচ্ছে। আগের দিনের মত সংস্কৃত অথবা আরবি শব্দবহুল বিশেষণ প্রয়োগ করা হয় না। অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য ত্যাগ করতে পারলে ভাষা হয় সাবলীল ও গতিশীল।

সম্ভাষণ লিখতে হয় চিঠির বাম কোণে। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন।

সম্ভাষণ

শ্রদ্ধাভাজনেষু

পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা

প্রিয় মহসিন

প্রিয় বান্ধবী

৩. মূলপত্র ঃ এটিই আসলে মূল অংশ। পত্র লেখক তাঁর বক্তব্য এখানে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে থাকেন। পত্র লেখক কেন এ পত্র লিখছেন তা এখানে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। একটি পত্রে যদি একাধিক বক্তব্য থাকে তবে সেগুলিকে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে লেখাই ভাল। ভাষা একদিকে হতে হয় সহজবোধ্য ও অন্য দিকে প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট। এলোমেলো কথা, অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্ভট প্রসঙ্গের আর্বিভাব মূল বক্তব্যকে হারিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাই আগেই পরিকল্পনা করে, সেভাবে পত্র রচনা করা উচিত।

৪. বিদায় সম্ভাষণ ঃ মূল চিঠি শেষ হয়ে গেলে ডান দিকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানাতে হয়। সেই সঙ্গে নিচে নাম স্বাক্ষর করতে হয়। বিদায়ী সম্ভাষণ পত্রটি যাকে লেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে পত্র লেখকের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে।

নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন

১. **বয়স্ক ও গুরুজনস্থানীয়দের ক্ষেত্রে** – ইতি, আপনার স্নেহভাজন, ইতি, আপনার স্নেহ ধন্য ইত্যাদি।

২. **বয়ঃ কনিষ্ঠ ও স্নেহভাজনদের ক্ষেত্রে** – ইতি, নিত্য শুভার্থী, ইতি, তোমার মঙ্গলপ্রার্থী, শুভাকাঙ্খী ইত্যাদি।

৩. **সম্পর্কহীন ও অপরিচিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে** - ইতি, বিনীত, ইতি, সালামান্তে ইত্যাদি।

৪. **বন্ধুদের ক্ষেত্রে** – ইতি, প্রিয় বান্ধব, ইতি প্রীতিমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ ইত্যাদি।

স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর চিঠি সর্বশেষ অংশ। বিদায়ী সম্ভাষণের পরে পত্রলেখককে স্বাক্ষর করতে হয়। পত্র লেখক তাঁর পূর্ণ নাম এখানে লিখতে পারেন অথবা ক্ষেত্রবিশেষে যে প্রচলিত মুদ্রাকৃতি নামও ব্যবহার করা যায়। পত্র লেখকের সঙ্গে পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে ব্যাপারটিও এক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হয়।

পত্রটি যেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পৌঁছায় এজন্য পত্র লেখককে আরও কিছু লিখতে হয়। তবে এটি পত্রের বাইরের রচনা। খাম বা এনভেলাপে ডান দিকে প্রাপকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ও বামে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। প্রাপকের ঠিকানায় পোষ্ট কোড নম্বরটি লেখা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে চিঠির কাঠামোটি লক্ষ্য করুন।

১. ঠিকানা
তারিখ

২. সম্ভাষণ

৩. মূলপত্র

৪. বিদায়ী সম্ভাষণ
৫. স্বাক্ষর

স্ট্যাম্প

প্রেরক	প্রাপক
নাম	নাম
ঠিকানা	ঠিকানা

১. ছোটভাইকে লেখাপড়ায় উপদেশ জানিয়ে দিয়ে একটি পত্র লিখুন।

ঢাকা
আজিমপুর
১২ নভেম্বর, ১৯৯৭

প্রিয় কাজল,

অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি তুমি সুস্থ আছ ও ভালভাবে লেখাপড়া করছো। তোমার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা প্রায় এসেই গেছে। নিশ্চয়ই খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। ছাত্রদের জন্য লেখাপড়াই একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ। সারাটি বছর যদি ভালভাবে লেখাপড়া না করে থাক তবে এখন শত মাথা কুটে মরলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। এজন্য পরীক্ষার আগে শুধু নয়, সারাটি বছরই মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা প্রয়োজন। অবশ্য আমি আশা করি তুমি তা করেছো।

এবারে তুমি নবম শ্রেণীতে উঠবে। নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা মিলেই কিন্তু এস এস সি পরীক্ষা হয়। সুতরাং বুঝতেই পারছো নবম শ্রেণীতে উঠেই তোমাকে এস এস সি ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। তাই এখন থেকেই তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছি। প্রথম থেকে সাবধান হলে কোন অসুবিধা হবে না। আর প্রতিটি বিষয়ে নির্ধারিত বইছাড়াও অন্য দু/একটি ভাল বইও দেখতে হবে। যাতে বিষয়ের ধারণা তোমার স্বচ্ছ হবে এবং প্রশ্নের উত্তর হবে সমৃদ্ধ।

মাঝে মাঝে তোমার লেখাপড়ার অগ্রগতি জানিয়ে চিঠি লিখো। আব্বা আম্মাকে আমার সালাম দিয়ো।

ইতি

তোমার ভাই
আরিফ

	স্ট্যাম্প
প্রেরক	প্রাপক
আরিফ	কাজল
১৮, স্টাফ কোয়ার্টার্স	প্রযত্নে- শরিফুর রহমান
আজিমপুর, ঢাকা	সাধুপাড়া, পাবনা।

২. পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র লিখুন।

কলেজ রোড
জয়পুরহাট
১লা জুলাই ১৯৯৬

প্রিয় জসিম,

অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। সেই সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার জন্য তোমাকে জানাচ্ছি অসংখ্য অভিনন্দন ও মোবারকবাদ।

তোমার ভাল ফলাফল কোনদিনই অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে তুমি যে অন্যান্য বন্ধুদের ছাড়িয়ে একেবারে মেধা তালিকার স্থান পাবে তা ভাবিনি। রাজশাহী বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকায় ৩নং স্থান অধিকার করে তুমি শুধু তোমার মুখই উজ্জ্বল করনি, আমাদের কলেজকে গৌরবান্বিত করেছো। আমাদের স্যার মহোদয়গণ তোমার ফলাফলে অত্যন্ত খুশি। আমরা যারা তোমার বন্ধু তারাও গর্ব অনুভব করছি। তোমাকে আরও একবার অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে। তখন তোমার ভবিষ্যৎ লেখাপড়া ও কর্ম পরিকল্পনা জেনে নিব।

ইতি

তোমার সুহৃদ
আফরোজ

ডাক টিকেট

প্রেরক	প্রাপক
আফরোজ	জসিম সরকার
কলেজ রোড	প্রযত্নে- কল্লোল ট্রেডার্স
জয়পুরহাট	রংপুর।

৩. পিতার কাছে টাকা চেয়ে একটি পত্র লিখুন।

রাজশাহী কলেজ হোস্টেল
ব্লক-এ
রুম নং - ৭
রাজশাহী
২০শে এপ্রিল ১৯৯৮

শ্রদ্ধেয় আব্বা,

আমার সালাম জানবেন ও মাকে জানাবেন। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। আমিও এখানে ভাল।

আগামী জুন মাসের শেষ দিকে আমাদের পরীক্ষা হবে। এ জন্য লেখাপড়ায় আমার ব্যস্ততা ভীষণ বেড়ে গেছে। তাই নিয়মিত চিঠি লিখতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আশা করি কিছু মনে করবেন না। পরীক্ষার জন্য জরুরি ভিত্তিতে দুটি নতুন বই কেনা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বই দুটোর দাম পড়বে ছয় শত টাকা। বই দুটোর জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই আমার চিঠি পেয়েই যদি ছয়শত টাকা কারও হাতে অথবা মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেন তবে খুব ভাল হয়। পরীক্ষার পরে মনে হয় কিছু দিনের জন্য আপনাদের কাছে যেতে পারবো। আমার জন্য দোয়া করবেন।

কল্লোল ও তনুকে আমার স্নেহ জানাবেন।

ইতি

আপনার স্নেহভাজন
শফিক রেজা

ডাক টিকেট

প্রেরক	প্রাপক
শফিক রেজা	জনাব মোঃ আহমেদুল কবির
রাজশাহী কলেজ হোস্টেল	গ্রাম- চৌবাড়ি
ব্লক- এ, রুম নং ৭	ডাকঘর- চৌবাড়ি
রাজশাহী	জেলা- খুলনা।

৪. হোস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে মায়ের কাছে একটি পত্র রচনা করুন।

ছাত্রী নিবাস
কুমিল্লা সরকারী কলেজ
২০/৩/৯৫

শ্রদ্ধেয় মা,

আমার অনেক সালাম জানবেন ও আব্বাকে জানাবেন। প্রায় এক মাস হলো মেয়েদের ছাত্রী নিবাসে আমি এসে উঠেছি। এস এস সি পর্যন্ত তোমাদের কাছে থেকেই পড়েছি তাই একা থাকার অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে এখানেও আমি একা নাই। আমরা দেড় শত ছাত্রী একই হোস্টেলে থাকি। এখানকার জীবনটা বাড়ির জীবনের মত নয়- একটু অন্যরকম। তবে সেটাও মন্দ নয়।

এখানে আমার জীবনটা কেমন ছকে বাঁধা- তোমাকে একটু বলি। আমাদের কলেজে সকাল আটটা থেকেই ক্লাশ শুরু হয়ে যায়। তাই ছ'টার মধ্যে বিছানা ছেড়ে না উঠলে ক্লাশে ঠিক সময়মত উপস্থিত হওয়া কঠিন হয়ে যায়। হোস্টেল থেকে ক্লাশ কক্ষগুলো খুব কাছে। যেতে পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগে। দুপুর একটায় টিফিন হয়। আমরা হোস্টেলে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিই। আড়াইটায় শুরু হয় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ- চারটা পর্যন্ত চলে। মাঝে মাঝে কলেজে বিতর্ক সভা হয়। সেদিন আর এ নিয়ম থাকে না।

যেদিন হোস্টেলে এসে প্রথম উঠলাম কেউ চেনা ছিল না। আর আজ সবাই চেনা। মনে হয় একটা বিরাট পরিবারের যেন সদস্য আমরা সবাই। আমরা ভালই আছি। একটু আধটু ঝগড়া ঝাঁটি মন কষাকষি যে না হয়, তা নয়। কিন্তু অন্যের প্রতি মমত্ববোধও কত বেশি তা বুঝতে পারি কোন কোন ঘটনা থেকে। কদিন আগে একটি মেয়ের বেশ জ্বর হয়েছিল। কিছুতেই ভাল হচ্ছিল না। কয়েকদিন ধরে আমাদের বড় আপারা দিন রাত জেগে কিভাবে যে তার সেবা শুশ্রুষা করলেন তার তুলনা হয় না। মেয়েটি এখন সেরে উঠেছে।

আমাদের হোস্টেলে সুপার আপাটিও বেশ। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় এসে আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে যান। সব কিছু মিলিয়ে হোস্টেল জীবন ভালই কাটছে। তুমি বিন্দুমাত্র দুঃশ্চিন্তা করো না। আমি ভালভাবে লেখাপড়া করে যাচ্ছি। আমার জন্য দোয়া কর।

সুমি, অমিকে আমার স্নেহাশীষ দিও।

ইতি
ফারজানা

	ডাকটিকেট
প্রেরক	প্রাপক
ফারজানা	মা
ছাত্রীনিবাস	প্রযত্নে- ইসমাইল হোসেন
কুমিল্লা সরকারী কলেজ	দাউদকান্দি
কুমিল্লা।	কুমিল্লা।

৫. আপনার জীবনের লক্ষ্য জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

কর্ণফুলি হাউজ
চট্টগ্রাম
১৭/০৬/৯৮

প্রিয় রফিক,

অনেক শুভেচ্ছা নিও। গতকাল তোমার চিঠিটা পেয়েছি।

চিঠিতে তুমি একটি গুরুতর প্রশ্ন করেছো– আমার জীবনের লক্ষ্য কি? হ্যা প্রশ্নটি অত্যন্ত সঙ্গত। কিছুদিন পরেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট হয়ে যাবে আর আমাদের ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে ভবিষ্যত উচ্চ শিক্ষার জন্য। তুমি জান, এস এস সি তে আমার রেজাল্ট বেশ ভাল হয়েছিল। এবারও অনুরূপ রেজাল্ট হবে বলে আশা রাখি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, জীববিজ্ঞানকে আমি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রেখেছিলাম ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। বন্ধু, আমি আসলে এমবি.বি.এস পড়তে চাই, ডাক্তার হতে চাই। এর কারণ দুটি। প্রথমত, ডাক্তার হতে পারলে চাকুরির জন্য কারো উমেদার হতে হবে না। নিজে নিজের পথ তৈরি করে নেওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত এই একটি পেশা যা দিয়ে মানুষের সেবা করা যায়। একটি স্মৃতির কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুব ছোট বেলায়, যখন আমি ক্লাশ থ্রির ছাত্র তখন এক মফস্বল শহরে আমরা ছিলাম। আমার ক্লাশের এক বন্ধু সে সময় বেশ কিছুদিন রোগ ভোগ করে মারা যায়। সেদিন যে কি দুঃখ লেগেছিল আমাদের সবার। পরে জেনেছিলাম ছেলেটির বাবা ছিল খুব দরিদ্র ডাক্তার পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। সেই দুঃখস্মৃতি আজও আমার মানস পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রিয় বন্ধু, আমি উচ্চভিলাষী নই। তবে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।

তোমার আব্বা, আম্মাকে আমার সালাম দিও। তোমার ছোট ভাইবোনদের স্নেহ জানিও। তোমার কুশল প্রাপ্তির অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি
আজাদ রহমান

ডাক টিকেট

প্রেরক	প্রাপক
আজাদ রহমান	আহমেদ রফিক
কর্ণফুলি হাউজ	গ্রাম ও ডাক - শ্রীফলতলা
চট্টগ্রাম।	জেলা- মানিজগঞ্জ।

ব্যবহারিক

নৈমিত্তিক ছুটির আবেদনপত্র।

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
শাহজাদপুর গার্লস হাই স্কুল
শাহজাদপুর।

বিষয় ঃ ২ দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন।

মহোদয়,
সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমি আগামী ৬ ও ৭ই মার্চ ব্যক্তিগত কারণে স্কুলে উপস্থিত থাকতে পারবো না। উক্ত দুই দিন আমাকে নৈমিত্তিক ছুটি প্রদানের আবেদন জানাচ্ছি।

পরিশেষে প্রার্থনা, আমাকে ঐ দুই দিন ছুটি দিয়ে বাধিত করবেন।

আপনার অনুগত

শাহজাদপুর
১৮ এপ্রিল ১৯৯৮

নাহার বানু
সহকারী শিক্ষিকা
শাহজাদপুর গার্লস হাইস্কুল।

একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাব রক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

বরাবর
জেনারেল ম্যানেজার
সিটি বীমা কর্পোরেশন
মতিঝিল, ঢাকা।

বিষয় ঃ হিসাব রক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

জনাব
সবিনয়ে জানাচ্ছি যে গত ১৮ই জুলাই 'দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানতে পারলাম যে আপনার প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসাব রক্ষক প্রয়োজন। এ পদের একজন প্রার্থী হিসাবে আমি আবেদনপত্রটি পাঠাচ্ছি। আমি উল্লেখিত পদের জন্য একজন যোগ্য প্রার্থী। আমার শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতাসহ আমার পূর্ণ জীবন তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. পূর্ণ নাম ঃ নজরুল ইসলাম
২. পিতার নাম ঃ নুরুল ইসলাম
৩. ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাক - নিমতলী, জেলা- নরসিংদী
৪. বয়স ঃ ২২ বছর (জন্ম তারিখ ১লা জানুয়ারি ১৯৭৪)
৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

এস এস সি	ঢাকা বোর্ড	দ্বিতীয় বিভাগ	১৯৯২
এইচ এস সি	ঢাকা বোর্ড	তৃতীয় বিভাগ	১৯৯৪
বি.কম	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	দ্বিতীয় বিভাগ	১৯৯৬

৬. অভিজ্ঞতা ঃ শহীদ সিদ্দিকী বিদ্যালয় ফরিদাবাদ, ঢাকায় ১ বছর যাবত সহকারী হিসাবরক্ষক পদে কর্মরত আছি।

উপরি-উক্ত তথ্যের আলোকে আমাকে নিয়োগ প্রদান করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিনীত

নরসিংদী
২৩শে জুন, ১৯৯৮

নজরুল ইসলাম

সংযুক্তি
১. সনদপত্র ৩টি
২. প্রশংসাপত্র ২টি
৩. নাগরিকত্ব প্রমানপত্র- ১টি

একজন সহকারী শিক্ষকের পদে আবেদন।

বরাবর
সভাপতি
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি
মালতিডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়
গাজীপুর।

বিষয় ঃ সহকারী শিক্ষক পদে আবেদন।

মহোদয়,
সবিনয়ে জানাচ্ছি যে গত ১৮ই জুলাই,৯৮ 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পেরেছি যে আপনার স্কুলে ২ জন সহকারী শিক্ষক প্রয়োজন। আমি উক্ত একটি পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমার জীবনতথ্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ নিম্নে প্রদান করা হল।

১. পূর্ণ নাম ঃ শাহনাজ পারভীন
২. পিতার নাম ঃ ইশতিয়াক জাফর
৩. ঠিকানা ঃ গ্রাম- ও ডাক- গোপালপুর, জেলা- টাঙ্গাইল।
৪. জন্ম তারিখ ঃ ২ রা মার্চ ১৯৭৪
৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

পরীক্ষা	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	বিভাগ/শ্রেণী	বছর
এস এস সি	রাজশাহী বোর্ড	প্রথম বিভাগ	১৯৯০
এইচ এস সি	রাজশাহী বোর্ড	প্রথম বিভাগ	১৯৯২
বি.এ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	দ্বিতীয় বিভাগ	১৯৯৪
বিএড	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	প্রথম শ্রেণী	১৯৯৬

৬. অভিজ্ঞতা ঃ আমি একটি বেসরকারী প্রাইমারি স্কুলে ১ বছর যাবত শিক্ষকতা করছি।

উপরি-উক্ত তথ্যের আলোকে আমাকে আপনার বিদ্যায়তনে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ করলে বিশেষ বাধিত হব।

নিবেদক

গোপালপুর
২৭শে জুলাই ১৯৯৮

শাহনাজ পারভীন

ডাকঘর স্থাপনের জন্য পত্রিকায় চিঠি

সম্পাদক
দৈনিক জাগরণ
ঢাকা।

জনাব,
এ পত্রের সঙ্গে প্রেরিত পত্রটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় পাঠকদের কলামে প্রকাশ করলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হব।

বিনীত

১০ জনু, ১৯৯৮

আব্দুল্লাহ ফারুক
ফুলতলি
খুলনা

সম্পাদক
দৈনিক জাগরণ
ঢাকা।

জনাব,
আমাদের ফুলতলি গ্রাম খুলনা জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। এখানে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও একটি হাইস্কুল আছে। এখানে সপ্তাহে দুই দিন বড় হাট বসে ও প্রতিদিন দৈনিক বাজার বসে। এখানের বহুলোক দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিদেশে চাকুরি করেন। তাঁরা প্রতিনিয়ত চিঠিপত্র লেখেন ও টাকা পয়সা পাঠান। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে কাছের ডাকঘরটি এখান থেকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ফলে ডাক যোগাযোগের কোন সুবিধাই আমরা পাইনা। এজন্য আমাদের গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপনের আবেদন জানাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে বলে আমরা আশা করি।

ফুলতলি
১০ জুন ১৯৯৮

ফুলতলি গ্রামবাসীর পক্ষে
আব্দুল্লাহ ফারুক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে আবেদন।

বরাবর
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা।

বিষয় ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের আবেদন।

জনাব,
বিনীত ভাবে জানাচ্ছি যে, ১৯শে মে তারিখের 'দৈনিক মুক্তকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পেরেছি যে আপনার অধিদপ্তর থেকে কিছু সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষকের পদ পূরণ করা হবে। আমি উক্ত একটি পদে নিয়োগ লাভের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আমার জীবনবৃত্তান্ত আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করছি।

১. পূর্ণ নাম ঃ মনজুর কাদের
২. পিতার নাম ঃ রওশন আলী
৩. ঠিকানা ঃ গ্রাম ও ডাক- মহারাজপুর, জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৪. জন্ম তারিখ ঃ ১লা মার্চ ১৯৭৬
৫. শিক্ষগত যোগ্যতা ঃ

পরীক্ষার নাম	বিভাগ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	সাল
এস এস সি	দ্বিতীয়	যশোর বোর্ড	১৯৯২
এইচ এস সি	দ্বিতীয়	যশোর বোর্ড	১৯৯৪
সি.এড	দ্বিতীয়	যশোর বোর্ড	১৯৯৫

৬. অভিজ্ঞতা ঃ বর্তমানে একটি বেসরকারী বিদ্যালয়ে কর্মরত।

উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে আমাকে নিয়োগ প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানচ্ছি।

বিনীত নিবেদক

মহারাজপুর (মনজুর কাদের)
২৩শে মে ১৯৯৮

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ

বরাবর

সম্পাদক
নবকণ্ঠ
সোনার গাঁ রোড, ঢাকা।

মহোদয়,
আপনার পত্রিকায় ১২.১২.৯৭ তারিখে প্রকাশিত ‘চেয়ারম্যানের কীর্তি’ শিরোনামে একটি বানোয়াট সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। আমি এ সংবাদটির প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠালাম। এটি অনতিবিলম্বে প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।

নিবেদক,

তারিক আজিজ
বেগমগঞ্জ
নোয়াখালী

মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ

১২.১২.৯৭ তারিখে দৈনিক মুক্তকণ্ঠে “চেয়ারম্যানের কীর্তি” শিরোনামে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত খবরটি অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বেগমগঞ্জ ইউনিয়নে অর্থ আত্মসাতের কোন ঘটনায় চেয়ারম্যান জড়িত নয়। যে প্রকল্পের কথা সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে তা যথাসময়ে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে একটি উপদেষ্টা কমিটি। সুতরাং চেয়ারম্যানকে জড়িত করে মিথ্যা রটনা যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা স্পষ্ট তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আসলে এলাকায় চেয়ারম্যান হিসাবে আমার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এ হেন বানোয়াট সংবাদ পরিবেশনে করেছেন। আশা করি মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংবাদদাতা ও সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।

তারিক আজিজ
চেয়ারম্যান
বেগমগঞ্জ ইউনিয়ন
নোয়াখালি।

চিকিৎসক দল পাঠানোর জন্য খবরের কাগজে একটি পত্র

সম্পাদক
দৈনিক বাংলাদেশ

ঢাকা।

জনাব,
সঙ্গের আবেদনটি আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় পাঠকের কলামে প্রকাশ করার জন্য বিনীতি আবেদন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদসহ

মোবারক আলী
মনিরামপুর
পাবনা।

চিকিৎসক দল প্রেরণ করুন

মনিরামপুর চলন বিল সংলগ্ন একটি গ্রাম। এবারের বন্যায় খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে। এখন বন্যার পানি নেমে গেছে বটে, তবে ধ্বংসলীলার চিহ্ন রেখেছে ব্যাপকভাবে। মরার উপর খাঁড়ার ঘা এর মত বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর পরই এলাকায় ব্যাপক ডাইরিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগের প্রকোপ শুরু হয়েছে। প্রতি বাড়িতে এ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। এ রোগ মহামারী রূপ নেওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এজন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও অচিরে এলাকাটিকে উপদ্রুপ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসকদল ও ওষুধপত্র প্রেরণের বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

বিশ্বস্ত,

২০.০৯.৯৮

মোবারক আলী
মনিরামপুর, পাবনা।

১. কলেজে নতুন অধ্যক্ষের যোগদান উপলক্ষে অভিনন্দন পত্র।

রাজশাহী সরকারী কলেজে
নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ড. আবুল হোসেনের শুভাগমন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন

হে শিক্ষাবিদ,

অজস্র আলোর ঝর্ণাধারার মত তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি আজ আমাদের আলোকিত করেছে। শিক্ষাব্রতীর চলার যোজন পথ অতিক্রম করে তুমি এসেছো আমাদের মাঝে দেশের অন্যতম ঐতিহ্যমন্ডিত বিদ্যাপীঠ রাজশাহী কলেজে। তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করো।

হে শিক্ষাগুরু,

দীর্ঘদিন আমাদের কলেজে কোন অধ্যক্ষ ছিল না। তুমি এসেছো সেই স্থান পূর্ণ করতে। সেনাপতির অভাবে যেমন সেনা বাহিনী দিকভ্রান্ত হয়, তেমিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সঠিক নেতৃত্ব না পেলে সমগ্র কর্মকান্ড হয়ে পড়ে নির্জীব প্রাণহীন ও শৃঙ্ক্ষহীন। আশা করি তুমি আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনবে কর্মচাঞ্চল্য, স্পৃহা, আনন্দ ও জীবনের উচ্ছলতা। তোমার কুশলী হাতের ছোঁয়ায় আবার জেগে উঠুক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। লেখাপড়া শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধুলা, বিতর্ক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সর্বক্ষেত্রে আমরা তোমার নেতৃত্বে আবার বিপুলভাবে এগিয়ে যেতে চাই।

পরম সুহৃদ,

তারুণ্যের প্রগলভায় আমরা অনেক কিছুই বলে ফেলেছি। যা বলা উচিত নয়। আনন্দে উদ্ভাসিত আমরা আজ কিছুটা বাঁধনহারা হয়তোবা হয়ে পড়েছি। আমাদের প্রগলভতা তুমি ক্ষমা করে দিও। তোমার স্নেহস্পর্শে আমরা সঞ্জীবিত হতে চাই। তোমার নেতৃত্ব আমাদের জীবনে নিয়ে আসুক নব চেতনা সামনে চলার অফুরন্ত প্রেরণা।

গুণমুগ্ধ

রাজশাহী — রাজশাহী সরকারী কলেজের
২.২.৯৫ — ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

২. কলেজে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে একটি মানপত্র

এন এস কলেজ, নাটোরের একাদশ শ্রেণীর নবাগত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে অভিনন্দনবাণী

হে নবীন শিক্ষার্থীবন্ধুরা,

আমাদের ঐতিহ্যবাহী এই কলেজে তোমাদের আগমনকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। জীবনের সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বারে তোমারা উপনীত হয়েছ। সুদীর্ঘ দশটি বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে তোমরা উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে আজ এসে পৌঁছেছো। তোমাদের আজ তাই অভিনন্দন জানাচ্ছি। সতীর্থের উষ্ণতায় হৃদয়পটে আজ বরণ করে নিচ্ছি।

হে নবীন সাধক,

তোমার সার্থকতা হবে একদিন এ বিদ্যাপীঠের ঐতিহ্য। তাই প্রথম দিনেই তোমার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চাই। কলেজ জীবন অবশ্যই আনন্দের ও উচ্ছাসের। তবে সেই দায়িত্বেরও। এ দায়িত্ব তোমার নিজের দায়িত্ব। তোমার নিজের দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। শুধু স্বপ্ন দেখলে হবে না- মানুষ হবার স্বপ্নকে তোমার বাস্তবায়িত করতে হবে।

হে চির তরুণ,

তারুণ্যের দীপ্তিতে তোমরা উজ্জ্বল। তোমাদের এ তারুণ্যের শক্তি তোমাদের শিক্ষা ও উন্নত হবার প্রেরণা অনির্বাণ হোক- এটাই আমাদের কামনা। তোমাদের প্রতিষ্ঠানকে তোমরা ভালবাস,তোমার সহযাত্রী নবীন ও প্রবীণ সবাইকে ভালবাস। একই সূত্রে গ্রথিত হোক আমাদের জীবনধারা।

পরিশেষে কামনা করি তোমাদের জীবন হোক মঙ্গলময় ও শান্তিময়। তোমাদের প্রীতির পরশে ধন্য- একান্ত আপন জন।

তোমাদের প্রীতিমুগ্ধ

এন.এস কলেজ, নাটোর
২০,৭.৯৭

জাহিদ হাসান মিন্টু
সাধারণ সম্পদক
ছাত্র সংসদ।

৩. কলেজের একজন প্রবীন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে একটি একটি মানপত্র

কুষ্টিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক
আব্দুল খালেকের বিদায়ে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে বিদায়ী সুহৃদ,

জীবনের কোন এক শুভলগ্নে তোমার কাছাকাছি এসেছিলাম। তুমি আপন গুণে আমাদের আপন করে নিয়েছিলে। শিক্ষার্থী যে শিক্ষকের এত কাছের মানুষ হতে পারে- আমরা সেদিনই বুঝেছিলাম। কর্তব্যের গুরুভার বহন করে, শিক্ষার্থী ও তার সমস্যাকে বুঝবার চেষ্টা তোমার মধ্যে দেখেছিলাম। সেদিনই তোমাকে মনে মনে জানিয়েছিলাম অসংখ্য প্রণিপাত।

হে শিক্ষাব্রতী,

তোমার কর্ম ও চেতনা আমরা ধরে রাখতে পারব কিনা জানিনা। বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে তোমার যে সরস সাহিত্যবোধ তা চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। জীবনের কঠিন সংগ্রামকেও কত সহজে ও সাবলীলভাবে তুমি অতিক্রম করেছো। আমাদেরও চোখকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছো। মাতৃভাষাকে যত ভালবাসি, সাহিত্যকে যত আপন করে নিয়েছি- সে শুধু তোমার অধ্যাপনা ও সান্নিধ্যের কারণে।

হে বিদায়ী গুরু,

এক সময় দিনের সব চঞ্চলতা থেমে যায় আসে সন্ধ্যা-ঘন কালো রাত্রি। মানুষের জীবনও তেমন। জীবনের সব লেনা-দেনা এক সময় শেষ হয়ে যায়। বাজে বিদায়ের ঘন্টা। এই অলঙ্ঘিত নিয়মের ধারাবাহিকতায়ই তোমার আজ বিদায়ের পালা।

সাহিত্যব্রতীর জীবন চর্চা হয়তো একটু অন্যরকমই হয়। তুমি আমাদের কাছে না থাকলেও মনে মনে জানবো তুমি আছে আমাদের কাছাকাছি হৃদয়ের গভীরতার গভীরে।

শেষে কামনা করি তোমার মঙ্গলময়, সুস্থ জীবন। তোমার অবসর জীবন হয়ে উঠুক শেষ বিকেলের আলোর মত শান্ত ও শ্রীময়।

কুষ্টিয়া কলেজ
১২.১.৯৮

বেদনাবিধুর
তোমার ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

৩. আপনার কলেজে ক্রীড়ানুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র রচনা করুন।

জনাব,

আগামী ২৭শে জানুয়ারি ১৯৯৮ কলেজ মাঠে, সকাল ৯টায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুরু সূচনা হবে। জেলা প্রশাসক জনাব জাহিদুল করিম প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি।

অনীক মাহমুদ
২০শে জানুয়ারি ১৯৯৮ ক্রীড়া সম্পাদক
চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ
চট্টগ্রাম।

২. নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা করুন।

জনাব,

আগামী **১১**ই জ্যেষ্ঠ, সন্ধ্যা সাতটায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলেজ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কলেজের অধ্যক্ষ জনাব রেজাউল করিম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব রওশন জামিল।

অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি।

রাজিয়া সুলতানা
ইডেন গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদ সম্পাদিকা, সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪

কোন প্রতিষ্ঠানের সভা আহ্বান করে একটি বিজ্ঞপ্তি রচনা করুন।

মতিপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি
মতিপুর, বগুড়া

তারিখ ২৬-৬-৯৬

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১লা জুলাই ১৯৯৬ বিকাল ৩টায় সমিতির কার্যালয়ে, সমিতির কার্যকরী সংসদের সদস্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সকল সদস্যকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

সাদিক মাহবুব
সম্পাদক
মতিপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি
বগুড়া।

আলোচ্য সূচি
১. পূর্ববর্তী সভার কার্যাবিবরণী অনুমোদন।
২. অসহায়দের ঋণদান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৩. বেকারদের কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে আলোচনা।
৪. বিবিধ।

৪. কলেজে ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের জন্য মূল্য তালিকা চেয়ে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র লিখুন।

বরিশাল বি.এম কলেজ
বরিশাল

প্রধান কর্মকর্তা
ক্রীড়া সম্ভার
স্টেডিয়াম মার্কেট
ঢাকা।

মহোদয়,
সম্প্রতি বি.এম কলেজের ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু ক্রীড়াসামগ্রী ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা প্রধানত শীতকালীন খেলাধুলা ক্রিকেট, হকি, বাস্কেট বল, লন টেনিস ও ব্যাডমিন্টণের পূর্ণ সেট কিনতে ইচ্ছুক। এজন্য ঐ সব সামগ্রীর একটি মূল্যতালিকা নিম্নঠিকানায় অনতিবিলম্বে পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত,

আজাদ রহমান
সম্পদাক ক্রীড়া বিভাগ
বরিশাল বি.এম কলেজ
ছাত্র সংসদ
বরিশাল।

ডাকটিকেট

প্রেরক	প্রাপক
আজাদ রহমান	প্রধান কর্মকর্তা
সম্পাদক ক্রীড়া বিভাগ	ক্রীড়া সম্ভার
বরিশাল বি.এম কলেজ	স্টেডিয়াম মার্কেট
বরিশাল	ঢাকা।

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন।

বরাবর
মহাপরিচালক
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয় ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন।

জনাব,
সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, 'আলোকদিয়া' টাঙ্গাইল জেলার একটি গন্ডগ্রাম। যমুনা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটি চর এলাকা। এখানের জনসাধারণ খুবই দরিদ্র। গ্রামের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কোন শহরেরও সহজ যোগাযোগ নাই। নাম 'আলোকদিয়া' হলেও এখানে শিক্ষার কোন আলো এখনও পৌঁছেনি। নিকটবর্তী প্রাইমারী স্কুলটি এখান থেকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। তাই এখানে শিশুরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এলাকার লোকজনও গ্রামের শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি একজন ধনী ও সমাজসেবী স্কুলের জন্য এক খন্ড জমিদান করেছেন। যদি আপনার অধিদপ্তর থেকে স্কুল ঘর তৈরির জন্য অনুদান প্রদান করা হয় তবে সহজেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
পরিশেষে প্রার্থনা আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে ও আর্থিক অনুদান দিয়ে শিক্ষা বিস্তারে আপনারা মহতী অবদান রাখবেন।

নিবেদক

মধুপুর
২০.১.৯৮

আবুবকর সিদ্দিক
মধুপুর, টাঙ্গাইল।

কলেজ থেকে ছাত্রদের জন্য শিক্ষাসফরের অনুমতি প্রদানের আবেদন।

বরাবর
অধ্যক্ষ
শাহ নিয়ামতুল্লাহ কলেজ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

বিষয় ঃ শিক্ষা সফরে প্রেরণের আবেদন।

মহোদয়,
আমরা দ্বিতীয় বর্ষ বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র। ডিসেম্বর মাসে শীতকালীন অবকাশে কলেজ ১০ দিন বন্ধ থাকবে। ঐ সময়ে আমাদের শিক্ষা সফরে চট্টগ্রামে পাঠানোর জন্য আবেদন জানাচ্ছি। চট্টগ্রাম একাধারে শিল্প ও বাণিজ্য নগরী। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই দেশের প্রধান আমদানী রফতানি হয়ে থাকে। বাণিজ্যে বিভাগের ছাত্র হিসাবে তাই আমাদের সরেজমিনে মিল কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা সফরের মাধ্যমে আমাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবতার ছোঁয়া পেয়ে সঠিক জ্ঞানে পরিণত হতে পারে। তাই কলেজের আর্থিক সহায়তা ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের শিক্ষা সফরে পাঠানোর জন্য সবিনয় আবেদন জানাচ্ছি।
পরিশেষে প্রার্থনা করি আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে শিক্ষা সফরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

বিনীত

শাহ নিয়ামতুল্লাহ কলেজ
২০.১০.৯৮

আব্দুর রশীদ
দ্বিতীয় বর্ষ বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদের পক্ষে

বাণিজ্যিক পত্র

কোন পুস্তক প্রকাশককে কিছু বই আপনাকে সরবরাহ করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখুন।

গ্রাম - খড়িয়া
ডাক - খড়িয়া
জেলা - নরসিংদি
২৫/১০/৯৭

কর্মাধ্যক্ষ
মিতা পাবলিশার্স
৩৮/৩ বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০

জনাব,

জরুরি ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তালিকার বইসমূহ সংগ্রহ করে আমার ঠিকানায় ভি.পি.পি. যোগে পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

অগ্রিম হিসেবে এক শত টাকা পাঠানো হল।

বিশ্বস্ত,

মমতাজ বেগম

বইয়ের তালিকা

১. শেষের কবিতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১ কপি
২. রক্তাক্ত প্রান্তর - মুনীর চৌধুরী - ১ কপি
৩. লাল সালু - সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ - ১ কপি

২. কলেজ লাইব্রেরীতে পুস্তক সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে প্রকাশককে একটি পত্র লিখুন।

শরীয়তপুর কলেজ
ডাক- শরীয়তপুর
জেলা- শরীয়তপুর
১৫.৩.৯৮

মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ
প্রগতি প্রকাশনী
বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০।

মহোদয়,
আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ আমাদের কলেজ লাইব্রেরী সরবরাহ করার জন্য অর্ডার পাঠালাম। ভি.পি.পি যোগে যথাসম্ভব দ্রুত বইগুলো অধ্যক্ষ বরাবর পাঠাবেন। ২ মে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ের একটি দল আমাদের কলেজ লাইব্রেরী পরিদর্শন করবেন। তার পূর্বেই বইগুলো প্রয়োজন। এর আগেও আপনারা যথাসময়ে পুস্তক সরবরাহ করেছেন ও উপযুক্ত হারে কমিশন প্রদান করেছেন। এবারও আমরা আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাব বলে আশা করছি। প্রেরিত পুস্তকের মূল্য যেন দশ হাজার টাকা বেশি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

পাঁচ শত টাকা মূল্যবাবদ অগ্রীম পাঠালাম। বই সরবরাহের এক মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করা হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

মোঃ হাসান ইমাম জাহিদ
গ্রন্থাগারিক
শরীয়তপুর কলেজ, শরীয়তপুর।

পুস্তকের তালিকা

১. জীববিজ্ঞান	ঃ ড. রাজীব, ২০ কপি
২. অর্থনীতির রূপরেখা	ঃ ড. জামান, ২০ কপি
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	ঃ আহমদ কবির, ২০ কপি
৪. রচনাবোধ	ঃ জামিলুর রেজা, ২০ কপি

৪. পত্রিকার এজেন্সি প্রার্থনা করে একটি পত্র লিখুন।

মেসার্স আরিফ এ্যান্ড ব্রাদার্স
প্রখ্যাত পত্র পত্রিকার এজেন্ট
সিরাজগঞ্জ বাজার, সিরাজগঞ্জ

সূত্র .... তারিখ ১.৫.৯৮

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আলোর পথে, আমিন ভবন
মতিঝিল, ঢাকা।

মহোদয়
আপনাদের প্রকাশিত ও পরিচালিত "আলোর পথে" দৈনিক পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমি পত্রিকাটির স্থানীয় এজেন্ট হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।
আমার প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ পনের বছরের পুরাতন। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঢাকা থেকে প্রকাশিত সকল জাতীয় দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি এ জেলা শহরের বাজারজাত করে আসছি। আমার অভিজ্ঞতাজাত অনুমান থেকে বলতে পারি আমাকে 'আলোর পথে' পত্রিকাটির এজেন্সি প্রদান করলে এ অঞ্চলে পত্রিকাটির বিস্তৃতি আরও ঘটাতে পারব। বর্তমানে আমাকে কমপক্ষে দুই শত পত্রিকার এজেন্সি প্রদান করবেন।
এজেন্সির জন্য আপনাদের নির্ধারিত ফরমটি পূরণ করে পাঠালাম। ঐ সঙ্গে একটি ব্যাঙ্ক সামর্থ্য সার্টিফিকেট পাঠালাম। আশা করি আমাদের আবেদন মঞ্জুর করে শীঘ্রই আমাদের এজেন্সি প্রদান করবেন। ধন্যবাদসহ।

ইতি

বিশ্বস্ত
আরিফ হোসেন

ডাক টিকেট

প্রেরক	**প্রাপক**
আরিফ হোসেন	সার্কুলেশন ম্যানেজার
কর্মাধ্যক্ষ	দৈনিক আলোর পথে
মেসার্স আরিফ এ্যান্ড ব্রাদার্স	আমিন ভবন
সিরাজগঞ্জ বাজার	মতিঝিল
সিরাজগঞ্জ	ঢাকা

ইউনিট ৭

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিচিত লাভ করবেন।
- প্রবন্ধের উদাহরণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করবেন।
- নিজে নিজে প্রবন্ধ রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- প্রবন্ধের সংজ্ঞার্থ, রূপ, আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রবন্ধ রচনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হবেন।

ভূমিকা

প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা। প্রবন্ধ শব্দের পরিবর্তে আমরা অনেক সময় রচনা শব্দটিও ব্যবহার করি। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবন্ধ বা রচনা লিখতে জানা অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি দক্ষতা। এ জন্য প্রবন্ধ/রচনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত জরুরি।

সংস্কৃতি প্রবন্ধ শব্দটি দ্বারা 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন' আছে যার এমন রচনাকে বুঝায়। বাংলাতেও মোটামুটিভাবে এ অর্থই গৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধ শব্দটির অর্থে যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা এই যে এটি কোন শিথিল ভাবে বিন্যস্ত রচনা নয়। এটি অশিথিল অর্থাৎ আটোসাঁটো বিধিবদ্ধ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। অধুনা গদ্যে রচিত লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তি প্রয়োগে প্রখর রচনাকেই বোঝায়। প্রবন্ধের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে প্রচলিত। যদিও এর প্রকৃতি ঠিক প্রবন্ধের প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না।

প্রবন্ধ সাহিত্যকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) চিন্তাশ্রিত প্রবন্ধ (২) ভাবাশ্রিত প্রবন্ধ। প্রথমটিতে বিষয়বস্তুর গুরুত্বই প্রধান কিন্তু দ্বিতীয়টিতে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব প্রাধান্য পায়।

কিভাবে রচনা লিখতে হয়?

সব কাজের জন্যই পরিকল্পনা প্রয়োজন। আপনার প্রবন্ধ রচনার জন্যও পরিকল্পনা করুন। প্রথমে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন। বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি আছে তা কাগজ কলমে লিখে ফেলুন। সেই সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে আপনার কি মনোভাব তাও ভেবে দেখুন।

রচনার তিনটি প্রধান অংশ

আপনার প্রবন্ধকে তিন ভাগে ভাগ করুন। ক) ভূমিকা বা সূচনা খ) মূল বিষয় গ) উপসংহার। ভূমিকা অংশ দিয়ে প্রবন্ধের বিষয়ের অবতারণা করা হয়। ভূমিকায় তথ্য প্রধান নয় এখানে ভাবটিই প্রধান তবে ভাবটি এমন হতে হবে যা বিষয়বস্তুর দিকে ধাবিত হয়। সব সময়ই ভূমিকাকে আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করে লেখার চেষ্টা করুন।

ভূমিকার পরে মূল বিষয়। এ অংশে তথ্যগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিন। একটির পর একটি তথ্য সাজিয়ে নিন। প্রয়োজনে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ করুন। যুক্তি তর্ক বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে যা কিছু বলবার সবই এখানে বলে নেবেন। সবশেষে আসবে উপসংহার। ভূমিকায় যার প্রস্তাবনা করা হয়েছিল- উপসংহারে হয় তার সকল সমাপ্তি। উপসংহারে বিষয় সম্পর্কে আপনার মতামত বা সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রবন্ধের ভাষা

প্রবন্ধ বা রচনার ভাষা হবে সহজ সাবলীল, প্রাঞ্জল ও গতিসম্পন্ন। ভাষা যদি হয় আড়ষ্ট তাহলে লেখকের মনোভাব সঠিকভাবে পরিস্ফুট হয় না। জটিল অথবা অনাবশ্যক দীর্ঘ বাক্য অলঙ্কার বহুল বাক্য, সমাজবহুল অপরিচিত শব্দ প্রবন্ধে ব্যবহার না করাই ভাল। ভাষার প্রাঞ্জলতা একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। আপনি সে ভাবেই লিখুন।

সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ কঠোরভাবে পরিহার করবেন বানান যাতে ভুল না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন।

উদ্ধৃতি

প্রবন্ধে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের উদ্ধৃতি দিলে প্রবন্ধের মান বেড়ে যায়। কিন্তু কখনও ভুল বা অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রয়োগ করবেন না। উদ্ধৃতি যাঁর রচনা থেকে গৃহীত তার শুদ্ধভাবে লিখতে হবে।

রচনার দৈর্ঘ্য

রচনার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। অতিশয় ছোট অথবা অতিদীর্ঘ রচনা পরিহার করবেন।

প্রবন্ধ/রচনার নমুনাগুলো ভাল করে পড়ুন

নমুনামূলক রচনার পড়ে অনুসারী রচনা নামে কিছু রচনার উল্লেখ আছে। মূল রচনার সাহায্যে একই রকম রচনা নিজে নিজে লিখুন।

প্রবন্ধ/রচনার নমুনা

বাংলাদেশের ষড়ঋতু

কবি বলেছেন– "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।"

বাংলাদেশের প্রশস্তি এত সহজ ও মধুর করে আর কোন কবি রচনা করেছেন বলে আমরা জানিনা। বাংলাদেশের রূপ মাধুর্যে মোহিত কবির এ এক অসাধারণ বর্ণনা। বাংলার প্রকৃতির কত বৈচিত্র্য, কত রূপ, কত মাধুর্য। একেক ঋতুতে তার একেক বৈভব, একেক বৈশিষ্ট্য। ঋতুর রঙ্গমঞ্চে এক একটি ঋতু আসে আর চলে যায়। কিন্তু সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যায় এ দেশের মানুষের মনে। ঋতুকে নিয়ে কবিদের তাই ক্লান্তি নেই। কবিতায়, গানে, গাথায় তার বহুবিচিত্র পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানকার মানুষের জীবন যাপন প্রণালীতেও পাওয়া যাবে ঋতুবৈচিত্র্যের নানা প্রভাব।

ঋতুচক্রের আবর্তনের প্রকৃতিতে একে একে আসে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। ষড়ঋতুর প্রকৃতি রূপ, রঙ, রস, লীলা, চাঞ্চল্য প্রত্যেকটি ঋতুরই একান্ত আলাদা। ঋতু পরিক্রমার সূচনা হয় গ্রীষ্মকে নিয়ে। পঞ্জিকার পাতায় বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মের পরিধি। রুদ্র রোদ্রের দাবদাহে প্রকৃতি এখন ভীষণ রুক্ষ। কঠোর দহন জ্বালা সর্বত্র। ঝাঁঝালো বাতাস, আদি অন্ত্যময় নীল আকাশ, জীব জগৎ এর প্রাণান্ত অবস্থা। গ্রীষ্ম যত কঠিন ও কঠোর হোক না কেন – এ ঋতু মধুময় ঋতু। এ সময়ই বাংলাদেশের মধুময় ফলসম্ভারের কাল। তাপদগ্ধ মানুষের রসনায় আম, কাঁঠাল জাম আর নানান ফলের সম্ভার এনে দেয় স্বর্গীয় আনন্দ। তীব্র রোদকে পান করে এ সময় ফোটে চম্পা। আরও কত ফুল। হঠাৎ কখনও ঈশান কোণে দেখা দেয় কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ। দেখে মানুষ পুলকিত হয়। হঠাৎ কখনও অন্ধবেগে নেমে আসে ঝড় – যার প্রকৃত নাম কালবৈশাখি। ভাঙে ঘর, ভাঙে বাড়ি, উড়ে যায় ছিন্নপাতা, সর্বস্ব হারায় কেউ। কাল বৈশাখির সঙ্গে নেমে আসা এক পশলা বৃষ্টি প্রাণে বুলিয়ে দেয় প্রশান্তির পরশ।

গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা। হঠাৎ করে এক দিন কাল মেঘের নিশান উড়িয়ে, ডম্বরু বাজিয়ে যেন দখল করে নেয় গ্রীষ্মের রাজ্য। দুঃসহ গরম আর ক্লান্তির বদলে বর্ষার অবিরল ধারা প্রকৃতির বুকে এনে দেয় স্বস্তি ও শান্তির প্রলেপ। ফসলের ক্ষেত, তরু-লতা, জীবজগৎ যেন নতুন করে প্রাণস্পন্দন খুঁজে পায়। কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে বর্ষার চিত্র এঁকেছেন এভাবে–

"নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর
কালিমাথা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

বর্ষা ঋতু বাংলাদেশের প্রাণ। ফসলের সম্ভার দেখা দেয় মাঠে মাঠে। প্রসন্ন দৃষ্টিতে কৃষক চোখ মেলে তাই দেখে। নগরে, বন্দরে, শহরে কাজকর্মে চঞ্চলতা কমে যায়। কোন কোন সময় মানুষের কষ্ট বেড়ে যায় অতি বর্ষায়।

শরৎ ঋতু প্রশান্তি আর স্নিগ্ধতার ঋতু। বর্ষার পরে প্রকৃতি শান্ত। বৃষ্টির একঘেয়েমি আর নেই। নীল উজ্জ্বল আকাশ। সেখানে হালকা মেঘের ভেলা। রাতে চাঁদের আলোয় যেন বাঁধ ভাঙে। নদীর ধারে কাশ ফুলের হাসি। শরৎ উৎসবের ঋতু। এ ঋতুতেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসবগুলো। শরৎ বাঙালির প্রাণের ঋতু – আনন্দের ঋতু।

শরতের অবসানে আসে হেমন্ত। সোনার রঙে রাঙানো হেমন্ত। হৈমন্তিক ধান এ সময়ের প্রধান ফসল। সারা বছরের অন্ন আহরণ শুরু হয়েছে। বহু দিনের প্রতীক্ষিত ফসল ঘরে উঠেছে। নবান্নের সমারোহ আজ ঘরে ঘরে। হেমন্ত এক অর্থে ধূসরতা ও রিক্ততার ঋতু। কিন্তু হেমন্তের অগমন মানুষের মনে জানায় এক অজানা আনন্দের আভাস।

শরতের পরেই ঋতুর নাট্যমঞ্চে অবির্ভাব ঘটে শীতের। এ ঋতু স্নিগ্ধ নয়, বলা চলে রুদ্র। হিমেল হাওয়া আর কুয়াশায় মোড়া শীত জানিয়ে দেয় আতঙ্কের বার্তা। শীতের তীব্রতায় জীবন থমকে দাঁড়ায়। ম্রিয়মান সূর্যের আলো সবটুকু উত্তাপ দিয়েও শীতের হিমেল ছোঁয়া থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে না। তাই জামার উপরে জামা তার উপরে শীত বস্ত্রের সন্ধান। শীতার্ত মানুষ এ সময় বড় কষ্ট পায়। অনেক ক্ষেত্রেই জোটে না শীতবস্ত্র।

শীত বাঙালির আরাম আয়েস করে পুলি পিঠে খাওয়ার ঋতু। এ সময় নানা রকম রঙের বাহারী ফুল ফোটে গাঁদা, গোলাপ এমন আরও কত কি!

বসন্ত দূরে নয়। শীতের পরেই তাই বসন্ত আসে। বসন্তকে বলা হয় ঋতুর রাজা। ফুলে, ফলে, নব কিশলয়ে সত্যি বসন্ত ঋতুর রাজা। কোকিলের মধুর কণ্ঠস্বর শোনা যায় এ সময়ই। প্রকৃতির রাজ্যে বসন্ত যেন এক মহাউৎসবের প্রতীক।

উপসংহার ঃ প্রকৃতি ও মানুষ যে কত কাছাকাছি - বাংলাদেশের ষড়ঋতুর দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। প্রত্যেকটি ঋতুর আলাদা আলাদা রূপ, বৈভব ও ঐশ্বর্য। এদের বৈচিত্র্য আমাদের জীবনধারাকে বদলে দিয়েছে। আমাদের সংস্কৃতিতে এগুলোর আছে স্পষ্ট ছাপ। ঋতুর বদল আমাদের রুচি বদলায় একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয়। কখনও যুদ্ধ করে ঠকতে শেখায়, কখনও প্রশান্তিতে আমাদের বুক ভরিয়ে দেয়। এই ষড়ঋতুর দোলায় আমরা সবাই দুলছি। এই ষড়ঋতুর আশীর্বাদ যেন ভবিষ্যত জীবনেও আমাদের সঙ্গী হয়।

অনুসারী রচনা

- বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্য
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
- বাংলাদেশের প্রকৃতি

বাংলাদেশের বর্ষা

সূচনা ঃ গ্রীষ্মের খরদাহে পৃথিবী যখন দগ্ধ ও দিশেহারা তখনই বাংলাদেশে বর্ষা আসে তার স্নিগ্ধ কোমল রূপ নিয়ে। প্রকৃতির রাজ্যে বর্ষা আসে বালিকার প্রগলভ রূপ নিয়ে। বালিকার খলখল হাসির ঝর্ণাধারার মতই বৃষ্টির বর্ণাধারা নেমে আসে সবাইকে হতচকিত ও বিস্মিত করে। বর্ষা বাংলাদেশের প্রাণ। বর্ষা আসে সগৌরবে, আসে ঘোষণা দিয়ে আর মুহূর্তের মধ্যে জয় করে ফেলে গ্রীষ্মের দারুণ দুঃসহময় দাপটকে অগ্রাহ্য করে।

আমাদের দেশে ঋতুর নাট্যমঞ্চে ছয়টি ঋতুর আনাগোণা। কিন্তু পঞ্জিকার পাতায় নয়, প্রকৃতিতেই যে কটি ঋতু স্পষ্টভাবে তার রূপ নিয়ে আবির্ভুত হয় বর্ষা তাদের একটি। বর্ষা এত স্পষ্ট যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় না যে এটা বর্ষা।

বর্ষার বর্ণনা ঃ গ্রীষ্মের তীব্র তীক্ষ্ণ রোদ আর নেই। পাখির নরম পালকের রঙের মত মেঘের আনাগোনা সারা আকাশ জুড়ে। তারপর কখন যেন নেমে আসে ঝরঝর অবিরল বৃষ্টির ধারা। কবির ভাষায়–

"নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।

ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর

আউশের ক্ষেত জলে ভরভর

কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহিরে।

ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

বর্ষার আগমনে সর্বত্রই যেন একটি আনন্দ শিহরণ বয়ে যায়। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে ঘরবন্দী হয়ে পড়ে। খুব প্রয়োজনীয় কাজ না হলে অঝোর বৃষ্টিধারায় কেউ বের হতে চায় না। বিস্তৃত সবুজ শস্যক্ষেত্র বর্ষায় আন্দোলিত হয়। প্রাণ প্রাচুর্য যেন সীমাহীন করে দেয় এ বর্ষা। তরু-লতা, বৃক্ষ বৃষ্টিস্নাত হয়ে যেন মাথা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। খামখেয়ালি বাতাস মাঝে মাঝে আরও তরু, বৃক্ষকে দুলিয়ে দিয়ে যায়।

বর্ষার নদ-নদী, খালবিল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সকল বাধা অতিক্রম করে জল ছলছল শব্দ করে ছুটে যায় সাগরের দিকে। নদীর পানি উপচে ঢুকে পড়ে মানুষের আবাসস্থল গ্রামে ও শহরে। কখনও নদী ও লোকালয় একাকার হয়ে যায় বন্যার প্রবাহে। গ্রামে নৌকাই একমাত্র বাহন। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে প্রয়োজন হয় নৌকার।

বর্ষার উপকার ঃ বর্ষা আমাদের অনেক উপকার করে। বর্ষার এই অঢেল বৃষ্টি না থাকলে বাংলাদেশে ফসলের এত সম্ভার উৎপন্ন হতো না। এ বর্ষার জন্যই দেশে এত গাছগাছালি জন্মান সম্ভব হয়েছে। বর্ষায় জলস্ফীতির কারণে নৌপথের চলাচল সহজ ও স্বাভাবিক হয়। বর্ষার প্রকৃতির আমাদের দেশকে দিয়েছে ভিন্ন একটি নৈসর্গিক চিত্র। বর্ষায় জলমগ্ন বাংলাদেশ ভিন্ন একটি রূপ ও বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে। এসব মিলিয়ে বর্ষা আমাদের খুব প্রিয়।

অপকার ঃ বর্ষা শুধু আমাদের উপকারই করে না – কিছু অপকারও করে। অতিবর্ষা আমাদের অনেক দুঃখ কষ্টের কারণ। অতিবর্ষার ফলে বন্যা হয়। এ বন্যা ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে ঘরবাড়ি ভেঙে সংসারকে তছনছ করে দেয়। অনেক সময় নদীর তীর ভেঙে যায়– হাজার হাজার মানুষ হয় গৃহহারা। তাছাড়া বন্যা বেশি হলে অনেক লোকালয় তলিয়ে যায় পানিতে। তখন সেখানকার মানুষকে পাড়ি জমাতে হয় অন্যত্র কোন শহরে অথবা বন্দরে। বন্যা পরবর্তীকালে নানা রকম পানিবাহিত পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

বর্ষায় কাজকর্মও বিঘ্নিত হয়। বন্যা অথবা অতিবর্ষণ হলে অফিস আদালত স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। হাট বাজার ঠিকভাবে চলে না। নানান ধরনের কর্মজীবী মানুষ বিশেষ করে দিন এনে দিন খায় এমন পেশার মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ।

উপসংহার ঃ বর্ষার কিছু অসুবিধার দিক থাকলেও বর্ষাই আমাদের দেশের প্রাণশক্তি। সারা বৎসরের অন্ন সংস্থান এ বর্ষা করে দেয়। ধান, পাট, ফসলের ক্ষেত দেখে বুক ভরে যায় কৃষকের। কদম, কেয়া, চামেলি, জুঁই বর্ষার ফুল। আমাদের প্রতিদিনের সাদামাঠা জীবনের চালচিত্র বদলে দেয় বর্ষা। বৃষ্টি স্নিগ্ধ দুপুরে মধ্যবিত্ত বাঙালির রসনা তৃপ্তির জন্য আয়োজন হয় খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা। সব কিছু মিলিয়ে বর্ষা বাঙালির প্রিয় ঋতু।

অনুসারী রচনা

- একটি বর্ষার দিন
- আমার প্রিয় ঋতু বর্ষা
- আমাদের জীবনে বর্ষা

বাংলাদেশের কুটির শিল্প

সূচনা ঃ সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশ কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ। এমন এক দিন ছিল যখন অন্নাভাব, দুঃখ-দারিদ্র্য ও জীবিকার তাড়না এত প্রবল ছিল না। মোটা কাপড় পরে, মোটা ভাত খেয়ে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ জীবন ধারণ করতে পারত। মানুষের চাওয়া পাওয়াও ছিল অল্প। সেই সব দিনে জীবিকা হিসাবে নয় সৌখিন শিল্প হিসাবে মানুষ নানা সামগ্রী প্রস্তুত করতে শেখে। বৃত্তি ও জীবিকার প্রয়োজনে ঘরে বসে তৈরি করা এ সব শিল্প সামগ্রীই কুটির শিল্প হিসেবে পরিচিত।

কুটির শিল্পের সংজ্ঞা ঃ নিজের কুটিরে বসে মানুষ যে সামগ্রী তৈরি করে তাই কুটির শিল্প। প্রয়োজনের জন্য মানুষ নানা রকম গৃহসামগ্রী তৈরি করে। এতে সৌন্দর্য ও মনের মাধুর্য মিশ্রিত একটি শিল্পী সত্তা প্রকাশিত হয়। শিল্পীর হাতের নৈপুণ্য ও চারুত্ব সৃজনী শক্তির দক্ষতা সাধারণ বস্তুকেও অসাধারণত্ব দিয়ে থাকে। আদি যুগে মানুষের শিল্পবোধ হয়তো এভাবেই জাগ্রত হয়েছে।

কুটির শিল্প অতীত ও বর্তমান ঃ অতীতে বাংলাদেশের গ্রামগুলো ছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাষী কৃষিকাজ করতো, তাঁতি কাপড় বুনতো, কামার গৃহস্থালী ও কৃষির যন্ত্র যোগাত, কুমোর মাটির নানা রকম সামগ্রী বানাতো, স্বর্ণকার বানাতো নানা রকমের অলঙ্কার, কৃষি সম্ভারের সঙ্গে এগুলোর অনেক কিছু সেকালে বিদেশে রপ্তানী হতো। ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি সৃষ্টি হয়েছিল জগৎ জোড়া। কিন্তু বাংলার কুটির শিল্পের এ অনন্য গৌরব ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। আঠার শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। ফলে যন্ত্র সভ্যতার দ্রুত প্রসার হতে থাকে। যন্ত্র সভ্যতার কাছে কুটিরশিল্প ক্রমাগত মার খেতে থাকে। তার কারণ হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে উৎপাদন করা সম্ভব হতো। হাতের দক্ষতা যতই থাকনা কেন উৎপাদন প্রক্রিয়া ছিল ধীর ও এটি ব্যয়বহুল। ফলে কম খরচে মানুষ জিনিসপত্র পেতে শুরু করে ও অচিরে কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যায়।

এছাড়া বিদেশী শাসক ইংরেজরা সুকৌশলে এদেশের কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। নিজেদের ব্যবসায়িক প্রাধান্য রক্ষা করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। ইংরেজরা এমনকি মসলিন শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য মসলিন তাঁতিদের হাত কেটে দিতেও দ্বিধা করেনি।

বাংলাদেশের কুটির শিল্পের পরিচয় ঃ কুটির শিল্পে বাংলাদেশের হারানো গৌরব হয়ত আর কখনও ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তাও কখনও বিস্মৃত হওয়া যাবে না। এখনও আমাদের দেশে নানা রকম কুটীর শিল্প প্রচলিত আছে। এর মধ্যে, মৃৎশিল্প, তাঁত, অলঙ্কার তৈরি করা, বিভিন্ন ধাতুর শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প প্রধান। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে শিল্পীরা অনেক নয়ন মনোহর শোভন সামগ্রী তৈরি করেন। সোনা-রূপা দিয়ে দিয়ে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার তৈরি করে স্বর্ণশিল্পীরা। পিতল, কাঁসা এগুলোর ব্যবহারও কুটির শিল্পে আছে। পাট ও আখের ছোবড়া দিয়ে বৈচিত্র্যময় অনেক সামগ্রী তৈরি করা যায়।

কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ঃ বড় বড় শিল্প যদিও দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে তবুও কুটীর শিল্পের প্রয়োজনীয়তা এতটুকুও কমেনি। শুধু ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে নয়, কুটির শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে অনেক নর-নারীকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করা যায়। কৃষিজীবীরা বছরের অধিক সময় বসেই বাড়িতে তাদের বাড়তি আয়ের একটি সুযোগ করে নিতে পারে। কুটির শিল্পকে আরও মনোগ্রাহী করা যেতে পারে ও এর উৎপাদন ব্যয় কমানো সম্ভব। ফলে আধুনিক রুচিসম্পন্ন মানুষের কাছে কুটির শিল্প আরও কাম্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

জাতীয় অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের ভূমিকা ঃ জাতীয় উন্নয়নে কুটির শিল্প একটি অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। কুটীর শিল্পের প্রসার হলে বেকারত্ব যেমন কমবে তেমনি জাতীয় আয়ের কিছুটা সুষম বন্টন ঘটবে। বিদেশে কুটির শিল্পের যথাযথ বাজারজাতকরণ ও নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে। ফলে রপ্তানী অনেক গুণ বেড়ে যাবে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সহায়ক ভূমিকা কুটির শিল্পের জন্য প্রসারিত করতে হবে। নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি ও দক্ষ কারিগরি উৎকৃষ্ট কুটির শিল্পকে নতুন সম্ভাবনা দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে। জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য কুটির শিল্প একটি বড় ধরনের খাত হতে পারে।

কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঃ কুটির শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য জনসচেতনতা দরকার। সেই সঙ্গে কিছু সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। যেমন কুটীর শিল্প প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। কুটির শিল্পের

উপযুক্ত প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাজন ও মধ্যবর্তী দালালদের হাতে কুটির শিল্পের কারিগরগণ না পড়েন তার তদারকি করতে হবে। কুটীর শিল্পকে যন্ত্রশিল্পের মতই সব রকমের সুযোগ ও গুরুত্ব দিতে হবে। কুটির শিল্পের কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার ঃ বাংলাদেশের মত উন্নয়নকামী দেশের জন্য কুটির শিল্প অত্যন্ত প্রয়োজন। বৃহদাকার শিল্পের ব্যাপক শিল্পায়ন সময় সাপেক্ষ ও আর্থিক ব্যাপার। কিন্তু কুটির শিল্পে খুব সহজে ও অল্প ব্যয়ে আমরা এর প্রসার ঘটাতে পারি। সুতরাং জাতীয় সমৃদ্ধির স্বার্থে কুটির শিল্প উন্নয়নে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

অনুসারী রচনা

কুটির শিল্পের ভবিষ্যৎ

কুটির শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

ভূমিকা ঃ আজকের পৃথিবী বিজ্ঞানের। বিজ্ঞান ছাড়া এখন সমাজ ও জীবন কোন কিছুই আমরা ভাবতে পারি না। নতুন নতুন আবিষ্কার ও জ্ঞান শাখার উন্মোচন বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে করেছে তীব্র গতিময়। বিজ্ঞান আমাদের কোন দূর-দিগন্তে নিয়ে পৌঁছাবে আমরা জানিনা। আমরা শুধু একথাই এখন জানি-বিজ্ঞান আমাদের নিত্যসঙ্গী ও সহচর।

আদিমকালে মানুষ ছিল অসহায়। বৈরী প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য চিন্তা করতে শুরু করেছে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। মানুষ দেখেছে প্রকৃতি শক্তিশালী বটে তবে জ্ঞান তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। এবোধ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মানুষ বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞান মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আধুনিক সভ্যতা এ বিজ্ঞানেরই অবদান।

বিজ্ঞানে অবদান ঃ মানুষ শুধু চাঁদেই পৌঁছেনি – তার অভিযান চলছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। বিজ্ঞান মানব কল্যাণে রেখেছে অভূতপূর্ব অবদান। আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার মানুষের জীবনকে দিয়েছে আমূল বদলে। রেডিও, টেলিভিশন, কৃত্রিম উপগ্রহ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব জীবনদায়িনী ওষুধের আবিষ্কার, সার্জারির বিস্ময়কর উন্নয়ন মানব জীবনকে দিয়েছে অমৃতের সন্ধান। বিজ্ঞানের কল্যাণে পৃথিবীর কোন দেশ সমাজ অথবা মানুষ কেউ দূরবর্তী নয়। বলা হচ্ছে পৃথিবী এখন পরিণত হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি পৃথিবীব্যাপী এ নব সভ্যতার সূচনা করেছে। এ সভ্যতা বিজ্ঞানের অবদান।

বিজ্ঞান ও প্রকৃতি ঃ মানুষ এক সময় ছিল প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক। প্রকৃতির রুদ্র তান্ডব সমাজবন্ধ মানুষের সংসারকে করেছে ছিন্নভিন্ন। মানুষ এ প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছে। এ প্রকৃতিরই আরেক রূপকেও মানুষ দেখেছে। প্রকৃতির রূপ, লীলা ও সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করেছে। মানুষ প্রকৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করেছে – তার রহস্য ভেদ করার কৌতূহল জেগেছে মনে। যেদিন পাথকে পাথর ঘষে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছে সেদিনই মানুষ এক মহৎ আবিষ্কার করেছে। সেদিনের সেই আবিষ্কারই মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে বিজ্ঞানের এক মহা কালজয়ী উপাখ্যান সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আজ বহুমুখী ও অবারিত।

বিজ্ঞানের অকল্যাণকর দিক ঃ বিজ্ঞান কি শুধু মানব সমাজে কল্যাণই বহন করে এনেছে; নাকি কিছু অকল্যাণকর দিকও এর আছে। বিজ্ঞান পৃথিবীকে বহু কিছু দিয়েছে, কিন্তু এ পৃথিবীকে ধ্বংসের উপাদানও সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান। আজ হাইড্রোজেন ও আনবিক বোমার ভয়ে মানুষ আশঙ্কাগ্রস্ত। কত রকমের ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ, জীবানু ও রাসায়নিক আক্রমণে গোটা মানবজাতি বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে – তার চেয়েও

হাজার গুণ ক্ষয়ক্ষতি হবে যদি আর একটি বিশ্বযুদ্ধ হয়। শুধু ক্ষয়ক্ষতিই নয়, হয়তো মানবজাতিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের এ বিভীষিকা মানুষের শান্তি হরণ করেছে।

আধনিক জীবন ও বিজ্ঞান ঃ বিজ্ঞান যদি মানব জীবনকে সমৃদ্ধ না করতো তবে আধুনিক জীবন কল্পনাও করতে পারতাম না। বিজ্ঞান জীবনে এনেছে সৌন্দর্য, আনন্দ ও বৈচিত্র্য। সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ পোশাক-আশাক থেকে আরম্ভ করে, সুদৃশ্য বহুতল অট্টালিকা, জীবন যাপনের নানাবিধ উপকরণ, বিনোদনের নানা সুযোগ এগুলোর কোনটিই সম্ভব হত না যদি বিজ্ঞানের কল্যাণকর আবিষ্কার হত। একটি আলপিন থেকে বৃহদাকার যন্ত্র সবই বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর সবই মানব জীবনের জন্য। কিন্তু এ বিজ্ঞানই কি আমাদের ধ্বংস করবে? একদিন বিনা চিকিৎসায়, ওষুধের অভাবে যে রোগে মানুষ মারা যেতো আজ আর তা হয় না। দুরারোগ্য ব্যাধিকে বিজ্ঞান আরোগ্যযোগ্য করেছে। সার্জারির বিপুল উন্নয়ন মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছে – দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিচ্ছে। এমনি কত শত আবিষ্কার মানুষের জীবনকে করেছে সহজ ও আনন্দময়। যে বিজ্ঞানের কাছে আমরা ঋণী, সেই বিজ্ঞানের দ্বারা কেন আমাদের জীবন নাশ হবে? কেন মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে? এ প্রশ্ন আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের।

উপসংহার ঃ প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়- সভ্যতাও বিনাশ করতে চায় না। বিজ্ঞানের যে অমিত শক্তি তার প্রয়োগকারী মানুষ। মানুষের শুভবুদ্ধিই পারে বিজ্ঞানের ধ্বংস যজ্ঞকে বন্ধ রাখতে। যে ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যায় সেই ডিনামাইট দিয়েই পাহাড় কেটে রাস্তা করে রেলপথও বসান যায়। আমরা কোনটি করবো – এটাতো আমাদের ব্যাপার। তাই দোষ বিজ্ঞানের নয় – দোষ প্রয়োগের। এ জন্য আমরা বলবো বিজ্ঞান কখনও অভিশাপ নয় – বিজ্ঞান সব সময়ই আর্শীবাদ।

অনুসারী রচনা

- বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতা
- মানব কল্যাণে বিজ্ঞান
- বিজ্ঞান অভিশাপ না আর্শীবাদ

দৈনন্দিন জীবন ও বিজ্ঞান

ভূমিকা ঃ আদিমকালে মানুষ ছিল অসহায়। পৃথিবীর পরিবেশ ছিল জীবন যাপনের জন্য অনুপযোগী-প্রকৃতি ছিল চরম বৈরী। অসহায় মানুষ প্রতিদিন এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে থেকেছে। এক্ষেত্রে মানুষই ছিল মানুষের প্রধান সহায়। প্রকৃতির শক্তি ও সৌন্দর্য, দুটোই মানুষকে অভিভূত করেছে। মানুষ প্রথম পর্যায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, পরে সে বিষয়টি চিন্তা করতে শিখেছে। অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ প্রথম জ্ঞান লাভ করেছে।

বিজ্ঞান শব্দটির তাৎপর্য ঃ বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। যে বিশেষায়িত জ্ঞান দিয়ে মানুষ প্রকৃতি ও বস্তুকে বিচার বিশ্লেষণ করেছে তাই বিজ্ঞান। মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। যেদিন থেকে কৌতূহলের জাগরণ সেদিন থেকে মানুষ থেমে নেই। জ্ঞানের সাধকগণ একের পর জ্ঞানের জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্রকে আবিষ্কার করে চলেছে।

সমাজ ও জীবনে ঃ মানুষের বিজ্ঞান সাধনা ও নতুন নতুন আবিষ্কারের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে মানুষের সমাজ ও জীবনে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার প্রতিনিয়ত বদলে দিচ্ছে মানুষের সমাজ, তার জীবন ও চিন্তাধারা। বিজ্ঞান আজ প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্গী। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, গৃহে অথবা কর্মক্ষেত্রে, পথে-ঘাটে, লেখাপড়ায়, যে কোন অনুষ্ঠান অথবা বিনোদনে সর্বত্র বিজ্ঞানের অবদান ও আবিষ্কার আমাদের জীবনকে করে দিয়েছে সহজ, অনায়াস ও সুন্দর। মাথার উপর পাখা ঘুরছে সেটি বিজ্ঞানের অবদান, বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে তার পিছনেও বিজ্ঞান। কম্পিউটারে কম্পোজ হচ্ছে, ইন্টারনেটে সংবাদ আদান প্রদান হচ্ছে, টেলিফোনে দূরে লোকের সঙ্গে কথা বলছি, টি.ভি-তে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের ঘটনার বিবরণ ও দৃশ্য দেখছি এমনি কত অবিশ্বাস্য ঘটনা বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে এবং সেগুলো জীবনের সহযাত্রী হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞান আমাদের জীবন যাপনকে সাহায্য করছে।

গৃহস্থালীর কাজে বিজ্ঞান ঃ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গৃহস্থালীর যত কাজ সবকিছুই বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গৃহস্থালীর জন্য বিজ্ঞান যে কত উপকরণ তৈরি করেছে তার যথার্থ হিসেব দেওয়া কষ্টকর। এলার্মঘড়ির শব্দ ঘুম ভাঙে, ঘুম ভাঙার পরে টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজি, ইলেকট্রিক হিটারে কিংবা গ্যাসের চুলায় তৈরি হয় চা-চা খেতে খেতে সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া সব কিছুর পিছনেই আছে বিজ্ঞান। সকালে নাস্তার উপকরণ বেরিয়ে আসে ফ্রিজ থেকে। গৃহের প্রয়োজনীয় খাদ্য সম্ভার জমা আছে ফ্রিজে। ঘরে কল ঘুরালে পানি আসে, তেল সাবান, জুতা ছাতা কোথায় বিজ্ঞান নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞান। আর প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমরা বিজ্ঞানের অবদানে জীবনকে করছি সহজ ও সুন্দর।

শুধু নাগরিক জীবনেই নয় গ্রামের মানুষের কাছেও বিজ্ঞান আজ নিত্যসঙ্গী। নাগরিক অনেক সুবিধাই অবশ্য আজ গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাছাড়াও গ্রামের মানুষ বিজ্ঞানের সুবাদে আজ ব্যবহার করছে রাসায়নিক সার, কৃষিকাজের জন্য পাম্পসেট, হাস্কিং মেশিন, ট্রাক্টর, উচ্চ ফলনশীল বীজ ইত্যাদি। বিজ্ঞানের সান্নিধ্যে এসে মানুষ এখন আর সেই পুরানো দিনে কৃষি ব্যবস্থায় নির্ভরশীল নয়। শহর থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত সর্বত্রই আজ বিজ্ঞান মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী।

অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ঃ মানুষের জীবনকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ বিজ্ঞান আমাদের নিত্যসঙ্গী। প্রতিদিন বিজ্ঞানের কত অবদানই না আমরা ব্যবহার করছি। আমরা পথ চলছি বৈদ্যুতিক ট্রেনে, আকাশে উড়ছি প্লেনে, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ করে চলেছে জাহাজ, পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হচ্ছে, উষ্ণ মরুভূমি হয়ে উঠছে সুজলা সুফলা, নদীর গতি পরিবর্তন করে তৈরি হচ্ছে বাঁধ, নদী পারাপারের জন্য তৈরি হচ্ছে সেতু, আকাশচুম্বী ইমারতে আজ আমরা বসবাস করছি, কত রকমের কল কারখানায়, কত রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যে তৈরি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই। বিজ্ঞান শুধু দেশকেই বদলে দেয়নি, বদলে দিয়েছে সমাজ, জীবন ও রুচিকে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে অত্যাশ্চর্য ওষুধ। মানুষ ফিরে পাচ্ছে জীবন। শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে মানুষের দেহে অঙ্গ সংযোজন সম্ভব হচ্ছে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখার জন্য বুকের ভেতর পেসমেকার যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া, দৃষ্টিহীন মানুষের চোখে কৃত্রিম লেন্স বসিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এ সবই সম্ভবপর হয়েছে বিজ্ঞানের অবদানের ফলে। ক্যান্সার অথবা এইডস এর মত ঘাতক রোগেরও চিকিৎসা একদিন মানুষের করায়ত্ব হবে বলে আমরা অনুমান করতে পারি।

উপসংহার ঃ সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবনে কোন অঙ্গন নেই যেখানে বিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগেনি। বিজ্ঞানের যাদুস্পর্শে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে মধুময় ও সৌন্দর্যময়। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গী। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের কল্যাণকর ব্যবহার জীবনকে করেছে সুখ ও সমৃদ্ধময়। বিজ্ঞান জীবনে এনে দিয়েছে বৈচিত্র্যের স্বাদ। বিজ্ঞান আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী।

অনুসারী রচনা

- প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের অবদান
- দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব
- মানব জীবন ও বিজ্ঞান
- নিত্যসঙ্গী বিজ্ঞান

টেলিভিশন

ভূমিকা ঃ টেলিভিশন বিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য অবদান। বিজ্ঞানের যে সমস্ত আবিষ্কার মানব সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত হরেছে টেলিভিশন তারই একটি। আমরা ঘরে বসেই দূরের জিনিসকে দেখতে পারি ও শুনতে পারি। এর আগে রেডিও আবিষ্কৃত হয়েছে তবে এর মাধ্যমে আমরা দূরের কথা শুনতেই পারতাম আর এখন টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা তা দেখতেও পারি।

টেলিভিশন শব্দটি ল্যাটিন 'টেলি' ও 'ভিশন' শব্দদুটো থেকে এসেছে। 'টেলি' শব্দের অর্থ দূরত্ব ও 'ভিশন' শব্দের অর্থ দেখা। অর্থাৎ দূর থেকে যা দেখা হয় তাই টেলিভিশন। টেলিভিশনের পর্দায় আমরা দূরের দৃশ্য দেখি ও কথা শুনতে পাই।

আবিষ্কার ঃ সর্বপ্রথমে জার্মান বিজ্ঞানী 'কন' বেতারে ছবি প্রেরণের কথা চিন্তা করেন। তাঁর অভিমত ছিল একটি ছবিকে ছায়া ও আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা সম্ভব ও তা দূরে প্রেরণ করা সম্ভব। ১৯২৭ সালে ইংল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক বেয়ার্ড টেলিভিশন আবিষ্কার করেন। ধাপে ধাপে এর অনেক উন্নতি হয়েছে ও বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

ব্যবহার ঃ ষাটের দশকেই আমাদের দেশে সীমিত আকারে টেলিভিশনের ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলই বাংলাদেশ টিভি নেটওয়ার্কের অধীনে এসেছে। টেলিভিশন বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যদিও টেলিভিশন এখনও ঘরে ঘরে পৌঁছায়নি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের গৃহে এখনও টি.ভি সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তবুও এর ব্যাপক ব্যবহার ক্লাব, প্রকাশ্য স্থান, বিদ্যায়তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহজলভ্য হয়েছে। ফলে টেলিভিশনের দর্শকও বেড়েছে।

সংবাদ, খেলাধুলা, নৃত্যগীত, নাটক, নানান ধরনের হাল্কা অনুষ্ঠান বাংলাদেশে টেলিভিশনের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। এছাড়া কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, নানান ধরনের সতর্কতামূলক নির্দেশনা ইত্যাদি টেলিভিশনের উপযোগিতা অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। উন্নত দেশগুলোতে টেলিভিশন শুধু আনন্দের উপকরণ হিসেবে নয় শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবেও কাজ করছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের একটি সহায়ক পন্থা হিসেবে টেলিভিশনের ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি কম হলেও বিকল্প ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় টেলিভিশন একটি বড় রকমের ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ব্যবহার সুদূরপ্রসারী ফলাফল রাখবে বলে অনুমান করা যায়।

উপকারিতা ঃ টেলিভিশনের উপকারিতা বহুবিধ। জনমত সৃষ্টির জন্য এটি একটি চমৎকার মাধ্যম। জনকল্যাণকর বিভিন্ন বিষয়ে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা যায়। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা একটি বড় অভিশাপ। দেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করতে টেলিভিশন একটি বড় ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তথা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের একটি বিকল্প ধারা সৃষ্টি করতে পারে টেলিভিশন। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই টেলিভিশন সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারে।

টেলিভিশন এখন আমাদেরই জীবনেরই একটি অঙ্গ। সেক্ষেত্রে জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে টেলিভিশন তার সাহায্যকারী ভূমিকা সহজেই রাখতে পারে।

অপকারিতা ঃ কোন জিনিসের অপব্যবহার হলেই তা সমাজের অপকার করে। শালীনতাবর্জিত ও কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান, নাটক, নৃত্যগীত সমাজে বিভিন্ন বয়সী মানুষের ক্ষতি করে থাকে। টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হলে স্বাভাবিক কাজকর্ম, লেখাপড়া ইত্যাদির ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার প্রতি সার্বক্ষণিক আকৃষ্ট হলে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। রোমাঞ্চকর বিদেশী ছায়াছবি ও অনুষ্ঠান দেখে যুব শ্রেণী বিপথগামীও হতে পারে। তাই অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা উচিত।

টেলিভিশন পর্দায় বেশিক্ষণ দৃষ্টিপাত করলে অনেকের দৃষ্টিশক্তির ও ক্ষতি হয়।

উপসংহার ঃ টেলিভিশন আধুনিক জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান। টেলিভিশনের ব্যাপ্তি ও উপযোগিতা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে টেলিভিশন যেন সব সময় সমাজে কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের জীবনকে একদিকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে ও অন্যদিকে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেও রক্ষা করতে হবে। টেলিভিশনের শুভ প্রভাব আমাদের জীবনে পড়ুক – এটাই সবার কাম্য।

অনুসারী রচনা

- টেলিভিশন ও আমাদের জীবন

কম্পিউটার

সূচনা ঃ বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারই আমাদের সমানভাবে প্রভাবিত করে না। তবে এমন কিছু আবিষ্কার আছে যা ধীরে ধীরে মানুষের জীবন ধারাকেই বদলে দেয়। কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমনি একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। এ যন্ত্রটির দ্রুত উন্নয়ন, এর উপযোগিতা, এর বহুমাত্রিক গুণ মানব সমাজের কর্মচিন্তা ও ধারণাকে আমূল পরিবর্তন করে দিচ্ছে। নিত্য দিনের কাজকর্মে কম্পিউটার যেমন সাহায্য করছে তেমনি অফিস, আদালতের কাজে, জটিল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার। আধুনিক মানব জীবনে কম্পিউটার তাই এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

পরিচিতি ঃ কম্পিউটার শব্দটি ইংরেজি। এর অর্থ হিসাবকারী যন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা Data বা উপাত্ত গ্রহণ করতে পারে, অতি দ্রুত বিশ্লেষণ করতে পারে ও সিদ্ধান্ত দান করতে পারে। জটিল সমস্যা সমাধানে কম্পিউটারের দ্রুততা এতো বেশি যা মানুষের পক্ষে শারীরিকভাবে করা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে কম্পিউটারকে শুধু হিসাবযন্ত্র বললে কম বলা হয়। যোগ, গুণ, ভাগ, যেমন এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত, হলেও এর কর্মক্ষেত্র আরও বহুদূর প্রসারিত। তথ্যের বিশ্লেষণ করা, তুলনা করা ও সিদ্ধান্ত প্রদানে কম্পিউটার এক অত্যাশ্চর্য যন্ত্র।

কম্পিউটারের গঠন ঃ কম্পিউটারের গঠন মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমত এর যান্ত্রিক সরঞ্জাম, অর্থাৎ যে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে কম্পিউটার গঠিত, তাকে বলে হার্ডওয়ার। দ্বিতীয়ত, সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় সুশৃঙ্খল যে নির্দেশ দেওয়া হয় তাকে বলে সফটওয়্যার। তথ্য সংরক্ষেণের স্মৃতি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জন্য গাণিতিক বা যুক্তি অংশ, তথ্য গ্রহণের জন্য প্রবেশ মুখ অংশ, ফলাফল প্রদর্শকের জন্য বহির্মুখ অংশ, নিয়ন্ত্রণ অংশ ইত্যাদি হার্ডওয়ারের অংশ। প্রোগ্রাম সাধারণত দু প্রকারের হয়- ব্যবহারিক প্রোগ্রাম ও পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম। সমস্যা সমাধানের জন্য লিখিত প্রোগ্রামকে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বলে। পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের কাজের সমন্বয় রক্ষা করে। একটি কম্পিউটারের পদ্ধতি হল যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও প্রোগ্রাম সামগ্রীর যৌথ সমন্বয়।

শ্রেণীবিভাগ ঃ অভ্যন্তরীণ গঠন, আকৃতি, ক্ষমতা ইত্যাদি অনুযায়ী কম্পিউটারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- সুপার কম্পিউটার, মেইন ফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার ও মাইক্রো কম্পিউটার। আকার, আকৃতি ও ক্ষমতায় পার্থক্য থাকলেও এগুলোর মৌলিক কাজ একই।

আবিষ্কার ঃ কম্পিউটারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সাম্প্রতিক কালে ঘটলেও এর বর্তমান রূপে আসতে বহু বছরের শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন পড়েছে। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ব্লেইলি পাসকেল নামে একজন গণিতবিদ যোগ বিয়োগ করতে সক্ষম একটি গণনাযন্ত্র তৈরি করেন। ১৬৭১ সালে গডফ্রাইড লেবনিটজ গুণ ও ভাগ করতে সক্ষম যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। ১৮১২ সালে চার্লস ব্যাবেজ ক্যালকুলেটরের মূলনীতির পরিকল্পনা করেন। ১৯৪৪ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আই.বি.এম কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে ইলেকট্রো মেকানিক্যাল কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব হয়। ১৯৫৭ সাল থেকেই কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৭১ সালের পর থেকে কম্পিউটারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। যার ধারা আজও অব্যাহত। কম্পিউটার ইতোমধ্যেই মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশ্বব্যাপী সমন্বিত চেষ্টায় এর আরও উন্নতি হচ্ছে। কম্পিউটার যন্ত্রের বিকাশ আরও কতদূর সম্প্রসারিত হবে তা বলা মুশকিল।

প্রয়োজনীয়তা ঃ কম্পিউটার আধুনিক বিশ্বের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় পর্যন্ত এর স্বগর্ব পদচারণা। মানুষের চিন্তা-চেতনা, পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে কম্পিউটার। কম্পিউটার শুধু জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যই নয়। কম্পিউটারে খেলাধুলা, কবিতা লেখা, সুর সৃষ্টি করা, ভাষা অনুবাদ করা– এগুলোও আজকাল সম্ভব হচ্ছে।

উপসংহার ঃ আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বাংলাদেশের তরুণদের কম্পিউটারে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। কম্পিউটারে পিছিয়ে থাকলে আমরা সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে যাব। বাংলাদেশে পরিকল্পনা, বাজেট, বন্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই কম্পিউটার বিরাট অবদান রাখতে পারে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী কম্পিউটারের যে চাহিদা প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে সফটওয়্যার রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে।

পরিবেশ দূষণ

সূচনা ঃ আমাদের চারপাশে যা আছে, তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আমাদের চারপাশে আছে আলো, বাতাস, মাটি, নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, মানুষ জন, বন্য প্রাণী, ও আরও নানান কিছু। এসব নিয়েই আমাদের পরিবেশ। এ পরিবেশকে ঘিরেই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর স্বাভাবিক বিকাশ হয়ে থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে আছে ভারসাম্য। পরিবেশের এ ভারসাম্য নষ্ট হয় পরিবেশ দূষণের মাধ্যমে। জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন, পয়:নিষ্কাশণের অব্যবস্থা, যত্রতত্র কলকারখানা স্থাপন, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, ফসলের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ ইত্যাদি প্রতিনিয়তই পরিবেশকে দূষিত করছে। পরিবেশের এই দূষণ মানুষ ও প্রাণীর জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করেছে।

পরিবেশ দূষণের শুরু ঃ আসলে যেদিন থেকে মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছে, সেদিন থেকে পরিবেশের দূষণও শুরু হয়েছে। আদিম মানুষ যেদিন, আগুন জ্বালাতে শিখল সেদিন থেকেই সম্ভবত পরিবশে দূষণের শুরু। এরপর যা মানুষ করেছে – যেমন বন কেটে বসতি তৈরি করেছে, গ্রাম ও শহরের পত্তন করেছে, ফসলের ক্ষেতে প্রয়োগ করেছে কীটনাশক, ব্যবহার করেছে রাসায়নিক সার, এর সব কিছুতেই পরিবেশ দূষিত হয়েছে। এরপরে আছে কলকারখানা স্থাপন, নানান রকমের পেট্রোল চালিত গাড়ি, জাহাজ, শিল্পকারখানার বর্জ্য, সবশেষে আনবিক ও পারমানবিক বোমার পরীক্ষা ও প্রয়োগ পৃথিবীর পরিবেশকে করেছে দূষিত ও বিপন্ন। এর ফলে ধরিত্রীর মানুষ ও জীবকূল আজ মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া ঃ পরিবেশ দূষণকে মূলত ৩টি ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি। এগুলো হচ্ছে – বাতাস, পানি ও শব্দ দূষণ। জীবনের জন্য যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা বাতাস। এ বাতাস যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। কলকারখানা, গাড়ির ধোঁয়া ও ধূলাবালি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি বাতাস দূষিত করে। পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যানবাহন থেকে এক ধরনের বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার নিঃসরণ ঘটে। এই বিষাক্ত ধোঁয়ায় থাকে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন। এ ধোঁয়া মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ধোঁয়ার কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, চোখ জ্বালাপোড়া, মাথাধরা ইত্যাদি রোগ হতে পারে। ধুলাবালি রোগজীবাণু বহন করে। আনবিক ও পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তা অঙ্গহানি ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে পারে। ক্যান্সার এর মত রোগও সৃষ্টি করে।

পানি দূষণে খাল-বিল, নদী ও জলাধারের পানি দূষিত হয়। নগরীর পয়ঃনিষ্কাশন, কল কারখানার বর্জ্য, কীটনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক সার, সমুদ্রে তেলবাহী জাহাজের তেল পানিতে মেশার ফলে পানি দূষিত হচ্ছে। এ বিরূপ পরিবেশে নদী ও সমুদ্রের জলচর প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। কথায় বলে পানির অপর নাম জীবন। এটা সত্য শুধু মানুষের জন্য নয় অন্যান্য প্রাণীর জন্যও সত্য। সেই পানি দূষিত হলে জীবন ধারণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। কারণ পানি রোগ জীবানু বহনের প্রধান মাধ্যম।

যানবাহনের বিকট শব্দ, হর্ণের শব্দ কলকারখানার শব্দ, মাইকের চিৎকার, বোমা ও অস্ত্রের শব্দ এগুলো শব্দদূষণ ঘটায়। এগুলো থেকে মানুষের নিদ্রাহীনতা, মাথা ব্যথা, স্নায়বিক ও মানসিক নানাবিধ রোগের জন্ম হয়।

প্রতিকার ঃ প্রকৃতিতে ভারসাম্যহীনতার কারণেই পরিবেশের বিপর্যয় নেমে আসছে। পৃথিবীব্যাপী আজ সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ রক্ষার। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট মানুষের রোগ-শোক, জীবন, অর্থ ও সম্পদের অপচয় এগুলো থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন প্রকৃতির ভারসাম্য যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। জনসংখ্যা একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় যেমন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে সেই সঙ্গে, কীটনাশক রাসায়নিক সার প্রভৃতির ব্যবহার বন্ধ করে প্রাকৃতিক অজৈব সার ব্যবহার করতে হবে। কলকারখানার বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে অথবা জলাশয়ে না ফেলে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলতে হবে। গাড়ীর কালো ধোঁয়া নিঃসরণ বন্ধ করতে হবে। বসতি অঞ্চলে কোন শিল্প কলকারখানা গড়তে না দেওয়া ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি

পরিবেশকে উন্নত করার জন্য কাজও আমাদের করতে হবে। নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ঠিক রাখতে হবে। বনজ ভূমির এলাকা বাড়াতে হবে, বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি পরিবেশ উন্নত ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক।

দেশে-দেশে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশেষ আইন কানুন চালু হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাবে পরিবেশ রক্ষার জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে বিশ্ব পরিবেশের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। আমাদের দেশেও প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং কঠোরভাবে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োগ করতে হবে।

উপসংহার ঃ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসযোগ্য রাখার জন্য অবশ্যই আমাদের পরিবেশকে দুষণমুক্ত রাখতে হবে। প্রত্যেক দেশেরই এ ব্যাপারে দায় দায়িত্ব আছে। পরিবেশকে দুষণমুক্ত রাখার জন্য প্রত্যেকটি নাগরিককেই কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাভাষা

সূচনা ঃ মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করতে যেয়ে কবিয়াল রামনিধি গুপ্ত বলেছিলেন –

> “নানা দেশের নানান ভাষা
> বিনা স্বদেশী ভাষা
> পুরে কি আশা?”

না, স্বদেশী বা মাতৃভাষার কোন বিকল্প নেই। এক সময় বিতর্ক ছিল – শিক্ষার মাধ্যম কি হবে বাংলা ভাষা অথবা ইংরেজি ভাষা। এ বিতর্কের আজ অবসান হয়েছে। তর্কাতীত ভাবে আজ মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে।

পটভূমি ঃ আমাদের দেশে আধুনিক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয় ইংরেজ আমলে। দীর্ঘ বিতর্কের পর এদেশবাসীকে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি বড়লাট বেন্টিঙ্কের আমলে গৃহীত হয়। তখন থেকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষার প্রচলন শুরু হয়। তবে সে সময়ও ইংরেজ শাসকদের একটি অংশ ও দেশীয় শিক্ষিত জনের একটি অংশ মনে করতেন মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। বিভাগোত্তর কালেও শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে ইংরেজির আধিপত্য ছিল প্রবল। ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মাতৃভাষা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের সকল কাজে এবং শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে বাংলার দাবি জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বাঙালিরী স্বাধীন আবাসভূমি বাংলাদেশ লাভ করে এবং সংবিধানে রাষ্ট্রীয় সমস্ত কাজ কর্মে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বর্তমান অবস্থা ঃ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাদেশের সংবিধানে মাতৃভাষা বাংলা স্বীকৃত হলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় ভিন্ন অবস্থা বিরাজমান। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে প্রকৌশল, চিকিৎসা, বিজ্ঞান চর্চায় ইংরেজি ভাষা প্রধান মাধ্যম। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগে ভাষার মাধ্যম অবশ্য প্রধানত বাংলাই। অথচ সর্বস্তরে বাংলা হওয়া উচিত ছিল শিক্ষার মাধ্যম।

শিক্ষার মাধ্যমহিসাবে বিদেশী ভাষা ঃ উন্নত দেশের ভাষা অনেক সময়ই স্বল্পোন্নত দেশের শিক্ষার মাধ্যম হতে দেখা যায়। অতীতে অনেক সময়ই বিজয়ী শাসকের ভাষাকে বিজিত ও শাসিত মানুষের শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় কাজের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হলে তা সাধারণত সার্বজনীন হয় না। বিদেশী ভাষা শেখার যে উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যবস্থা প্রয়োজন তাও অনেক সময় থাকে না। ফলে ভাষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বরাবরই অদক্ষ থেকে যায়। ফলে শিক্ষার্থী মুখস্থ করতে বাধ্য হয়।

বিদেশী ভাষাচর্চার আমরা বিরোধী নই। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষাই হওয়া উচিত। কারণ মাতৃভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতা আসলে তবেই, অন্য ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করা প্রয়োজন। মাতৃভাষায় যত সহজে বিদ্যাচর্চা করা সম্ভব বিদেশী ভাষায় তা হয় না। বিদেশী ভাষায় জ্ঞানচর্চার জন্য যে সময় ব্যয় করতে হয়ে তার অর্ধেক সময়েই মাতৃভাষায় সে জ্ঞানচর্চা করা

যায়। তাছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র ও নিরক্ষর। এদেরকে সাক্ষর করা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। এদের অধিকাংশেরই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা নেই এবং অধিকাংশকে দেশের অভ্যন্তরে কাজ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে যদি বাধ্যতামূলক একটি বিদেশী ভাষা শেখাতে হয় – তা হবে নিতান্তই অপচয়।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা ঃ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। বিদেশী ভাষার বাতাবরণ সৃষ্টি করে মানুষকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত। দেশের সর্বত্র যদি শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হয় তবে উপযুক্ত মাধ্যম হচ্ছে মাতৃভাষা বাংলা। কেউ কেউ অবশ্য এরকম যুক্তি দেখান যে বাংলা ভাষা সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার মত উপযুক্ত নয়। বাংলা ভাষায় উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গ্রন্থের অভাব, পরিভাষার অভাব ইত্যাদি। এ সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় কোন ভাষা তো এসব চর্চার উপযোগী হয়ে তৈরি থাকে না। যখন যে ভাষায় জ্ঞানশাখার বিষয়টি চর্চা হয়, তখন সে ভাষা ঐ বিষয়টি চর্চার উপযোগী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে চীনা ও জাপানি ভাষার উদাহরণ সহজেই উল্লেখ করা যায়।

উপসংহার ঃ প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব একটা প্রাণশক্তি থাকে। বাংলা ভাষারও তা আছে। সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অনন্যতা প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষা ও জ্ঞানের সর্বপর্যায়ে বাংলা ভাষার দক্ষতা ও যোগ্যতা পূর্ণ বিকাশের অপেক্ষায় আছে। যাঁরা যে বিষয়টি চর্চা করেন তাদের সাফল্য ও আন্তরিকতার উপরই নির্ভর করে বাংলা ভাষাকে ঐ বিষয়ে বিকশিত করার দায়িত্ব।

আমরা আশা করবো শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য যথার্থ বাহন হবে মাতৃভাষা বাংলা।

শ্রমের মর্যাদা

সূচনা ঃ মানুষে জীবনে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রম দিয়েই মানুষ তার ভাগ্যকে জয় করে। শ্রম দিয়ে মানুষ যেমন আয় উন্নতি বাড়াতে পারে – আর্থিক উন্নতি করতে পারে তেমনি কঠোর শ্রমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষও অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে পারে। তবে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমাজের কিছু মানুষ শ্রমের মর্যাদা দিতে চায় না। কায়িক পরিশ্রমকে অনেকে অবহেলার চোখে দেখেন। ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নে এ দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

শ্রমের গুরুত্ব ঃ মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু না কিছু ভোগ করতে হয়। আর ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে হয় শ্রম দিয়ে তাই বেঁচে থাকার জন্য শ্রম অপরিহার্য। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম ছিল সামাজিক দায়িত্ব। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব আর থাকেনি। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ মতো মানুষ নিজস্ব শ্রমের ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানান পেশা।

অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমের নানা বিভাজন করা হয়েছে। কায়িক পরিশ্রমকে সেখানে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। তাছাড়াও শ্রমের কোনো কোনোটিকে অমর্যাদাপূর্ণ আবার কোনটিকে মর্যাদাপূর্ণ বলে জ্ঞান করা হয়। ভারতীয় প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম বিভাজন করে চারটি বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করা হয়েছিল। পেশা দিয়ে সেকালে উচ্চ বর্ণ ও নিম্নবর্ণ নির্ধারণ করা হয়েছিল।

আমরা জানি, যে সমস্ত দেশ উন্নতি করেছে সে সমস্ত দেশ ও সমাজে সকল শ্রমকে সমমর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। কোন শ্রম ও কাজকেই সেখানে ছোট করে দেখা হয় না বা অবজ্ঞা করা হয় না। শ্রমের ক্ষেত্রে এটিই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

শ্রমের গুরুত্ব ঃ শ্রমের উপর নির্ভর করেই মানব সমাজ বেঁচে থাকে। তাই সমাজে শ্রমের গুরুত্ব অনেক বেশি। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি হয় শ্রমবিমুখ তবে সে সমাজের উন্নতি হয় না। অনুন্নত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উন্নত করতে হলে প্রত্যেকটি নাগরিকের কঠোর শ্রম করার মানসিকতা থাকা দরকার। সমাজ ও রাষ্ট্রের মত ব্যক্তিগত জীবনেও শ্রমের গুরুত্ব খুবই বেশি। ব্যক্তির আর্থিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য কঠোর শ্রমের বিকল্প কিছু নেই। পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি। সৌভাগ্যের অর্জন করতে হলে কঠোর শ্রমের অবশ্যই প্রয়োজন।

মানব সমাজে অসংখ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পেশা লক্ষ্য করা যায়। মানুষে মানুষে শিক্ষা, যোগ্যতা ও দক্ষতার পার্থক্য থাকে। সে অনুযায়ী পেশা নির্ধারিত হয়। যে পেশায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োজন সেখানে নিরক্ষর অথবা অদক্ষ ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে কাজের তারতম্য থাকবে। আবার কর্মের ক্ষেত্রে দেখা যাবে কেউ অল্প পরিশ্রম করেই জীবিকা অর্জন করছে আবার কেউ কঠোর পরিশ্রম করেও ভালভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারছে না। এক্ষেত্রে সমাজ তার ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে কাজকর্ম ও পেশার জন্য উচ্চ নীচু ভেদাভেদ না রেখে সবাই কর্মী হিসেবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। জীবিকা ও পেশার পার্থক্য থাকলেও সবাই কর্মী।

শ্রমবিমুখতা ঃ মানুষের সমাজ ও জীবনের জন্যই শ্রমের প্রয়োজন আছে। তাই শ্রমবিমুখতা কখনও কাম্য নয়। শ্রম বিমুখ হলে ব্যক্তির যেমন উন্নতি বন্ধ হয় এবং তেমনি রাষ্ট্র সমাজেরও ক্ষতি হয়। অবকাশভোগী শ্রমবিমুখ মানুষেরা সাধারণত সুবিধাবাদী হয় অন্যের শ্রমকে তারা চুরি করে সুবিধা লাভ করে। এরা সমাজের পরজীবী। পরজীবী বা পরগাছা যেমন অন্যকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে শ্রমবিমুখ মানুষ তেমনি সমাজের শ্রমকে শোষণ করে বেঁচে থাকতে চায়। শ্রমবিমুখ মানুষ সমাজের ক্ষতি করে ও উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

উপসংহার ঃ মানুষের কল্যাণের জন্যই শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে যে কোন ধরনের শ্রমই হোক না কেন তা অবজ্ঞার নয়। দেশের প্রতিটি কর্মী, যে যে কোন পেশায় অথবা কর্মে নিয়োজিত থাকুন না কেন তিনি সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করছেন। জেলে, তাঁতি, চাষী কেউই ছোট কর্ম করছেন না। কবির ভাষায়–

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল।
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।

বিরাট এই পৃথিবীর কর্মভার বহন করছেন এই কর্মীরা। তারাই মানবসভ্যতা নির্মাণ করেছেন। মানব সভ্যতা তাঁদেরকে অবলম্বন করেই টিকে আছে। সুতরাং তাঁরাই জীবনের ও সমাজের মহৎ কর্মী। এ কর্মীদের শ্রমের প্রকৃত মর্যাদা দিতে হবে। আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতা সীমাহীন। আর্থিক উন্নয়ন, রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নের জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করা দরকার। সকলের শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা যদি আমরা দিতে পারি তবে অচিরে বাংলাদেশ একদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উন্নতদেশে পরিণত হতে পারবে।

অনুসারী রচনা

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

শিষ্টাচার

ভূমিকা ঃ যে সব গুণ মানুষকে মহৎ করে, তার মধ্যে শিষ্টাচার একটি। অন্য মানুষের সঙ্গে ভদ্র আচরণ বা ব্যবহার, সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রকাশ করা ইত্যাদিকেই শিষ্টাচার বলে। যার ব্যবহারে শিষ্টাচার নাই তাকে কেউ পছন্দ করে না। রূঢ় ব্যবহার, কর্কশ কণ্ঠস্বর, দুর্বিনীত ভঙ্গি মানুষের মন্দ দিককে প্রকট করে। অন্যদিকে সুবোধ আচরণ, বিনীত মনোভাব, মধুর ব্যবহার, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ও লৌকিকতা মানুষকে আকৃষ্ট করে। মানুষের জন্য শিষ্টাচার একটি প্রয়োজনীয় গুণ। শিষ্টাচার মার্জিত রুচি ও মনকে প্রকাশ করে।

Courtesy Costs nothing একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। এর অর্থ ভদ্রতা বা সৌজন্যের জন্য কিছু খরচ হয় না। অত্যন্ত সত্য কথা যে মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে, নিজের কোন ক্ষতি হয় না অথবা কিছু ব্যয় হয় না। পরিচিত অথবা অপরিচিত যেই হোন না কেন, তার প্রতি শিষ্টোচিত ব্যবহার করা উচিত।

সমাজে শিষ্ট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক শত্রুতার নয় তা বন্ধুত্বের। শিষ্টাচার বা সৌজন্যমূলক আচরণ মানুষে-মানুষে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সুশীল আচরণ প্রীতি ও ভালবাসার প্রকাশ। সামাজিক লৌকিতা প্রকাশ করাও বিধেয়। সমাজে যা প্রচলিত নয় বা যে আচরণ কাম্য বলে বিবেচিত নয়, তা পরিহার করা দরকার। সমাজের লৌকিকতা পালন ও শিষ্টাচাররের অন্তর্ভুক্ত।

শিষ্টাচার মানব জীবনের একটি গুণ, যা মানুষ চর্চার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। শৈশব থেকেই পারিবারিক পরিবেশে এর চর্চা আরম্ভ হলেই ভাল। পরিবার হচ্ছে ব্যক্তিগত গুণ অর্জনের প্রধানতম ক্ষেত্র, মা-বাবার আচরণ দেখে শিশুরা তাতে আকৃষ্ট হয়। আদব-কায়দা, ভদ্রতা, লৌকিকতা, বাকসংযম ইত্যাদি গুণ শৈশবকালে পারিবারিক পরিবেশেই শিক্ষার সূচনা হয়। পরবর্তী জীবনে যে শিশুটি বড় হয়ে শিষ্ট আচরণ করবে, শৈশবেই তার এ শিক্ষা শুরু না হলে এটি অর্জন করা কঠিন।

শিষ্টাচারকে অনেকে দুর্বলতা বলে ভুল করেন। আসলে শিষ্টাচারের মধ্যে দুর্বলতা কোন সম্পর্ক নাই। মানবিক অন্যান্য গুণের সঙ্গেও শিষ্টাচারের কোন বৈরীতা নেই। যেমন সত্যকথা বলা একটি গুণ। অনেক সময় সত্যভাষণ রূঢ়তা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যভাষণটি যদি পক্ষপাতহীন ও স্বাভাবিকভাবে পরিবেশন করা হয় তবে তা শিষ্টাচারবর্জিত মনে হয় না।

সুনাগরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শিষ্টাচার। পথে ঘাটে চলতে ফিরতে অনেককেই দেখা যায় কঠোর ও অশালীন ব্যবহার করতে। ছিন্ন পোশাক, মলিন বস্ত্র পরিহিত বলেই সে লোকটির প্রতি তর্জন-গর্জন করতে হবে– রিকশাওয়ালা বা ঠেলাগাড়ির চালক বলেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে হবে এমনটি শিষ্টাচার বর্জিত। গাড়ির ঠেলাঠেলির মধ্যে বৃদ্ধটিকে একটু জায়গা দিলে নিজের খুব একটা কষ্ট হয় না। বরঞ্চ এ সৌজন্যবোধ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ করে। সহনশীলতা, ধৈর্য এসব গুণই শিষ্টাচারের অনুষঙ্গ। মানুষর প্রতি ভদ্র আচরণ, সহনশীলতা ও ধৈর্য দিয়ে অন্যের কথাকে বুঝতে চেষ্টা, অন্যকে সাহায্য করা, আন্তরিকতা দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা ইত্যাদি শিষ্টাচারেরই অংশ। পথে ঘাটে, ভ্রমণে-বিশ্রামে, গৃহে অথবা কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই মধুর আচরণ মানুষকে ব্যক্তিত্বশালী প্রিয় মানুষে পরিণত করতে পারে। পৃথিবীতে যাঁরা কর্মে ও ধ্যানে, বিদ্যায় ও দক্ষতায় নিজেদের অনন্যতা প্রমাণ করেছেন তাঁরা সবাই ভদ্র ও শিষ্টাচারের জন্যও আদর্শ স্থানীয়।

উপসংহার ঃ অন্যকে সম্মান করতে পারলে নিজেও সম্মানিত হওয়া যায়। প্রবাদতুল্য এ বাণীকে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। আপনার মধুর ব্যবহার আপনার চারপাশের মানুষকে প্রভাবিত করে। শিষ্টাচার তাই আমাদের জীবন ও সমাজে অবশ্যই চর্চার যোগ্য একটি সৎ গুণ।

অনুসারী রচনা

- ভদ্রতা
- সৌজন্যবোধ

দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা

সূচনা ঃ দেশভ্রমণ মানুষের জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি দিক। দেশভ্রমণ মানুষকে আনন্দ ও শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। দেশভ্রমণ মানুষের মনকে উদার ও উন্মুক্ত করে। এ পৃথিবী যে মানুষের মিলন মেলা দেশভ্রমণ তা বলে দেয়। অপরপক্ষে ঘরকুণো লোক নিজের রচনা করা বৃত্তে আটকে পড়ে বৃহত্তর জীবন থেকে ছিটকে পড়ে।

দেশভ্রমণ কি?

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানই দেশভ্রমণ। দেশে-দেশে অর্থাৎ শুধু বিদেশ নয়, নিজ দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করাও দেশভ্রমণ। আমরা অনেক সময় নিজের দেশটাকেও ভাল করে দেখার সুযোগ করে নিতে পারিনা। এটার অন্যতম

কারণ আমাদের অলসতা উদ্যমের অভাব। নিজের দেশকে ভাল করে জানা অবশ্যই আমাদের কর্তব্য। বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ। কিন্তু আমরা সবাই কি সমুদ্র দেখেছি, অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ে উঠার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি? আমরা অনেকেই আমাদের দেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সাঁওতাল, গারোদের কখনও দেখিনি, তার স্বতন্ত্র জীবনধারা সম্পর্কেও জানিনা। তাই প্রথমেই নিজেদের দেশকে প্রথমে জানা দরকার। তারপরেই বিদেশ ভ্রমণ করা দরকার। এই পৃথিবীর বিপুল বৈচিত্র্য। একজন মানুষের পক্ষে পৃথিবীর সম্পূর্ণ বৈচিত্র্য হয়তো দেখার সুযোগ হয় না। তবুও যতটুকু সম্ভব তা দেখা প্রয়োজন।

শিক্ষা ও দেশভ্রমণ

আমরা শিশুকালেই বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন করি। শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে, কৈশোর, যৌবন পর্যন্ত তাদের নানাবিধ শিক্ষা, বিদ্যা ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ করে তুলতে চেষ্টা করি। শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয় বটে তবে তা পু৭জিগত ও সঙ্কীর্ণ। দেশভ্রমণের সাহায্যে এ সঙ্কীর্ণ শিক্ষাকে বিস্তৃত ও ফলপ্রসু করা যায়। পুঁজিগত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের উন্নয়ন, শিল্পকলা প্রভৃতি সকল বিদ্যারই দর্শকের মনে যে গভীর ও বিস্তৃত চাপ ফেলে যায় তা পুঁজিগত বিদ্যার প্রভাবকে সহজে ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষার সঙ্গে তাই দেশভ্রমণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশভ্রমণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যতালিকা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

আনন্দ ও দেশভ্রমণ

মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ আনন্দ। নিজের ঘরের কোণে আবদ্ধ থেকে মানুষ হাঁপিয়ে উঠে। তখন নতুন মানুষ, নতুন জনপদ ও নতুন প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাবার জন্য মানুষের মন চঞ্চল হয়ে উঠে। আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতাকে পরিহার করার জন্য দেশভ্রমণ অতি প্রয়োজনীয়। দেশভ্রমণ মনকে নবীন করে। দেশভ্রমণের নতুন অভিজ্ঞতা মানুষকে বাঁচাতে শেখায়। বাঁচার উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, বাঁচার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। দেশভ্রমণের আনন্দ তাই তুচ্ছ করবার বিষয় নয়।

দেশভ্রমণ- সেকাল আর একাল

মানুষ কতকাল থেকে দেশভ্রমণ করছে তা বলা মুস্কিল। তবে দেশভ্রমণের প্রথা অনেক প্রাচীন। প্রাচীন কালের ইতিহাসেও দেশভ্রমণকারী পর্যটকদের বিবরণ পাই। অন্য মানুষকে জানা, অজানাকে জানা, নতুন নগরী, পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণা, জলস্রোত, নিসর্গ ও দেশকে জানার জন্যই প্রাচীনকালে মানুষ দেশে দেশে পর্যটন করেছে। তখন কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি, রাস্তায় কোন যানবাহন ছিল না। রেল পথ, আকাশ পথ তখনও স্বপ্নেরও অতীত। তবুও মানুষের দেশ ভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা সব বাধাকে তুচ্ছ করেছে। তখন দেশভ্রমণের তীব্র ইচ্ছার কারণ কবির ভাষায়-

“বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
দেশে দেশে কতনা নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।”

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীময় যোগাযোগ বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব

সূচনা ঃ একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি উজ্জ্বলতম দিন। দিনপঞ্জির সব দিন ও তারিখ ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে সমান গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু এমন কিছু দিন, ক্ষণ, তারিখ থাকে, যা কোনদিন ভোলা যায় না। জাতীয় স্মৃতিতে এমনই অম্লান একটি দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারির উন্মেষ না হলে জাতি হিসাবে

আমাদের আত্মপরিচয় সন্ধান সম্ভব হতো না। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের দিয়েছে আত্ম প্রত্যয়, জাতি হিসেবে উন্মেষের দিশা।

একুশে ইতিহাস

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি দেশের উদ্ভব ঘটে। আমাদের বাংলাদেশ ছিল সেই পাকিস্তানের একটি অংশ। পাকিস্তানী শাসন ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক কায়দায় বাংলাদেশকে শাসন ও শোষণ করা শুরু হয়। পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল বাংলা। অথচ ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালিরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে ও আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে ২১ ফেব্রুয়ারি। ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় ও সকল সভা সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেদিন সভা করে ঐ ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য মিছিল করে। পুলিশ এই অসহায় ছাত্রছাত্রীদের উপর টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্চ ও গুলিবর্ষণ করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিবর্ষণে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার শাহাদত বরণ করেন। পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে সারাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে সালাম, বরকত প্রমুখরা নিহত হয়েছিলেন, সেখানে গড়ে ওঠে শহীদ মিনার। সেটি আজ জাতীয় শহীদ মিনার।

পরবর্তী ঘটনাসমূহ

১৯৫২ সালে ছাত্রজনতার উপর অত্যাচার ও গুলিবর্ষণ বাঙালি নবজাগরণের সূত্রপাত করে। পাকিস্তানের প্রতি অনুমোহ দ্রুত কেটে যেতে থাকে। বাঙালি অনুভব করে জাতীয় সত্তাকে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে। '৬৯ সালে পাকিস্তান বিরোধী ব্যাপক গণ অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৭১ এ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের এ ঘটনাক্রমের সুতিকাগার ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন। ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আবাসভূমি হিসাবে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

একুশে প্রেরণা

বাংলাদেশ যতদিন থাকবে গভীর আবেগ নিয়ে মানুষ একুশকে স্মরণ করবে। কারণ একুশের চেতনা আমাদের উদ্দীপ্ত করেছে দেশপ্রেমে, আত্মত্যাগ করতে শিখিয়েছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে শিখিয়েছে। একুশের প্রেরণাই আমাদের জাতিগঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে। একুশ না হলে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ সম্ভব হত না এবং মুক্তিযুদ্ধ হতো সুদূর পরাহত। এ কারণেই বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবছর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে একুশে ফেব্রুয়ারিকে। গভীর শ্রদ্ধায় নিহতদের স্মরণে ফুলের অর্ঘ্য অর্পণ করে শহীদ মিনারে।

উপসংহার

একুশের চেতনাকে আমাদের জাতীয় জীবনে সংরক্ষণ করতে হবে। এটি যেন গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত না হয় সেদিকে যথাযথ খেয়াল রাখতে হবে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় যে একুশের চেতনা থেকে সঞ্চারিত তা মনে রাখতে হবে। একুশ এর শহীদ মিনার আমাদের জাতীয় জীবনের এক মহান চালিকা শক্তি। সে কথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে। তাহলেই আমাদের যে কোন সমস্যা উত্তরণ হবে সহজ ও সরল। কবির সেই বিখ্যাত গানটি-

> আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
> আমি কি ভুলিতে পারি।

মনে রাখতে হবে এবং একুশের চেতনাকে চিরদিন লালন করতে হবে।

অনুসারী রচনা

- আমাদের ভাষা আন্দোলন
- একুশে চেতনা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	সংকেতের সাহায্যে নিচের রচনাগুলো লিখুন। প্রয়োজনে অন্যান্য বই-পত্রের সাহায্য নিন। শিক্ষক ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রচনা লেখার ব্যাপারে আলোচনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রশ্ন

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১. সূচনা
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি?
৩. বাংলাদেশে কি ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশে এর ক্ষয় ক্ষতি
৫. পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কিভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব
৭. প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা
৮. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার সম্ভাবনা
৯. উপসংহার।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা

১. সূচনা
২. সবার জন্য শিক্ষা
৩. সকলকে সাক্ষর করার মহান উদ্যোগ
৪. সাক্ষরতা অভিযানে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা
৫. সাক্ষরতার উপকারিতা
৬. জনশিক্ষা ও সাক্ষরতার বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা
৭. রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নতি
৮. সাক্ষরতা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে
৯. উপসংহার।

একটি ঝড়ের রাত্রির অভিজ্ঞতা

১. সূচনা
২. কালবৈশাখী ঝড়ের মধ্যে পথে
৩. প্রকৃতির রুদ্ররূপ
৪. অন্ধকার রাত্রে আশ্রয়গ্রহণ
৫. ভুতুড়ে রাতের অভিজ্ঞতা
৬. পরবর্তী সকালে প্রকৃতির শান্তস্নিগ্ধ রূপ
৭. ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে জনজীবনে হাহাকার
৮. কৌতূহলী মানুষের ভিড়
৯. প্রকৃতির বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা
১০. উপসংহার।

একজন বেকারের আত্মকথা

১. সূচনা
২. বেকার কাকে বলে?

৩. জীবন ও জীবিকার সোনালী স্বপ্ন
৪. শিক্ষা শেষে চাকুরির অভাব
৫. চাকুরি প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অভিজ্ঞতা
৬. কেন এই বেকারত্ব? কার দোষ?
৭. আত্মকর্মসংস্থানই আমার ভবিষ্যৎ
৮. নিজের জীবনকে নিজেই গড়তে চাই
৯. উপসংহার।

ট্রেনে ভ্রমণ

১. সূচনা
২. যাত্রারম্ভ
৩. ট্রেনে প্রচণ্ড ভীড়, বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র আচরণ
৪. জংশনে ভুল ট্রেনে উঠে পড়া ও পরে সংশোধন
৫. রাত দশটায় গন্তব্যে পৌঁছানো
৬. উপসংহার।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১. সূচনা
২. বৃত্তিমূলক শিক্ষা কি?
৩. প্রচলিত শিক্ষা সমাজের চাহিদা পূরণে অক্ষম কেন?
৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
৫. বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে বৃত্তিমূলক শিক্ষা
৬. উপসংহার।

পরীক্ষায় দুর্নীতি

১. সূচনা
২. দুর্নীতির বর্তমান অবস্থা
৩. দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ
৪. দুর্নীতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়
৫. সমাজের সকলের দায়িত্ব
৬. শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন
৭. উপসংহার।

বাংলাদেশের পাখি

১. সূচনা
২. বাংলাদেশে কি কি পাখি দেখা যায়
৩. পাখিদের বৈশিষ্ট্য
৪. পাখি ও মানুষ
৫. পাখি পরিবেশ সংরক্ষণ করে
৬. উপসংহার

পহেলা বৈশাখ

১. সূচনা
২. পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ

৩. নববর্ষ উদযাপনের রীতি- দেশে ও বিদেশে
৪. নববর্ষে বাংলাদেশের প্রকৃতি
৫. উৎসব
৬. তাৎপর্য
৭. উপসংহার।

নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. সূচনা
২. নাগরিক কাকে বলে
৩. নাগরিক অধিকার
৪. নাগরিকের দায়িত্ব
৫. উপসংহার।

ইউনিট ৮

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- ভাষণ ও প্রতিবেদনের রূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ভাষণ বা বক্তৃতার সংজ্ঞার্থ ও প্রকৃতি লিখতে পারবেন।
- ভাষণ ও প্রবন্ধের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- ভাষণের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- ভাষণ বা বক্তৃতার খসড়া রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

ভাষণের সংজ্ঞার্থ ও প্রকৃতি

ভাষণ শব্দটির প্রচলিত অর্থ বক্তৃতা। বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসমাবেশে বা অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করতে বক্তা যে বক্তব্য প্রকাশ করেন, তাই বক্তৃতা। ভাষণ সাধারণ পূর্ব নির্ধারিত হয়। তাই এর সুচিহ্নিত খসড়া আগে থেকে রচনা করা যায়। তবে ভাষণ যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল হলেই হয় না, বক্তার উপস্থাপনা কৌশলে বক্তব্য/ভাষণ প্রাণবন্ত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ভাষণ ও প্রবন্ধের পার্থক্য

ভাষণ ও প্রবন্ধের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বেশ কিছু মিল আছে। দুই ক্ষেত্রেই বক্তব্যের বিষয় যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু ভাষণ ও প্রবন্ধ মূলত এক নয়। প্রবন্ধে স্থান কাল পাত্রে অনুল্লেখিত। কিন্তু ভাষণে স্থান কাল পাত্র মুখ্য। একটি বিশেষ জনসমাবেশকে সামনে রেখে ভাষণ পরিকল্পিত হয়। বক্তা তাঁর ভাষণকে আকর্ষণীয় করার জন্য সমসাময়িক ঘটনা ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কোন কোন বিষয়ে তির্যক মন্তব্য বক্তব্য স্মরণ করতে সাহায্য করে। প্রবন্ধ সাহিত্যের অংশ ভাষণের উদ্দেশ্য সাহিত্য সৃষ্টি নয়।

ভাষণের বিভিন্ন অংশ

ভাষণকে বিশ্লেষণ করলে এর ৫টি অংশ লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হচ্ছে (১) সম্ভাষণ বা সম্বোধন (২) প্রস্তাবনা বা বিষয় পরিচিতি (৩) মূল বক্তব্য বিষয় (৪) বক্তব্যের সারাংশ (৫) উপসংহার।

(১) সম্ভাষণ বা সম্বোধন ঃ ভাষণের সূচনায় বা আরম্ভে সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং সভায় উপস্থিত সকলকে সম্ভাষণ বা সম্বোধন জানাতে হয়। সাধারনত মাননীয় সভাপতি বা সম্মানিত সভাপতি, শ্রদ্ধেয় বা শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি, উপস্থিত ভদ্রমন্ডলী বা ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ ইত্যাদি সম্বোধন করতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভা হলে, মাননীয় প্রধান শিক্ষক বা মাননীয় অধ্যক্ষ, মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ ও আমার সতীর্থ ভাই ও বোনেরা বা সতীর্থ ছাত্রছাত্রীরা ইত্যাদি সম্বোধন করা যায়। সভায় উপস্থিতজনকে আকৃষ্ট করার জন্য বক্তা আন্তরিক সম্ভাষণ করে থাকেন।

(২) প্রস্তাবনা বা বিষয় পরিচিতি ঃ সভা বা অধিবেশনের প্রসঙ্গকথা যদিও পূর্বেই ঘোষিত থাকে তবুও বক্তার বিশেষ বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি জানা থাকে না। তাই সম্ভাষণের পরেই বক্তা তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি মূলকথা বলার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা করেন। কোন কোন বক্তা এ সময় বক্তব্য রাখার সুযোগ দেবার জন্য সভায় আয়োজনকারীদের ধন্যবাদও জানান।

(৩) মূলবক্তব্য ঃ বিষয় প্রস্তাবনার পরেই আসে মূল বিষয়। মূল বক্তব্য উপস্থাপনায় একটির পর একটি পয়েন্ট এভাবে আসে যাতে সহজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। দীর্ঘ ভাষণ কোন শ্রোতারই পছন্দ হয় না। বক্তব্য অহেতুক দীর্ঘ না করা ও একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে না বলা বাঞ্ছনীয়। অনেকের কথা বলার সময় মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করা যায়। মুদ্রাদোষ পরিহার করতে হবে।

(৪) সারাংশ ঃ মূল বক্তব্য শেষ হয়ে গেলে বক্তা প্রাঞ্জল একটি সারাংশ বলবেন। এতে শ্রোতাবর্গের কাছে মূল বক্তব্য বুঝতে সহজ হয়। সারাংশ অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হবে।

(৫) উপসংহার ঃ উপসংহারে বক্তা কিছু আবেদন রাখতে পারেন অথবা যে বিষয়টি আলোচিত হল সে প্রসঙ্গে করণীয় কাজের কথা বলতে পারেন।

সুন্দর কথা যেমন মানুষকে আকৃষ্ট করে তেমনি সুন্দর বক্তৃতা ও ভাষণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। কথা ও ভাষণের বিষয়কে যেমন সুন্দর করে তোলা যায় তেমনি উপস্থাপনার কৌশল বক্তৃতার ভঙ্গি, চমৎকার উচ্চারন, ভাষণদানকারীর ব্যক্তিত্ব সব কিছু মিলিযে ভাষণকে একটি শিল্পে পরিণত করতে পারে। চমৎকার ভাষণ প্রদান তাই অনুশীলনের যোগ্য।

ভাষণের কিছু নমুনা

আপনার কলেজে বৃক্ষরোপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের যৌথসভায় একজন শিক্ষার্থীর বক্তৃতা।

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ এবং আমার সতীর্থ শিক্ষার্থী বন্ধুগণ।

ঐতিহ্য লালিত আমাদের এই বিদ্যাপীঠে আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য একত্র হয়েছি। প্রত্যেকটি নর-নারী তার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চায়। আর জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে, চাই সুন্দর পরিবেশ। আর পৃথিবীর পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে হলে চাই বৃক্ষরাজি।

বৃক্ষ মানুষের বন্ধু। মানুষের উপযোগী পৃথিবীর পরিবেশ গড়তে হলে বৃক্ষ আমাদের প্রধান সহায়। বৃক্ষ আমাদের খাদ্য দেয়। বস্ত্র দেয়, ছায়া দেয়, জ্বালানী দেয়। পরিবেশের সহায়ক পাখিদের আশ্রয় দেয়। বৃক্ষ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। পৃথিবীতে বৃক্ষের তুলনা আর কিছু নেই।

আমরা জানি দেশের মোট অঞ্চলের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। না হলে সেদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে না। সেক্ষেত্রে আমাদের মোট বনাঞ্চল দেশের এলাকার নয় ভাগ মাত্র। এর বিষয়ের প্রতিক্রিয়া চারিদিকে পরিস্ফুট। দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমেছে, নদীগুলো আর খরস্রোতা

নয়, তাই পলি জমে নদী মরে যাচ্ছে, বনভূমি দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে, বনভূমির বৈচিত্র্য হারাচ্ছে, বন্যপ্রাণী দিনদিন হারিয়ে যাচ্ছে।

আমরা দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারি যদি আমরা বনায়নের দিকে নজর দিই। আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন নিজেদের বাড়ি-ঘরের চারপাশে গাছ-গাছালি লাগাতে পারি। স্কুল কলেজের আঙ্গিনা, পতিত জমি, ঘরের আশে পাশে প্রচুর গাছ লাগাতে পারি। বনায়ন ও বৃক্ষ রোপনের দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়। এটি জনসাধারণের দায়িত্ব। বৃক্ষরোপনকে আমরা সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে পারি।

এতক্ষণের আলোচনায় আমি আপনাদের বলবার চেষ্টা করেছি বৃক্ষ কি করে আমাদের জীবন যাপনে সহায়তা করে। বৃক্ষের পরিমাণ কেন কমে যাচ্ছে এদেশে কি করে আমরা বৃক্ষের পরিমাণ বাড়াতে পারি।

বৃক্ষ আমাদের বন্ধু, বৃক্ষ আমাদের জীবন বৃক্ষ আমাদের প্রশান্তির উৎস। আসুন, এ কথা মনে করে আমরা আরও বৃক্ষ রোপনে উৎসাহী হই। তাহলে অচিরেই আমরা দূষণমুক্ত পরিবেশ ফিরে পাবে। আমাদের জীবন হবে শঙ্কামুক্ত ও প্রশান্তির।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বক্তৃতা

মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

বছরের সবগুলো দিন আমাদের কাছে সমান গুরুত্ব বহন করে না। কোন কোন দিন আসে ঔজ্জ্বল্যের প্রভা নিয়ে, নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা নিয়ে। আজ পঁচিশে বৈশাখ তেমনি একটি দিন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহৎ কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি– বাঙালির কবি। বাঙালির হাসি-কান্না-দুঃখ -বেদনার এমন রূপকার আর কেউ নেই। প্রাদেশিক সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ সমাধান করেছিলেন বিশ্ব দরবারে। আমাদের সাহিত্যের মানকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দিয়েছিলেন এই রবীন্দ্রনাথই। তাই রবীন্দ্রনাথ আজও হৃদয়ে অবিনশ্বর। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন যেন আমাদের কাছে নতুনের বার্তা নিয়ে আসে। তাই আমরা নতুন করে শপথ নেই তাঁর জন্মদিনের। চির নতুনকে ভালবাসার শপথ। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে– "চির নতুনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ"।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা একটি বিরাট বনস্পতি। তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা বিস্ময়কর। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, গান, প্রবন্ধ – কোথায় নেই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সৃষ্টি সম্ভারের যেদিকে তাকাই সেদিকেই বিপুল বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতির পরিমন্ডলকে রবীন্দ্রনাথ করেছেন ফুলে-ফলে, ঐশ্বর্য, দীপ্তিতে পূর্ণ এক অসাধারণ ক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য দিয়ে আমাদের হৃদয়কে শুধু বিকশিত করেনি – দুর্দিনে তাঁর কবিতা ও গানই দিয়েছে আমাদের দুর্জয়, সাহস ও প্রেরণা। মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল আমাদের প্রেরণার অন্যতম উৎস। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। রবীন্দ্রনাথের এবানীতে আমরা উদ্দীপ্ত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছের মানুষ – ভালবাসবার মানুষ।

আমাদের ভালবাসার এ মানুষটিকে, এ কবিটিকে প্রতি বছর ২৫শে বৈশাখ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করি। তাঁর প্রতিটি জন্মদিনে কবিকে আমরা নতুনভাবে আবিষ্কার করি, নতুন করে উপলব্ধি করি। মনে পড়ে তাঁরই বাণী।

> "পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
> জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
> মৃত্যুদিনের দিকে ....।"

পরিশেষে কামনা করি কবির অমৃত বাণী আমাদের চিত্তকে জাগরূক করুণ, আমাদের চিত্তকে সঞ্জিবীত করুক। সবাইকে ধন্যবাদ।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- প্রতিবেদনের সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রতিবেদন রচনা করতে পারবেন।

প্রতিবেদন শব্দটি ইংরেজি Report শব্দের প্রতিশব্দ। প্রতিবেদন শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধান করে যে, তথ্যমূলক বিবরণী রচনা করা হয়, তাই প্রতিবেদন। প্রতিবেদন কোন ব্যক্তিকে, প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায় অথবা সংবাদপত্রে লেখা হয়। প্রতিবেদনে কিছু কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করলেও মোটামুটি এর কাঠামো নির্দিষ্ট। প্রতিবেদনে তিনটি অংশ থকে। প্রথমটি প্রারম্ভিক অংশ। এখানে বিষয়বস্তুর সূচনা থকে। দ্বিতীয় অংশ – প্রধান অংশ। অর্থাৎ এখানে বিষয়টি পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়। তৃতীয় অংশটি সমাপ্তিসূচক। তবে এখানে থেকে প্রতিবেদন করা হয়েছে যে বিষয়ে সে সম্পর্কে করণীয় বা সম্ভাব্য সমাধান।

নিচের নমুনা প্রতিবেদনগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করুন।

পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন।

মণিরামপুর বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

মণিরামপুর বাজারে(দিনাজপুর) সম্প্রতি এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এতে প্রায় ২৫টি আধা পাকা দোকানঘর সপূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে। ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই কোটি টাকা বলে স্থানীয় জনসাধারণ জানিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২৫শে মার্চ রাত ২টায় অগ্নিকান্ড শুরু হয়। আগুনের সূত্রপাতের কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অভিজ্ঞমহলের অভিমত সিগারেটের আগুন থেকেই একই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত। মাঝরাতে দোকানীদের আর্ত চিৎকার শহরবাসীদের ঘুম ভেঙে যায়। তারা ঘর থেকে বের হয়ে এসে দেখতে পান আগুনের লেলিহান শিখা একের পর এক ঘর গ্রাস করে যাচ্ছে – আর হতভাগ্য ব্যবসায়ীদের কোলাহলে ও আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। মানুষ জন আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আগুণ নেভাতে। কিন্তু আগুণ ততক্ষণ বাগে আনা যায়নি যতক্ষণ না দমকল বাহিনী এসে পৌঁছায়। দমকল বাহিনী প্রায় দুঘণ্টা অক্লান্ত চেষ্টা করে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। কোন ব্যবসায়ীই তাদের জিনিষপত্র দোকান থেকে বের করতে পারেনি। তাদের আর্ত চিৎকার ও আহাজারী করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না।

ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখেছে। স্থানীয় পৌরসভা মার্কেটটি আবার চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও মার্কেটটি পাকা করার ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া প্রয়োজন। না হলে তাদের অনেকের পক্ষেই পুনরায় ব্যবসা শুরু করা সম্ভব হবে না।

কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন

বরাবর
অধ্যক্ষ
সুনামগঞ্জ কলেজ
সুনামগঞ্জ

বিষয় ঃ সুনামগঞ্জ কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

মহোদয়,
আপনার ২৩/১/৯৯ তারিখে প্রেরিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে কলেজ গ্রন্থাগারের বার্ষিক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আপনার সমীপে পেশ করছি।

১। আমাদের কলেজটি ৫০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সূত্রে কলেজ গ্রন্থাগারটিও একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরানো রেকর্ডপত্রে মাত্র ৩০০ শত বই নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল বলে জানা যায়। স্বাভাবিকভাবেই পুরাতন অনেক বই-পত্র গ্রন্থাগারে থাকার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রথম বিশ বছরের বইপত্র আমরা দেখতে পাইনা। তুলনামূলকভাবে নতুন বছরগুলোর বইপত্র কিছু কিছু আছে। তবে সর্বসাকুল্যে এখন বই-এর সংখ্যা ২৩ হাজার। এর মধ্যে বেশ কিছু বই এত জীর্ণ যে পাঠের জন্য ব্যবহার উপযোগী নয়। তাছাড়া বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষকদের জন্য ব্যবহার্য বইয়ের সংখ্যা খুবই কম।

২। গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র অধিকাংশজীর্ণ-শীর্ণ। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের আলাদা ও প্রশস্ত কোন পাঠকক্ষ নেই।

৩। এখানের গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। তাই বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গ্রন্থগার পরিচালনার রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি অনভিজ্ঞ।

৪। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বই সরবরাহের কোন নীতিমালা নেই।

এ অবস্থায় নিম্নলিখিত সুপারিশ করছি যাতে গ্রন্থাগারটি ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের যথার্থ উপকারে আসে।

১. গ্রন্থাগারটির আধুনিকীকরণ করতে হবে। জীর্ণ বইগুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করতে হবে। সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তক ক্রয় করতে হবে।

২. পাঠাগারে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের বসার স্থান প্রশস্ত করতে হবে ও পাঠের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

৩. গ্রন্থাগারের সমস্ত বই বৈজ্ঞানিক উপায়ে তালিকাকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে ও প্রয়োজনীয় লোকবল বাড়াতে হবে।

৫. গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

এ প্রতিবেদন তৈরি, অনুসন্ধান ও তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদসহ জানাচ্ছি।

আপনার বিশ্বাসভাজন

আশরাফ হোসেন
প্রভাষক- অর্থনীতি বিভাগ
সুনামগঞ্জ কলেজ
সিলেট।

১লা মার্চ, ১৯৯৯

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নীচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে আয়োজিত একটি সভার জন্য একটি ভাষণের খসড়া তৈরি করুন।
২. আপনার কলেজের একজন অধ্যাপকের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে একটি ভাষণ রচনা করুন।
৩. "বই পড়া কেন প্রয়োজন"– সম্পর্কিত একটি আলোচনা সভার জন্য ভাষণ রচনা করুন।
৪. একুশে ফেব্রুয়ারির একটি সভার জন্য ভাষণের খসড়া তৈরি করুন।
৫. নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি ভাষণ তৈরি করুন।
৬. কলেজের 'নবীন বরণ' অনুষ্ঠানের জন্য একটি ভাষণ তৈরি করুন।
৭. ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজীয়তা সম্পর্কে সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন রচনা করুণ।
৮. আপনার কলেজে খেলাধুলার মান উন্নয়নের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।
৯. সাম্প্রতিক একটি দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।
১০. বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করুন।
১১. কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।
১২. আপনার শহরে নাগরিক সুযোগ সুবিধা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম

ইউনিট ৯

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারবেন।
- ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম রচনার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ভাবসম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক সর্ম্পকে অবহিত হবেন।
- ভাবসম্প্রসারণ রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

ভাবসম্প্রসারণ শব্দের অর্থ ভাব বা বক্তব্যকে সম্প্রসারণ বা দীর্ঘায়িত করা। সাহিত্যের সঙ্গে ভাবের একটি সম্পর্ক আছে। ভাব ছাড়া সাহিত্য হয় না আর সাহিত্য ছাড়া ভাব প্রকাশ করা যায় না। লেখক ও কবি ভাষার কারিগর। ভাষার মাধুর্য ও দীপ্তি সৃষ্টিতে তাঁরা তৎপর। যথার্থ ভাবের সঙ্গে যখন যথার্থ ভাষার সম্মিলন হয় তখনই তা হয় অপূর্ব সৃষ্টি। এ সৃষ্টির সৌন্দর্য উজ্জ্বলতা, প্রভাব ইঙ্গিতময়তা ও ব্যঞ্জনা পাঠকের মনকে করে আলোকিত ও উদ্দীপ্ত। একটি বাক্যের গভীরতর অর্থের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে গভীর ভাবের বীজ। এ বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ভাবের প্রকৃত তাৎপর্য।

ভাবসম্প্রসারণ শব্দের অর্থ ভাবের সম্প্রসারণ করা বা বিস্তৃত করা। ভাবময় দীপ্তিতে উজ্জ্বল বাক্য বিশ্লেষণ করলে যে নানাবিধ বক্তব্য ও বক্তব্যের বিশ্লেষিত রূপ পাওয়া যায় তাই ভাবসম্প্রসারণ। বাক্যের অস্ফুট তাৎপর্যকে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করার নামই ভাবসম্প্রসারণ।

ভাবসম্প্রসারণ করার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলুন

১. প্রদত্ত অংশটি বারবার পড়ুন ও মূলভাব ও তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করুন।
২. প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ জানার চেষ্টা করুন ও উপমা, রূপক ও অলঙ্কার বুঝবার চেষ্টা করুন।
৩. কবি/লেখকের নাম অথবা অমুক বলেছেন- এ সব লিখবেন না।
৪. প্রদত্ত অংশটির সাধারণ অর্থ লিখুন পরে তার মূল তাৎপর্য।
৫. মূলভাবকে স্পষ্ট করার জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবেন।
৬. ভাবের পরম্পরা যুক্তিসহ লিখুন।
৭. অপ্রাসঙ্গিক কোন কথা লিখবেন না ও পুনরাবৃত্তি করবেন না।
৮. প্রারম্ভিক বাক্যটি শ্রতিমধুর ও মুল লক্ষ্য অভিমুখী করে প্রয়োগ করুন।
৯. প্রবাদ প্রবচন, উক্তি ব্যবহার করতে পারেন তবে তা হতে হবে নির্ভুল।
১০. ভাবসম্প্রসারণের বাঁধা ধরা আয়তনের কোন নিয়ম নাই। মোটামুটি দশ থেকে পনেরটি বাক্য লিখুন।

নমুনা

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

উপরের কবিতার লাইন দুটি পড়ুন। নিম্নরেখ শব্দগুলোর অর্থ জানা আছে কিনা দেখুন। যদি জানা না থাকে তবে লাইন দুটি বারবার পড়ে ও চিন্তা করে দেখুন সম্ভাব্য অর্থ কি হতে পারে? পরে অর্থগুলো মিলিয়ে দেখুন, আপনার উত্তর কতটুকু ঠিক হয়েছে?

হেরি – দেখে, দেখিয়া
ক্ষান্ত – বিরত, থেমে থাকা
কমল – পদ্মফুল
বিনা – ছাড়া, ব্যতীত
মহীতে – পৃথিবীতে

এখন কবিতাংশটি আক্ষরিক অর্থ লিখতে হবে। সেটি এরকম হতে পারে।

কমল বা পদ্মফুল অত্যন্ত সুন্দর। বাংলাদেশের বিল, ঝিল, দিঘি, সরোবরে প্রচুর পদ্মফুল ফোটে। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের সৌন্দর্যে মনে হয় জলাশয়গুলো হাসছে। পদ্মফুলের সৌন্দর্যে এগুলো সংগ্রহ করার আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এগুলো সংগ্রহ করা কঠিন। প্রথমত, পদ্মফুল সংগ্রহ করতে হলে পানিতে নামতে হবে, দ্বিতীয়ত, পদ্মফুলের মৃনাল বা ডাঁটা থাকে কাঁটায় ভরা। পদ্মফুল নিতে হলে তাই সইতে হয় কাঁটার আঘাত। পদ্মফুল যত সুন্দরই হোক তাকে পেতে হলে পানিতে নামার কষ্ট, সেই সঙ্গে কাঁটার আঘাত সইতে হবে।
দু:খ আর সুখ – দুটোর অবস্থানই কাছাকাছি। পৃথিবীতে দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ করা যায় না।

বিশেষ অর্থ এরকম হতে পারে–
পৃথিবী কঠিন কর্মক্ষেত্র। কঠিন জীবন সাধনার মধ্য দিয়েই এখানে সাফল্য আসে। বিনা পরিশ্রমে, বিনা কষ্টে এখানে কোন কিছুই অর্জন করা যায় না। জীবন কুসুম শয্যা নয়। জীবনের প্রতি পদে আছে দুঃখ-কষ্ট ও ব্যর্থতার চোরাবালি। কিন্তু তাই বলে জীবন পথের পথিক থেমে থাকে না। জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য অর্জন করা যাঁদের ব্রত তাঁরা বন্ধুর পথ ও দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েই পথ চলেন। আর এ মনোভাব ও মনোবলের কারণেই তাঁদের জীবনে আসে সার্থকতা ও সাফল্য।

“কে লইবে মোর কার্য? – কহে সন্ধ্যারবি
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।”

সারাদিন পৃথিবীতে আলো বিকিরণ করেছে সূর্য। সন্ধ্যার সময় হয়েছে তার অস্ত যাবার। কিন্তু এখন পৃথিবীকে কে আলো দান করবে? সূর্যের দায়িত্ব কেউ নিল না। জগৎ উত্তরহীন হয়ে রইলো। শুধু মাটির প্রদীপ। যার আলো দেবার

ক্ষমতা খুবই কম, সে নিজের সাধ্য অনুযায়ী কাজ করার সম্মতি দিল। সূর্য প্রকান্ড, তার ক্ষমতাও বিপুল। সূর্য সারাদিন আলো দিয়ে মানুষ ও জীবজগৎকে সচল রাখে। পৃথিবীতে আরও অনেক বড় বড় শক্তি আছে। আকাশস্পর্শী পর্বতচূড়া আছে, দুর্গম অরণ্য, বিশাল সমুদ্র আছে– কিন্তু কেউই পৃথিবীকে আলো দিতে পারে না। বিশাল আকৃতি হয়েও সূর্যের দায়িত্বভার তারা নিতে পারে না। তাই সকলেই নিরুত্তর ও লজ্জায় মলিন। সেই মুহূর্তে ক্ষুদ্র দীপ শিখা তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

মানুষের ও সমাজের কল্যাণ সব মানুষই করতে পারে। লোক সেবার আগ্রহটাই এখানে বড় ব্যাপার। অনেক বড় মানুষ যা পারেন না– একজন সামান্য মানুষও তা করতে পারেন। একজন ধনী মানুষ যে কাজে ভয়ে পিছিয়ে যায় মহৎ উদ্দেশ্য থাকলে সে কাজে একজন সাধারণ দীন মানুষও সফল হতে পারেন। মহৎ ইচ্ছা থাকলে ক্ষুদ্র হয়েও মানুষের জন্য অশেষ কল্যাণকর কাজ করা যায়। পরের মঙ্গল কামনা ও কল্যাণ সাধনের ব্রত থাকলে সামান্য মানুষকে দিয়েও মানব সমাজের অসামান্য প্রয়োজন মিটাতে পারে।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

যে অন্যায় করে ও যে নির্বিচারে অন্যায়কে সহ্য করে দুজনই সমান অপরাধী। বিধাতার ঘৃণা যেন দুজনের উপরেই সমানভাবে বর্ষিত হয়। অন্যায় আচরণকে সহ্য করার মধ্যে কোন মহত্ত নাই। ক্ষমা নিঃসন্দেহে মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। কিন্তু নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য যদি ক্ষমা করা হয় তবে তা হয় চরিত্রের দুর্বলতা। সহনশীলতা তখন ব্যর্থতারই নামান্তর হয়। অন্যায়কারীর অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে অন্যায়কারী প্রশ্রয় পায় ও তার অত্যাচার ক্রমশ বেড়ে যায়। অত্যাচারে প্রতিবাদ করতে পারাটাই সেখানে প্রয়োজন। অন্যায় যে করে সে দোষী এবং ঘৃণিত কিন্তু যার উপরে অন্যায় করা হচ্ছে সে যদি সহনশীলতা ও ক্ষমার নামে তা সহ্য করে যেতে থাকে তবে অত্যাচারিতও হবে সমান হারে দোষী। পৃথিবীর সকল ধর্মেই সহনশীলতা ও ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যায়ের প্রতিবাদের কথাও বলা হয়েছে। অন্যায়কারীকে প্রতিহত করার যার ক্ষমতা আছে তিনিই মাত্র প্রয়োজনে ক্ষমা করতে পারেন। ভীরু ব্যক্তির জন্য ক্ষমা দুর্বলতামাত্র। বিধাতার দৃষ্টিতে অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী দুজনেই সমান অপরাধী। বিধাতার কাছে দুজনই ঘৃণিত।

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে

ভাই বলে ডাকো যদি গলা দিব টিপে

হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা

কেরোসিন শিখা বলো - এস মোর দাদা।

কেরোসিন শিখা ও মাটির প্রদীপ উভয়েরই কাজ আলো বিতরণ করা। সেদিক থেকে তার একই শ্রেণীভুক্ত। তবে মাটির প্রদীপের চাইতে কেরোসিন শিখা জোরালো এবং বেশি জায়গায় আলো ছড়ায়। কেরোসিন শিখা প্রদীপ্ত কিন্তু মাটির প্রদীপের আলো নিস্প্রভ ও ম্লান। দুজনের উদ্দেশ্য একই – অন্ধকার দূর করা। তবে তাদের কাজের মাত্রা ভিন্ন। কিন্তু কেরোসিন শিখা মাটির প্রদীপকে সমগোত্রীয় ও আত্মীয় বলে মনে করে না। কেরোসিন শিখার মধ্যে আছে বড়ত্বের অহঙ্কার ও গর্ববোধ।

রাতের বেলা চাঁদ পৃথিবীকে তার স্নিগ্ধ আলো দান করে। বহু দূরবর্তী উজ্জ্বল চাঁদকে কেরোসিন শিখা তার সমগোত্রীয় ও আত্মীয় বলে মনে করে। তাই আকাশে চাঁদ উঠলেই কেরোসিন শিখা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। চাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা গড়তে কেরোসিন শিখার আগ্রহের কোন অভাব নেই। কিন্তু পৃথিবীর সমগোত্রীয় ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপের প্রতি অবহেলা দেখায় ও অস্বীকার করে।

কেরোসিন শিখার এ ব্যবহার মানব সমাজেও দেখা যায়। কিছু মানুষ আছে যারা দরিদ্র ও হীনাবস্থায় পতিত মানুষকে অস্বীকার করে। হয়তো তাদের কেউ তার নিকটাত্মীয় কেউ প্রতিবেশি। কিন্তু তাদেরকে অবহেলা করে দূরের ধনী-মানী,

ক্ষমতাশালী লোককে আপনজন হিসাবে বিবেচনা করে ও আত্মীয় বলে পরিচয় দেয়। এরকম মনোভাব যে সব মানুষের তারা কখনও সৎ নয়। তাদের অবিবেচনা ও বিকৃত রুচির জন্য মানব সমাজে ধিকৃত হয়ে থাকেন।

বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

পৃথিবীর পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবন পথে চলতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তি, বিঘ্ন ও বিপদ আছে। সংসারের দুঃখ দৈন্যকে অস্বীকার করে জীবন পথে চলতে হয়। জীবনের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে আছে বিপদের নানা ক্ষেত্র। তাই বলে জীবন সংগ্রামে মানুষ কোন দিন পিছপা হয়নি। বিপদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই মানুষ পৃথিবীতে টিকে আছে। সুখ আর দুঃখ জীবনের এপিঠ আর ওপিঠ। দুঃখের ভয়ে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া মানুষের আদর্শ হতে পারে না। তাই জীবন যুদ্ধে মানুষ কখনও পলাতক নয়। মানুষ মাত্রই জীবনবাদী।

একারণেই বিধাতার কাছে কবির প্রার্থনা – বিপদ থেকে আমরা ভয়ে যেন পালিয়ে না যাই। বিপদের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বাঁচতে চাই। সেই সঙ্গে আরও প্রার্থনা ,দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা-সান্ত্বনার দরকার নাই। বরং আমরা চাই যেন নিজের প্রাণশক্তি দিয়ে দুঃখ, তাপকে কষ্ট ও ব্যথাকে পরাজিত ও উপেক্ষা করতে পারি।

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনির কাছ ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

ধ্বনি বা শব্দ থেকেই প্রতিধ্বনি বা প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়। ধ্বনিটি আসল, প্রতিধ্বনি নকল। ধ্বনির জন্ম না হলে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হতো না। তাই প্রতিধ্বনি ধ্বনির কাছে ঋণী। এই ঋণ যেন অন্যের কাছে ধরা না পড়ে সেজন্য প্রতিধ্বনি দূর থেকে ধ্বনিকে বারবার ব্যঙ্গ করে। নিজের ঋণকে অস্বীকার করার জন্য ও নিজের জন্মরহস্য যেন অন্যের কাছে ধরা না পড়ে সেজন্য সে সদা তৎপর। প্রতিধ্বনি প্রচার করতে চায় সে স্বয়ংসম্পূর্ণ-সৃষ্টি তার স্বাভাবিকভাবে। উপকারীর উপকারকে অস্বীকার করার মধ্যে প্রতিধ্বনির ক্ষুদ্রতা সহজে ধরা পড়ে।

মানুষের সমাজেও একশ্রেণীর লোক দেখা যায় যারা উপকারীর উপকার প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের সমাজে একজন মানুষ অন্য মানুষের উপর নির্ভরশীল হবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে যদি মানবিকতা, দয়াশীলতা অন্যের উপকার করার চেতনা – যদি না থাকত তবে মানুষ সমাজে বসবাসের উপযোগী থাকতো না। কোন কিছুর প্রত্যাশা না করেই মহৎ ব্যক্তি অন্যের উপকার করে। কিন্তু যদি উপকৃত ব্যক্তি যদি সে উপকার বা ঋণকে অস্বীকার করে, তবে তা হবে মারাত্মক অপরাধ। ঋণ স্বীকার করলে উপকৃত ব্যক্তিটির সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হয় না। নিজের প্রয়োজনটি ফুরিয়ে গেলে অনেকেই কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয়। উপকারী ব্যক্তির ক্ষতি ও সুনাম নষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তাতে অবশ্য মহৎ ব্যক্তির কোন ক্ষতিই হয় না। মহৎ ব্যক্তিকে ছোট করতে যেয়ে কৃতঘ্ন ব্যক্তি নিজের হীনতাকেই আরও বেশি করে প্রকাশ করে দেয়।

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে বিকশিত করিও।

পুষ্পের সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ হই। তাই পুষ্প বা ফুল মানুষ মাত্রেরই প্রিয়। পুষ্পের বুকে পরবর্তীকালে বেঁচে থাকার জন্য বীজ থাকে বটে; তবে বীজধারণই পুষ্পের প্রধানতম উদ্দেশ্য নয়। পুষ্পের সুরভি ও সৌন্দর্য প্রকৃতির অসামান্য দান। ফুলের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ মানুষকে মোহিত করে। যে মানুষ নিজে ফুলের সুবাস নিতে ভুলে যায়, বাতাস তাকে

পৌঁছে দেয় ফুলের বার্তা – ফুলের গন্ধ। ফুলের সুগন্ধ ও সৌন্দর্য কিছুই তার নিজের জন্য নয়। সবই অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য-অন্যের ভাল লাগার জন্য।

পুষ্পের ফোটার সঙ্গে মানুষের হৃদয় কুসম বিকশিত হওয়ার একটি সাদৃশ্য বা মিল আছে। যে মানুষ মহৎ, যার মন বিকশিত হয়েছে – ফুলের মতই তার হৃদয়ও সুবাস ছড়ায়। মানুষের উপকারে লাগাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ যে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, নিজের স্বার্থ উদ্ধারই যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সে প্রকৃত মানুষ নয়। মহৎ কর্মে যে মানুষটি নিয়োজিত, অন্য মানুষের বিপদ আপদে যে নিজের বুক পেতে দেয় – এমন মানুষকেই সমাজ কামনা করে। মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত ফুল। ফুল নিজের জন্য নয় অন্যের জন্য তার নিজের যা ঐশ্বর্য অকাতরে বিলিয়ে দেয়। মানুষেরও তেমনি উচিত নিজের কথা চিন্তা না করে অন্য মানুষের উপকারে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। তাই ফুল যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হয় তেমনি মানুষের হৃদয় কুসুমকেও বিকশিত করতে হয়।

মন সজীব রাখিতে হইলে বিস্ময়বোধ জাগ্রত রাখিবে।

পৃথিবীর পাঠশালায় বিস্ময়কর বস্তুর অভাব নাই। আমরা যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখতে পাই অফুরন্ত বিস্ময়কে। প্রকৃতির মধ্যে সামান্য তৃণ থেকে প্রাণীকুলের জীবনধারণের যে আনন্দ সুদূর আকাশে গায়ে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত যে রহস্যময়তা সর্বত্রই এক অলৌকিক আনন্দ বিরাজিত। মানুষ পৃথিবীর এক দুর্বল ছোটখাট প্রাণীমাত্র। কিন্তু সে বুদ্ধিমান প্রাণী। আর এ বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে তার বিস্ময়বোধ বা কৌতূহল থেকে। মানুষের মধ্যে যদি কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ না থাকত তবে বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হত না। শিশুকে যেমন আমরা দেখি – অপার বিস্ময়বোধ নিয়ে প্রথমে তার পরিবেশ তারপর বিশাল পৃথিবীকে ক্রমশ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। মানুষ একদিকে চিরশিশু। মহাবিশ্বের মহারহস্যের প্রায় কিছুই মানুষের এখনও জানা নেই। বিস্ময়বোধে মানুষের একরকম আনন্দ আছে। বিশ্বের অপরূপ সৌন্দর্য, রূপ ও শোভা মানুষকে মুগ্ধ করে। সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা মানুষকে বিস্মিত করে।

মানুষের বিস্ময়বোধ যতদিন জাগ্রত থাকে ততদিনই মানুষ পদবাচ্য। যে মানুষের আর কিছু জানার নেই, অনুভব করার শক্তি যে মানুষের নেই সে মানুষ মৃত মানুষের শামিল। মনকে রাখতে হয় সজীব ও সচল। যখন মানুষের মন মরে যায় তখন সেখানে আর কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ থাকে না। অল্প বয়সেই মনের মৃত্যু ঘটতে পারে। মনের এ মৃত্যুকে রোধ করতে হলে মনকে রাখতে হয় সজীব ও টাটকা। আর মানুষের মন ততদিনই সজীব থাকে যতদিন তার মধ্যে থাকে বিস্ময়বোধ ও কৌতূহল। মানুষের মন থেকে যেদিন সমস্ত রকমের কৌতূহল বিলুপ্ত হয় সেদিনই প্রকৃত মৃত্যু ঘটে যায়। জীর্ণদেহেও সজীব মন থাকতে পারে যদি সেখানে কৌতূহল চির জাগ্রত থাকে। অজানাকে জানার আগ্রহই মানুষের জীবনের চলার একমাত্র সঙ্গী।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে।

নদী নিরবধি বয়ে চলে। নদীর এপার আর ওপার – কখনও এক হবার নয়। সমান্তরাল রেখার মত দুইপার নির্দিষ্ট ব্যবধানে যেন ছকে বাঁধা। নদীর দুইপারে শহর বন্দর গ্রাম। সেখানে নানা মানুষ জীবন তাদের হাসিকান্না আনন্দ বেদনায় পরিপূর্ণ। জীবনের কোলাহল দুই তীরেই অভিন্ন। তারপরও নদীর এপারের মানুষ বেদনার নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মনে করে ওপারেই যত সুখ আনন্দ কোলাহল জীবনের উচ্ছ্বাস। অনুরূপভাবে ওপারের মানুষ মনে করে – নিজেদের জীবন হতাশায় নিমগ্ন – যতসুখ আর আনন্দ সবই ওপারে। নদীর এপারের মানুষও সুখী নয় – ওপারের মানুষও সুখী নয়। দুইপারের লোকই ভাবে তারা দুঃখী। দূরের বাদ্যি-বাজনা মধুর শোনায়। তেমনি দূরের জীবনযাত্রাও মধুর মনে হয়। কাছের জগৎ নিরেট বাস্তব, দূরের জগৎ স্বপ্নময় ও মধুময়। দূরের জগৎই মানুষের কাছে চিরদিন –"ছায়াসুনিবিড়। শান্তির নীড়"।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু না কিছু অতৃপ্তি থাকে। তাছাড়া মানুষ নিজেকে দুঃখী ও অন্যকে সুখী ভাবতে অভ্যস্ত। সুখ-দুঃখবোধ নিতান্তই আপেক্ষিক ব্যাপার। তারপরও অন্যের প্রতি প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা একটা অশুভ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। অন্যের চেয়ে ধন সম্পদ বিত্ত অনেক সময় বেশি থাকলেও পরের সম্পদের উপর লোভ-লালসা থাকে পুরোমাত্রায়। কাল্পনিক একটা অভাববোধ মানুষের হৃদয়কে মাঝে মাঝে এমন গ্রাস করে ফেলে যে সে অন্যকে তার চেয়ে সুখী ও সম্পদশালী ভাবতে থাকে। এই অতৃপ্তি অভাববোধ মানুষকে শান্ত ও স্থির হতে দেয় না। এ মনোভাব তাকে চিরকাল তাড়িত করে – যেখানে জীবনের ভাগ্যে জড় হয় অতৃপ্তি আর অবিশ্বাস – ঈর্ষা আর বিদ্বেষ।

বন্যের বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

সৌন্দর্য নির্দিষ্ট আধার বা অবয়বকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়। সৌন্দর্য দেখা ও উপভোগ করার জন্য দৃষ্টি ও মনি থাকা প্রয়োজন। মানুষ স্বভাবত সৌন্দর্য প্রিয়। কিন্তু সব সৌন্দর্যই সকল মানুষকে সমান আকৃষ্ট করে না। ফুলের সৌন্দর্য সার্বজনীন। এতে আকৃষ্ট হয় না এমন লোক খুঁজে পাওয়া হয়তো ভার। কিন্তু বন্যজন্তুর হিংস্রতা ও ক্ষিপ্রতা, উদ্ধত ভঙ্গিতে যে সৌন্দর্য আছে তা হয়তো সবাই খুঁজে পায় না। অরণ্য ও বনের একটি সৌন্দর্য আছে। এমন কি অরণ্যবাসী বন্য জীব জন্তুরও একটি সৌন্দর্য আছে। না হলে মানুষ অরণ্যে বিচরণশীল বন্য জীবজন্তু দেখতে যায় কেন? তবে এখানে মনে রাখা দরকার বন্য সৌন্দর্য বনেই মানায় ভাল সেখানেই সৌন্দর্যের প্রকৃত বিকাশ। চিড়িয়াখানায় লোহার খাচায়, বন্যপ্রাণী আটকে রাখা যায় বটে। কিন্তু সেখানে বন্য সৌন্দর্যের প্রকৃত প্রকাশ ঘটে না।

সৌন্দর্যের আধার সম্পর্কে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। শিশুরা আমাদের খুব প্রিয়। আর শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় তার মা। মায়ের কোলে শিশু যখন হাত পা নেড়ে খেলে তখন এ দৃশ্যটি আমাদের মন ও চোখকে বেশি তৃপ্তি দেয়। শিশু যদি হয় অযত্নেলালিত, যদি শিশুটি অবহেলায় পড়ে থাকে তবে সে শিশুকে দেখে আমরা আনন্দিত হইনা বড়জোর শিশুর জন্য কৃপাবোধ জাগে।

চিড়িয়াখানায় বন্দী বন্যপ্রাণীর যেমন বন্য সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয় তেমনি মাতৃক্রোড়হীন অনাদৃত শিশুর মধ্যেও আমরা প্রকৃত সৌন্দর্য খুঁজে পাইনা। তাই একথা যথার্থ যে বন্যদের বনের মধ্যে শোভন আর শিশুরা শোভন মায়ের কোলে।

১

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

সঙ্কেত ঃ শিক্ষা কি , শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? শিক্ষা মানুষকে কিভাবে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। অশিক্ষার কুফল কি- অশিক্ষা মানুষের জীবনযাত্রাকে কিভাবে অনুন্নত করে রাখে। পৃথিবীব্যাপী মানব-জাতির উন্নতিতে শিক্ষা কিভাবে ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। একটি জাতি কতটুকু উন্নত তা তার শিক্ষার মান দেখেই বোঝা যায়। শিক্ষার কোন বিকল্প নাই।

২

সততাই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি

সততা কি – সততা কিভাবে মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টি করে। দুর্নীতিহীন সাধুতা জীবনের জন্য প্রয়োজন। সততার জন্য দুঃখ কষ্ট নির্যাতন ভোগ করতে হলেও শেষ পর্যন্ত সাধুতারই জয় হয়। সাধু ব্যক্তি নিঃস্বার্থ বলে তার শত্রু কম। একান্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া সৎজীবন যাপনকারীর সাধুতা ও সততা সম্পর্কে কেউ অবিশ্বাসী হয় না। সৎ ও সাধু জীবনাচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তি নির্মল জীবনের আনন্দ পেয়ে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে যেমন তেমন জাতীয়ভাবেও সততা ও সাধুতা উন্নতিতে সহায়তা করে।

৩

দুঃখের মত বড় পরশ পাথর আর নাই

সঙ্কেত ঃ দুঃখ মানুষকে সচেতন করে। আমরা সব সময়ই সুখ চাই – কিন্তু দুঃখ সব সময় সুখের পাশাপাশিই থাকে। দুঃখ মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে শাণিত করে। দুঃখ জড়তা ও স্থবিরতা থেকে মুক্তি দেয়। দুঃখের আগুণে পুড়ে মানুষ বৃহৎ ও মহৎকে অনুভব করতে পারে।

পরশ পাথর হচ্ছে সেই পাথর – যা দিয়ে অন্য ধাতুকে স্পর্শ করলে তা সোনায় রূপান্তরিত হয়। দুঃখ তেমনি পরশ পাথর। এর ছোঁয়ার মানুষ হয় মূল্যবান ও সোনার মত নিখাদ। দুঃখের স্পর্শে সামান্য মানুষ হয় অসামান্য।

৪

তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ, দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না।

সঙ্কেত – তেলা মাথায় তেল দেওয়া একটি বাংলা প্রবাদ। আমাদের সমাজে ধনী ও বিত্তশালী মানুষ যাদের প্রচুর ধনসম্পদ আছে তাদেরই খাতির যত্ন বেশি করে। বিনা প্রয়োজনে তাদের তোয়াজ তোষামোদ করা হয়। অপ্রয়োজনে তাদের সাহায্য করার জন্য মানুষ এগিয়ে আসে।

সমাজে ধনী ছাড়াও আছে দরিদ্র মানুষ। অনেক দিনই তাদের ক্ষুধার অন্ন, পরিধেয় বস্ত্র জোগাড় হয় না। নানারকম অভাবের তাড়নায় তারা দিশেহারা। এ সমস্ত মানুষকে কিন্তু আমরা সাহায্য করি না। হয়তো তাদের কাছে প্রতিদান পাওয়া যাবে না অথবা দীন দরিদ্র মানুষ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না বলেই তাদের আমরা তুচ্ছ করি। পক্ষান্তরে যাদের সাহায্যের দরকার নেই এবং যারা ধনী ও ক্ষমতার অধিকারী আমাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদেরই তোয়াজ তোষামোদ করি।

৫

দন্ডিতের সাথে
দন্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

মানুষ সমাজের বিকাশ সাধন করেছে। সমাজকে গতিশীল ও শৃঙ্খলামন্ডিত রাখার জন্য নিয়ম কানুন তৈরি করেছে। সমাজের নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থাও রেখেছে। দন্ডিত যেন সংশোধিত হতে পারে সেজন্যই তাকে দন্ডদান। দন্ডিতের প্রতি কোন আক্রোশ অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দন্ডদান করা হয় না। বিচারক বা দন্ডদাতা নিষ্ঠুর হন না। বৃহত্তর কর্তব্য সাধনের জন্যই তিনি দন্ডদান করেন। দন্ডিত দন্ড ভোগের ভয়ে কাঁদে। দন্ডদাতা দন্ডিতের মতই সমান আঘাতে কাঁদেন। দুজনেই যখন কাঁদেন তখন তা হয় শ্রেষ্ঠ বিচার।

৬

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে কলঙ্ক যা আছে তা আছে মোর গায়ে।

সূদূরের চাঁদ পৃথিবীকে আলো দেয়। তার গায়ে যে কলঙ্কের ছাপ আছে তা পৃথিবীকে স্পর্শ করে না।

মানব সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা চাঁদের আলো বিকীরণ করার মতই নিজেকে বিলিয়ে দেয় জগতের কল্যাণে। যা কিছু সহায় সামর্থ্য অকাতরে তা তারা বিলিয়ে দেয়। নিজেদের দুঃখ বেদনা অপূর্ণতা ও ব্যর্থতাকে চেপে রেখে জগতের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে তাঁরা কাজ করে যান।

৭

যত বড় হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা
আমি ভালবাসি মোর ধরনীর
প্রজাপতিটির পাখা।

কল্পনা ও বাস্তবে অনেক পার্থক্য। আকাশের ইন্দ্রধনু যত মায়াবী হোক তা ধরাছোয়ার বাইরে। দূর থেকে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারি। রঙিন প্রজাপতি কিন্তু বাস্তব এবং আমাদের প্রতিদিনের দেখা ধরনীর অধিবাসী। পৃথিবীর রূপ সৌন্দর্যকেই আমরা ভালবাসি। দূরের মোহনীয় সৌন্দর্য অপেক্ষা নিকটের সৌন্দর্য অনেক আকর্ষণীয়।

৮

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুটি
সত্য বলে তবে আমি কোথা দিয়ে ঢুকি?

ভ্রম অথবা ভুল কর্মজীবনে হতেই পারে। তবে ভুল হয়েছে বলে মানুষ কর্মত্যাগ করে নিজেকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। ভুলকে রুখতে যেয়ে সত্য যেন হারিয়ে না যায়। ভুলের ভয়ে নিশ্চেষ্ট থাকলে ঠিক কাজটিও তো হবে না।

অনুশীলনী

নিচের ভাবসম্প্রসারণগুলো নিজে নিজে লিখুন

১. মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

২. নানান দেশের ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?

৩. যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

৪. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

৫. পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোন ছুতা
জাননা সূর্যের সাথে আমার শত্রুতা।

৬. যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

৭. জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর

৮. গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন
নহে বিদ্যা নহে ধন, হলে প্রয়োজন।

৯. শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

১০. মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়

আড়ালে তার সূর্য হাসে
হারা শশীর হারা হাসি
অন্ধকারেই ফিরে আসে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- সারাংশ ও সারমর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সারাংশ ও সারমর্ম রচনার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

সারাংশ/সারমর্ম

মানুষের সমাজ জীবনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা অন্যের সঙ্গে কথা বলি, অন্যকে চিঠিপত্র লিখি। এসবই ভাষার সাহায্যে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা। অথবা বলা যেতে পারে নিজের মনের ভাবনা বা ভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া। একেই বলে ভাবের আদান প্রদান। ভাষা ঠিক এ কাজটিই করে- যাকে আমরা বলতে পারি ভাবের আদান-প্রদান।

ভাব বা ভাবনা সব সময় একরকম হয় না। তাই এর ভাষাও একরকম হয় না। তাছাড়া যা বলছি বা যা লিখছি অবস্থাভেদে তার গভীরতা ও বিস্তৃতি সব সময় সমান হয় না। আমরা কম-বেশি সবাই রেডিও, টিভি শুনি ও দেখি। আপনি নিশ্চয় খেয়াল করে দেখেছেন যখন আমরা সংবাদ শুনি তখন সংবাদের মূল কথাগুলিই মাত্র শুনি। যেমন ধরা যাক একটি সংবাদ “ আজ সকাল ৫টায় চট্টগ্রাম সমুদ্র উপকূলে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এখন পর্যন্ত হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি।” এ দুবাক্যের সংবাদের উপর যখন সংবাদ ভাষ্য বা বিবরণ প্রকাশ করা হয় তখন কিন্তু অনেক বেশি কথা বলা হয়। যেমন ধরুন ঘুর্ণিঝড় সতর্ক সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে কিনা, ঘুর্ণিঝড় পূর্ব কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, উপকূলে কতটা বিস্তৃত অঞ্চলে ঝড়টি আঘাত হেনেছে, আঘাত হানার আগে সারাদিনের আবহাওয়া কেমন ছিল, যে অঞ্চলে আঘাত হেনেছে সেখানে আশ্রয় কেন্দ্র আছে কিনা ইত্যাদি। সংবাদ ও সংবাদভাষ্যের মূল বক্তব্য এক হলেও ভাবপ্রকাশে ভাষার পরিস্থিতি অনেক পার্থক্য আছে। অর্থাৎ জানা গেল প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা বক্তব্যের মূল ভাবকে কখনও ছোট করে উপস্থাপন করি কখনও বিস্তৃত বা বড় করে উপস্থাপন করি। আবার দেখুন আমরা যখন লিখি তখনও ছোট বড়র ব্যাপারটিকে অনুসরণ করি। যেমন ধরুন টেলিগ্রাম ও চিঠির কথা। একই ভাব বা বক্তব্য দুটো মাধ্যমেই পাঠানো যায়। যদি একটি টেলিগ্রাম হয় এরকম মা অসুস্থ, তাড়াতাড়ি এসো। টেলিগ্রামের ঠিক এ বক্তব্যকে যদি আমরা চিঠিতে পুরে পাঠাই তবে অবশ্যই আমরা আরও বিস্তৃত করে লিখি। চিঠিপত্রের আঙ্গিক বা কাঠামো অনুসরণ করেই মূল বক্তব্যের সঙ্গে নিশ্চয় আমরা আরও লিখব - মা কবে থেকে অসুস্থ, কি ধরনের অসুখ, ডাক্তার দেখেছেন, হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে কিনা ইত্যাদি আরও জরুরি বিষয়।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় জানা গেল – প্রয়োজনমত ভাষাকে আমরা ব্যবহার করি। মূল ভাব বা ভাবনা কখনও সংক্ষিপ্ত করেও কখনও বিস্তৃত করে প্রকাশ করতে পারি। ভাষার অনেক গুণের মধ্যে এটি একটি প্রধান গুণ যে ভাষাকে আমরা সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত দুভাবেই প্রয়োগ করতে পারি। ভাষার এগুণ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

সারাংশে ও ভাবসম্প্রসারণ লিখন প্রকৃতপক্ষে ভাষার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত করে লেখার পদ্ধতির নাম। আগে যেমন আমরা দেখলাম একটি বিষয়কে প্রয়োজন মোতাবেক সংক্ষিপ্ত বা ছোট করে এবং বিস্তৃত বা বড় করে লেখা যায়। সাধারণভাবে

সংক্ষিপ্ত বা ছোট করে লেখার নামই সারাংশ আর বিস্তৃত বা বড় করে লেখার নামই ভাবসম্প্রসারণ। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনেই ভাষার এ গুণকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। সঠিকভাবে সারাংশ ও ভাবসম্প্রসারণ লিখনের জন্য আমাদের বিশেষ কতকগুলো দিকে নজর রাখতে হবে।

সারাংশ শব্দের অর্থ 'সার' অংশ বা 'মূল' অংশ। যে কোন একটি লেখা পড়লে আমরা দেখতে পাই, লেখকের মনের মূলভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূল ভাবের সহায়ক অনেক কথা বলতে হয়। একটি ভাবকে যথার্থ ও সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। সে লেখাটির মূল কথা বা সার কথা বা সারবস্তুই আসলে সারাংশ। ইংরেজিতে তিনটি শব্দ আমরা লক্ষ করি Summary, Substance ও Precis এ শব্দগুলোর যথার্থ বাংলা শব্দ নাই। এ শব্দটির সঙ্গে ভাব অনুষঙ্গও এক নয়। এ তিনটি ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সারাংশ নয়। তবে সারাংশ বলতে যে কাজটি বোঝায় তার সঙ্গে ঐ শব্দগুলোর মিল আছে। Summary লিখতে বললে মূল অংশের অর্ধেক, Substance এ মূলের এক তৃতীয়াংশে বা তিন ভাগের এক ভাগ ও Precis মূল অংশের চার ভাগের একভাগ লিখতে হয় Precis এ একটি শিরোনাম ও দিতে হয়। সারাংশ লিখতে আমরা মূল অংশের তিন ভাগের এক ভাগ লেখা উচিত। তবে সারাংশের আকৃতির দিকে যেমন নজর দিতে হবে তেমন নজর দিতে হবে তার প্রকৃতির দিকেও। সারাংশে মূলভাবটি যথার্থ ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করাটাই মূল বিষয়। বাহুল্য কথার মধ্য থেকে মূল কথাটি খুঁজে বের করাই সারাংশ লেখার উদ্দেশ্য।

সারাংশ লিখন চর্চার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে।

১. প্রদত্ত অনুচ্ছেদ অথবা কবিতাংশটি বারবার পড়ে মূলভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
২. উদ্ধৃত অংশের মূলভাবের বাক্য/বাক্যগুলি চিহ্নিত করুন।
৩. উপমা, উদাহরণ, উদ্ধৃতি ও রূপক আলাদাভাবে চিহ্নিত করুন।
৪. সারাংশ লিখনের সময় লেখার আয়তনের দিকে লক্ষ্য রাখুন।
৫. মূলভাবটি যথাযথ ও সহজ বাক্যবিন্যাসে লিখুন।
৬. উপমা, রূপক উদ্ধৃতসহ সকল বাহুল্য বর্জন করুন।
৭. একই কথার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে লক্ষ্য করুন।
৮. উদ্ধৃতাংশটি কোন কবি বা লেখকের সেটি বলার দরকার নেই।
৯. প্রথম বাক্যটি হবে সহজ সরল ও মূলভাবের প্রতি নির্দেশক।
১০. সারাংশটি লেখা হলে কয়েকবার পড়ে নিশ্চিত হন যে প্রয়োজনীয় কোন কিছু বাদ যায়নি।

ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। সারাংশ রচনায় ভাষা পড়ে বুঝতে পারা ও সংক্ষিপ্ত করে লেখা এ দুটি বিষয়ের দক্ষতা প্রয়োজন হয়। এ দক্ষতা অর্জন করতে হলে সারাংশ রচনার অনুশীলন করতে হবে।

সারাংশ রচনার নমুনাগুলো ভাল করে পড়ুন

১

কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়,
কামড়ের চোটে বিষ দাঁত ফুটে বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার, তারি সাথে হায়, জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে বলে সে ভৎর্সনা ছলে কপালে রাখিয়া হাত,
"তুমি কেন্ বাবা ছেড়ে দিলে তারে, তোমার কি নেই দাঁত"

কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল, "তুই রে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের পায় দংশি কেমন করে?
কুকুরের কাজ কুকুরের করেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কুকুরের কামড়ানো কি রে মানুষে শোভা যায়?

সারমর্ম ঃ ক্ষমা মানুষের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। কোন হীন ও নীচ ব্যক্তি তাঁর অনিষ্ট করলেও তিনি রাগান্বিত হয় প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। তিনি বরং ক্রোধকে দমন করে উদারতার পরিচয় দেন। তিনি জানেন হীন ও নীচের মত ব্যবহার করলে নিজেকেও হীন হয়ে যেতে হয়। তাই তিনি তা করেন না।

২

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোকে কালো অক্ষরের শিকলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা যদি সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া ভঙ্গ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে। হিমালয়ের উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যুৎ মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিতে মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কিন্তু কে জানত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে পুরিয়া রাখিবে। কে জানিতো মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী রাখিবে। অতলস্পর্শী কালো সমুদ্রের উপর কেবল একখানা বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

সারাংশ ঃ বহু যুগের বহু কবি, লেখক, শিল্পী, চিন্তাবিদের কথা কল্পনা, আশা আকাঙ্খা বইয়ের মধ্যে লিখিত হয়ে আছে। মহাসাগরের বুকে যেমন আছে তরঙ্গের ধ্বনি তেমনি মানব সমাজে আছে আনন্দ বেদনার মত্তকোলাহল। মানুষ এসবকেই কালো অক্ষরে বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। সমুদ্র তরঙ্গের মত বইয়ের ভিতরে আছে কোলাহল যদি শোনা যেত তাহলে তা কি প্রচন্ড তা অনুভব করা যেত। মানুষ যেমন বিদ্যুৎকে লোহার তারে বেঁধেছে তেমনি মানুষ তার ভাব ও ভাবনাকে কালো অক্ষরে বেঁধে রেখেছে। অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে মানুষ বই দিয়ে সেতু রচনা করেছে।

৩

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান,
কণ্টক-মুকুট শোভা: দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী খুরধার
বাণী মোর শাপে হর তরবার।
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস-প্রাণ
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান

যতবার নিতে যাই-হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি, কর পান! শুন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক।

সারমর্ম ঃ দারিদ্র্যের জ্বালাযন্ত্রণায় পৃথিবী বিরস হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য জীবনকে করেছে সৌন্দর্যহীন ও কুৎসিত। কিন্তু এ দারিদ্র্যই আবার দিয়েছে স্পষ্ট বলার দুরন্ত সাহস। বাণীকে করেছে খ্রিস্ট্রের মত সম্মান। অকামে শুকিয়ে দিয়েছে জীবনের রস, রূপ, প্রাণ। দারিদ্র্যের অভিশাপে বীণা হয়েছে তরবারি।

৪

বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুইপা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

সারমর্ম ঃ মানুষ অনেক কষ্ট করে অনেক অর্থ ব্যয় করে পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি দেখতে যায়। কিন্তু ঘরের কাছেই ধানের শীষের উপর শিশির বিন্দুর যে সৌন্দর্য তা দেখা হয় না। সৌন্দর্য শুধু বহুবিস্তৃত অদেখা দেশ ও জনপদেই থাকে না - নিজের দেশের গন্ডিতে ও নিজ লোকালয়েও সৌন্দর্যের বিচিত্র বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

৫

সার্থক জনম মোর জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে।
জানি না তোর ধন রতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় বসে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল
কোন বনেতে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।

সারাংশ ঃ জন্মভূমি সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। জন্মভূমি ধনী না দরিদ্র এটা বিবেচনা না করেই সকলে গভীরভাবে স্বদেশকে জন্মভূমিকে ভালবাসে। মাতৃভূমির মত এত সুন্দর দেশ পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। তাই জন্মভূমির সৌন্দর্যে হৃদয় মন জুড়িয়ে যায়। জন্মভূমিতে মৃত্যুবরণ করতে পারাও একটা আনন্দের ব্যাপার বলে মনে হয়।

৬

বার্ধক্য তাহাই - যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার-শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন, শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অটল সংসারের পাষাণস্তূপ আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে; আলোক-পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলকে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে। জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে, জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে

যাহার আজ কঙ্কালসার, বৃদ্ধ তাহারাই। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি, যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন।

সারাংশ ঃ বার্ধক্য ও যৌবন বয়স দিয়ে নির্ণয় করা যায় না। পুরাতন ও মিথ্যাকে যাঁরা আঁকড়ে থাকে তারাই বৃদ্ধ। যারা সংস্কারে আবদ্ধ, জড়তায় স্থবির, প্রাণ কোলাহলে ও নতুনত্বে ভীত তারাই বৃদ্ধ। নতুন যুগ ও জীবনকে যারা গ্রহণ করতে পারে না বয়সে তারা যুবক হলেও বার্ধক্য তাদের গ্রাস করেছে। বয়সে জীবনের অগ্রগতিকে যারা সাগ্রহে গ্রহণ করতে পারে তারাও যৌবন ও তারুণ্যের প্রভাব আলোকিত।

৭

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কিছু বাড়ল তাতে?
আপনারে যে ভেঙ্গে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক ফাঁকি, মেকি সেজন - নামটা তার কদিন বাঁচে?

সারাংশ ঃ সব মানুষেরই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। পরের ভাষা, ভঙ্গি, চলা, বলা নকল করে মানুষ সং সাজতে পারে। এতে করে নিজেকে নিজে অপমান করা হয়। বিধাতা সবাইকে আপন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পরের অনুকরণ করলে নিজস্ব গুণ ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটে না।

৮

থাকবো নাক বন্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে, ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।
কেমন করে পারলে পাথার লক্ষ্মী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে
কিসের অভিমানে মানুষ চড়ছে হিমালয়ের চূড়ে
তুহিন মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চলে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে।

সারাংশ ঃ মানুষ ঘরকুণো নয়। প্রকৃতির রহস্যময়তা তাকে হাতচানি দিয়ে ডাকে। অজানা দেশ, পাহাড় পর্বত, মরুভূমি, জনপদের মানুষকে জানার আশায় মানুষ চিরকাল ছুটছে। বাধাবিপত্তি এমন কি মৃত্যুও মানুষকে এ ছুটে চলা থেকে বিরত করতে পারেনি। অতল গভীর সমুদ্র থেকে হিমালয়ের চূড়াপর্বত সর্বত্রই মানুষের গতিবিধি। চাঁদের অচিন লোক থেকে দূরগ্রহের অন্বেষণে মানুষ মরণ পণ করে ছুটছে। অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা মানুষের চিরকালের ব্রত।

৯

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতকর্ণেরও অভাব নেই। এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত

থাকি, এই বিশ্বাসে যে, যেখানে থেকে তারা একটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে বাকী জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণ সাপেক্ষ; অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারে ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয় - ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। মনোরাজ্যের ঐশ্বয্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্যেক করতে পারেন, তার বুদ্ধি বৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জাগ্রত করতে পারেন এর বেশি আর কিছু পারেন না।

সারাংশ ঃ শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। শিক্ষা নিজেকে অর্জন করতে হয়। তাই সুশিক্ষিত লোকমাত্রই নিজের দ্বারা নিজে শিক্ষিতা। শিক্ষক কাউকে বিদ্বান অথবা শিক্ষিত করে তুলতে পারেন না। ছাত্র যাতে শিক্ষা অর্জন করার যোগ্য হয়ে উঠে এটিই শিক্ষকের লক্ষ। শিক্ষক শিক্ষার্থীর কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করতে পারেন। বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে দিতে পারেন, জ্ঞানের পিপাসাকে বাড়িয়ে দিতে পারেন। এক কথায় শিক্ষার্থীর অন্তরের সুপ্ত শক্তিগুলোকে শিক্ষক জাগিয়ে তুলতে পারেন। বিদ্যার সাধনার কাজটি শিক্ষার্থীকেই করতে হয়।

বাংলা ব্যাকরণ ঃ প্রাথমিক কথা

ইউনিট ১

প্রস্তাবনা ঃ

ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম, মানুষে-মানুষে বন্ধন ও যোগাযোগের উপায় হল ভাষা। ভাষা মানুষের কর্ম ও চিন্তার, শিক্ষা ও জ্ঞানের, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অবলম্বন। ভাষা ছাড়া মানুষকে ভাবাই যায় না। পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর ভাষা এক নয়। নানান দেশের নানান ভাষা। এক এক জায়গায় এক এক ভাষা গড়ে উঠেছে। সেই স্থানের মানুষের দীর্ঘদিনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাষার গাঁথুনি স্থায়ী রূপ পায়। মানুষ মুখে মুখে ভাষা ব্যবহার করে। তারপর দেখা যায় এই ভাষার মধ্যে রয়েছে কিছু নিয়ম-কানুন। এই নিয়মগুলো বিধিবদ্ধ করে ভাষার মধ্যে শৃঙ্খলা আনার প্রয়োজন রয়েছে।

ভাষার নিয়ম কানুনগুলোকে সূত্রবদ্ধ করার যে বিদ্যা রয়েছে তাকে বলা হয় ব্যাকরণ।

ভাষা সৃষ্টি হয়েছে আগে, তারপর ব্যাকরণ। প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণ আছে, বাংলা ভাষারও আছে।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণকে বলা হয় বাংলা ব্যাকরণ।

আমরা সবাই বাংলা ভাষা ব্যবহার করি। সেজন্য বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে জানার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বাংলা ব্যাকরণ পাঠ বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক কাজ। বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার যাবতীয় প্রসঙ্গ ও নিয়মশৃঙ্খলা আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ ঃ ভাষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- ভাষার রূপবৈচিত্র্যের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।

মানুষ ভাষা বিশিষ্ট প্রাণী। মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি ও ভাবনা চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করে। ভাষা হল মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া অর্থবোধক ধ্বনি-সমষ্টি। ধ্বনি উচ্চারণের সুবিধার জন্য মানুষের শরীরে নানা সহায়ক অঙ্গ আছে। যেমন- ফুসফুস, গলনালি, স্বরতন্ত্রী, মুখগহ্বর, জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি। এগুলোর নাম বাক-প্রত্যঙ্গ।

বাক-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে মানুষ ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং কথা বলে।

ধ্বনিতে ধ্বনিতে মিলে হয় শব্দ, আর শব্দে শব্দে মিলে হয় বাক্য। ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য দিয়ে মানুষ কথা বলে। তাহলে মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া কথাই হল ভাষা।

ভাষার সাহায্যে এক মানুষ অপর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তার মনের ভাব প্রকাশ করে, সুখ-সুবিধার কথা জানায়। এভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সখ্য ও প্রীতি গড়ে ওঠে এবং এভাবে মানুষের সমাজও গঠিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে,

মানুষের কথা অর্থাৎ ভাষা, সমাজ গড়ার সব চাইতে জরুরি উপাদান।

মানুষ ভাষা দিয়ে সমাজ তো গড়েই, তা ছাড়া শিক্ষার্থী ও জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শনের পথেও অগ্রসর হয়। মানুষ তার মনের নানা স্বপ্ন-কল্পনা ও সূক্ষ্মভাব ভাষায় প্রকাশ করে। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ কবিতা, গান, উপাখ্যান, গল্প ইত্যাদি সাহিত্যও তৈরি করে। অর্থাৎ মানুষ যে সভ্য ও সংস্কৃতিবান হয় তার মূলে রয়েছে ভাষা। ভাষা মানুষের সকল অনুভূতি ও জ্ঞানের বাহন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি।

মানুষ অন্যভাবেও মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। যেমন- মাথা নেড়ে, হাতের ইশারায়, চোখের ইংগিতে, শব্দ করে, অর্থাৎ নানা ভঙ্গিতে ও মুদ্রার সাহায্যে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এসব ইশারা ইংগিত ভাষা নয়। ভাষাকে অর্থগ্রাহ্য হতে হয় এবং কথা বলার মধ্যে ভাষা পূর্ণতা পায়। সেজন্য বোবা মানুষের অব্যক্ত ধ্বনি কিংবা পশু-পাখির বিচিত্র ডাক ভাষা নয়; কারণ এগুলো বোধ্য নয়। তাহলে ভাষার সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এইরূপে−

ভাষার সংজ্ঞা

মনের ভাবচিন্তা ইচ্ছা অনুভূতি উপলব্ধি ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য যখন মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে মুখ দিয়ে অর্থগ্রাহ্য ধ্বনি, শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে তখন তাকে ভাষা বলা হয়।

পৃথিবীর সকল মানুষের ভাষা কিন্তু এক নয়। পৃথিবীতে নানান ভাষা আছে। এক এক অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক আবহ মানুষের ভাষা ভঙ্গিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সেজন্য এক এক অঞ্চলের এক এক ভাষা। আবার একই ভাষার মধ্যেও দেখা যায় নানা পার্থক্য। ভাষা প্রতি পনর বিশ মাইল অন্তর-অন্তর কিঞ্চিৎ পালটে যায়। উচ্চারণে, কথ্যভঙ্গিতে এবং শব্দ ব্যবহারে পরিবর্তন দেখা যায়। আবার সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গেও ভাষার পরিবর্তন হয়। একশ বছর আগের আর একশ বছর পরের ভাষা এক নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের ভাষা গড়ে উঠেছে। প্রাচীন কালে গ্রীক, সংস্কৃত, ল্যাটিন, আবেস্তা ইত্যাদি ভাষা ছিল বিখ্যাত। এই ভাষাগুলো এখন আর প্রচলিত নেই। এগুলো এখন মৃত ভাষা। আধুনিক পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, চীনা, জাপানি, আরবি, ফারসি, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি। বর্তমানে ইংরেজি এক নম্বর আন্তর্জাতিক ভাষা। বাংলা ভাষাও ঐতিহ্যমন্ডিত। এই ভাষার রয়েছে সমৃদ্ধ সাহিত্য। বাংলাদেশের, পশ্চিমবঙ্গের, ত্রিপুরার, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের কিছু অংশের এবং মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলের অধিবাসীরা বাংলাভাষী। বাংলা এখন বিশ্বের নানান জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। বৃটেন, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি অঞ্চলে এখন প্রচুর বাংলা ভাষী অভিবাসী। এরা স্থানীয়ভাবে বাংলা পত্রপত্রিকা ও বই পুস্তক বের করছে; সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্মেলন ইত্যাদিও করছে। সুতরাং বাংলা ভাষার চর্চা হচ্ছে বিদেশ বিভূঁইয়েও। এখন পৃথিবীর বিশ পঁচিশ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে।

মুখের ভাষা, লেখার ভাষা

মানুষকে ঘরে বাইরে সব জায়গাতে কথা বলতে হয়। ঘরের লোকজনের সঙ্গে সে কথা বলে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বলে, পাওনাদারের সঙ্গে বলে, দোকানদারের সঙ্গে বলে। রান্না ঘরে, বৈঠকখানায়, বাজারে-হাটে, রাস্তা-ঘাটে, অফিসে, স্কুলে-কলেজে, বন্ধু বান্ধবদের আড্ডায়, বাস রেল স্টেশনে, চায়ের দোকানে, খেলার মাঠে, পার্কে আরো কত জায়গায় কত প্রয়োজনে মানুষকে কথা বলতে হয়।

মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া ভাষা হল মুখের ভাষা।

মুখের ভাষার সাহায্যে এক মানুষ আরেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আদান প্রদান ও ভাব বিনিময় করে। মুখের ভাষা বলা ও শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তা স্থায়ী নয়। মুখের ভাষা সহজে হারিয়ে যায়।

ভাষাকে স্থায়ী করার জন্যই লেখার রীতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

লেখার জন্য উচ্চারিত ধ্বনিগুলির প্রতীক রূপের (Symbol) প্রয়োজন। যেমন আমরা যে ধ্বনিকে 'ক' বলে উচ্চারণ করছি তার লেখ্য প্রতীক হল 'ক'। মুখে বলছি 'র', এর লেখ্য রূপ ''র। এইভাবে প্রতীকগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– অ, আ, ই, উ, ক, জ, ট, ত, ম, শ, হ ইত্যাদি। প্রায় সব ভাষার এই রকম লেখ্য ধ্বনি প্রতীক আছে, যেমন– ইংরেজি A, B, C, D ইত্যাদি; আরবি ইত্যাদি। এভাবে কোন ভাষাকে লেখ্য রূপ দিতে হলে ধ্বনির প্রতীক রূপ বর্ণ (Letter)থাকতে হবে। বর্ণমালা (alphabets)বলতে বোঝায় সবগুলো বর্ণকে একত্রে। বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যুক্ত হয়ে কোন বস্তু, ভাব, ক্রিয়া ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করলে তা হয় শব্দ; শব্দের সঙ্গে শব্দ দিয়ে আমরা বাক্য তৈরি করি। এই শব্দ বা বাক্য ধ্বনি প্রতীকের রূপে লিখিত হতে পারে পায়। তাহলে লেখ্য ভাষা বা লিখিত ভাষা হল, –

ধ্বনি প্রতীকের সাহায্যে লিখিত রূপে পাওয়া ভাষা।

শিষ্ট ভাষা, উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, সাহিত্যের ভাষা

একটি দেশের শিক্ষিত ও ভদ্রশ্রেণী মানুষের ব্যবহার উপযোগী যে বিশেষ ভাষার প্রচলন রয়েছে তাকে বলা হয় শিষ্ট ভাষা বা মান ভাষা বা প্রমিত ভাষা।

বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষেরা অফিসে আদালতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে কিংবা ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় যে ভাষায় কথা বলে তা শিষ্ট বা মান ভাষা। অন্যদিকে একই ভাষা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করে। যেমন বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, ইত্যাদি এলাকার ভাষা যে বাংলা ভাষা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার পার্থক্য আছে। উচ্চারণের টানটুনে সে পার্থক্য বোঝা যায়। সে জন্য চট্টগ্রামের ভাষা আর সিলেটের ভাষা এক নয়। নোয়াখালির ভাষা আর ঢাকার ভাষা এক নয়। তাহলে আঞ্চলিক ভাষা বলতে বোঝায়, –

কোন দেশের অঞ্চল বিশেষের লোকজনের ব্যবহার্য ভাষা।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও অন্যান্য গদ্য রচনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তা সাহিত্যের ভাষা।

সাহিত্যে মানুষের ভাব, চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি ও কল্পনার সুন্দর রূপায়ন ঘটে। সেজন্য সাহিত্যের ভাষা হয় মার্জিত ও পরিশীলিত। সব সময় শিষ্ট বা মান ভাষাতে সাহিত্য রচিত হয়। দেশের শিক্ষিত মানুষ সাহিত্যের পাঠক। তাদের জন্যই সাহিত্যে সর্বজনীন মান ভাষার ব্যবহার হয়। তবে বর্তমানে জীবনের নিরেট বাস্তবতা প্রকাশের প্রয়োজনে সাহিত্যে বিশেষ করে গল্পের, উপন্যাসের ও নাটকের চরিত্রের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে সাহিত্য জীবনধর্মী হয়। শুধু বাংলার নয়, পৃথিবীর সব উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ভাষায় মানরূপ এবং আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভাষার ব্যবহার রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'মানুষ ভাষা বিশিষ্ট প্রাণী' - এ কথা বুঝিয়ে লিখুন।
২. ভাষার কি কি কাজ?
৩. ভাষার সংজ্ঞা দিন।
৪. পৃথিবীতে বহু ভাষার সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে?
৫. পৃথিবীর মৃত ভাষাগুলোর নাম লিখুন। আধুনিক ভাষাগুলোরও তালিকা দিন।
৬. কোন কোন অঞ্চলের লোক বাংলায় কথা বলে?
৭. মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।
৮. শিষ্ট বা মান ভাষা আর আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।
৯. বাক-প্রত্যঙ্গ কি? কয়েকটি বাক-প্রত্যঙ্গের নাম লিখুন।

উত্তর

প্রশ্ন ঃ 'মানুষ ভাষা বিশিষ্ট প্রাণী' - এ কথা বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর *॥* মানুষ এমন এক ধরনের বিশেষ প্রাণী যার ভাষা আছে। অন্য প্রাণীরও ভাষা আছে মনে করা হয়। যেমন পাখির কিচিরমিচির, বিড়ালের মিউ মিউ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, গরুর হাম্বা ধ্বনি। কিন্তু এই শব্দগুলো একেবারেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ পাখি কিচির মিচির করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না; তেমনি কুকুর ঘেউ ঘেউ কিংবা গরু হাম্বা হাম্বা করা ছাড়া অন্য কোন শব্দ করতে পারে না। তাছাড়া এই শব্দগুলো যে অর্থ বহন করে তাও বোধগম্য নয়। কিন্তু মানুষ তার আবেগ, অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, কামনা-বাসনা সবই ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। মানুষের ভাষা অর্থপূর্ণ এবং বিচিত্র ভাব প্রকাশক। মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টি অর্থাৎ তার কথাই হল তার ভাষা। ভাষা দিয়ে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। এই জন্য বলা হয়েছে 'মানুষ ভাষা বিশিষ্ট প্রাণী'।

প্রশ্ন ঃ ভাষার কি কি কাজ?

উত্তর *॥* ভাষার সাহায্যে মানুষ নিজের মনের ভাব অন্যকে জানায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হল ভাষা। এতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক হয়, সম্প্রীতির জন্ম হয়। কার কি সুবিধা বা অসুবিধা তাও জানা যায় ভাষার মাধ্যমে। এভাবে ভাষা মানুষের সমাজ গড়ে তোলে। মানুষের সমাজ গড়ার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হল ভাষা। সমাজ গড়া ছাড়াও সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতিতে ভাষার প্রয়োজন সর্বাধিক। ভাষার সাহায্যে মানুষ লেখা পড়া শেখে, জ্ঞান-অর্জন করে, সাহিত্য সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে বহু ভাষার সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে?

উত্তর *॥* পৃথিবীতে বহু ভাষার প্রচলন রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীতে এত ভাষা কেন? পৃথিবীতে বহু মানবগোষ্ঠী আছে এবং তারা পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এক এক জায়গার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন, তাছাড়া নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন। এইসব কারণে ভাষার মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়। বহু দিনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এক এক মানবগোষ্ঠীর ভাষা নির্দিষ্ট রূপ পায়। তখন আমরা এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পার্থক্য সহজে বুঝতে পারি। পৃথিবীতে বহু ভাষার সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মানুষদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে।

প্রশ্ন ঃ মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ॥ মানুষ নানা প্রয়োজনে কথা বলে। মুখ থেকে বের হওয়া এই ভাষা হল মৌখিক ভাষা। মুখের ভাষার সাহায্যে এক মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে সরাসরি ভাবের আদান-প্রদান করে। মুখের ভাষা বলা ও শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুখের ভাষাকে লেখ্য রূপ দিলে তা হয় লিখিত ভাষা। লেখার জন্য মুখের উচ্চারিত ধ্বনিকে প্রতীক রূপ দেওয়া হয়। যেমন অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হয় বর্ণ। বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোগে শব্দ হয়, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি হয়। এইভাবে ধ্বনি প্রতীকের সাহায্যে ভাষা লেখ্য রূপ পায়।

প্রশ্ন ঃ শিষ্ট বা মান ভাষা আর আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

উত্তর ॥ দেশের লেখা পড়া জানা লোকজনের ব্যবহার উপযোগী মার্জিত ভাষার নাম শিষ্টভাষা বা মান ভাষা। সাধারণত দেখা যায় দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনে মান ভাষার ব্যবহার খুবই কম। এটি দেশের ভদ্র সমাজে প্রচলিত। এই ভাষাকে শিক্ষিত শ্রেণীর সকল মানুষ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের অফিসে আদালতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ভাষা মৌখিক রূপে ও লেখায় চালু আছে তা-ই মান ভাষা।

অন্যদিকে দেখা যায়, দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাষার রূপ একই রকম নয়। এই ভাষা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সাধারণ ও অশিক্ষিত লোক ঘরে সংসারে, কৃষিক্ষেত্রে, বাজারে হাটে এই ভাষা ব্যবহার করে। অঞ্চল বিশেষের জনসাধারণের ব্যবহৃত এই ভাষা হল আঞ্চলিক ভাষা। যেমন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলের ভাষা। এগুলো পৃথক পৃথক আঞ্চলিক বাংলা ভাষা।

প্রশ্ন ঃ বাক প্রত্যঙ্গ কি? কয়েকটি বাক প্রত্যঙ্গের নাম লিখুন।

উত্তর ॥ ঃ 'বাক্' শব্দের অর্থ কথা। কথা মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়। মানবদেহে এমন কিছু অঙ্গ আছে যেগুলির সহায়তায় মানুষ কথা বলতে পারে। এগুলোকে বাকপ্রত্যঙ্গ বলা হয়। যেমন, ফুসফুস, গলনালি, স্বরযন্ত্র, স্বরতন্ত্রী, জিহ্বা, আলজিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি। অবশ্য সব ধ্বনি উচ্চারণের জন্য সকল বাকপ্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয় না।

পাঠ ২ ঃ বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় কত রকম শব্দ রয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার

বাংলা ভাষায় যত শব্দ রয়েছে সেগুলোকে এক সঙ্গে বলা হয় বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার।

বাংলা ভাষায় কত শব্দ আছে তা চট করে বলা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বাংলা একটি জীবন্ত ভাষা। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই ভাষার যাত্রা শুরু হয়েছে। বহু মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। নানা সূত্রে এই ভাষায় বহু মব্দ এসেছে। প্রাচীন মানুষেরা যে সব শব্দ ব্যবহার করত সেগুলো কিছু কিছু এখনো টিকে আছে। তাছাড়া ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদি নতুন শব্দ আমদানীতে সাহায্য করে। এভাবে নতুন নতুন শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। যেমন বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমনের কারণে নামাজ, রোজা, আল্লাহ, মসজিদ, হাজী ইত্যাদি শব্দ আমরা পাচ্ছি। মুসলমান শাসনের সূত্রে পেয়েছি আদালত, মোকদ্দমা, এজলাস, জমি জিরাত, দস্তখত, কলম, খাজনা, দলিল, দস্তাবেজ ইত্যাদি। ইংরেজরা দীর্ঘদিন আমাদের দেশ শাসন করেছে। শাসনসূত্রে বহু ইংরেজি শব্দ বাংলায় গৃহীত হয়েছে। যেমন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কোর্ট, অফিস, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে পেয়েছি রেডিও, টিলিভিশন, টেলিগ্রাফ, কম্পিউটার, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, সাইকেল ইত্যাদি। শব্দ একবার চালু হয়ে গেলে তা ভাষার সম্পদ হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষায় যত শব্দ আছে সেগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. তৎসম শব্দ

সংস্কৃত থেকে যেসব শব্দ হুবহু বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে।
যেমন- চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, মস্তক, চন্দ্র, গৃহ, পত্র ইত্যাদি।

২. তদ্ভব শব্দ

সংস্কৃত থেকে রূপান্তরিত হয়ে যেসব শব্দ বাংলা শব্দ রূপে পরিচিত হয়েছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে।

যেমন- চোখ, কাল, হাত, মাথা, চাঁদ, ঘর, পাতা ইত্যাদি।

৩. অর্ধ তৎসম শব্দ

সংস্কৃত থেকে যে সব শব্দ সামান্য পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়েছে সেগুলোকে অর্ধতৎসম শব্দ বলা হয়।

যেমন- গিন্নী (গৃহীনী), পুরুত (পুরোহিত), কুচ্ছিৎ (কুৎসিত), কেষ্ট (কৃষ্ণ), জোছনা (জ্যোৎস্না), ছেরাদ্দ (শ্রাদ্ধ)।

৪) দেশী শব্দ

বাংলার আদিবাসীদের ব্যবহৃত যেসব শব্দ বাংলায় রয়ে গেছে সেগুলোকে দেশী শব্দ বলা হয়।

যেমন- মই, ঢেঁকি, কুলা, চাঙ্গারি ইত্যাদি।

৫) বিদেশী শব্দ

ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রশাসন, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে যে শব্দ সমূহ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে বিদেশী শব্দ বলা হয়।

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবি ফারসি ও ইংরেজি শব্দই প্রধান। তবে অন্য ভাষারও কিছু শব্দ বাংলায় রয়েছে। যেমন-

আরবি

ইসলাম, আল্লাহ, রসুল, নবী, হারাম, হালাল, ইমান, হজ্ব, যাকাৎ, মজলিস, ইজ্জত, খেদমত, জাহাজ, জমা, আসল, বাকী, হিসাব, নগদ, আলেম, কলম, হরফ, গোলাম, বাতিল, মৌজা, মহকুমা ইত্যাদি।

ফারসি

দোকান, কারখানা, কাগজ, উকিল, চশমা, জমিদার, দফতর, পর্দা, পায়খানা, সরকার, বালিশ, আয়না, কাছারি, নালিশ, জবানবন্দী, রুমাল, সিপাহী, পোশাক, পায়জামা, দস্তখত, তারিখ, সাল, মেথর, খাজনা।

ইংরেজি

পুলিশ, ব্যাংক, ব্যাগ, মাস্টার, কলেজ, স্কুল, অফিস, হাসপাতাল, বোমা, মেশিন, শেয়ার, ট্রেন, ট্রাম, প্রফেসর, বোতল, কেতলি, কাপ, প্লেট, প্লেন, টিকিট, হেডমাস্টার।

পতুর্গিজ

আলমারি, আলপিন, জানালা, বোতাম, চাবি, আনারস, পেরেক ইত্যাদি।

ফরাসি

রেস্তোরাঁ, ডিপো, আঁতাত, কুপন ইত্যাদি।

ওলন্দাজ

টেক্কা, তুরুপ, হরতন, রুইতন ইত্যাদি।

তুর্কী

দারোগা, চাকর

গুজরাটি

হরতাল

জাপানি

রিকশা

বর্মী

লুঙ্গি

চীনা

চা, চিনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠটি পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন

১. বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার বলতে কী বোঝায়?

২. বাংলা ভাষার শব্দ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের তিনটি করে উদাহরণ দিন।

৩. নিম্নবর্ণিত শব্দগুলো কোন্ কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তা লিখুন ঃ

সম্রাট, বক্ষ, কুরবানী, হাকিম, মজবুত, ব্লেড, বাস, ডিপো, গুদাম, আনারস, চিনি, লুঙ্গি, জাহাজ, বাঁদী, পর্দা, সাল, সুইচ, হল, ফটো, রুমাল, জবাই, ফরিয়াদী, জাহান্নাম, কিয়ামত, রিকশা।

বাংলা গদ্যরীতি ঃ সাধু ও চলিতভাষা

ইউনিট ২

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল ভাষাতেই গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে পদ্যের অনেক পরে; পদ্যেই রচিত হয়েছে প্রাচীনতম সাহিত্যগুলো। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। একটি আনুমানিক হিসাব করে বলা যাবে, বাংলা কবিতার বয়স যদি হয় দেড় হাজার বছর তবে বাংলা গদ্যের বয়স মাত্র শ'দুয়েক বছর। সমগ্র মধ্যযুগের (১২০১-১৮০০ পর্যন্ত) বাংলা সাহিত্যে গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা পরিমাণে খুবই সামান্য; তাও সীমাবদ্ধ ছিল দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র রচনার মধ্যে। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূত্রপাত আধুনিক যুগে (১৮০১- বর্তমান কাল অবধি)। এদেশে ইংরেজদের আগমনের পর কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ(প্রতিষ্ঠা ১৮০০ সাল)কে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্য চর্চা বেগবান হয়। আগেই বলেছি, এর আগে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল কিঞ্চিৎ পরিমাণে এবং সীমিত পরিসরে। এ থেকে মনে করার কোন কারণ নেই, প্রাচীন বা মধ্যযুগের লোকেরা বুঝি বা কথাবার্তা বলতো পদ্যে; ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে। আসলে কথাবার্তার ক্ষেত্রে কোনদিনই কেউ কবিতা ব্যবহার করতো না, বলতো গদ্যেই, এখনও যেমন আমরা বলি। কিন্তু তারপরও সাহিত্য রচনার জন্য দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়েছে কবিতা বা কবিতার ভঙ্গি।

আধুনিক কালে উদ্ভূত বাংলা গদ্যে লক্ষ করা যায় দু'টো রীতি- একটি কথা বলার রীতি- যাকে বলা হয় মৌখিক রূপ বা কথ্যরূপ; অন্যটি লেখার রীতি- যাকে বলা হয় লৈখিক রূপ বা লেখ্য রূপ। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষারই রয়েছে এমন দুটো রূপ। সাধারণ কথাবার্তা যখন মানুষেরা বলে তখন ভাষা ব্যাকরণের আঁটো-সাঁটো বন্ধনের অনেক বাইরে থাকে অর্থাৎ ব্যাকরণ তখন কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হয় না, ভাষীরা আরোপ করেন না– ভাব প্রকাশ করাই সেখানে মুখ্য। কিন্তু লৈখিক রূপ বা লেখ্য রূপ অনেক বেশি সুনির্দিষ্টি বা সুনিয়ন্ত্রিত। বাংলা ভাষার মৌখিক রূপের রয়েছে আবার দুটো রীতি : একটা সর্বজন স্বীকৃত শিষ্টজন কথিত আদর্শ চলিত ভাষা (Standard Colloquial Language), বা আদর্শ চলিত রীতি (Standard Colloquial Style), অপরটি আঞ্চলিক কথ্য উপভাষা (Local Colloquial Style)। লৈখিক রূপ বা লেখ্যরূপেরও রয়েছে দুটো রীতি : একটি আদর্শ চলিত রীতি (Standard Colloquial Style) অপরটি সর্বজন স্বীকৃত লেখ্যরূপ বা সাধুরীতি (Standard Written Form) বাংলা গদ্যের উল্লিখিত বৈচিত্র্য নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় :

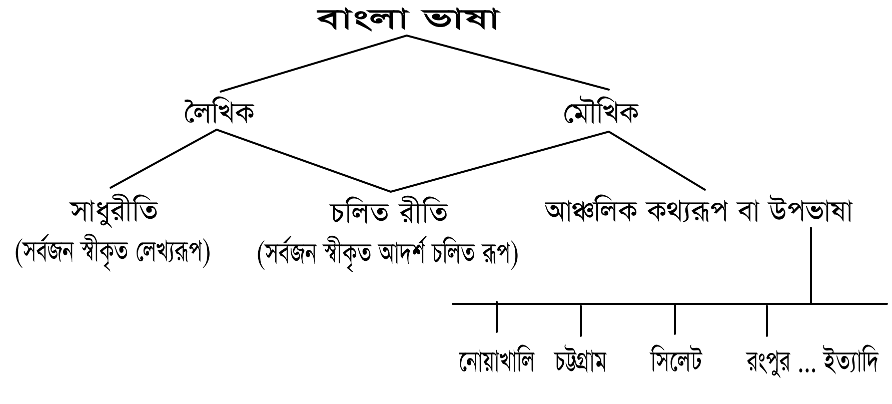

পাঠ ১ ঃ সাধু ও চলিত ভাষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সাধু ও চলিত ভাষা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- ঐ ভাষারীতি দুটোর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।

কাকে বলবো সাধুভাষা?

যতদূর জানা যায় 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ১৮১৫ সালে 'বেদান্ত গ্রন্থ' নামে একটি রচনায় প্রথম ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু সাধুভাষা বলতে তিনি বিশেষ কোন্ ধরনের ভাষারীতিকে বুঝিয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তবে এ-টুকু বোঝা যায় যাঁরা 'সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন' তাঁদের ভাষাকে বোঝাতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন সাধুভাষা শব্দটি। অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যাঁদের ভাষা ছিল 'সংস্কৃতমূলক' ও 'সংস্কৃতানুসারী' তাঁদের ভাষাকেই রামমোহন চিহ্নিত করেছিলেন সাধুভাষা বলে। সাধুভাষার বিপরীতে এখন যে 'চলিত' বা 'চলতি' ভাষার কথা আমরা বলছি, রামমোহনের বেশ পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে একটি প্রবন্ধে সে বিষয়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম অপরভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। ... সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ অভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না।" বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রবন্ধে তৎকালীন সাধুভাষাকে আক্রমণ করে বলেছিলেন 'সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা'র কারণেই বাংলা সাহিত্য 'অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর পরামর্শ, 'অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে।' সাধুভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐ সব মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত সাধুভাষার যে সুনির্ধারিত রূপ গড়ে উঠেছিল তাতে তদ্ভব, অর্ধতৎসম প্রভৃতি শব্দের তুলনায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ ছিল বেশি। তবে বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের রচনার মধ্য দিয়ে সাধুভাষা ক্রমে সংস্কৃতের গণ্ডী বা সংস্কৃত ভাষারীতির অপ্রয়োজনীয় বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ভাষায় তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন তাকে আজ আমরা নিঃসন্দেহে সাধুভাষা বলে চিহ্নিত করি। কিন্তু তিনি তাঁর শেষ দিককার উপন্যাসগুলোয়, আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম(১৮৮৬) এ যে সাধুভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা ক্রিয়াপদের আদিম রূপ ছাড়া অনেকখানিই বর্তমানের চলিত বাংলার পূর্বসুরী হবার যোগ্য।

তবে সাধুভাষা বাংলাভাষীদের মুখের ভাষা অনেক কাছাকাছি চলে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধু গদ্যরীতির মাধ্যমে। তিনি ১৯১৪ সালের আগে চলিত ভাষা ব্যবহার করেননি একথা তথ্য হিসেবে সত্য হলেও চলিত বাংলা বা কথ্য বাংলার অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছিল তাঁর গদ্যভঙ্গি। ক্রিয়াপদের ও সর্বনামের আদিম রূপ হয়তো রবীন্দ্রনাথের ১৯১৪ সালের আগেকার গদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি অনেক বেশী চলিত বাংলার নিকটবর্তী। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, **উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের রীতি প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা সাহিত্যিক গদ্য অবলম্বন করেছিল সংস্কৃত ভাষার আদর্শ অর্থাৎ সংস্কৃত রীতির শব্দ চয়ন, সমাস-বাহুল্য, কথ্য ভাষার পদ বর্জন রীতি। ঐ শতাব্দীর পণ্ডিতেরাই এ ধরনের ভাষা রীতির নাম দিয়েছিলেন সাধুভাষা।** এখানে বলে রাখা দরকার যে সাধু ভাষা কখনোই মানুষের কথাবর্তার ভাষা ছিল না, এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল কেবল সাহিত্য রচনার মধ্যেই।

কাকে বলে চলিত ভাষা?

চলিত বাংলা গদ্যরীতির প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে যার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। বয়সের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক। বাংলা সাধু গদ্যরীতির আঁটোসাঁটো বন্ধন থেকে ভাষাকে সহজ স্বাভাবিক করে তোলার বাসনায় তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে- ১. বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ রাখার প্রয়োজন নেই; ২. বহুবচনে- গণ প্রত্যয় বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়; ৩. বাংলায় অযথা সন্ধির ভার বাক্যের পক্ষে ক্ষতিকর; ৪. অবিকৃত সংস্কৃত (অর্থাৎ তৎসম) শব্দের তুলনায় রূপান্তরিত (অর্থাৎ তদ্ভব) এবং দেশজ শব্দের ব্যবহারই বাংলায় স্বাভাবিক। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এসব প্রস্তাবে, তাঁর কালের তুলনায়, অনেক বেশি আধুনিক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত চলিত বাংলার সঙ্গে সাধু বাংলার প্রধান যে পার্থক্য অর্থাৎ সর্বনাম পদের ও ক্রিয়াপদের, সে সম্পর্কে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোন প্রস্তাব নেই। তারপরও বলা যায়, শ্যামাচরণের ঐ প্রস্তাবসমূহ চলিত বাংলা প্রবর্তনে বা ভাষাকে, সরল ও সাবলীল করে তোলার আন্দোলন বেগবান করেছিল।

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর লেখায় তৎকালীন কলিকাতার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদের ঐ ভাষাভঙ্গি অন্যদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে বিকাশ লাভ করেনি; এমনকি প্যারীচাঁদ মিত্র নিজেও সে ভাষাভঙ্গি পরিত্যাগ করেছিলেন। হয়তো এর অন্যতম কারন, সমকালের মানুষের সাহিত্য রুচির সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'- এর ভাষার খুব বেশি ঐক্য সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ফলে 'আলালীভাষা'র অকাল মৃত্যু ঘটে।

বর্তমানে যাকে আমরা চলিত বাংলা ভাষা বলে চিনি তার প্রবর্তনের ও প্রয়োগের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপের জন্য। ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' নামে একটি উঁচুমানের পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি। ঐ পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই চলিত বাংলার প্রায়োগিক প্রকাশ ঘটতে থাকে। প্রমথ চৌধুরীর এ প্রচেষ্টা খুব সহজসাধ্য ছিল না কিন্তু অসীম সাহসিকতায় চলিত বাংলার পক্ষে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেনাপতির ভূমিকায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'কথার কথা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯), 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা' (পৌষ ১৩১৯), 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' (চৈত্র ১৩১৯), আমাদের ভাষা সংকট (১৩২৯) প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'কথার কথা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমার ইচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়।' তার কারণ স্বাধীন হয়ে, স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টাতেও সুখ আছে। সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বা সংস্কৃতের 'অঞ্চল ধরে বেড়ানো'তে বাংলা ভাষার কোন কল্যাণ নেই। তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, কাকে বলে বাংলা ভাষা? উত্তর দিচ্ছেন এভাবে, 'যে ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি যে ভাষায় ভাবনা চিন্তা সুখ-দুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরো বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা। তাই চলিত বাংলার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মতামত হচ্ছে, আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। **যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।'** চলিত বাংলা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী এই মানসিকতা ও সবুজপত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর কুশলতায় আধুনিক বাংলায় চলিত গদ্যরীতি বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। তা ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সব সময় ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকুণ্ঠ সমর্থন। ফলে প্রমথ চৌধুরীর প্রচেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহ ও পৃষ্টপোষকতায় বাংলা গদ্যে চলিত রীতি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক কারণে পিছিয়ে পড়েছে সাধুভাষা এবং সম্প্রতি তা সম্পূর্ণ বর্জিত হবারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার প্রাচীন সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছে–
ক) গদ্যে খ) পদ্যে
গ) গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে ঘ) কোনটিই নয়

২। মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের যে নমুনা পাওয়া গেছে তা সীমাবদ্ধ–
ক) উপন্যাস ও ছোটগল্পে খ) প্রবন্ধ ও উপন্যাসে
গ) নাটক ও চিঠিপত্রে ঘ) দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে

৩। কোন কলেজকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্য চর্চা বেগবান হয়?
ক) হিন্দু কলেজ খ) সংস্কৃত কলেজ
গ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ঘ) বেথুন কলেজ

৪। আধুনিক বাংলা গদ্যে কোন দুটি রূপ লক্ষ করা যায়?
ক) মৌখিক ও লৈখিক খ) বাচনিক ও প্রায়োগিক
গ) ব্যবহারিক ও অব্যবহারিক ঘ) লৌকিক মৌখিক

৫। ভাষার মৌখিক রূপে কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হয় না–
ক) শব্দচয়ন খ) বাক্যগঠন
গ) সমাস ঘ) ব্যাকরণ

৬। ‘সাধুভাষা’ শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?
ক) রাজা রামমোহন রায় খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। সাধুভাষা কখন মানুষের মুখের ভাষা ছিল?
ক) প্রাচীন যুগে খ) মধ্যযুগে
গ) আধুনিক যুগে ঘ) কখনোই না।

৮। বাংলা চলতি গদ্যরীতির প্রথম উদ্যোক্তা কে?
ক) প্যারীচাঁদ মিত্র খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ) রামমোহন রায় ঘ) শ্যামাচরণ গঙ্গোপধ্যায়

৯। মুখের ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদা প্রথম কে দিয়েছিলেন?
ক) শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় খ) প্যারীচাঁদ মিত্র
গ) প্রমথ চৌধুরী ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা প্রবর্তনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কে পালন করেন?
ক) প্রমথ চৌধুরী খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ) রামমোহন রায়

সঠিক উত্তর

১।খ ২।ঘ ৩।গ ৪।ক ৫।ঘ ৬।ক ৭।ঘ ৮।ঘ ৯।খ ১০।ক

পাঠ ২ ঃ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- সাধু থেকে চলিত বা চলিত থেকে সাধুরীতিতে রূপান্তর করতে পারবেন।

সাধু ও চলিত ভাষা

সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতা তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ শতকের শুরুতে তার গ্রহণযোগ্য মীমাংসা আমরা লাভ করেছি। সাধু ও চলিত ভাষারীতির প্রধান পার্থক্য নির্ভরশীল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ওপর। সাধু ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণ ও দীর্ঘরূপ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরের চলিত বাংলায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত বা হ্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নিচে ঐ পদ দুটি সাধু ও চলিত রীতিতে ব্যবহারে ক্ষেত্রে কি পার্থক্য ঘটে তা দেখানো হল :

সর্বনাম		ক্রিয়া	
সাধুভাষা	**চলিত ভাষা**	**সাধুভাষা**	**চলিত**
তাহারা, তাঁহারা	তারা, তাঁরা	যাইতেছে	যাচ্ছে
তাহাদের, তাহাদিগের	তাদের	যাইতেছি	যাচ্ছি
তাহাদিগকে	তাদের	গিয়াছেন	গিয়েছেন
উহাদিগকে	তাদেরকে	যাইবেন	যাবেন
কাহারা	ওদেরকে	লিখিবেন	লিখবেন
সেইগুলির	কারা	দিয়াছিল	দিয়েছিল
যাহারা, যাহাদিগের	সেগুলোর	দিবেন	দেবেন
উহা	যারা, যাদের	উঠিতেছিস	উঠছিস
ইহা	ওটা	উঠিবেন	উঠবেন
	এটা ইত্যাদি	শুইয়াছিলাম	শুয়েছিলাম ইত্যাদি

একথা সত্য যে সাধু ও চলিত ভাষার সম্পর্ক যত সহজ ও সমান্তরাল মনে করা হয়, তা তেমন সহজ ও সমান্তরাল নয়। বাংলা বাক্যে অনেক ক্ষেত্রেই যেহেতু ক্রিয়াপদ উহ্য বা অনুক্ত থাকে তাই বিচ্ছিন্নভাবে একটি বাক্য দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ঐ বাক্যটি সাধু বা চলিত রীতির। নিচের বাক্যগুলো লক্ষ করুন :

ক. মুনমুনের এখন বাড়ি ফেরা উচিত।

খ. দূরের পথ, যত দ্রুত ফেরা যায় ততই ভাল।

গ. মুনমুনের বাড়ি ঢাকার এক প্রান্তে।

ওপরের তিনটি বাক্যকে তাদের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বলা প্রায় অসম্ভব যে বাক্যগুলো সাধু নাকি চলিত বাংলার অন্তর্গত। এর প্রধান কারণ বাক্যে যদি সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকে অর্থাৎ অনুক্ত থাকে তবে সাধু চলিতের পার্থক্য নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব।

আবার কোন কোন বাক্যে ক্রিয়াপদ অনুক্ত না হলেও তার সাধু চলিতের গোত্র নিরূপণ দুরূহ। যেমন নিত্য বর্তমান বা বর্তমান অনুজ্ঞায় কিছু কিছু ক্রিয়াপদের রূপ একবচন ও বহুবচনে এবং সাধু ও চলিত অভিন্ন। উদাহরণগুলো লক্ষ করুন :

আমি/আমরা	শুই
তুমি/তোমরা	শোও
সে/তারা	শোয়

কিন্তু নিত্য বর্তমান ও বর্তমান অনুজ্ঞা ছাড়া অন্যকালের ক্রিয়ারূপে সাধু ও চলিতের পার্থক্য স্পষ্ট। যেমন—

সাধু রূপ	**চলিত রূপ**
আমি/আমরা শুইলাম	আমি/আমরা শুলাম
তুমি/তোমরা শুইলে	তুমি/তোমরা শুলে
সে/তারা শুইল	সে/তারা শুল .... ইত্যাদি।

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিয়ে চলিত ভাষার প্রধান সেনাপতি প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু ভাষা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধ দুটিতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। আমরা এখন সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামতের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করছি। তাঁর মতে, 'লেখার ভাষা শুধু মুখের ভাষার প্রতিনিধি মাত্র'। তাই মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার কোন পার্থক্য থাকা অনুচিত। 'একমাত্র সেই ভাষা অবলম্বন করেই আমরা সাহিত্যকে সজীব করে তুলতে পারব। যেমন একটি প্রদীপ থেকে অপর একটি প্রদীপ ধরাতে হলে পরস্পরের স্পর্শ ব্যতিরেকে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তেমনি লেখার ভাষাতেও প্রাণ সঞ্চার করতে হলে মুখের ভাষার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তবে লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য সব সময়ই লক্ষ করা যায় 'সে পার্থক্য ভাষাগত নয়, স্টাইলগত'। সংস্কৃতের অনুসরণে উনিশ শতকে যে ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল প্রমথ চৌধুরী তাকে বলেছেন, 'কবিরাজ বিনিন্দিত মন্দগতি'। ফলে সাধুভাষার গড়নটি হয়ে ওঠে 'চলৎশক্তি রহিত'। 'ভাষার এই আড়ষ্ট ভাবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে পরিচিত। তাই বাংলা সাহিত্যে সাধারণ লেখকদের গদ্য গদাই লশ্‌করি ভাবে চলে, এবং কুলেখকদের হাতের লেখা একটা জড় পদার্থের স্তূপমাত্র হয়ে থাকে। এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটি রক্ষা করা।' প্রমথ চৌধুরী মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটিকেই চলিত বাংলার আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন নদীয়া-শান্তিপুর এবং ভাগীরথির উভয় তীরের ডায়ালেক্ট বা উপভাষাকে। তিনি পূর্ববাংলার কিংবা কলিকাতার উচ্চারণকে প্রমিত বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে, 'ঢাকাই কথা এবং খাস-কলকাত্তাই কথা, অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্যভাষা, দুয়েরই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত। ....পূর্ববঙ্গের লোকের মুখে স্বরবর্ণ ছড়িয়ে যায়, কলকাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়।' এসব কারণেই নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলের ডায়ালেক্টেই তিনি প্রমিত মনে করেছিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত চলিত ভাষা প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ অনুসরণ করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সাধু ও চলিত ভাষার অন্যান্য পার্থক্য

ক. ধ্বনি তাত্ত্বিক পার্থক্য

মৌখিক উচ্চারণই চলিত ভাষার ভিত্তি। কিন্তু চলিত ভাষার লিখিতরূপে উচ্চারণের মৌখিক বিকৃতিকে অনুসরণ করা হয় না। যে সব শব্দের মৌখিক উচ্চারণ চলিত ভাষার লিখিত রূপের সঙ্গে হুবহু এক নয় তেমন কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হল ঃ

সাধুরূপ	চলিত রূপ	মৌখিক উচ্চারণ	চলিত লিখিত রূপ
দেখিয়া	দেখে	দ্যাখে	দেখে
ফেলিয়া	ফেলে	ফ্যালে	ফেলে

খ. নাম পদের পার্থক্য

নাম শব্দের বচনভেদ নির্দেশ করার ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষায় পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নামপদের 'দুই' সংখ্যাবাচকতা বোঝানোর ক্ষেত্রে সাধু ভাষায় 'দ্বয়' দুইটি ব্যবহার করা হয়, আর চলিত ভাষায় ব্যবহার করা হয় 'দুটি', 'দুটো' অথবা 'জোড়া'। যেমন

সাধু	চলিত
ভাতৃদ্বয় পাখী দুইটি শাড়ি দুইটি হস্তিদ্বয়	ভাইদুটো, দুটোভাই, দু'ভাই পাখি দুটো একজোড়া শাড়ি একজোড়া হাতি

চলিত বাংলায় কারকের ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োগ সাধু বাংলার মত কখনো কখনো অনিবার্য হয়ে ওঠে না। যেমন–

কর্ম ঃ ছেলে ডেকে রাত দুপুরে লোক জাগাচ্ছো কেন?
করণ ঃ তারা জোর ফুটবল খেলেছে।
অপাদান ঃ ছাদ-চোয়ানো জলে ঘর ভেসে গেল।
অধিকরণ ঃ পাড়া-বেড়ানি মেয়ে। গাছ পাকা আম।

গ. শব্দ গঠনগত পার্থক্য

যদিও চলিত বাংলায় সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা খুব কম। কিন্তু চলিত বাংলায় সমাসের ব্যবহার অত্যন্ত সহজ। পাশাপাশি দুটো শব্দের উচ্চারণে ফাঁক না থাকলেই তা সমাসবদ্ধ ধরা হয়। যেমন–

চোর ডাকাত ধরলে **মাবাপের** নাম ভুলিয়ে ছাড়বে। (দ্বন্দ্ব সমাস)
এমন মনভোলা যে **গাছপাকা** আমগুলো ফেলে এলে। (তৎপুরুষ)

ঘ. পদবিন্যাসগত পার্থক্য

সাধু বাংলায় সর্বক্ষণই পদবিন্যাসে একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করা হয়। সেখানে বাক্যের প্রাথমিক গঠন হল 'কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া' অর্থাৎ প্রথমে উদ্দেশ্য পরে বিধেয়। আর উদ্দেশ্যের মূল অংশ হচ্ছে কর্তা তা বসে কর্মের আগে। বাক্যের বিধেয় থাকে শেষে। আর বিধেয়ের মূল অংশ ক্রিয়াপদ তা বসে সব সময় বাক্যের শেষে– সমস্ত কারকের পর। যেমন– মুনমুন সব সময় মায়ের কথা শোনে। কিন্তু চলিত বাংলায় সব সময় এক্রম রক্ষিত হয় না, প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। যেমন–

কিছু খাইনি তো সাত দিন।
ওকে দেখবার পরই ভুল ভাঙলো আমার।
'রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ।'

দুটি অনুসর্গ সম্পর্কে সতর্কতা

'টি' এবং 'গুলি' এ দুটি অনুসর্গ (নির্দেশক) সাধু বাংলার- তা চলিত বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। চলিত বাংলায় 'লোকটি' নয় লোকটা, 'মেয়েটি' নয় 'মেয়েটা'। একইভাবে চলিত বাংলায় 'গাছগুলি' নয় 'গাছগুলো', মাছগুলি', নয়, 'মাছগুলো' ইত্যাদি।

বিভিন্ন কালের ক্রিয়ারূপে সাধু ও চলিত ভাষায় কি পরিবর্তন ঘটে তা নিচে দেখানো হল।

১. ঘটমান বর্তমান

সাধু	চলিত	

হাসিতেছি করিতেছি	হাসছি করছি	উত্তম পুরুষ
হাসিতেছ করিতেছ	হাসছো করছো	মধ্যম পুরুষ
হাসিতেছিস করিতেছিস	হাসছিস করছিস	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
করিতেছেন হাসিতেছেন	করছেন হাসছেন	তৃতীয় পুরুষ(সম্মানার্থক)
হাসিতেছে করিতেছে	হাসছে করছে	তৃতীয় পুরুষ (সাধারণ)
২. পুরাঘটিত বর্তমান		
সাধু	**চলিত**	
হাসিয়াছি করিয়াছি	হেসেছি করেছি	উত্তম পুরুষ
হাসিয়াছিস করিয়াছিস	হেসেছিস করেছিস	মধ্যম পুরুষ
হাসিয়াছিস করিয়াছিস	হেসেছিস করেছিস	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিয়াছেন করিয়াছেন	হেসেছেন করেছেন	তৃতীয় পুরুষ (সম্মানার্থক)
হাসিয়াছে করিয়াছে	হেসেছে করেছে	তৃতীয় পুরুষ (সাধারণ)
৩. সাধারণ		
সাধু	**চলিত**	
হাসিলাম করিলাম	হাসলাম হাসলুম করলুম	উত্তম পুরুষ
হাসিলে করিলে	হাসলে করলে	মধ্যম পুরুষ
হাসিনি করিলি	হাসলি করলি	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিল করিল	হাসলো করলো করলে	তৃতীয় পুরুষ (সাধারণ)
৪. ঘটমান অতীত		
সাধু	**চলিত**	
হাসিতেছিলাম করিতেছিলাম	হাসছিলাম করছিলাম	উত্তম পুরুষ
হাসিতেছিলে	হাসছিলে	মধ্যম পুরুষ

করিতেছিলে	করছিলে	
হাসিতেছিলি করিতেছিলি	হাসছিলি করছিলি	মধ্যমপুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিতেছিলেন করিতেছিলেন	হাসছিলেন করছিলেন	তৃতীয় পুরুষ (সম্মানার্থক)
হাসিতেছিল করিতেছিল	হাসছিল করছিল	তৃতীয় পুরুষ (সাধারণ)
৫. সম্পন্ন অতীত		
সাধু	**চলিত**	
হাসিয়াছিলাম করিয়াছিলাম	হেসেছিলাম করেছিলাম	উত্তম পুরুষ
হাসিয়াছিলে করিয়াছিলে	হেসেছিলে করেছিলে	মধ্যম পুরুষ
হাসিয়াছিলি করিয়াছিলি	হেসেছিলি করেছিলি	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিয়াছিলেন করিয়াছিলেন	হেসেছিলেন করেছিলেন	তৃতীয় পুরুষ (সম্মানার্থক)
হাসিয়াছিল করিয়াছিল	হেসেছিল করেছিল	তৃতীয় পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
৬. সাধারণ ভবিষ্যত		
সাধু	**চলিত**	
হাসিব করিব	হাসবো করবো	উত্তম পুরুষ
হাসিবে করিবে	হাসবে করবে	মধ্যম
হাসিবি করিবি	হাসবি করবি	মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থক)
হাসিবেন করিবেন	হাসবেন করবেন	তৃতীয় পুরুষ (সম্মানার্থক)
হাসিবে করিবে	হাসবে করবে	তৃতীয় পুরুষ (তুচ্ছার্থক)

সাধু ভাষারীতির নমুনা

অনিরুদ্ধ এবং হিরু পাল– এই দুইজনেই গ্রামখানার সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙিয়া দিল। ওই সঙ্গে গিরীশ ছুতার, তারা নাপিত ও আছে। দেবু আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিল– অনিরুদ্ধ ঐ দম্ভভরে সামাজিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ভোগ উঠাইয়া লইয়া গেল, অথচ সমাজের কেউ তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? এ কয়েকদিন সে নিজেই লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়াছে, গ্রামের লোক তাহাকে ভালবাসে, অনেকে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু এক্ষেত্রে সকলেই বলিয়াছে এক কথা– এর আর করবে কি দেবু? উপায় কি বল? যদি থাকে তাহলে তুমি কর। তবে বুঝেচ কি না– উ হবে না! কি সমাজ ক'রছ? সমাজ কই?

–গণদেবতা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না– পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিন দেখে নাই– কিন্তু আমের গুঁটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি, তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখির তলায় আম ক'টা পড়িয়াছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে কাল হইতে দিদি অনেকবার বলিয়াছে– ও অপু, এবার সেই আমের গুঁটিগুলো জারাবো, কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ি উপস্থিত থাকার দরুণ উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর দিদির এরূপভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল।

–পথের পাঁচালী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলিত ভাষারীতির নমুনা

কোণের ঘরটি আমার জন্য আলাদা করা আছে। ছোটো ঘর জানালার বাইরে মা-র বাগানের শিউলি আর স্থলপদ্ম, ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকে পুকুরটা চোখে পড়ে। বাড়িতে যত ভিড়ই হোক ও ঘরের অংশ তিনি কাউকেই দেন না, কেউ আশাও করে না তা। কেননা– দু-পক্ষই মেনে নিয়েছে কথাটা আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নামমাত্র, যাকে বলে ফর্ম্যাল। তারা যখন তাস খেলেন, বা 'দেশের অবস্থা' বিষয়ে আলোচনা করেন, বা বেঁধে রসনার কালীমন্দিরে যান, তখন আমি যে সে সব ব্যাপারে যোগ দেবে তা সম্ভাবনার বাইরে ব'লেই ধ'রে নেয়া হয়।

– নীলাঞ্জনের খাতা : বুদ্ধদেব বসু

সমুদ্র মেখলা স্রোতস্বিনীর ধারাস্পর্শী নীল বনাচ্ছন্ন এক ভূমি। কবে সেই সৃষ্টির আদিতে যখন তৃতীয় হিমবাহর যুগ অতীত হয়ে পৃথিবীর বুকে নেমেছে সোনালী বসন্ত। কিন্তু তখনও জন্মলগ্নের আলোড়ন হিমালয়ের পূর্ব-দক্ষিণ সীমানায়, সেই জন্মলগ্নের বেদনা-আনন্দের মধ্য দিয়ে নীল জলধির বুক চিরে দেবী ভেনাসের মত জেগে উঠেছিল এই ভূখণ্ড। পাষাণ পর্বতের অন্তঃস্থল থেকে যে পয়োধর সদৃশ ধারা কিশোরীর চঞ্চলতার নৃত্যছন্দে স্বচ্ছ শরীরে ঘর ছেড়েছিল সেই ক্ষীণাঙ্গী ধারাই পূর্ণযৌবনা হয়ে জন্ম দিল এক সুবর্ণ পলিখণ্ড সমতট।

–বং থেকে বাংলা : রিজিয়া রহমান

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য নির্ভরশীল

ক) লিখিত ও মৌখিক রীতির ওপর ☐ খ) সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ওপর ☐

গ) তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ওপর ☐ ঘ) অর্ধতৎসম ও দেশী শব্দের ওপর ☐

২। সাধু ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়া রূপ ব্যবহৃত হয়

ক) পূর্ণ ও দীর্ঘ রূপ ☐ খ) অপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত রূপ ☐

গ) পূর্ণ ও দীর্ঘ উভয় রূপ ☐ ঘ) কোনটিই নয় ☐

৩। চলিত ভাষার প্রমিত রূপ গড়ে উঠেছে কোন অঞ্চলের ভাষাকে কেন্দ্র করে?

ক) কলিকাতা ☐ খ) ঢাকা ☐

গ) পূর্ববাংলা ☐ ঘ) নদীয়া শান্তিপুর ☐

৪। চলিত ভাষার ভিত্তি হচ্ছে

ক) আঞ্চলিক উচ্চারণ ☐ খ) গ্রাম্য উচ্চারণ ☐

গ) শাহরিক উচ্চারণ ☐ ঘ) মৌখিক উচ্চারণ ☐

৫। ‘টি এর গুলি’ এ অনুসর্গ দুটি ব্যবহৃত হয়-

ক) সাধু বাংলায় ☐ খ) চলিত বাংলায় ☐

গ) আঞ্চলিক বাংলায় ☐ ঘ) অপ্রচলিত বাংলায় ☐

৬। নিচের অনুচ্ছেদগুলো চলিত বাংলায় রূপান্তর করুন :

ক) সমস্ত মজলিশটা স্তব্ধ হইয়া গেল। ছ্যাঁচড়ার দলের ছোকরা কয়টি বিড়ি টানিতে টানিতে মৃদুস্বরে রসিকতা করিতেছিল– তাহারা পর্যন্ত সবিস্ময়ে দেবু ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। অনুত্তেজিত শান্ত স্বরে উচ্চারিত কথা কয়টি শুনিয়া সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল– এবং কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে আশ্চর্য সে এক মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না।

খ) যাহাকে বলে খাঁটি চাষী, সেই খাঁটি চাষীর ঘরের ছেলে সে। বাপ তাহার নিজের হাতে লাঙল ধরিয়া চাষ করিত। কাঁধে করিয়া বাঁক বহিত। সারের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া গাড়ি বোঝাই করিত, ধানের বোঝা মাঠ হইতে মাথায় বহিয়া ঘরে আনিত; গরুর সেবা করিত। দেবুও ছেলেবেলায় ভাগের রাখালের পালে গরু দিয়া আসিয়াছে, গরুর সেও সে সময় নিয়মিত করিত, চাষের সময় বাপের জন্য জল খাবার মাঠে লইয়া যাইত।

গ) বাংলাদেশে ভাষা বিবর্তনের প্রধান কারণ কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তা ও ভাবের সংঘাত। সুতরাং যেই এই ধাক্কা লাগিল তখনই বাংলা ভাষার পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করিল, উহার অতিরিক্ত বাঙালীর মধ্যে ভাষাগত একটা দ্বিত্বও দেখা দিল, অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালী বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাই, ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে যে দ্বন্দ্ব ও সমস্যার সৃষ্টি হইল তাহা আজও চলিয়াছে।

ঘ) ললিতা ধীরে ধীরে ক্যাবিনের দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্র শেষের শিশিরার্দ্র অন্ধকার তখনও নদীর উপরকার মুক্ত আকাশ এবং তীরের বনশ্রেণীকে জড়াইয়া রহিয়াছে– এইমাত্র একটি শীতল বাতাস উঠিয়া নদীর জলে কলধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং নিচের তলায় এঞ্জিনের খালাসিরা কাজ আরম্ভ করিবে এমনতর চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক ৫। ক

ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি নিয়ম ও পরিচয়

ইউনিট ৩

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- শব্দের ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি নিয়ম সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের পরিচয় জানবেন।

পাঠটি বারবার পড়ুন। তাহলে আপনি ধ্বনি পরিবর্তনের বিষয় সম্পর্কে সহজে লিখতে পারবেন।

প্রস্তাবনা

মানুষ যখন কথা বলে তখন আসলে সে অনেকগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করে। অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টি হল ভাষা। মানুষ অর্থবোধক ধ্বনিই উচ্চারণ করে অর্থাৎ মানুষ ভাষা সৃষ্টি করে। ধ্বনিগুলো পাশাপাশি অবস্থান করে। কথা বলার সময় দেখা যায় একটি ধ্বনি আরেকটি ধ্বনি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। কিংবা দুই ধ্বনির মাঝামাঝি আরেকটি নতুন ধ্বনি এসে যাচ্ছে। উচ্চারণের টানটুনে এবং জিহ্বার গতিশীলতায় উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মানুষ চায় সহজে উচ্চারণ করতে। একটা পরিবেশে থাকতে থাকতে মানুষ যেভাবে উচ্চারণ করতে শেখে তা-ই তার উচ্চারণ ভঙ্গি তৈরি করে। এভাবে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার বিরোধও বাধে। সে যাই হোক, ভাষা সব সময় পরিবর্তনশীল। ধ্বনি পরিবর্তনও ভাষার একটি স্বাভাবিক নিয়ম। বাংলা একটি জীবন্ত ভাষা। এই ভাষাও ধ্বনি পরিবর্তনের অধীন। এই ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের বৈচিত্র্য নিম্নরূপ ঃ

১) স্বরাগম

শব্দের প্রথম বর্ণ সংযুক্ত হলে সহজভাবে উচ্চারণের জন্য ঐ বর্ণের আগে আ বা ই স্বর যোগ করাকে বলা হয় স্বরাগম।

যেমন-

আস্পর্ধা [আ+স্পর্ধা]

ইস্টিশন [ই+স্টেশন], ইস্কুল [ই+স্কুল]

২) স্বরসংগতি

শব্দের ভিতরে যে স্বরধ্বনিগুলো রয়েছে সেগুলো যখন উচ্চারণের সময় একরূপ ধারণ করে কিংবা সংগতি পেতে চায় তখন তাকে স্বরসংগতি বলে।

যেমন-

দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি

মিলামিশা > মেলামেশা, হিসাব> হিসেব

সুবিধা > সুবিধে, ইচ্ছা> ইচ্ছে
চিরনি> চিরুনি, ধূলা > ধুলো, পূজা > পুজো
তখনি > তখুনি, এখনি > এখুনি ইত্যাদি।

৩) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ

উচ্চারণকে সহজ করার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙে অ, ই, এ, ও, উ ইত্যাদি স্বরধ্বনি যোগ করাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে।

যেমন,
স্বরধ্বনি যোগে → যত্ন > যতন [য+ত্+ন> য+ত্+অ+ন]
এইভাবে রত্ন > রতন, বর্ষ> বরষ, স্পর্শ > পরশ, জন্ম > জনম, কর্ম> করম, স্বপ্ন > স্বপন
ই-স্বরধ্বনি যোগে → প্রীতি > পীরিতি [(প্র+ঈ+ত+ই) > (প+ঈ+র+ই+ত+ই)]
এইভাবে শ্রী> ছিরি, ফ্লিম> ফিলিম
এ স্বরধ্বনি যোগে → গ্রাম > গেরাম [(গ্র+আ+ম) > (গ+এ+রা+আ+ম)]
এইভাবে ট্রাম > টেরাম
প্রেক > পেরেক
গ্লাস > গেলাস
শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ
ও-স্বরধ্বনি যোগে → শ্লোক > শোলোক [(শ্+ল্+ও+ক) > (শ্+ও+ল+ও+ক)]
এইভাবে মুর্গ্ > মোরগ
উ-স্বরধ্বনি যোগে → ভ্রূ > ভুরু [(ভ্+র্+ঊ) > (ভ্+উ+র+ঊ)]
এইভাবে পুত্র > পুত্তুর, মুক্তা > মুকুতা, শুক্র> শুক্কুর (বার), পদ্মিনী > পদুমিনী, সূর্য > সুরুজ।

৪) বর্ণ বিপর্যয়

উচ্চারণের সময় শব্দের মধ্যবর্তী ধ্বনির স্থান পরিবর্তন ঘটলে বর্ণ বিপর্যয় বলা হয়।

যেমন- রিক্শা > রিশ্কা, বাক্স > বাস্ক, পিশাচ > পিচাশ ইত্যাদি।

৫) স্বরলোপ

উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনির লোপকে স্বরলোপ বলা হয়।

যেমন- উধার > ধার (উ স্বরধ্বনির লোপ)
বড় দাদা > বড়দা (ড় এর সঙ্গে যুক্ত অ স্বরধ্বনির লোপ)

৬) অন্তর্হতি

শব্দের মধ্যস্থ কোন স্বরহীন বা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ ঘটলে তাকে অন্তর্হতি বলা হয়।

যেমন-
পূর্ব > পুব (র্ এর বিলোপ)
ফাল্গুন > ফাগুন (ল্ এর বিলোপ)

ফলাহার > ফলার (হা-এর বিলোপ)

৭) বর্ণচ্যুতি

উচ্চারণের সময় দুটি একজাতীয় বর্ণের একটির লোপ হলে তাকে বর্ণচ্যুতি বলা হয়।

যেমন-

ছোট দাদা > ছোট্দা

বউ দিদি > বউদি

মেজ দিদি > মেজদি

ঠাকুর দাদা > ঠাকুর দা

৮) সমীভবন বা সমীকরণ

শব্দের মধ্যে অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ যখন উচ্চারণের সময় একই রূপ ধারণ করে তখন তাকে বলা হয় সমীভবন বা সমীকরণ।

যেমন-

পদ্ম > পদ্দ, কাঁদ্না > কান্না, রাঁধ না > রান্না।

৯) সমীকরণ

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে আ-স্বর যোগে উচ্চারণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার যে নিয়ম তাকে বলা হয় অসমীকরণ।

যেমন-

গপ গপ > গপাগপ, টপ টপ > টপাটপ, দম দম > দমাদম।

১০) সম্প্রকর্ষ

কথ্য ভাষায় দ্রুত উচ্চারণের কারণে শব্দের মধ্যে অবস্থিত কোন বর্ণের স্বরলোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ।

যেমন-

জানালা > জান্লা, দরজা > দর্জা, বসতি > বস্তি

১১) বর্ণদ্বিত্ব

জোর দেওয়ার জন্য শব্দের মধ্যে অবস্থিত কোন বর্ণের দুবার উচ্চারণকে বর্ণদ্বিত্ব বলা হয়।

যেমন-

ছোট > ছোট্ট, বড় > বড্ড, সকাল > সক্কাল, পাকা > পাক্কা।

১২) বর্ণ বিকৃতি

শব্দস্থিত কোন ব্যঞ্জন বর্ণ নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে বলা হয় বর্ণবিকৃতি।

যেমন-

ধাইমা > দাইমা, ধোবা > ধোপা

১৩) বিষমীভবন

শব্দের মধ্যে দুটি এক জাতীয় বর্ণের একটির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলা হয় বিষমীভবন।

যেমন- শরীর> শরীল

১৪) অপিনিহিতি

শব্দের ভিতরে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেই 'ই' বা 'উ' কে আগে উচ্চারণ করাকে অপিনিহিতি বলা হয়।

যেমন, বসিয়া>বইস্যা

আঞ্চলিক ভাষায় অপিনিহিতির প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কাল> কাইল্যা	আজি>আইজ
রাখিয়া > রাইখ্যা	রাতি > রাইত
হাসিয়া > হাইস্যা	জাতি > জাইত
ধরিয়া > ধইর‍্যা	জেলে > জাইল্যা
করিয়া > কইর‍্যা	সাধু > সাউধ
	মেয়ে > মাইয়া

১৫) অভিশ্রুতি

অপিনিহিতির 'ই' 'উ' ইত্যাদি ধ্বনির পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে নতুন রূপ ধারণ করাকে অভিশ্রুতি বলে।

যেমন-

করিয়া > কইরা > করে

হাসিয়া > হাইস্যা > হেসে

ধরিয়া > ধইর‍্যা > ধরে

আজি > আইজ > আজ

কালি > কাইল > কাল

রাতি > রাইত > রাত

বাংলা চলিত রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অভিশ্রুতি। মান কথ্য ভাষায় অভিশ্রুতিজাত শব্দ ব্যবহৃত হয়।

১৬ 'য়' শ্রুতি ও 'ব' শ্রুতি

শব্দের ভিতরের পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি মিলে যদি যৌগিক স্বর না হয়, তাহলে ঐ দুই স্বরের মধ্যে অন্ত:স্থ 'য়' বা অন্ত:স্থ 'ব' আগম ঘটে। **এই অন্ত:স্থ 'য়'-শ্রুতি, আর অন্ত:স্থ'ব' হল ব-শ্রুতি।**

যেমন

'য়' শ্রতি

মা+আমার>মায় আমার [আ+য়+আ]

ব-শ্রুতি

খা+আ>খাওয়া [আ+ও+আ]
যা+আ>যাওয়া [আ+ও+আ]

১৭) র-কার লোপ

কথ্য বাংলায় সাধারণত 'র' এর লোপ হয়ে পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব হয়।

যেমন
কর্ম>কম্ম
শিরনি> শিন্নি
তর্ক > তক্ক

১৮) হ-কার লোপ

কথ্য বাংলায় 'হ' এরও লোপ হয়।

যেমন-
কহে>কয় চাহ > চাও
দধি > দই আলাহিদা > আলাদা
ফলাহার > ফলার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন।

১. ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তন কেন হয়?
২. স্বরভক্তি কাকে বলে? পাঁচটি উদাহরণ দিন।
৩. স্বরাগম ও সমীভবন কাকে বলে? তিনটি করে উদাহরণ দিন।
৪. উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখুন
স্বরসংগতি, বর্ণচ্যুতি, অসমীকরণ, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি।
৫. অপিনিহিতি থেকে অভিশ্রুতি হওয়ার সাতটি দৃষ্টান্ত দিন।
৬. নিম্ন বর্ণিত ধ্বনি পরিবর্তনগুলোর নাম লিখুন ঃ
ক. গাহে > গায়
খ. শরীল > শরীল
গ. বড় > বড্ড
ঘ. বসতি > বস্‌তি
ঙ. ফাল্গুন > ফাগুন
চ. দে+আ > দেওয়া
ছ. ধর্ম > ধম্ম

ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান

ইউনিট ৪

ভূমিকা

ভাষার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার শব্দরাজি; পৃথিবীর সব উন্নত ভাষারই রয়েছে বিপুল শব্দসম্ভার। বাংলা ভাষাও শব্দ সম্পদে বেশী ধনী। কিন্তু ঐ বিপুল শব্দরাজি একদিনে ভাষায় ঠাঁই পায়নি– দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়েছে এত সব শব্দ বাংলা ভাষায় জমে উঠতে। বাংলা ভাষায় ঐ সব শব্দের সমাবেশ ঘটেছে বিভিন্ন উৎস থেকে। শব্দগুলোর উৎস অনুসারে অর্থাৎ শব্দটি ঠিক কোথা থেকে এসেছে সে অনুসারে বাংলা শব্দসম্ভারকে ভাগ করা হয় পাঁচ ভাগে। আপনারা এতোক্ষণে মনে করতে পারছেন ঐ পাঁচ ভাগের নাম? কি মনে পড়েছে? তৎসম শব্দ, অর্ধতৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, দেশী শব্দ, বিদেশী শব্দ– এই পাঁচ ভাগের কথা? মনে পড়েছে নিশ্চয়ই। এই যে পাঁচ রকম শব্দ, এর মধ্যে যেগুলো তৎসম শব্দ সেগুলো বাংলায় এসেছে সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে – অর্থাৎ আসতে আসতে শব্দের আগের চেহারায় কোন বদল ঘটেনি। চেহারা বদলে যায়নি বলেই ঐ ধরনের শব্দের নাম তৎসম অর্থাৎ তার সমান। কার সমান? ঐ যে বললাম, সংস্কৃত শব্দ, তার সমান বা তার মত– সংস্কৃত ভাষার আর বাংলা ভাষার যাদের চেহারা একেবারে হুবহু মিলে যায়। তৎসম শব্দগুলোর বানানের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বাংলাতে রয়েছে, যাদের একটির নাম ণ-ত্ব বিধান, অন্যটি ষ-ত্ব বিধান।

মনে রাখবেন

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কেবল তৎসম শব্দের বেলাতেই কার্যকরী- অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী বা বিদেশী শব্দের বেলাতে নয়।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে ণ-এর যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন।
- বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে ষ-এর যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন।
- তৎসম শব্দের বানানে ণ ও ষ এর কারণে ঘটিত বানান ভুল এড়াতে পারবেন।
- বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাঠ ১ ঃ ণ-ত্ব বিধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাংলা বানানোর ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- কতিপয় শব্দে ণ-ত্ব বিধানের ব্যতিক্রম নির্দেশ করতে পারবেন।
- স্বভাবতই ণ-হয় এমন কিছু শব্দের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।

আগেই বলেছি, আপনাদেরও নিশ্চয়ই মনে আছে, যে খাঁটি বাংলা শব্দের (দেশী শব্দের) বানানের বেলাতে মূর্ধন্য ব্যবহারের রীতি নেই। তাই যদি এমন হত যে বাংলাতে কেবল দেশী শব্দই আছে, কোন তৎসম শব্দ নেই, তাহলে

বানানের ক্ষেত্রে মূর্ধন্য ণ আর দন্ত্য ন এর ব্যবহার নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলতো। কিন্তু আমরা এ পাঠের ভূমিকাতে যে শব্দ সম্ভারের কথা বলেছি সেখানে চোখ মেলালেই দেখতে পাব বাংলা ভাষা আমরা যে সকল শব্দ ব্যবহার করছি তার মধ্যে রয়েছে অগণিত তৎসম শব্দ– যেগুলো সংস্কৃত শব্দ হতে অবিকৃতভাবে এসে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। আর ঐ সকল তৎসম শব্দে যদি ণ-ত্ব বিধান মানা হয়ে থাকে তবে বাংলাতেও অবশ্যই মানতে হবে। ফলে বাংলা বানানের শুদ্ধতার জন্যে ণ-ত্ব বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া, ণ-ত্ব বিধানের সঠিক ব্যবহার না করলে শব্দের বানানরূপ বদলে গিয়ে অর্থ বিভ্রাট তৈরি হতে পারে। এ কারণেও ণ-ত্ব বিধান আয়ত্ত করা জরুরি। ণ-ত্ব বিধানগুলো জানার আগে, আসুন, আমরা প্রথমেই জেনে নিই ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে

সংস্কৃত ভাষায় দন্ত্য-ন এর মূর্ধন্য-ণ-তে পরিবর্তনের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

১. ‘ট’ বর্গীয় বর্ণের (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) সঙ্গে কেবল ‘ণ’ যুক্ত হয়। যেমন কণ্টক, ঘণ্টা, কণ্ঠ, লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, খণ্ড, ভাণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি।

মনে রাখবেন ঃ

‘ত’ বর্গীয় বর্ণের (ত, থ, দ, ধ, ন) আগে কখনো ‘ণ’ যুক্ত হয় না, কেবল ‘ন’ হয়। যেমন - অন্ত, প্রান্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি।

২. “ঋ’ ‘র’ ‘ষ’-এর পরে ‘ণ’ বসে।

যেমন ঋণ, তৃণ, ঘৃণা, বর্ণ, বিকীর্ণ, ভীষণ, বিষাণ, লক্ষণ ইত্যাদি।

৩. ‘ঋ’, ‘র’, ‘ষ’এর পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় বর্ণ, প-বর্গীয় বর্ণ, ‘য’ অন্তস্থ‘ব’, ‘হ’ অথবা অনুস্বার থাকলে ‘ণ’ হয়।

যেমন চরণ, হরিণ, রেণু, কৃপণ, অর্পণ, নির্বাণ, লক্ষ্মণ, প্রয়াণ, ম্রিয়মাণ, প্রমাণ, গ্রহণ ইত্যাদি।

মনে রাখবেন

‘ঋ’, ‘র’, ‘ষ’ এবং ‘দন্ত্য ন’ এর মাঝে অন্য কোন বর্গের বর্ণ থাকলে ‘ন’ ‘ণ’ পরিণত হয় না। যেমন- রচনা, অর্চনা, দর্শন, নর্তন, প্রার্থনা ইত্যাদি।

৪. সমাসবদ্ধ শব্দে পূর্বপদে ‘ঋ’ ‘র’ ‘ষ’ যদি থাকে তবে পরপদের ‘ন’ ‘ণ’-তে রূপান্তরিত হয় না।

যেমন– সর্বনাম, বরানুগমন, ত্রিনয়ন, দুর্নাম, দুর্নিবার, দুর্নীতি ইত্যাদি।

মনে রাখবেন

সমাস সত্ত্বেও কতকগুলো শব্দে ‘ন’-এর জায়গায় ‘ণ’ হয়।

যেমন- অগ্রহায়ণ(অগ্র+হায়ন), উত্তরায়ণ(উত্তর+অয়ন), রামায়ণ (রাম+অয়ন), অপরাহ্ণ (অপর+অহ্ন), শূর্পণ খা (শূর্প+ নখ+আ), পূর্বাহ্ণ (পূর্ব+অহ্ন) ইত্যাদি।

৫. প্র, পরা, পরি, নির প্রভৃতি উপসর্গের পর কোন কোন ক্ষেত্রে ‘ণ’ হয়।

যেমন– প্রণাম, প্রণয়, প্রণয়ন, প্রণিপাত (প্র++নিপাত), প্রণীত, প্রবাহিনী, পরিণয়, পরিণত, পরিবহণ, নির্ণয়, নির্ণীত, ইত্যাদি।

মনে রাখবেন

ওপরের নিয়মটি মেনে চলার কথা থাকলেও পরিনির্বাণ, নির্নিমেষ, প্রনষ্ট হয়; কোন ভাবেই পরিনির্বাণ, নির্ণিমেষ, বা প্রণষ্ট হয় না। ফলে আমরা এই শব্দগুলোর বানানকে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

৬. কতকগুলো তৎসম শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়। আপনাদের সুবিধার জন্য শব্দগুলোর একটি তালিকা ছড়ার আকারে তুলে দেওয়া হল। ছড়া কেটে কেটে শব্দগুলোর বানান মুখস্ত করে রাখলে আর ভুল হবে না। তাহলে ছড়াটি শিখে ফেলুন কিন্তু ছড়াটির অর্থ খুঁজতে যাবেন না।

বাণিজ্য ভণিতা ভাণ লাবণ্য শোণিত,
আপণ কঙ্কণ কোণ গণনা গণিত
চাণক্য নিক্কণ তূণ কফোণি নিপুণ
লবণ বণিক স্থাণূ গুণী গুণ তূণ।
বীণা কণা মণি পাণি বাণ পণ্য পণ
মাণিক্য নৈপুণ্য গণ্য ফণী পুণ্য গণ॥

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ বানান পাশের খালি জায়গায় লিখুন।

ভীষণ	....................,	লক্ষণ	....................,	প্রমাণ	....................,
গ্রহণ	....................,	হরিণ	....................,	দুর্ণাম	....................,
দুণীতি	....................,	সর্বণাম	....................,	পরিণয়	....................,
নির্ণয়	....................,	ক্রন্দণ	....................,	নিক্কন	....................,
প্রার্থনা	....................,,	লাবন্য	....................,	দর্শণ	....................,
পূর্বাহ্ন	....................,	অপরাহ্ন	....................,	মধ্যাহ্ণ	....................।

২. ণ-ত্ব বিধানের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে এমন তিনটি শব্দ নিচের খালি জায়গায় লিখুন ঃ

...................., ..., ..., ..., ...,

৩. স্বভাবতই 'ণ' হয় এমন দশটি শব্দের একটি তালিকা তৈরি করুন।

পাঠ ২ ঃ ষ-ত্ব বিধান

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ষ-ত্ব বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- ষ-ত্ব বিধানের কতিপয় ব্যতিক্রম নির্দেশ করতে পারবেন।
- ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণকরণের নিয়ম লিখতে পারবেন।

ষ-ত্ব বিধানও, ণ-ত্ব বিধানের মত, খাঁটি বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারের একটি দেশী শব্দেও 'ষ'-এর ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেশী শব্দের মত তদ্ভব ও বিদেশী শব্দেও 'ষ' এর ব্যবহার নেই। সুতরাং, মনে রাখতে সুবিধা হবে বলে আবারও বলি, **ণ-ত্ব বিধানের মত ষ-ত্ব বিধানও কেবল তৎসম শব্দের বেলাতেই প্রযোজ্য।** লেখার মধ্যে বার বার 'ণ'- ও 'ষ' ভুল করলে যে-কেউই বলে ফেলতে পারে, লোকটির 'ণ-ত্ব ষ-ত্ব' জ্ঞান নেই। এমন লজ্জার কথা যাতে শুনতে না হয় সেজন্য, আসুন ষ-ত্ব বিধানটাও শিখে নিই। শুরুতেই শিখতে হবে ষ-ত্ব বিধানের সংজ্ঞা।

সে-সমস্ত নিয়ম অনুসারে দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয় তাকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

তৎসম শব্দে ষ-ত্ব বিধান

১. 'ঋ'-কারের পর 'ষ' বসে। যেমন- ঋষি, বৃষ, কৃষক, তৃষা, কৃষি।

মনে রাখবেন

সংস্কৃত 'কৃশ্' ধাতু থেকে সৃষ্ট শব্দে ঋ-কার থাকার পরও 'ষ' না হয়ে 'শ' হয়। যেমন কৃশ, কৃশকায়, কৃশাঙ্গ, কৃশানু, কৃশোদর।
ষ-ত্ব বিধানে এটি একটি ব্যতিক্রম।

২. 'ট' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে কেবল 'ষ' যুক্ত হয়।
যেমন- দুষ্টু, কষ্ট, সৃষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা, কণ্ঠ, কণ্ঠা ইত্যাদি।

৩. 'অ' 'আ'-ভিন্ন স্বর ববং 'ক' 'র'-এর পর বিভক্তি বা প্রত্যয়ের 'স' থাকলে তা ষ-তে রূপান্তরিত হয়।
যেমন- কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, আবিষ্কার, গোষ্পদ, জিগীষা (জয়ের ইচ্ছা) ইত্যাদি চিকীর্ষ(করবার ইচ্ছ)।

৪. ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত (অধি, অনু, অভি, নি, পরি, প্রতি, সু) উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুর 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়। যেমন–

'অধি' উপসর্গযোগে – অধিষ্ঠান (অধি+স্থান), অধিষ্ঠাতা, অধিষ্ঠিত।

'অনু' উপসর্গ যোগে– অনুষঙ্গ (অনু+সঙ্গ), অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠাতা।

'অভি' উপসর্গ যোগে – অভিষেক (অভি+সেক) অভিষিক্ত।

'নি' অথবা 'নির' উপসর্গযোগে – নিষ্কণ্টক, নিষেধ, নিষ্পাপ, নিষ্ফল।

'পরি' উপসর্গ যোগে– পরিষ্কার (পরি+কার), পরিষ্কৃত।

'প্রতি' উপসর্গ যোগে – প্রতিষেধ (প্রতি+সেধ), প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান।

'বি' উপসর্গ যোগে – বিষণ্ণ (বি+সন্ন), বিষুব, বিষাদ।

'সু' উপসর্গ যোগে সুষুপ্ত (সু+সুপ্ত) সুষমা, সুষ্ঠু ইত্যাদি।

৫. দুটি পদ সমাসযুক্ত হয়ে একটি শব্দ হলে প্রথম পদের শেষে যদি 'ই', 'উ', 'ঋ' অথবা 'ও' থাকে, তবে পরবর্তী শব্দের আদি বা শুরুর 'স' 'ষ'-য়ে পরিবর্তিত হয়। যেমন– যুধিষ্ঠির (যুধিথস্থির), সুষমা (সু+সমা), গোষ্ঠ (গো+স্থ) ইত্যাদি।

৬. কতকগুলো তৎসম শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। আপনাদের মনে রাখার সুবিধার জন্য ছন্দে গেঁথে দেয়া হল ঃ

আষাঢ় ঈষৎ ঈষা উষর নিকষ
বিশেষণ ভাষা ঊষা বিশেষ ষোড়শ
বিষাণ ও শোণ বিষ পুষ্প দোষ রোষ
মহিষ মূষিক পূষা পুরুষ প্রদোষ।
প্রত্যুষ ভূষণ কোষ ভূষা শষ্প শেষ,
বাষ্প ষট্ ভাষ্য পোষ্য অভিলাষ মেষ॥

৭. ব্যতিক্রম

ক) আমরা ওপরের ৪ নম্বর বিধানে বলেছি ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুর 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়। কিন্তু কিছু কিছু শব্দের 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়না।

যেমন– অনুসরণ, অনুসন্ধিৎসা, অভিসার, পরিসমাপ্তি, পরিসীমা, বিসর্গ, পরিস্থিতি, সুসংবাদ, সুসময়, সুস্পষ্ট, সুসম্পন্ন ইত্যাদি।

খ) স্পৃহ্ বা স্পন্দ্ ধাতুর 'স' কখনো 'ষ' হয় না।

যেমন– নিস্পৃহ, নিস্পন্দ।

গ) 'সাৎ' প্রত্যয়ের 'স' কখনো 'ষ' হয় না।

যেমন– অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।

ঘ) স্ফুট্ ও স্ফুর ধাতুর 'স' পরিবর্তিত হয় না।

যেমন– দন্তস্ফুট, পরিস্ফুট, বিস্ফোরণ ইত্যাদি।

লক্ষণীয়

ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশী ভাষা থেকে আগত শব্দে 'ষ' হয় না। তাই বিদেশী শব্দের বানানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যেমন- জিজ্ঞেস, পোশাক, সবুজ ইত্যাদি শব্দে যেন ভুলবশত 'ষ' ব্যবহার করবেন না।

খ) ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের সময় মূল শব্দের S স্থানে 'স' Sh স্থানে 'শ' এবং St স্থানে 'স্ট' ব্যবহৃত হয়। যেমন- ইংরেজি sofa, soapকে বাংলা লিখতে হবে সোফা, সোপ; ইংরেজি Shop, Shine-কে বাংলায় লিখতে হবে সপ, শাইন রূপে, ইংরেজি Post, Station, Master, Restaurant-কে বাংলায় লিখতে হবে পোস্ট, স্টেশন, মাস্টার, রেস্টুরেন্ট। কোনভাবেই পোষ্ট, ষ্টেশন, রেষ্টুরেন্ট নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ বানান পাশের খালি জায়গায় লিখুন ঃ

কৃষক -------------------- নিস্পন্দ ----------------- বিশেষণ --------------------

পরিষীসা ------------------- বিষর্গ -------------------, পোষাক -------------------

জিজ্ঞাষা -------------------- মহিস ------------------ সুসমা --------------------

বিস্ফোরণ ------------------, অভিলাস ------------------ শোড়স ------------------

২. ষ-ত্ব বিধানের ব্যতিক্রম ঘটেছে এমন পাঁচটি শব্দ নিচের খালি জায়গায় লিখুন

-------------------, -------------------, -------------------

-------------------, -------------------, -------------------।

৩. স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয় এমন শব্দগুলোর তালিকা প্রদান করুন।

৪. ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়মগুলো লিখুন।

৫. নিম্ন লিখিত বিদেশী শব্দগুলোর নিচে বাংলা প্রতিবর্ণীকৃত রূপ লিখুন।

Steamer, Steel, Show, Photostat, Post master, Station, August.

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব বিধান বাংলা শব্দ সম্ভারের মধ্যেকার কোন ধরনের শব্দের বেলায় প্রযুক্ত হয়?

২. বিধানের নিয়মগুলো লিখুন।

৩. বিধানের ব্যতিক্রমগুলো নির্দেশ করুন।

৪. বিধান কাকে বলে?

৫. বিধানের ব্যতিক্রমগুলো নির্দেশ করুন।

৬. বাংলা ভাষায় ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের প্রয়োজনীয়তা কী?

পাঠগুলোর সাহায্য নিয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নিজে নিজে তৈরি করুন।

ইউনিট ৫

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সন্ধির সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষাকে এক সময় বলা হতো সংস্কৃত ভাষার দুহিতা। বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার গঠনে দেশী, বিদেশী শব্দের যেমন সহায়ক ভূমিকা রয়েছে তেমনি সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ অবিকৃত কখনো বিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে এই ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ভাষার শব্দ নিয়ে গঠিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সূত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই শব্দাবলীর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে বাংলা সন্ধির এবং সংস্কৃত ভাষার তৎসম শব্দের জন্য আলাদা সূত্র বেঁধে দেয়া হয়েছে। অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলা সন্ধির নিয়ম। সংস্কৃত ভাষার যে সকল শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে এসব শব্দই তৎসম (তৎ=তার+সম=সমান) শব্দ হিসেবে পরিচিত। তৎসম শব্দের সন্ধির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার সন্ধির নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সন্ধির আলোচনায় বাংলা সন্ধির এবং তৎসম সন্ধির এই তফাৎটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে।

সন্ধির শব্দগত অর্থ সংযোগ বা মিলন। ব্যাকরণের সন্ধি আর যুদ্ধক্ষেত্রের সন্ধি প্রায় সমার্থক। যুদ্ধের পর দুই বিপরীত পক্ষ যখন একটা সমঝোতায় আসে, মিলেমিশে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তখনই বলা হয় দুই পক্ষে সন্ধি হয়েছে। ব্যাকরণে যে সন্ধি সেটিও দুই পক্ষেরই মিলন। তবে তা দুইদশ সৈন্যের মধ্যে নয়, দুটো ধ্বনির মধ্যে। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই সন্ধি দেখা যায়, তবে ভাষাভেদে সন্ধির প্রকৃতিও ভিন্ন হয়ে থাকে।

দুটো বর্ণ বা ধ্বনি অত্যন্ত কাছাকাছি এলে দ্রুত উচ্চারণের ফলে সেই ধ্বনি দুটো মিলে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধ্বনি এসে যায়, কখনোবা দুটোর একটা লোপ পায় কিংবা একটির টানে আরেকটি বদলে যায়। দুটো ধ্বনি মিলে যাওয়ার ফলে যে ধ্বনির লোপ পাওয়া কিংবা বদলে যাওয়া, ব্যাকরণে একেই বলে সন্ধি। এক কথায় বলা যায় ঃ

পাশাপাশি দুটো শব্দের মিলনকে সন্ধি বলে।

যেমন মহা+আশয় = মহাশয়
পশু+আদি = পশ্বাদি
অতঃ+এব = অতএব
উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

এখানে পাশাপাশি দুটো শব্দ মিলে সন্ধি হয়েছে। ফলে উচ্চারণের খুব সুবিধা হয়েছে। দুটো শব্দ মিলে নতুন শব্দও তৈরী হয়েছে। মহা-আশায়, পশু-আদি, অতঃ - এব, উৎ - শ্বাস - এ রকম বলা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি শুনতে ও শ্রুতি মধুর নয়। তার বদলে মহাশয়, পশ্বাদি, অতএব, উচ্ছ্বাস - এ কথাগুলো বলতে সহজ শুনতেও সুন্দর। সন্ধি এভাবেই ভাষার উচ্চারণ সহজ করে শব্দকে শ্রুতিমধুর করে তোলে।

সন্ধির উদ্দেশ্য

সন্ধি ভাষার উচ্চারণকে সহজ করে, শব্দকে শ্রুতিমধুর করে। যেমন– হিম আলয়, জন – এক, উদ–হত না বলে হিমালয়, জনৈক, উদ্ধত বললে শব্দগুলো সহজে ও সংক্ষেপে উচ্চারণ করা যায় এবং শ্রুতিমধুর হয়।

সন্ধির উদ্দেশ্য

১. উচ্চরণ সহজ করা ২. শ্রুতিমধুর করা ৩. নতুন শব্দ তৈরী করা- যেমন ঃ বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়, হিম+ আলয় = হিমালয়।

যেখানে ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি হয় না সেখানে শুধু উচ্চারণ সহজ করার জন্য সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন– কচু+আদা+আলু = কচ্চাদালু হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞ উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১. সন্ধি শব্দের অর্থ কি?

ক) সমঝোতা ☐ খ) চুক্তি ☐
গ) সংযোগ ☐ ঘ) মিলন ☐

২. বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কি রকম?

ক) গুরুত্বহীন ☐ খ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ☐
গ) সামান্য ☐ ঘ) নেই বললে চলে ☐

৩. সন্ধির উদ্দেশ্য কি?

ক) উচ্চারণ পরিবর্তন করা ☐ খ) উচ্চারণ সহজ করা ☐
গ) নতুন শব্দ তৈরী করা ☐ ঘ) উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর করা ☐

উত্তর

১. ঘ, ২. খ ৩. ঘ

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সন্ধি কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন। প্রয়োজন বোধে ছক এঁকে দেখাতে পারবেন।
- সবর্ণ, অসবর্ণ, সন্ধ্যক্ষর, গুণস্বর ও বৃদ্ধিস্বর কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অঘোষ বর্ণের প্রভেদ কি এবং তারা কোন্ কোন্ বর্ণ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার সন্ধি

বাংলা ভাষার সন্ধির ধারাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ক) বাংলা সন্ধি খ) তৎসম সন্ধি।

বাংলা সন্ধি

অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের একাধিক ধ্বনির যে মিলন ঘটে তারই নাম বাংলা সন্ধি।

তৎসম সন্ধি

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের একাধিক ধ্বনির যে মিলন হয়, তার নাম তৎসম সন্ধি।

বাংলা শব্দের সন্ধি

বাংলা শব্দের সন্ধি দুরকমের- স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলিত হয়ে কিংবা উভয়ের একের লোপে অথবা তাদের পারস্পরিক প্রভাব ঘটিত পরিবর্তনে স্বরবর্ণের যে অবস্থা ঘটে, তার নাম স্বর সন্ধি। যেমন- বিদ্যালয়।

বিদ্যা+আলয়

আ+আ = আ

এখানে বিদ্যা শব্দের শেষের আকার ও আলয় শব্দের পূর্বের আকার, এই দুইস্বর মিলে একটি স্বরে পরিণত হয়ে বিদ্যালয় শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

কত+এক = কতেক

অ+এ = এ

এখানে অ লোপ পেয়েছে।

দুটি স্বর অত্যন্ত কাছাকাছি এলে তাদের মিলনে একটি স্বর উৎপন্ন হলে তাকে স্বরসন্ধি বলে।

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জন ধ্বনির অথবা ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির যোগে, কিংবা তাদের একের লোপে, অথবা তাদের পারস্পরিক প্রভাব ঘটিত পরিবর্তনে ধ্বনির যে অবস্থা ঘটে, তার নাম ব্যঞ্জন সন্ধি। যেমন দিক+ইন্দ্র = দিগিন্দ্র।

মনে রাখার সুবিধার জন্য সন্ধির আলোচিত বিষয়গুলোকে নিম্নে ছক এঁকে দেখানো হল ঃ

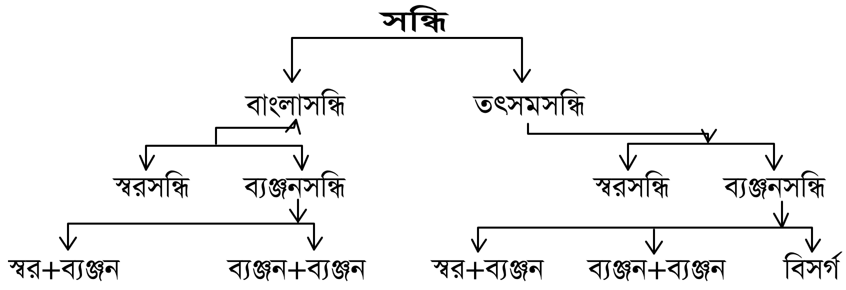

ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরের বা ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

সন্ধির প্রকৃতি বুঝতে হলে কতকগুলো বিষয় অত্যন্ত সহায়ক। সুতরাং তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নেরূপ ঃ

ক) সবর্ণ এর অর্থ সমান উচ্চারণ স্থানীয় স্বরবর্ণ অর্থাৎ একই উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চার্য স্বর বর্ণ যেমন–

অ, আ = অ-বর্ণ
ই, ঈ = ই-বর্ণ
উ, ঊ = উ - বর্ণ
ঋ, ঋ = ঋ - বর্ণ

উচ্চারণে এদের প্রথম বর্ণ হ্রস্ব এবং দ্বিতীয় বর্ণ দীর্ঘ, এটাই বিশেষ লক্ষণীয়।

খ) অসবর্ণ - একই উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চারণ নয়, এমন স্বর বর্ণ সুতরাং সবর্ণ ছাড়া অন্যসব স্বরবর্ণ।

গ) ই, ঈ-এর গুণ-এ
উ, ঊ- এর গুণ-এ
ঋ,ঋৃ এর গুণ-এ অর

ঘ) বৃদ্ধিস্বর অ, আ-এর বৃদ্ধি আ
ই উ, এ এর বৃদ্ধি ঐ
উ, ঊ, ও-এর বৃদ্ধি ও
ঋ, ঋ এর বৃদ্ধি আর

ঙ) সন্ধি-স্বর বা সন্ধ্যক্ষর যে সকল স্বর একাধিক স্বরের মিলন থেকে জাত, তাদেরকে সন্ধিস্বর বলে, যেমন এ, ঐ ও ঐ।

চ) উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন স্বর - ই, উ = উচ্চমানের স্বর
এ, ও = মধ্যমানের স্বর
অ, আ = নিম্নমানের স্বর

ছ) নিপাতনে সিদ্ধ – কোন প্রচার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, এমন স্বল্প সংখ্যক শব্দ বিনা আপত্তিতে ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এরকম নিয়ম বহির্ভূত অথচ সর্বস্বীকৃত প্রচলিত শব্দকে নিপাতনে সিদ্ধ শব্দ বলে।

জ) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্ উচ্চারণের সময় কণ্ঠের স্বরতন্ত্রী স্পন্দিত হয় বলে, এগুলোর নাম ঘোষ বর্ণ। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে অঘোষ বর্ণ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞ উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১। বাংলা শব্দের সন্ধি কত প্রকার?
ক) তিন প্রকার ☐ খ) পাঁচ প্রকার ☐
গ) বহু প্রকার ☐ ঘ) দুই প্রকার ☐

২। স্বর ধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিত হলে তাকে কি সন্ধি বলে?
ক) স্বর-ব্যঞ্জন সন্ধি ☐ খ) স্বরসন্ধি ☐
গ) ব্যঞ্জন সন্ধি ☐ ঘ) মিত্রসন্ধি ☐

৩। অ এর পর থাকলে উভয়ে মিলে কি হয়?

ক) অ	☐	খ) আ	☐
গ) এ	☐	ঘ) ই	☐

৪। একই উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চার্য স্বরবর্ণকে কি বলে?

ক) সবর্ণ	☐	খ) মিত্রবর্ণ	☐
গ) স্বর বর্ণ	☐	ঘ) সমবর্ণ	☐

৫. যে সকল স্বর একাধিক স্বরের মিলন থেকে জাত তাকে কি বলে?

ক) সংকরস্বর	☐	খ) মিত্রস্বর	☐
গ) সন্ধিস্বর	☐	ঘ) ধ্বনিস্বর	☐

৬. বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে কি বলে?

ক) ঘোষবর্ণ	☐	খ) অঘোষ বর্ণ	☐
গ) স্বরবর্ণ	☐	ঘ) মহাপ্রাণ ধ্বনি	☐

৭. স্বরবর্ণকে বলা হয়-

ক) ঘোষবর্ণ	☐	খ) অঘোষ বর্ণ	☐
গ) অসবর্ণ	☐	ঘ) সবর্ণ	☐

৮. ই-উ কোন মানের স্বর?

ক) মধ্য মানের	☐	খ) উচ্চ মানের	☐
গ) নিম্ন মানের	☐	ঘ) মিশ্রমানের	☐

উত্তর

১. ঘ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. গ ৬. খ ৭. ক ৮. খ

পাঠ ৩ ঃ খাঁটি বাংলা ভাষার সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাংলা সন্ধি কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা স্বর সন্ধির উদাহরণ দিতে পারবেন।
- বহিঃসন্ধি ও অন্তঃ সন্ধির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

খাঁটি বাংলা ভাষার সন্ধি

খাঁটি বাংলা ভাষায় যে ধরনের সন্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তা মূলত, বাংলা উচ্চারণ রীতিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। ফলে বাংলা সন্ধি মৌখিক ভাষায় যতটা পাওয়া যায়, লিখিত ভাষায় তত দেখা যায় না। বাংলা উচ্চারণ রীতি সংস্কৃত উচ্চারণ রীতি থেকে বরাবরই আলাদা। কাজেই তৎসম বা সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাংলা সন্ধির অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাটে না। বাংলা ভাষায় অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের একাধিক ধ্বনির যে মিলন ঘটে, তারই নাম বাংলা সন্ধি। বাংলা শব্দের সন্ধিকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বর ধ্বনির সঙ্গে অপর স্বরধ্বনি মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন মহাশয়

মহা+আশয় = মহাশয়

আ + আ = আ

এখানে আ লোপ পেয়েছে।

স্বরসন্ধি = স্বর ধ্বনি + স্বরধ্বনি

স্বর সন্ধি আবার দু রকমের হয়ে থাকে।

বহিঃসন্ধি ও অন্তঃসন্ধি

বিভিন্ন শব্দদ্বয়ের সন্ধি, যেমন– মহা+আশয়। এখানে মহা ও আশয় এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছে তাকে বহিঃ সন্ধি বলে।

বিভিন্ন শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বহিঃসন্ধি বলে।

একই শব্দের সন্ধি, যেমন– নৌ+ইক = নাবিক, ভজ+ত = ভক্ত। একে অন্তঃসন্ধি বলে।

একই শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয় তাকে অন্তঃসন্ধি বলে।

স্বরের বহিঃসন্ধি

১. অ-কারের পর অ-কার থাকলে অথবা অ-কারের পর আ-কার, আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কারের পর আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয় এবং আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

আ+অ = আ

শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক

প্রাণ+অধিক = প্রাণাধিক

হিম+অচল = হিমাচল

হিত+অহিত = হিতাহিত

নর+অধম = নরাধম

অ+আ = আ

প্রবাল+আদি = প্রবালাদি

হিম+আলয় = হিমালয়

দেব + আলয় = দেবালয়

সিংহ + আসন = হিংহাসন

আ+অ = আ

মহা+অর্ঘ = মহার্ঘ

যথা+অর্থ = যথার্থ
আশা+অতীত = আশাতীত

আ+আ = আ

কারা+আগার = কারাগার
মহা+আশয় = মহাশয়
বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার অথবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়্-েকার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ই = এ

নর+ইন্দ্র = নরেন্দ্র
শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
স্ব+ইচ্ছা = স্বেচ্ছা

আ+ই = এ

মহা+ইন্দ্র = মহেন্দ্র
যথা+ইচ্ছা = যথেচ্ছা

অ+ঈ = এ

নর+ইশ = নরেশ
পরম+ইশ = পরমেশ

আ+ঈ = এ

মহা+ঈশ = মহেশ

৩. অ-কার অথবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

অ+উ = ও

মূল + উচ্ছেদ = মূলোচ্ছেদ
সূর্য+উদয় = সূর্যোদয়
নীল + উৎপল = নীলোৎপল

আ+উ = ও

যথা+উচিত = যতোচিত
মহা+উৎসব = মহোৎসব
অ+ঊ = ও

গৃহ +উর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব
চল+উর্মি = চলোর্মি

আ+ঊ = ও

গঙ্গা+উর্মি= গঙ্গোর্মি

৪. অ-কার অথবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর্' হয়। 'অর' রেফ(́) হিসেবে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ+ঋ = অর্

দেব+ঋষি = দেবর্ষি
সপ্ত+ঋষি = সপ্তর্ষি
আ+ঋ = অর
মহা+ঋষি = মহর্ষি

৫. অ-কার অথবা আ-কারের পরে এ-কার অথবা ঐকার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্বের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।
অ+এ = ঐ
জন+এক = জনৈক

আ+এ = ঐ
সদা+এব = সদৈব
মহা+একত্ব = মহৈকত্ব
অ+ঐ = ঐ
মত+ঐক্য = মতৈক্য

আ+ঐ = ঐ

মহা+ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

৬. অ-কার অথবা আ-কারের পরে ও-কার অথবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। ঐ-কার পূর্বের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ও = ঔ

বন+ঔষধি = বনৌষধি

অ+ঔ = ঔ

পরম+ঔষধ = পরমৌষধ

আ+ঔ = ঔ

মহা+ঔষধ = মহৌষধ

মহা+ঔষধি = মহৌষধি

৭. ই-কার অথবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+ই = ঈ

যতি+ইন্দ্র = যতীন্দ্র

অতি+ইত = অতীত

অতি+ইব = অতীব

ই+ঈ = ঈ

অধি+ঈশ্বর = অধীশ্বর

পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা

ঈ+ই = ঈ

মহী+ইন্দ্র = মহীন্দ্র

সতী+ইন্দ্র=সতীন্দ্র

৮. ই-কার, অথবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ-কার স্থানে য হয়। য-ফলা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+অ = য্+অ

অতি+অন্ত = অত্যন্ত

প্রতি+অহ = প্রত্যহ

অতি+অধিক = অত্যধিক

ই+আ = য্+আ

অতি+আচার = অত্যাচার

ইতি+আদি = ইত্যাদি

প্রতি+আশা = প্রত্যাশা

ই+উ = য্+উ

অতি+উচ্চ = অত্যুচ্চ

অতি+উক্তি = অত্যুক্তি

প্রতি+উপকার = প্রত্যুপকার

ই+ঊ = য্+ঊ

প্রতি+ঊষ= প্রত্যুষ

ঈ+আ = য্+আ

মসী+আধার = মস্যাধার

ই+এ = য+এ

প্রতি+এক = প্রত্যেক

ঈ+অ = য্+অ

নদী+অম্বু = নদ্যম্বু

৯. উ-কার অথবা ঊ-কারের পর উ-কার অথবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

উ+উ = ঊ

কটু+উক্তি = কটূক্তি

মরু + উদ্যান = মরূদ্যান

উ+ঊ = ঊ

বহু+ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব

ঊ+ঊ = ঊ

ব্যবহার নেই

১০. উ-কার অথবা ঊ-কারের পর উ-কার ওঊ-কার ছাড়া অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব-ফলা হয়। ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ+অ = ব+অ

মনু+অন্তর = মন্বন্তর

সু+অল্প = স্বল্প

উ+আ = ব+আ

পশু+আদি = পশ্বাদি

সু+আগত = স্বাগত

উ+ই = ব+ই

অণু+ইত = অন্বিত

উ+ঈ = ব+ঈ

তনু+ঈ = তন্বী

উ+এ = ব+এ

অণু+এষণ = অন্বেষণ

১১. ঋ-কারের পর ঋ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ঋ- কার স্থানে র-ফলা হয়। র-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

ঋ+অ = র

পিতৃ+আর = পিত্ররি

ঋ+আ = র

মাতৃ+আদেশ = মাত্রাদেশ

পিতৃ+আলয় = পিত্রালয়

বিশেষ স্বরসন্ধি

অ-বর্ণের পর কাতর অর্থে ঋত শব্দের ঋ থাকলে ঋ স্থানে আর হয়ে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়।

শীত+ঋত = শীতার্ত

দুঃখ+ঋত=দুঃখার্ত

তৃষ্ণা+ঋত = তৃষ্ণার্ত

নিম্নলিখিত সন্ধিগুলো বিশেষ রূপে সম্পন্ন হয় ঃ

স্ব+ঈর = স্বৈর

স্ব+ঈরিনী = স্বৈরিণী

অক্ষ+উহিনী = অক্ষোহিনী

গো+ইন্দ্র = গবেন্দ্র

গো+অক্ষ = গবাক্ষ

প্র+উঢ় = প্রৌঢ়

কুল+অটা = কুলটা ইত্যাদি।

স্বরের অন্তঃসন্ধি

১. শব্দের মধ্যে এ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে এ-কারের স্থানে 'অয়' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

এ+অ

নে+অন = নয়ন

বে+অন = বয়ন

এ+আ = আয়

শে+আন = শয়ান

২. ঐ-কারের পরে স্বরবর্ণ থাকলে ঐ-কার স্থানে 'আয়' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ঐ+অ = আয়

নৈ+অক = নায়ক
গৈ+অক = গায়ক

৩. শব্দের মধ্যে ও-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ও-কারের স্থানে ‘অব’ হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ও+অ= অব
ভো+অন = ভবন
পো+অন = পবন
লো+অণ = লবণ

৪. শব্দের মধ্যে ঔ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-কার স্থানে ‘আব’ হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ঔ+অ = আব
পৌ+অক = পাবক
নৌ+ইক = নাবিক
ভৌ+উক = ভাবুক

নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিশেষ স্বরস্বন্ধি হিসেবে চিহ্নিত ঃ

দেখিতে+আছি = দেখিতেছি
দেখিয়া+আছি = দেখিয়াছি
পাগল+আমি = পাগলামি
কুড়ি+এক = কুড়িক
দেখ+সে = দেখসে
যাব+এখন = যাব’খন
খানি+এক = খানিক ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১. বাংলা সন্ধি কত প্রকার?
ক) তিন প্রকার ☐ খ) আট প্রকার ☐
গ) দুই প্রকার ☐ ঘ) এক প্রকার ☐
২. বিভিন্ন শব্দদ্বয়ের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলে,

ক) স্বরসন্ধি ☐ খ) বহিঃসন্ধি ☐
গ) ব্যঞ্জন সন্ধি ☐ ঘ) অন্তঃসন্ধি ☐

৩. একই শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলে,
ক) বহিঃসন্ধি ☐ খ) ব্যঞ্জন ☐
গ) স্বরসন্ধি ☐ ঘ) অন্তঃসন্ধি ☐

৪. শশাঙ্ক শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয়-
ক) শশা+অঙ্ক ☐ খ) শশ+আঙ্ক ☐
গ) শশ+অঙ্ক ☐ ঘ) শশা+অঙ্ক ☐

৫. অ বর্ণের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে হয়
ক) অর ☐ খ) আর ☐
গ) আব ☐ ঘ) অব ☐

৬. অন্তঃসন্ধি চিহ্নিত করুন ঃ
ক) যে+অন ☐ খ) পিতৃ+আলয় ☐
গ) ভো+অন ☐ ঘ) পৌ+অক ☐

৭. সন্ধি করুন ঃ

ক মরু+উদ্যান =		খ) প্রতি+অহ =	
গ) নীল+উৎপল =		ঘ) কারা+আগার =	
ঙ) হিত+অহিত =		চ) যথা+অর্থ =	
ছ) সতী+ইন্দ্র =		জ) পরম+ঔষধ =	
ঝ)ইতি+আদি =		ঞ) সদা+এব =	

৮. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন

ক. প্রৌঢ় =		খ. গবাক্ষ =	
গ. অন্যান্য =		ঘ. অতীত =	
ঙ. সপ্তর্ষি =		চ. যথেচ্ছা =	
ছ. শুভেচ্ছা =		জ. দেবালয় =	
ঝ. প্রাণাধিক		ঞ. গঙ্গোর্মি =	

উত্তর

১. গ ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. ক ৬. গ

৭. মরুদ্যান, প্রত্যহ, নীলোৎপল, কারাগার, হিতাহিত, যথার্থ, সতীন্দ্র, পরমৌষধ, ইত্যাদি, সদৈব।

৮. প্র+ঊঢ়, গো+অক্ষ, অন্য+অন্য, অতি+ইত, সপ্ত+ঋষি, যথা+ইচ্ছা, শুভ+ইচ্ছা, দেব+আলয়, প্রাণ+অধিক, গঙ্গা+ঊর্মি।

পাঠ ৪ ঃ ব্যঞ্জন সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধির সংজ্ঞা ও নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি ও স্বর সন্ধির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত শব্দগুলো সন্ধিবিচ্ছেদ ও সন্ধি করতে পারবেন।

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বর সন্ধির ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির সঙ্গে যেমন স্বরধ্বনির সন্ধি হতে হবে। ব্যঞ্জন সন্ধির ক্ষেত্রে এরকম বাধ্যবাধকতা নেই। স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জন ধ্বনির অথবা ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জন ধ্বনির যে সন্ধি হয়ে থাকে, তাকেই ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি সাধারণত দুই উপায়ে নিষ্পন্ন হয়।

১. স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিশ্রণে

২. ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিশ্রণে

ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরের অথবা ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

ব্যঞ্জনের বহিঃসন্ধি

১. স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।

ক+ঈ = গ

বাক+ঈশ = বাগীশ

ক+এ = গ

ঋক+বেদ = ঋগবেদ

চ+অ = জ

অচ্+অন্ত = অজন্ত

ট+ই = ড

ষট্+বিঠ ঃ ষড়বিধ

২. অনুনাসিক বর্ণ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

ক+ম = ঙ

বাক+ময় = বাঙ্ময়

দিক+নির্ণয় = দিঙনির্ণয়

ট+ন = ণ

ষট+নবতি = ষণ্ণবতি

ত+ম = ন

বিৎ+ময় = বিস্ময়

জগৎ+নাথ = জগন্নাথ

৩. চ কিংবা ছ পরে থাকলে ত্ এবং দ স্থানে চ হয়।

ত+চ = চ

সৎ+চিৎ = সচ্চিৎ

দ+ছ = চ

তদ+ছিদ্র = তচ্ছিদ্র

৪. জ, ঝ পরে থাকলে ত এবং দ স্থানে জ হয়।

ত+জ = জ

জগৎ+জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি

ত+ঝ = জ

কুৎ+ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা

দ+জ = জ

তদ্+জাতীয় = তজ্জাতীয়

৫. ট, ঠ পরে থাকলে ত বা দ স্থানে ট হয়।

ত+ট = ট

বৃহৎ+টীকা = বৃহট্টীকা

ত+ঠ = ট

বৃহৎ+ঠক্কুর = রহট্ঠক্কুর

৬. ড, ঢ পরে থাকলে ত এবং দ স্থানে ড হয়।

ত+ড = ড

উৎ+ডীন = উড্ডীন

ত+ঢ = ড

বৃহৎ+ঢক্কা = বৃহড্ডঢক্কা

৭. ল পরে থাকলে ত এবং দ স্থানে ল হয়।

ত+ল = ল

বিদ্যুৎ+লতা = বিদ্যুল্লতা

দ+ল = ল

তদ্+লিখিত = তল্লিখিত

৮. শ পরে থাকলে ত এবং দ্ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয়।

ত+শ = চ

উৎ+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল

উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস

দ+ল = ছ

তদ্+শক্তি = তচ্ছক্তি

৯. হ পরে থাকলে ত, দ স্থানে দ্ এবং হ স্থানে ধ হয়।

ত+হ = দ

উৎ+হত = উদ্ধত

দ+হ = ধ

পদ+হতি = পদ্ধতি

১০. স্বরবর্ণের পর ছ থাকলে ছ স্থানে চ্ছ হয়।

উ+ছ = চ্ছ

তরু+ছায়া = তরুচ্ছায়া

আ+ছাদন = আচ্ছাদন

১১. অকারের পরে স্মিত বিসর্গের পর অকার থাকলে পূর্বের অঃ স্থানে ও-কার হয় এবং পরের অ-কার লুপ্ত হয়।

অঃ+অ = ও

ততঃ+অধিক = ততোধিক

মনঃ+অন্তর = মনোন্তর

১২. অ কারের পরে স্মিত বিসর্গের পর বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চমবর্ণ কিংবা য/র/ল/ব/হ থাকলে পূর্বের অঃস্থানে ও-কার হয়।

অঃ+গ = ও

মনঃ+গামী = মনোগামী

অঃ+ঘ = ও

সদ্যঃ+ঘৃত = সদ্যোঘৃত

অঃ+ন = ও

যৎপরঃ+নাস্তি = যৎপরোনাস্তি

মনঃ+হর = মনোহর

১৩. অ, আ ভিন্ন স্বরের পরে স্থিত বিসর্গের পর স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য/র/ল/ব/হ থাকলে বিসর্গস্থানে র হয়।

উ+উ = র

চক্ষুঃ+উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন

জ্যোতিঃ+ ময় = জ্যোর্তিময়

ধনুঃ+বিদ্যা = ধনুর্বিদ্যা

১৪. র পরে থাকলে অ, আ ভিন্ন স্বরের পরে স্থিত বিসর্গের লোপ হয় এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয়ে যায়।

নিঃ+রব = নীরব

নিঃ+রস = নীরস

১৫. চ, ছ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে শ্ হয়।

দুঃ+চিন্তা = দুশ্চিন্তা

শিরঃ+ছেদ = শিরচ্ছেদ

১৬. ট পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়।

ধনুঃ+টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার

১৭. ত পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে স হয়।

নিঃ+তার = নিস্তার

মনঃ+তার = মনস্তাপ

১৮. ক, প পরে থাকলে অবর্ণের পরে স্থিত বিসর্গ স্থানে প্রায় স হয়।

মনঃ+কাম = মনস্কাম

তেজঃ+কর = তেজস্কর

বাচঃ+পতি = বাচস্পতি

নমঃ+কার = নমস্কার

ভাঃ+কর = ভাস্কর

আঃ+পদ = আস্পদ

১৯. ক, খ, প ফ পরে থাকলে অবর্ণ ভিন্ন স্বরের পতে স্থিত বিসর্গ স্থানে ষ হয়।

নিঃ+কাম = নিষ্কাম

বহিঃ+কৃত = বহিষ্কৃত

নিঃ+ফল = নিষ্ফল

ভ্রাতুঃ+পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র

চতুঃ+পদ = চতুষ্পদ

আয়ু+কাল = আয়ু:ষ্কাল

২০ স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য/র/ল/ব/হ পরে থাকলে অকারের পরে স্থিত র-জাত বিসর্গ স্থানে র হয়।

প্রাঃ+উত্থান = প্রাতরুত্থান

অন্ত+রঙ্গ = অন্তরঙ্গ

পুনঃ+বার = পুনর্বার

স্বঃ +গত = স্বর্গত

২১. রজাত বিসর্গ যথা- নিঃ দুঃ প্রাদুঃ অন্তঃ অহঃ পুনঃ প্রাতঃ চতুঃ স্বর ইত্যাদি শব্দে।

ব্যঞ্জনের অন্তঃ সন্ধি

প্রত্যয় যোগে পদমধ্যে যে সন্ধি হয় তাকেই ব্যঞ্জনের অন্তঃসন্ধি বলে। যথা ঃ

চ্+ন = চঞ

যাচ্+না = যাচঞা

জ+ন = জ্ঞ

রাজ+নী = রাজ্ঞী

চ+ত = ক্ত

সিচ+ত = সিক্ত, মুচ্+ = মুক্ত

জ+ত = ক্ত

ত্যজ্+ত = ত্যক্ত, ভজ্+ত = ভক্ত

জ+ত = ষ্ট

মৃজ+ত = মৃষ্ট, সৃজ্+ত = সৃষ্ট

ধ+ত = দ্ধ

ক্রুধ+ত = ক্রুদ্ধ

ভ+ত = ব্ধ

লভ+ত = লব্ধ

ক্ষুভ+ ত = ক্ষুব্ধ

শ+ত = ষ্ট

দৃশ+ত = দৃষ্ট

আ+দিশ্+ত = আদিষ্ট

ষ্+ত = ষ্ট

আ+কৃষ+ত = আকৃষ্ট

ঘৃষ+ত = ঘৃষ্ট

ষ+থ = ষ্ঠ

ষষ+থ = ষষ্ঠ

নিষ+থা = নিষ্ঠা

হ+ত = গ্ধ

দুহ+ত = দুগ্ধ

হ্+ত = দ্ধ

নহ্+ত = নদ্ধ

হ+ত = ঢ় (পূর্বস্বর দীর্ঘ)

গুহ্+ত = গূঢ়

রুহ+ত = রূঢ়

অন্যান্য সন্ধি অর্থাৎ ব্যতিক্রম

১. স্পর্শ বর্ণ পরে থাকলে ম স্থানে পরবর্তী বর্ণের বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

ম+য = ঞ্চ

সম+চয় = সঞ্চয়

ম+ব = ম্ব

সম+বদ্ধ = সম্বন্ধ

ম+ম = ম্ম

২. স্পর্শবর্ণ ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন বর্ন পরে থাকলে ম স্থানে অনুস্বার-ং হয়।

ম+য = ং

সম+যোগ = সংযোগ

ম+ব = ং

কিম+বা = কিংবা

বশম+বদ = বশংবদ

ম+স = ং

সম+সার = সংসার

ম+হ = ং

সম+হার = সংহার

ম+ব = ং

সম+বর্ধনা = সংবর্ধনা

কিন্তু সম+রাই = সম্রাট, সম+রাজ্ঞ = সম্রাজ্ঞী

নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ অর্থাৎ নিপাতনে সিদ্ধ।

গো+য = গব্য, নৌ+য = নাব্য, বৃহৎ+পতি = বৃহস্পতি, বন+পতি = বনস্পতি, তৎ+কর = তস্কর, গো+পদ = গোষ্পদ, পর+পর = পরস্পর, সম+কৃত = সংস্কৃত, পরি+কার = পরিষ্কার, এক+দশ = একাদশ, ষষ+দশ = ষোড়শ, পতৎ+অঞ্জলি = পতঞ্জলি, মনঃ+ঈষা = মনীষা ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা শব্দে সন্ধি হয় না। তবে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ-

কাঁদ+না = কান্না

রাঁধ+না = রান্না

পাট+কাটি = পাকাটি

না+কাটি = ণাকাটি

না+হই = নহি

বদ+জাত = বজ্জাত

খাঁটি বাংলা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সন্ধি হয় না-

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ব্যঞ্জন সন্ধির সংজ্ঞা ও উদাহরণ সহযোগে প্রকারভেদ লিখুন।

২. ব্যঞ্জনের বহিঃসন্ধি বলতে কি বোঝায়? উদাহরণ সহযোগে বহিঃসন্ধি ও আন্তঃসন্ধির পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৩. উদাহরণ সহযোগে ব্যঞ্জন সন্ধির পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

৪. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন ঃ

ক) ঋগবেদ
খ) বাঙ্ময়
গ) ষষ্ঠ
ঘ) জগন্নাথ
ঙ) উড্ডীন
চ) আচ্ছাদন
ছ) মনোগামী
জ) ততোধিক
ঝ) বজ্জাত
ঞ) নাব্য

৫. সন্ধি করুন

ক) এক+দশ
খ) পর+পর
গ) সদ্যঃ+ঘৃত
ঘ) জ্যোতিঃ+ময়
ঙ)কুৎ+ঝটিকা
চ) তদ+ছিদ্র
ছ) ষট+নবতি
জ) অচ্+অন্ত
ঞ) উৎ+শৃঙ্খল

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- তৎসম সন্ধি কত প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন।
- উদাহরণসহ তৎসম স্বরসন্ধির নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি

সংস্কৃত ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সকল শব্দই বাংলায় তৎসম শব্দ হিসেবে পরিচিত। তৎসম শব্দগত অর্থ ‘তার সমান’ (তৎ = তার, সম = সমান) অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণীর শব্দের সন্ধির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার সন্ধির নিয়ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি তিন প্রকার

যথা ঃ স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি তার নাম স্বরসন্ধি।

১। অ, আ-কারের পর অ-কার অথবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে।

অ+অ = আ

পরম+অণূ = পরমাণু

নর+অধম = নরাধম

অ+আ = আ

হিম+আলয় = হিমালয়

সিংহ+আসন = সিংহাসন

আ+অ = আ

মহা+অর্ঘ = মহার্ঘ

আশা+অনুরূপ = আশানুরূপ

আ+আ = আ

মহা+আশয় = মহাশয়

বিদ্যা+আলয় = বিদ্যালয়

২। অ, আ-কারের পর ই-কার অথবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়ে থাকে। এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ই = এ

শুভ+ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

স্ব+ইচ্ছা = স্বেচ্ছা

আ+ই = এ

যথা+ইচ্ছা = যথেচ্ছা

অ+ঈ = এ

পরম+ঈশ = পরমেশ

আ+ঈ = এ
মহা+ঈশ = মহেশ

৩। অ, আ-কারের পর উ-কার অথবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়ে থাকে। ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

অ+উ = ও
হিত+উপদেশ = হিতোপদেশ
পর+উপকার = পরোপকার

আ+উ = ও
যথা+উচিত = যথোচিত
মহা+উৎসব = মহোৎসব

অ+ঊ = ও
গৃহ+ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব

আ+ঊ = ও
গঙ্গা+ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

৪। অ, আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে অর্ হয়ে থাকে। অর্ রেফ (র্) হিসেবে পরবতী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ+ঋ = অর্
দেব+ঋষি = দেবর্ষি
সপ্ত+ঋষি = সপ্তর্ষি

আ+ঋ = অর
মহা+ঋষি = মহর্ষি

৫। অ, আ-কারের পর 'ঋত' শব্দ থাকলে উভয়ে মিলে 'আর' হয়ে থাকে এবং পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ যুক্ত হয়।

অ+ঋ = আর

শীত+ঋত = শীতার্ত
ভয়+ঋত = ভয়ার্ত

আ+ঋ = আর
তৃষ্ণা+ঋত = তৃষ্ণার্ত
ক্ষুধা+ঋত = ক্ষুধার্ত

৬। অ, আ-কারের পর এ-কার অথবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। ঐ-কার পূর্বের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+এ = ঐ
জন+এক = জনৈক
হিত+এষী = হিতৈষী

আ+এ = ঐ
সদা+এব = সদৈব

অ+ঐ = ঐ
মত+ঐক্য = মতৈক্য
বিপুল+ঐশ্বর্য = বিপুলৈশ্বর্য

আ+ঐ = ঐ
মহা+ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

৭। অ, আ-কারের পর ও-কার অথবা ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়ে থাকে। ঔ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ+ও = ঔ
জল+ওকা = জলৌকা
বন+ওষধি = বনৌষধি

অ+ঔ = ঔ
পরম+ঔষধ = পরমৌষধ
চিত্ত+ঔদার্য = চিত্তৌদার্য

আ+ঔ = ঔ
মহা+ঔষধ = মহৌষধ
৮। ই, ঈ-কারের পর ই-কার অথবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+ই = ঈ

অতি+ইব = অতীব
অতি+ইত = অতীত

ই+ঈ = ঈ
পরি+ঈক্ষা = পরীক্ষা
ঈ+ই = ঈ
সতী+ইন্দ্র = সতীন্দ্র

ঈ+ঈ = ঈ
সতী+ঈশ = সতীশ

ই, ঈ-কারের পরে ঈ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ঈ বা ঈ-স্থানে 'য' হয়। য-ফলা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই+অ = য্+অ = য = ্য

প্রতি+অহ = প্রত্যহ
আদি+অন্ত = আদ্যন্ত
অতি+অন্ত = অত্যন্ত

ঈ+অ = য্+অ = য = ্য

নদী+অম্বু = নদ্যম্বু
সতী+অঙ্গ = সত্যঙ্গ

ই+আ = য্+আ = যা = ্যা

পরি+আলোচনা = পর্যালোচনা
অতি+আচার = অত্যাচার
ইতি+আদি = ইত্যাদি
প্রতি+আশা = প্রত্যাশা

ই+উ=য্+উ = যু = ্যু
অতি+উচ্চ = অতুচ্ছ
প্রতি+উত্তর = প্রত্যুত্তর

ই+ঊ = য্+ঊ = যূ = ্যূ
প্রতি+ঊষ = প্রত্যূষ

অতি+ঊর্ধ্ব = অত্যূর্ধ্ব

ঈ+আ = য্+আ = যা = ্যা

মসী+আধার = মস্যাধার

ই+ঔ = য্+ঔ = যৌ = = ্যৌ

অতি+ঔৎসুক্য = অত্যৌৎসুক্য

উ, ঊ-কারের পর উ-কার অথবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়ে থাকে। ঊ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

উ+উ = ঊ = ূ

মরু+উদ্যান = মরূদ্যান

উ+ঊ = ঊ = ূ

বহু+ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব্

ঊ+ঊ = ঊ = ৗ

ব্যবহার নেই

উ, ঈ-কারের পরে উ-কার অথবা ঊ-কার ছাড়া অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব্ (ব-ফলা) হয়ে থাকে। ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ+অ = ব+অ = ব

সু+অল্প = স্বল্প

মনু+অন্তর = মন্বন্তর

অণু+অয় = অন্বয়

উ+আ = ব+আ = বা

সু+আগত = স্বাগত

পশু+আচার = পশ্চাচার

উ+ই = ব্+ই = বি

অনু+ইত = অন্বিত

উ+ঊ = ব্+ঈ = ঈ = ঈ = বী

তনু+উ = তন্বী

উ+এ = ব্+এ = বে
অনু+এষণ = অন্বেষণ

ঊ+আ = ব্+আ = বা
বধূ+আলয় = বর্ধ্বালয়

ঋ-কারের পরে ঋ-ছাড়া অন্য কোনো স্বরবর্ণ থাকলে ঋ-কার স্থানে র-ফলা হয় এবং পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হয়।

ঋ+অ = র্+অ = র
পিতৃ+অরি = পিত্ররি
পিতৃ+অনুগ্রহ = পিত্রনুগ্রহ

ঋ+আ = র+আ = রা
পিতৃ+আলয় = পিত্রালয়
মাতৃ+আদেশ = মাত্রাদেশ

শব্দের মধ্যে এ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে এ-কারের স্থানে 'অয়' হয়ে থাকে এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

এ+অ = অয়+অ = অয়
নে+অন = নয়ন
বে+অন = বয়ন
এ+আ = অয়া+আ = অয়া
শে+আন = শয়ান
ঐ-কারের পরে স্বরবর্ণ থাকলে ঐ-কারের স্থানে 'আয়' হয়ে থাকে এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

নৈ+অ = আয়্+অ = আয়
নৈ+অক = নায়ক
গৈ+অক = গায়ক

শব্দের শধ্যে ও-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ও-কারের স্থানে 'অব' হয়ে থাকে এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ও+অ = অব্+অ = অব
পো+অন = পবন
লো+অণ = লবণ
শ্রো+অণ = শ্রবণ

শব্দের মধ্যে ঔ=কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-কারের স্থানে 'আর' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।

ঔ+অ = আব্+অ = আব

পৌ+অক = পাবক

ঔ+ই = আব+ই = আবি

নৌ+ইক = নাবিক

সন্ধির প্রচলিত নিয়মানুসারে যেগুলো নিষ্পন্ন হয়নি, তাকে বলে নিপাতনে সিদ্ধ। যেমন ঃ

গো+অক্ষ = গবাক্ষ, বিশ্ব+ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ, কুল+অটা = কুলটা, প্র+ঊঢ় = প্রৌঢ়, প্র+এষণ = প্রেষণ, অক্ষ+উহিনী = অক্ষৌহিনী, স্ব+ঈর = স্বৈর, শার+অঙ্গ = শারঙ্গ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. তৎসম সন্ধি কত প্রকার?

ক) চার প্রকার ☐ খ) পাঁচ প্রকার ☐

গ) দুই প্রকার ☐ ঘ) তিন প্রকার ☐

২. উ-কারের পর উ-কার যুক্ত হলে উবয়ে মিলে

ক) ঊ-কার ☐ খ) উ-কার ☐

গ) ও-কার ☐ ঘ) ই-কার ☐

৩. মাত্রাদেশ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়-

ক) মাত্র+দেশ ☐ খ) মাত্র+আদেশ ☐

গ) মাতৃ+আদেশ ☐ ঘ) মাতৃ+দেশ ☐

৪. সন্ধি করুন

ক) ভৌ+উক =

ক) ভৌ+উক =		খ) লো+অন	
গ) নদী+উম্বু =		ঘ) মসী+আধার	
ঙ) প্রতি+উপকার		চ) প্রাণ+অধিক	

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন

ক) পবন =		খ) মহৈশ্বর্য	
গ) অত্যুক্তি =		ঘ) ক্ষুধার্ত =	
ঙ) সপ্তর্ষি =		চ)স্বেচ্ছা =	
ছ) সূর্যোদয় =		জ) যথোচিত =	
ঝ) মহার্ঘ =		ঞ) গঙ্গোর্মি =	

উত্তর

১. গ ২. ক ৩. গ

৪. ক) ভাবুক খ) লবণ গ) নদ্যম্বু ঘ) মস্যাধার

ঙ) প্রত্যুপকার চ) প্রাণাধিক

৫ ক) পো+অন গ) মহা+ঐশ্বর্য গ) অতি+উক্তি ঘ) ক্ষুধা+ঋত
ঙ) সপ্ত+ঋষি চ) স্ব+ইচ্ছা ছ) সূর্য+উদয় জ) যথা+উচিত
ঝ) মহা+অর্ঘ ঞ) গঙ্গা+উর্মি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. সন্ধি বলতে কি বোঝায়? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কি? উদাহরণসহ লিখুন।

২. সন্ধি কত প্রকার ও কি কি? উদ্ধৃতিসহযোগ লিখুন।

৩. উদ্ধৃতি সহযোগে বহিৎসন্ধি ও অন্তঃসন্ধির পার্থক্য লিখুন।

৪. উদ্ধৃতি সহযোগে স্বরসন্ধি অথবা ব্যঞ্জন সন্ধির পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

৫. সন্ধি বিচ্ছেদ করুন।

অধীশ্বর, সতীন্দ্র, অতীত, কারাগার, পরমৌষধ, উচ্ছ্বাস, বনস্পতি, ভাস্কর, শিরশ্ছেদ, কান্না সঞ্চয়, কিংবা, সংবর্ধনা, তরুচ্ছায়া, বিস্ময়, ষড়বিধ ততোধিক, মনোহর, নায়ক, মুক্ত।

৬. সন্ধি করুন ঃ

বাক+ঈশ, তদ্+জাতীয়, উৎ+ডীন, পদ+হতি, বিদ্যা+আলয়, ধনুঃ+টঙ্কার, বাঁধ+না, শুভ+ইচ্ছা, নর+ইশ, অতি+ইব, প্রতি+উপকার, প্রতি+এক, সু+অল্প, প্র+উঢ়, তৃষ্ণা+ঋত।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

ইউনিট ৬

ভূমিকা

প্রত্যয় বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের একটি পদ্ধতি। তাই প্রত্যয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- গঠনগত দিক থেকে শব্দ কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।
- প্রকৃতি ও প্রত্যয় সনাক্ত করতে পারবেন।

আমরা মুখ দিয়ে ধ্বনি উচ্চারণ করি। ধ্বনি অথবা কয়েকটি ধ্বনি মিলে যখন কোন অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ ধ্বনি/ধ্বনিগুলি অর্থবোধক হয় তখন তা হয় শব্দ। যেমন, এ, সে, হাত, পা, ফুল, পাখি ইত্যাদি।

গঠনগত দিক থেকে শব্দকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

১. মৌলিক শব্দ   ২. সাধিত শব্দ

যে শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভাঙ্গা যায় না সেগুলোকে বলে মৌলিক শব্দ। যেমন– এ, ও, পা ইত্যাদি।

যে শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় বা ভাঙ্গা যায় তাকে বলে সাধিত শব্দ। সাধিত শব্দের মূল অংশকে বলা হয় প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে শব্দ/শব্দাংশ যুক্ত হয়ে শব্দ তৈরি হয়। যেমন চল্+অন্ত = চলন্ত, হাত+অল = হাতল।

প্রকৃতি দু প্রকারের

১. ক্রিয়া প্রকৃতি
২. নাম প্রকৃতি

ক্রিয়াপ্রকৃতি ঃ শব্দের মূল যদি জাতি, গুণ, বিষয় বা কোন বস্তু না বুঝিয়ে অবস্থান, গতি বা কোন প্রকার ক্রিয়া বোঝায় তবে তাকে বলে প্রকৃতি বা ধাতু। যেমন চল্+অন = চলন, কাঁদ্+না = কান্না। এখানে শব্দ মূল চল্ ও কাঁদ ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

নাম প্রকৃতি ঃ যে শব্দমূল অবস্থান, গতি, ক্রিয়া না বুঝিয়ে জাতি, গুণ, বিষয় বা বস্তু বুঝায় তাকে বলে নাম প্রকৃতি। যেমন– ঢাকা+আই = ঢাকাই, পাগল+আ = পাগলা। এখানের শব্দ- মূল দুটি স্থান ও গুণ বুঝিয়েছে। এগুলো নাম প্রকৃতি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শব্দমূলগুলি মৌলিক শব্দ।

প্রত্যয়

নাম প্রকৃতি অথবা ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে প্রত্যয়। কোন কোন সময় প্রত্যয়ের নিজস্ব অর্থ থাকে আবার কখনও থাকেও না। প্রত্যয় প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রকৃতির অর্থে সম্প্রসারন, সঙ্কোচন ও ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

প্রত্যয় দুই প্রকার।

১. কৃৎ প্রত্যয়

২. তদ্ধিত প্রত্যয়

ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়।

নাম প্রকৃতির সঙ্গে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায়।

১. তৎসম বা সংস্কৃত প্রত্যয়

২. বাংলা প্রত্যয়

৩. বিদেশী প্রত্যয়।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ	**প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ**
ধার্ + অ = ধার	কর + আ = করা
হার্ + অ = হার	চড়্ + আই = চড়াই
কাঁদ্ + অন = কাঁদন	বৈঠ + অক = বৈঠক
নাচ্ + অন = নাচন	লড়্ + আই = লড়াই
চল্ + অন্ত = চলন্ত	
ফল্ + অন্ত = ফলন্ত	বাড়্ + তি = বাড়তি
বাঁধ্ + অন = বাঁধন	কম্ + তি = কমতি
চির্ + উনি = চিরুনী	ঘাট + তি = ঘাটতি
রাঁধ + না = রান্না	ফির্ + অত = ফিরত
কাঁদ + না = কান্না	বস্ + অত = বসত
ঘুম + অন্ত = ঘুমন্ত	উঠ্ + তি = উঠতি
দুল্ + না = দোলনা	বাট্ + না = বাটনা
ঢাক + না = ঢাকনা	গা + ইয়ে = গাইয়ে
ধো + আ = ধোয়া	খা + ইয়ে = খাইয়ে

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

প্রকৃতি+ প্রত্যয় = শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ
গৈ + অক = গায়ক	কৃ + অক = কারক
দৃশ + অক = দর্শক	রক্ষ + অক = রক্ষক
শী + অন = শয়ন	ভুজ + অনট = ভোজন
গম + ক্ত = গত	দহ + ক্ত = দগ্ধ
মুহ + ক্ত = মুগ্ধ	মৃ + ক্ত = মৃত
মুচ + ক্তি = মুক্তি	কৃ + তব্য = কর্তব্য
বচ + তব্য = বক্তব্য	

বাংলা তদ্ধিত/প্রত্যয়

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ
জল+আ = জলা
বাঘ + আ = বাঘা
হাত + আ = হাতা
লুন + আ = লোনা
পাগল + আ = পাগলা
গোয়াল + আ = গোয়ালা
চোর + আই = চোরাই
জুতা + আন = জুতান
বোমা+আর = বোমারু
লাঠি + আল = লাঠিয়াল
গাছ + ড়া = গাছড়া
নাম + তা = নামতা
মেঘ+লা = মেঘলা
দুধ + আল = দুধাল
চালাক + ই = চালাকি
ডাক্তার + ই = ডাক্তারি
পাকা + আমি = পাকামি
চাম + আর = চামার
চতুর + আলি = চতুরালি
মাটি + ইয়া = মাটিয়া > মেটে

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ
শহর+ইয়া = শহরিয়া >শহুরে
জাল + ইয়া = জালিয়া>জেলে
দেশ + ঈ = দেশী
পশম + ঈ = পশমী
ঢোল + ক = ঢোলক
ঘাম + আচি = ঘামাচি
পাথর+ইয়া = পাথরিয়া>পাথুরে
জল+উয়া = জলুয়া>জলো
ধান + উয়া = ধানুয়া > ধেনো
চাক + তি = চাকতি
লাল + পানা = লালপানা
ধার + আল = ধারাল
বঙ্গ + আল = বাঙ্গাল
জমিদার + ই = জমিদারি
বোকা + আমি = বোকামি
ঘর + আমি = ঘরামি
কাঁসা + আরী = কাঁসারী
মেয়ে + আলি = মেয়েলি

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ

কুরু + ষ্ণ = কৌরব	মনু + ষ্ণ = মানব
পুত্র + ষ্ণ = পৌত্র	বৃদ্ধ + ষ্ণ = বার্ধক্য
সুজন + ষ্ণ = সৌজন্য	পৃথিবী + ষ্ণ = পার্থিব
গ্রাম + ষ্ণ্য = গ্রাম্য	কিশোর + ষ্ণ =কৈশোর
যুব + ষ্ণ = যৌবন	শিশু + ষ্ণ = শৈশব
ন্যায় + ষ্ণ = মাধুর্য	ন্যায় + ষ্ণ = ন্যায্য
সম্রাট + ষ্ণ = সাম্রাজ্য	বুদ্ধ + ষ্ণ = বৌদ্ধ
সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক	ইতিহাস + ষ্ণিক = ঐতিহাসিক
লোক + ষ্ণিক = লৌকিক	দর্শন + ষ্ণিক = দার্শনিক

বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয় = শব্দ
গাড়ি + ওয়ান = গাড়োওয়ান	দার+ওয়ান = দারোয়ান
বাবু + আনা = বাবুআনা	পিল + খানা = পিলখানা
ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা	গুলি + খোর = গুলিখোর
ঘুষ + খোর = ঘুষখোর	কারি + গর = কারিগর
বাগ + চা = বাগিচা	কলম + দান = কলমদান
আতর + দান = আতরদান	মজা + দার = মজাদার
জমা + দার = জমাদার	নকল + নবিশ = নকলনবিশ
বাক্স + বন্দী = বাক্সবন্দী	নজর + বন্দী = নজরবন্দী
ধোকা + বাজ = ধোকাবাজ	চাল + বাজ = = চালবাজ
মানান + সই = মানানসই	লাগ + সই = লাগসই

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দিন। প্রত্যয় কত প্রকার ও কি কি?

২। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করুন।

ধার, পড়, করা, চড়াই, বৈঠক, বাড়তি, ছাউনি, গ্রাম্য, বাঘা, লৌকিক, হাতা, চালাকি, জলো, গোয়ালা, শৈশব, লোনা, নজরবন্দী, শয়ন, ঘামাচি, দাগাবাজ, দারওয়ান, কর্তব্য, পিলখানা, নামতা, ধারাল।

উপসর্গ

ইউনিট ৭

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া ‘উপসর্গ’ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূমিকা

প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দগঠনের কিছু প্রক্রিয়া থাকে। স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষাতেও নতুন শব্দগঠনের প্রক্রিয়া আছে। বাংলা ভাষায় দুই প্রকারের শব্দ ব্যবহৃত হয়। এক- মৌলিক শব্দ, দুই- সাধিত শব্দ। মৌলিক শব্দ সেগুলো, যেগুলোর কোন গঠনমূলক বিশ্লেষণ নেই। আর সাধিত শব্দ সেগুলো, যেগুলো কোন না কোন পদ্ধতির মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। মৌলিক শব্দের সঙ্গে বর্ণ অথবা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি পদ্ধতি পাই। সেগুলো–

১. উপসর্গ ২. প্রত্যয় ৩. সমাস

উপসর্গ শব্দটির একাধিক সাধারণ অর্থ আছে। তবে বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গ– “শব্দগঠনের একটি প্রক্রিয়া”– এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ ইউনিটে আমরা উপসর্গ নিয়ে আলোচনা করবো।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- উপসর্গ কিভাবে শব্দগঠন করে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- উপসর্গের একটি সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- উপসর্গ কত প্রকার ও কি কি তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ‘উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোকতা আছে’– কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উপসর্গ এক শ্রেণীর অব্যয়। এ অব্যয়গুলোর নিজস্ব কোন অর্থ নেই। ধাতু ও শব্দের পূর্বে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। এই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি আসলে এক প্রকার অব্যয়। এ অব্যয়গুলো ধাতু অথবা শব্দের পূর্বে বসে ধাতু অথবা শব্দকে অর্থবিশিষ্টতা দেয়। যেমন– হার শব্দের পূর্বে ‘আ’ উপসর্গ বসে ‘আহার’, গতি শব্দের পূর্বে ‘প্র’ উপসর্গ বসে ‘প্রগতি’, ‘দান’ শব্দের পূর্বে ‘প্রতি’ উপসর্গ বসে ‘প্রতিদান শব্দ তৈরি করেছে। এখানে লক্ষ্য করা যাবে শব্দের পূর্বে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে শব্দটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এবার তাহলে আমরা উপসর্গের সংজ্ঞা এভাবে লিখতে পারি–

যে সব বর্ণ বা বর্ণসমিষ্ট ধাতু অথবা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে সেগুলোকে উপসর্গ বলে। যেমন- প্র+হার= প্রহার

উপসর্গগুলোর নিজের কোন অর্থ নেই। এর যখন ধাতু অথবা শব্দের পূর্বে বসে তখন নতুন সৃষ্ট শব্দটি অর্থবৈচিত্র্য পায়। এ অর্থবৈচিত্র্য সাধারণত এরকম হয়–

১. নতুন অর্থ প্রকাশ করে
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা প্রদান করে
৩. শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত করে
৪. শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত করে

উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই। এজন্য বলা হয় উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই। অর্থাৎ এগুলো কোন অর্থ প্রকাশ করে না। কিন্তু এগুলো অর্থদ্যোতনা অর্থাৎ অর্থের আবহ সৃষ্টি করতে পারে। এ অর্থদ্যোতনা সৃষ্টিই উপসর্গের প্রধান কাজ। সেদিক থেকে এ কথাটি খুবই তাৎপর্যময় যে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

উপসর্গ দিয়ে শব্দগঠনে এক অথবা একাধিক উপসর্গ প্রয়োগ হতে পারে। যেমন– আ+হার = আহার, একটি উপসর্গ যোগে গঠিত হয়েছে। কিন্তু সম+অভি+বি+অ+হার = সমভিব্যহার, চারটি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকার। এগুলো হচ্ছে–

১. সংস্কৃত উপসর্গ
২. বাংলা উপসর্গ
৩. বিদেশী উপসর্গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. শুন্যস্থান পূরণ করুন

ক) উপসর্গ শব্দগঠনের একটি --------------।
খ) বাংলা ভাষায় শব্দ দুই প্রকার। এক- মৌলিক শব্দ, দুই- --------- শব্দ।
গ) ধাতু অথবা শব্দের ----------- যে বর্ণ/বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে ---------- বলে।
ঘ) উপসর্গ ছাড়া --------- ও ---------- দ্বারা নতুন শব্দ গঠিত হয়।
ঙ) উপসর্গ এক শ্রেণীর ---------।
চ) উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু ----------- আছে।
ছ) উপসর্গ তিন প্রকার। যথা ---------------, বাংলা উপসর্গ ও --------------- উপসর্গ।

২. উপসর্গ কি ধরনের অর্থবৈচিত্র্য ঘটায়, নীচে লিখুন।

১. --.

২. --.

৩. --.

৪. --.

৫. --.

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

১. ক. প্রক্রিয়া, খ. সাধিত, গ. পূর্বে, উপসর্গ। ঘ. প্রত্যয়, সমাস। ঙ. অব্যয়।

চ. অর্থদ্যোতকতা, ছ . সংস্কৃত, বিদেশী।

২. পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সংস্কৃত উপসর্গ কোনগুলি ও কয়টি তা লিখতে পারবেন।
- সংস্কৃত উপসর্গের প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বাক্যে সংস্কৃত উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দ সনাক্ত ও ব্যবহার করতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিপুল সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ আছে বলে আমরা জানি। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গও বাংলা ভাষায় এসেছে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা কুড়িটি এগুলো হচ্ছে—

প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধ, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

সংস্কৃত উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দের উদাহরণ—

প্র – প্রভাত, প্রহার, প্রচার, প্রকাশ, প্রগতি

পরা – পরাজয়, পরামর্শ, পরাক্রম, পরাশক্তি, পরাভব

অপ – অপকার, অপব্যয়, অপমান, অপবাদ, অপরাধ

সম – সংবাদ, সঞ্চয়, সম্ভাষণ, সমাদর, সংস্কার

নি – নিরব, নিবারণ, নিগ্রহ, নিকৃষ্ট, নিপাত,

অব – অবকাশ, অবহেলা, অবসর, অবদান, অবনত।

অনু – অনুচর, অনুসরণ, অনুগমন, অনুবাদ, অনুশীলন।

নির্ – নির্ণয়, নির্জন, নির্ভয়, নির্মল, নিরক্ষর

দুর্ – দুর্বল, দুর্গতি, দুর্বার, দুর্ভাগ্য, দুর্লভ

নি – নিজয়, বিনয়, বিফল, বিমর্ষ, বিখ্যাত

অধি – অধিকার, অধিপতি, অধিবেশন, অধিবাসী, অধিনায়ক

সু – সুগম, সুলভ, সুবাস, সুনাম, সুজন

উৎ – উৎকর্ষ, উৎসর্গ, উৎপত্তি, উৎসাহ, উৎপন্ন
পরি – পরীক্ষা, পরিহার, পরিণতি, পরিতাপ, পরিমাপ
প্রতি – প্রতিদান, প্রতিকার, প্রতিবাদ, প্রতিফল, প্রতিমূর্তি
অভি – অভিনব, অভিনয়, অভিধান, অভিযান, অভিশাপ
অতি – অতিক্রম, অতিরিক্ত, অতিশয়, অতিবৃষ্টি, অতিরিক্ত
অপি – অপিবদ্ধ, অপিচ, অপিনিহিত
উপ – উপগ্রহ, উপকার, উপবন, উপনেতা, উপকূল
আ – আহার, আকাশ, আবেগ, আদেশ, আভাস।

সংস্কৃতে উপসর্গজাতীয় আরও কয়েকটি অব্যয় ব্যবহার করা হয়। যেমন– অন্ত:(অন্তঃপুর), আবি:(আবিষ্কার), পুর:(পুরষ্কার) ইত্যাদি।

সংস্কৃত উপসর্গের বাক্যে প্রয়োগ

প্র – প্রভাত – প্রভাতে সূর্য উঠে।
প্রহার – ছেলেটিকে প্রহার করছো কেন?
অপ – অপকর্ম – অপকর্ম করে লোকটি এখন জেলে।
অপব্যয় – এখন অপব্যয় করলে, পরে পস্তাতে হবে।
বি – বিনয় – বিনয় চরিত্রের অলঙ্কার।
বিফল – সে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে।
আ – আকাশ – নীল আকাশে মেঘের ভেলা ভাসছে।
আদেশ – আপনার আদেশ মেনে চলবো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শুন্যস্থানগুলো পূরণ করুন
ক. সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা --------------।
খ. প্রকাশ, প্রচার, প্রগতি – এ তিনটি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ ----------।
গ. অনুচর, অনুগত, অনুদান এ তিনটি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ ---------।
ঘ. অতিক্রম, অতিশয়, অতিরিক্ত এ তিনটি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ ------।
ঙ. সংস্কৃতে উপসর্গ ছাড়াও কয়েকটি ব্যবহার করা হয়।
চ. যে উপসর্গগুলো বাদ পড়েছে সেগুলো লিখুন।
প্র, পরা, ------ ------ নি
অব, ----- নির, ------ দুর
--------- অধি, সু ----- ----- ------
প্রতি, -----, অতি, ------- -------।

২. নীচের উপসর্গগুলো দিয়ে শব্দ গঠন করুন।

পরা – ক) -------------- খ) -------------- গ) --------------

অধি – ক) -------------- খ) -------------- গ) --------------

অতি – ক) -------------- খ) -------------- গ) --------------

পরি – ক) -------------- খ) -------------- গ) --------------

আ – ক) -------------- খ) -------------- গ) --------------

৩. নীচের উপসর্গগুলো দিয়ে শব্দগঠন করুন ও বাক্যে প্রয়োগ করুন।

উপসর্গ	শব্দ	বাক্য
প্র	–	–
নি	–	–
সু	–	–
উপ	–	–

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা উপসর্গগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাংলা উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন করতে পারবেন।
- বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দ বাক্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে অসংস্কৃত শব্দের পূর্বে কিছু অব্যয় বা অব্যয়রূপী শব্দ বা শব্দাংশে ব্যবহার করা হয়। এ শব্দ বা শব্দাংশ আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃতের মত ধাতুর পূর্বেও এগুলো বসে না। শুধু সাধিত শব্দের পূর্বে বসে। এগুলোকে বাংলা উপসর্গ বলে। বাংলা উপসর্গগুলো হচ্ছে–

অ, আ, অনা, অঘা, অজ, অব, আগ, আড়, উন, কু, নি, পাতি, বি, ভর, স, সু, রাম, হা ইত্যাদি।

বাংলা উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দের উদাহরণ–

অ – অকাজ, অদেখা, অবেলা, অপয়া, অঢেল

আ – আলুনি, আকাল, আগাছা, আকাঁড়া, আকণ্ঠ

অনা – অনাদর, অনাচার, অনাবৃষ্টি, অনাদায়

অঘা – অঘারাম, অঘাচণ্ডী

অজ – অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ

আগ – আগড়াল, আগপাড়া,

আড় – আড়নয়ন, আড়মোড়া

উন – উনপাঁজরে, উনবর্ষা

কু – কুকাজ, কুকথা, কুচুটে

নি – নিলাজ, নিখোঁজ

পাতি – পাতিহাঁস, পাতিনেতা, পাতিকাক

বি – বিদেশ, বিজোড়, বিকাল

ভর – ভরদুপুর, ভরপেট, ভরসন্ধ্যা

স – সরব, সকাল, সলাজ, সখেদ

সু – সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুসময়

রাম – রামছাগল, রামদা, রামশালিক

হা – হাভাতে, হাঘরে, হাপিত্যেশ

বাক্যে বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ

অ – অচেনা – অচেনা রাস্তা ঘাট যেতে তো একটু দেরি হবেই।

অবেলা – এ অবেলায় কোথায় চললে তুমি?

অজ – অজপাড়াগাঁ – কোন অজপাড়াগাঁ থেকে এসেছে, রাস্তায় চলতে পর্যন্ত জানেনা।

আড় – আড়মোড়া – এবার আড়মোড়া ভাঙ্গ, বাজার যেতে হবে না।

পাতি – পাতিনেতা – তোমার মত ঢের পাতিনেতা দেখেছি, এবার মানে মানে কেটে পড়।

ভর – ভরপেট খেয়ে সেই যে ভরদুপুরে ঘুমিয়েছে, এখনও ঘুম ভাঙেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. পাঁচটি বাংলা উপসর্গ লিখুন

১) ------- ২) -------- ৩) -------- ৪) ------- ৫) -----

২. নীচের শব্দগুলোতে যে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে তা লিখুন।

আকাল, নিখরচা, রামদা, অঘাচন্ডী, সুদিন, অনাবৃষ্টি

--------------------------------------।

৩. নীচের উপসর্গগুলো দিয়ে শব্দ গঠন করুন

আ, অনা, কু, ভর, সু, হা,

এখানে লিখুন

--।

৪. বাংলা উসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দগুলোকে বাক্যে প্রয়োগ করুন।
অজানা, অনাবৃষ্টি, আগডাল, বিজোড়, হা-ঘরে
এখানে লিখুন

--।

৫. বাংলা উপসর্গ প্রকৃত উপসর্গ কি? এগুলো শব্দের অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে?
এখানে লিখুন

--।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বিদেশী উপসর্গগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিদেশী কোন কোন ভাষার উপসর্গ বাংলাভাষায় এসেছে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বিদেশী উপসর্গ দিয়ে শব্দগঠন করতে পারবেন।
- বাক্যে বিদেশী উপসর্গ ব্যবহার করতে পারবেন।

ভূমিকা

ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসনিক, কূটনৈতিক, শিক্ষাদীক্ষাসহ বিভিন্ন সূত্রে বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগের ফলে প্রচুর বিদেশী শব্দ বাংলা শব্দভান্ডারে জমা হয়েছে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু বিদেশী উপসর্গও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এ উপসর্গগুলো প্রধানত ফারসি, আরবি, ইংরেজি হিন্দি ও উর্দু থেকে আমাদের ভাষায় এসেছে।

ফারসি থেকে যে উপসর্গগুলো এসেছে সেগুলো হচ্ছে-

কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, কে, বর, ব, কম

আরবি থেকে যে উপসর্গগুলো এসেছে সেগুলো হচ্ছে -

আম, খাস, লা, বাজে, গর, খয়ের

ইংরেজি থেকে যে উপসর্গগুলো এসেছে সেগুলো হচ্ছে-

ফুল, হাফ, হেড, সাব

হিন্দি থেকে যে উপসর্গ এসেছে তা হচ্ছে-

হর

বিদেশী উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দের উদাহরণ-

ফারসি উপসর্গ

কার – কারখানা, কারবার, কারসাজি।
দর – দরদালান, দরপত্তনি, দরকাঁচা।
না – নাচার, নালায়েক, নামঞ্জুর।
নিম – নিমরাজি, নিমখুন।
ফি – ফিবছর, ফিহপ্তা, ফিরোজ, ফিসন।
বদ – বদমেজাজ, বদরাগী, বদলোক, বদহজম।
বর – বরখাস্ত, বরবাদ।
বে – বেয়াদব, বেকসুর, বেআক্কেল।
ব – বমাল, বনাম।
কম – কমজোর, কমবখত।

আরবি উপসর্গ

আম – আমদরবার, আমমোক্তার।
খাস – খাসমহল, খাসকামরা, খাসদরবার।
লা – লাজওয়াব, লাওয়ারিশ, লাখেরাজ।
বাজে – বাজেকথা, বাজে খরচ, বাজেজমা।
গর – গরমিল, গরহাজির।
খয়ের – খয়ের খাঁ।

ইংরেজি উপসর্গ

ফুল – ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলসার্ট।
হাফ – হাফহাতা, হাফশার্ট, হাফটিকেট।
হেড – হেডমাস্টার, হেডমৌলানা, হেড অফিস।
সাব – সাব অফিস, সাবজজ।

হিন্দি-উর্দু থেকে

হর – হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা।
হর (+এক) হরেক রকম, হরেক আদমী।

বাক্যে বিদেশী উপসর্গের প্রয়োগ

কার – কারখানা – কারখানায় পুরোদমে উৎপাদন শুরু হয়েছে।
নিম – নিমরাজি – এখনও নিমরাজি বটে, তবে আমার বিশ্বাস সে পুরোপুরি রাজি হয়ে যাবে।
ফি – ফিবছর – ফি বছর বন্যা, খরা, লেগেই আছে।
ব – বমাল – চোরটি বমাল ধরা পড়েছে।

খাস – খাসমহল – বাদশাহ-বেগম এই খাসমহলেই বাস করতেন।

গর – গরহাজির – যে ছাত্ররা গরহাজির তাদের শাস্তি দিতে হবে।

ফুল – ফুলাহাতা – শীত শীত করছে তাই ফুলহাতা শার্ট পরেছি।

হর(+এক) – হরেক রকম লোক আসবে, তাই একটু সাবধানে থেকো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. পাঁচটি বিদেশী উপসর্গ লিখুন

১. -------- ২. --------- ৩. --------- ৪. -------- ৫. --------

২. নীচের শব্দগুলো থেকে উপসর্গটি আলাদা করে বন্ধনীর মধ্যে লিখুন।

আমদরবার ( ), হেড অফিস ( ), হররোজ ( ), দরকাঁচা ( ), নিমরাজি ( ), বমাল ( ), বরবাদ ( )।

৩. নীচের বাক্যগুলো পড়ুন ও উপসর্গযুক্ত শব্দের নিচে দাগ দিন।

ক) হাফনেতা বলেই তো ও লাফাচ্ছে বেশি।

খ) দরদালানে নহবৎ বাজছে।

গ) আসামী বেকসুর খালাস হয়েছে।

ঘ) বাজে খরচ কমাতে হবে, নইলে সংসার উচ্ছন্নে যাবে।

ঙ) যাদুকরের কারসাজি আমরা কিছুই ধরতে পারিনি।

৪. নীচের প্রত্যেকটি উপসর্গ দিয়ে বাক্য রচনা করুন।

ক) লা –

খ) ফুল –

গ) নিম –

ঘ) কম –

ঙ) খাম –

চ) গর –

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

প্রশ্নগুলো ভাল করে পড়ুন ও উত্তরগুলো আপনার বই থেকে খুঁজে নিন।

১. উপসর্গ কাকে বলে? বাংলা ভাষায় কতপ্রকার উপসর্গ আছে? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দিন।

২. খাঁটি বাংলা উপসর্গের ব্যবহার দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা করুন।

৩. বিদেশী উপসর্গ বলতে কি বোঝায়? তিনটি বিদেশী উপসর্গ দিয়ে বাক্য রচনা করুন।

৪. দশটি সংস্কৃত উপসর্গ দিয়ে দশটি শব্দ গঠন করুন।

৫. উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই– কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে – বুঝিয়ে লিখুন।

সমাস

ইউনিট ৮

প্রস্তাবনা ঃ

ব্যাকরণের যে কয়টি সূত্রের সাহায্যে বাংলা শব্দ সাধিত হয় সমাস সেগুলোর একটি। সমাস একদিকে নতুন শব্দ তৈরি করে, অন্যদিকে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সমাসের সাহায্যে বিস্তারিত কথাকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সেজন্য বাংলা ভাষায় সমাসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আলোচ্য ইউনিটে সমাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সমাসের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- সমাসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমাসের শ্রেণী ভাগ করতে পারবেন।

কোন কথাকে একটু ব্যাখ্যা করে বিস্তারিতভাবে বলা যায়, আবার ভাব ঠিক রেখে ঐ কথাকে সংক্ষেপেও বলা যায়। সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপ। সমাসের সাহায্যে লম্বা বাক্যকে ছোট করে রূপ দেওয়া যায়। যেমন, 'পুকুরে হাঁটু পরিমাণ জল রয়েছে' বাক্যটিকে সংক্ষেপ করে আমরা বলতে পারি 'পুকুরে হাঁটু জল রয়েছে'। গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে তাতে তুমি আসবে' এই বাক্যটিকে ছোট করে বলা যায় এইভাবে 'গায়ে হলুদে তুমি আসবে'। কত ছোট হয়ে গেল বাক্য। শুধু ছোট হল না, সুন্দরও হল। লক্ষণীয় সমাসে বাক্যের সব শব্দ সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় না, বাক্যের যে সব শব্দের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে শুধু সেগুলোই সংক্ষিপ্ত হয়। বাক্যে যে সব শব্দ থাকে সেগুলোকে বলা হয় পদ। সুতরাং সমাসের সংজ্ঞা এইরূপ ঃ

বাক্যের মধ্যে অবস্থিত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদের এক পদে মিলিত হওয়াকে সমাস বলে।

সমাসের অন্যান্য প্রসঙ্গ।

ক) সমাসের সাহায্যে যে বড় শব্দটি তৈরি হয় তাকে সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদ বলা হয়।
খ) যে পদগুলোকে নিয়ে সমস্ত পদ গঠিত হয় সেগুলোকে বলা হয় সমস্যমান পদ। বাংলায় সাধারণত দুই পদের মিলনে সমাস হয়।
গ) সমস্যমান পদের প্রথম অংশকে বলা হয় পূর্বপদ, আর দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় পরপদ বা উত্তরপদ।
ঘ) পূর্বপদ ও পরপদের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য যে বিশ্লেষণমূলক বাক্য ব্যবহৃত হয় তাকে ব্যাসবাক্য বা সমাস বাক্য কিংবা বিগ্রহবাক্য বলা হয়।

দৃষ্টান্ত

১।	সমস্যমান পদ	.....	আগাগোড়া
	পূর্বপদ	.....	আগা
	পরপদ বা উত্তরপদ	.....	গোড়া
	ব্যাসবাক্য	.....	আগা থেকে গোড়া
	সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ	.....	আগাগোড়া

২। সমস্যমান পদ ..... মহান, পুরুষ

পূর্বপদ ..... মহান

পরপদ ..... পুরুষ

ব্যাসবাক্য ..... মহান যে পুরুষ

সমস্ত পদ ..... মহাপুরুষ

বাংলায় দুই পদের সমাস হয়। প্রথমটি পূর্বপদ, দ্বিতীয়টি পরপদ বা উত্তরপদ।

সমাসের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা সহজে বোঝা যায়। কথাকে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করার জন্য সমাসের সৃষ্টি। সমাস ভাষাকে সংহত, সুন্দর, গভীর ও গাঢ়বদ্ধ করে। সমাস নতুন শব্দ গঠন করে, ফলে ভাষায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। সন্ধির দ্বারাও নতুন শব্দ গঠন করা যায়, কিন্তু সন্ধির সঙ্গে সমাসের পার্থক্য আছে। সন্ধি হয় ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির (অর্থাৎ বর্ণের সঙ্গে বর্ণের), আর সমাস হয় শব্দের সঙ্গে শব্দের মিলনে। এই মিলন হয় কোন মনোভাবকে অল্প কথায় প্রকাশ করার জন্য। এতে একদিকে বক্তার সময়ও বাঁচে, অন্যদিকে ভাষা শ্রুতিমধুর হয়। সাধারণ কথাতেও সমাস নিত্য ব্যবহৃত হয় - যেমন আব্বা-আম্মা, ধান-চাল, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি।

সমাস নতুন শব্দ গঠন করে। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর করে।

সমাসের শ্রেণীভাগ

সমাস গঠনের সূত্র ব্যাখ্যা করে পন্ডিতেরা কেউ বলেছেন সমাস তিন প্রকার, কেউ বলেছেন চার প্রকার। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে সমাস ছয় প্রকার। এগুলো–

দ্বন্দ্ব সমাস, তৎপুরুষ সমাস, কর্মধারয় সমাস, বহুব্রীহি সমাস, দ্বিগু সমাস, অব্যয়ীভাব সমাস।

এগুলো ছাড়া আরো কিছু সমাসের নাম পরিচিত। যেমন অলুক সমাস, নঞ-সমাস, উপপদ সমাস, প্রাদি সমাস, নিত্য সমাস ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো আলাদা কোন সমাস নয়; এগুলো মূল সমাসগুলোর সঙ্গে যুক্ত। যেমন অলুক সমাস রয়েছে দ্বন্দ্বে, তৎপুরুষে, বহুব্রীহিতে। নঞ-সমাস দেখা যায় তৎপুরুষ ও বহুব্রীহিতে; উপপদ সমাস ও প্রাদি সমাস তৎপুরুষ সমাসের অর্ন্তভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সমাস বলতে কি বোঝায়?

২. ভাষায় সমাসের কি কাজ?

৩. সমাস কয় প্রকার ও কি কি?

৪. সমস্ত পদ কি?
৫. ব্যাস বাক্য কাকে বলে?
৬. পূর্বপদ ও পরপদ বুঝিয়ে লিখুন?
৭. অলুক সমাস ও নঞ-সমাস আলাদা সমাস কি?

উত্তর

১. সম্পর্কযুক্ত পদগুলোকে এক পদে রূপ দেওয়াকে সমাস বলা হয়।
২. সমাসের সাহায্যে বাক্য সংক্ষিপ্ত রূপ পায়। এতে ভাষা সুন্দর হয়। তাছাড়া সমাস ভাষায় নতুন শব্দ তৈরি করে।
৭. অলুক সমাস ও নঞ সমাস আলাদা কোন সমাস নয়। এগুলো বিশেষ বিশেষ সমাসের বিশেষ বিশেষ রূপ।

পাঠ ১ ঃ দ্বন্দ্ব সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- দ্বন্দ্ব সমাসের পরিচয় জানবেন।
- দ্বন্দ্ব সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিতে পারবেন।

দ্বন্দ্ব শব্দের এক বিশেষ অর্থ হল 'জোড়া'। দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপর দুয়েরই প্রাধান্য থাকে। 'ও' এবং 'আর' ইত্যাদি অব্যয় দিয়ে পূর্বপদ ও পরপদের সংযোগ হয় এবং এইভাবে দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাস বাক্য তৈরি হয়। যেমন ভাই ও বোন = ভাইবোন, কিংবা গরু এবং ছাগল = গরুছাগল। উপরের দৃষ্টান্তে বোঝা যায় যে, সমস্তপদে দুইপদেরই প্রাধান্য রয়েছে। সুতরাং

যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণত দেখা যায় ছোটপদটি আগে বসে, বড় পদটি পরে। যেমন হাটবাজার, রুই-কাতলা, আসা-যাওয়া ইত্যাদি।
কিন্তু এ নিয়ে খুব যে ধরাবাঁধা নিয়ম আছে তাও নয়। দেখা যায় গৌরব বা মর্যাদাসূচক পদ দীর্ঘ হলেও আগে বসতে পারে। যেমন- ডাক্তার-বৈদ্য, শাশুড়ি-বউ, বাজার-হাট ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস নানাভাবে গঠিত হয়। যেমন ঃ-
মিলনার্থক শব্দ দিয়ে ঃ আব্বা-আম্মা, ফুফু-খালা, ছেলে-মেয়ে, মশা-মাছি, বর-বধূ, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি।
বিরোধমূলক শব্দ দিয়ে ঃ বেহেশত-দোজখ, অহি-নকুল, দা-কুমড়া, শত্রু-মিত্র, বাদী-বিবাদী ইত্যাদি।
বিপরীত শব্দ দিয়ে ঃ হাসি-কান্না, লাভ-ক্ষতি, জমা-খরচ, আয়-ব্যয়, আসমান-জমিন, জল-স্থল ইত্যাদি।
সমার্থক শব্দ দিয়ে ঃ ধন-দৌলত, বই-পুস্তক, রাজা-বাদশা, জন্তু-জানোয়ার, মাথা-মুন্ডু, চালাক-চতুর ইত্যাদি।
সহচর শব্দ দিয়ে ঃ কাপড়-চোপড়, খাতা-পত্র, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া ইত্যাদি।
অঙ্গবাচক শব্দ দিয়ে ঃ হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, গোঁফ-দাড়ি, ইত্যাদি।
দুই বিশেষ্য দিয়ে ঃ হাতি-ঘোড়া, মাছ-মাংস, লেপ-তোশক, রিকশা-টেম্পো ইত্যাদি।
দুই সর্বনাম শব্দ দিয়ে ঃ যে-সে, যা-তা, যখন-তখন ইত্যাদি।

দুই ক্রিয়াবাচক শব্দ দিয়ে ঃ লেখা-পড়া, আসা-যাওয়া, চলা-ফেরা, দেখা-শোনা, ওঠা-বসা ইত্যাদি।

দুই বিশেষণ দিয়ে ঃ ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, লাল-নীল, মোটা-তাজা ইত্যাদি।

দুই ক্রিয়া বিশেষণ দিয়ে ঃ কলে-কৌশলে, ধীরে-সুস্থে, আস্তে-ধীরে, টেনে-টুনে ইত্যাদি।

বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস

দ্বন্দ্ব সমাস সাধারণত দুই পদের মধ্যে হয়; কিন্তু দুইয়ের অধিক পদে সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়। যেমন–

মেঘ, বৃষ্টি ও রোদ	=	মেঘ-বৃষ্টি-রোদ
নাক, কান ও গলা	=	নাক-কান-গলা
ইট, কাঠ ও চুন	=	ইট-কাঠ-চুন
স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল	=	স্বর্গ-মর্ত-পাতাল
সাহেব, বিবি ও গোলাম	=	সাহেব-বিবি-গোলাম
রূপ,রস, গন্ধ ও স্পর্শ	=	রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ

অলুক দ্বন্দ্ব সমাস

পদের বিভক্তির লোপ না হলে বলা হয় অলুক। সুতরাং, পূর্বপদ ও পরপদের বিভক্তির লোপ না হলে যে দ্বন্দ্ব সমাস হয় তাকে বলা হয় অলুক দ্বন্দ্ব সমাস।

উদাহরণ

পথে ও গাটে	=	পথে-ঘাটে
হাটে ও বাজারে	=	হাটে-বাজারে
দুধে ও ভাতে	=	দুধে-ভাতে
বাঘে ও মহিষে	=	বাঘে-মহিষে
হাতে ও পায়ে	=	হাতে-পায়ে
দেশে ও বিদেশে	=	দেশে-বিদেশে
মায়ে ও ঝিয়ে	=	মায়ে-ঝিয়ে

দ্রষ্টব্য

কখনো কখনো সমস্যমান পদ দ্বন্দ্ব সমাসবন্ধ পদে একটু পরিবর্তিত হয়। যেমন–

জায়া ও পতি	=	দম্পতি
দিবা ও রাত্রি	=	দিবারাত্র
কুশ ও লব	=	কুশীলব
অহ: ও নিশা	=	অহর্নিশ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে? দ্বন্দ্ব সমাসের কয়েকটি উদাহরণ দিন।

২. দ্বন্দ্ব সমাস গঠনের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।

৩. অলুক দ্বন্দ্ব বলতে কি বোঝায়? অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৪. বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস কি? দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৫. নিম্নলিখিত পদগুলোর ব্যাসবাক্য লিখুন ঃ

ছেলেমেয়ে, ঝোপেঝাড়ে, লোক-লস্কর, সকাল-সন্ধ্যা, আজকাল, কমবেশী, হাতপা, নয়ছয়, অস্ত্র-শস্ত্র, বাঘেমহিষে, স্টিমার-লঞ্চ, ডালভাত, চাষাভূষা, পুকুর-বিল, দম্পতি, অহোরাত্র, জলেডাঙ্গায়, দুধ-দই-ক্ষীর, কিল-ঘুষি-থাপ্পড়, আনাচে-কানাচে, লাঙল-জোয়াল।

পাঠ ৩ ঃ কর্মধারয় সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- কর্মধারয় সমাসের পরিচয় জানবেন।
- কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ জানবেন। বিভিন্ন শ্রেণী সম্বন্ধেও জানবেন।

☞	পাঠটি ভালোভাবে পড়ুন। তাহলে কর্মধারয় সমাস সম্বন্ধে আপনি স্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন এবং বর্ণনা করতে পারবেন।

কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদ সাধারণত হয় বিশেষণ, আর পরপদ বিশেষ্য এবং এই সমাসে বিশেষ্য পদের প্রাধান্য থাকে। কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

> বিশেষ্য পদের সঙ্গে বিশেষণ পদের যে সমাস হয় এবং যাতে বিশেষ্য পদের প্রাধান্য থাকে তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমন :

লাল যে ফুল = লালফুল	এক যে জন = একজন
নীল যে আকাশ = নীলাকাশ	জন যে এক = জনৈক
ছোট যে নদী = ছোট নদী	এখানে বিশেষ্য আগে এসেছে।

দেখা যাচ্ছে, কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে 'যে' ব্যবহৃত হয়েছে পূর্বপদ ও পরপদের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য। অবশ্য আরো নানাভাবে ব্যাস বাক্য তৈরি হয়।

কর্মধারয়ে শুধু যে বিশেষ্য আর বিশেষণের সমাস হয় তা নয়, বিশেষ্য বিশেষ্যও হতে পারে, আবার বিশেষণ বিশেষণও হতে পারে।

বিশেষ্য বিশেষ্য :

যিনি মৌলবী তিনি সাহেব = মৌলবী সাহেব

যিনি পন্ডিত তিনি মহাশয় = পন্ডিত মহাশয়
যিনি রাজা তিনি ঋষি = রাজর্ষি
যে ছেলে সে মানুষ = ছেলে মানুষ

বিশেষণ-বিশেষণ

যে সহজ সে সরল = সহজ-সরল
যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা
যে সুস্থ সেই সবল = সুস্থ সবল
যে চালাক সে চতুর = চালাক চতুর
যে কচি সে কাঁচা = কচি কাঁচা
আরো নানাভাবে কর্মধারয় সমাস হয়।

(১) এক কাজের পর আরেক কাজ বোঝালে দুটি পদে কর্মধারয় সমাস হয়–
আগে বাছা পরে কুটা = বাছাকুটা/কুটাবাছা
আগে ঘষা পরে মাজা = ঘষামাজা
প্রথমে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত
আগে খাওয়া পরে পরা = খাওয়া পরা

২) পূর্বপদে স্ত্রী বাচক বিশেষণ থাকলে সমাসদ্ধ পদে তা পুরুষবাচক হয়। –
দুষ্ট যে মতি = দুষ্টমতি
সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা
মহতী যে নদী = মহানদী
মহতী যে সভা = মহাসভা

৩) পূর্বপদ 'মহান' বা 'মহৎ' হলে সমাসবদ্ধ পদে তা 'মহা' হয়।
মহান যে নবী = মহানবী
মহান যে বীর = মহাবীর
মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান

৪) পরপদের প্রথম অক্ষর স্বরবর্ণ হলে পূর্বপদের 'কু' বিশেষণ সমাসবদ্ধ পদে 'কৎ' হয়।
কু যে অর্থ = কদর্থ ←(কৎ+অর্থ)
কু যে আচার = কদাচার ←(কৎ+আচার)

কু কখনো কখনো 'কা' হয়-
কু যে পুরুষ = কাপুরুষ

৫) পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে সমাসবদ্ধ পদে তা 'রাজ' হয়।
মহান যে রাজা = মহারাজ
যুব যে রাজা = যুবরাজ

৬) কোন কোন কর্মধারয় সমাসে দেখা যায়, যে পদের আগে বসা উচিত যা পরে বসে।

উত্তম যে পুরুষ – পুরুষোত্তম

ভাজা যে মাছ – মাছভাজা

সিদ্ধ যে আলু – আলুসিদ্ধ

বাটা যে মরিচ – মরিচবাটা

অধম যে নর – নরাধম

গরম যে চা – চা-গরম

বিশেষ বিশেষ কর্মধারয় সমাস

সাধারণ কর্মধারয় সমাস ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ রূপ রয়েছে। যেমন–

১) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস

২) উপমান কর্মধারয় সমাস

৩) উপমিত কর্মধারয় সমাস

৪) রূপক কর্মধারয় সমাস

১) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস ঃ

ব্যাস বাক্যের ব্যাখ্যামূলক মধ্য পদের লোপ হয়ে যে কর্মধারয় সমাস হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।

দুধে সিদ্ধ সাগু = দুধসাগু

ঘি-মেশানো ভাত = ঘি-ভাত

ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন

পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন

ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই

আয়ের উপর কর = আয়কর

ডাকবাহী গাড়ি = ডাকগাড়ি

মৌ (মধু) আশ্রয়ী মাছি = মৌমাছি

মানি (টাকা)রাখার ব্যাগ = মানিব্যাগ

২) উপমান কর্মধারয় সমাস

দুই বস্তুর মধ্যে তুলনা করে অর্থাৎ উপমা দিয়েও কর্মধারয় সমাস হয়। যাকে তুলনা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় উপমান। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, উপমেয় ও উপমানের মধ্যে তুলনা করা হয় একটা সাধারণ ধর্মের কথা মনে রেখে। যেমন,

মেয়েটির চুল মেঘের মতো কালো।

এখানে উপমেয় মেয়েটির চুল, উপমান 'মেঘ, সাধারণ ধর্ম 'কালো'। তুলনা দেওয়ার জন্য 'মতো' তুলনা বাচক শব্দ ও ব্যবহৃত হয়েছে। এখন উপমেয় উপমানে কিংবা উপমান ও সাধারণ ধর্মের মধ্যে সমাস হতে পারে।

যে কর্মধারয় সমাসে উপমান পদের সঙ্গে সাধারনত ধর্মের সমাস হয় তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।

মতো, ন্যায়, সম, সদৃশ ইত্যাদি উপমান কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়।

মেঘের মতো কালো = মেঘ কালো
তুষারের মতো শুভ্র = তুষার শুভ্র
বজ্রের ন্যায় কঠোর = বজ্রকঠোর
কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল
অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণ রাঙা
মিশির মতো কালো = মিশ কালো
দুধের মতো সাদা = দুধসাদা
শশের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত
ফুটির ন্যায় ফাটা = ফুটি ফাটা
গো(গরুর)-এর ন্যায় বেচারী = গোবেচারী

উপমিত কর্মধারয়

উপমেয় ও উপমান পদের যে সমাস হয় এবং যাতে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে।

সাধারণত উপমেয় পদটি আগে বসে। যেমন-
কর পল্লবের ন্যায় = কর পল্লব
পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষ সিংহ
নয়ন কমলের ন্যায় = নয়ন কমল
মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র

অনেক সময় উপমান পদটিও আগে বসে যেমন-
চাঁদের মতো মুখ = চাঁদমুখ
সোনার মতো মুগ = সোনামুগ
পদ্মের ন্যায় আঁখি = পদ্মআঁখি
শিশিরের মতো অশ্রু = শিশিরাশ্রু
খড়মের মতো পা = খড়ম পা।

রূপক কর্মধারয়

উপমেয় ও উপমানকে অভেদ কল্পনা করে যে সমাস হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় বলে।

এই সমাসে উপমেয় পদ আগে বসে, তারপর উপমান। উপমেয় পদে 'রূপ' যোগ করে ব্যাসবাক্য তৈরি করতে হয়।

প্রাণ রূপ পাখি = প্রাণপাখি
মন রূপ মাঝি = মনমাঝি
জ্ঞান রূপ আলোক = জ্ঞানালোক
ভব রূপ নদী = ভবনদী
বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদ সিন্ধু
সংসার রূপ সমুদ্র = সংসার সমুদ্র
হৃদয় রূপ আসন = হৃদয়াসন
বিরহ রূপ সাগর = বিরহ সাগর
ক্ষুধা রূপ অনল = ক্ষুধানল
দেহ রূপ ঘড়ি = দেহঘড়ি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দৃষ্টান্তসহ কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা দিন।
২. কর্মধারয় সমাসের সাধনের কয়েকটি উদাহরণ দিন।
৩. বিশেষ কর্মধারয় সমাস কয়টি? এগুলোর নাম লিখুন।
৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কাকে বলে? পাঁচটি নমুনা দিন।
৫. উপমান কর্মধারয় ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের সংজ্ঞা দিন এবং এ-দুটো সমাসের পার্থক্য দেখান।
৬. দৃষ্টান্তসহ রূপ'ক কর্মধারয় সমাস বুঝিয়ে দিন।
৭. ব্যাসবাক্য লিখুন ঃ
চরণকমল, দুধভাত, সবুজছাতা, পচাগলা, কাঁচকলা, যুবরাজ, চাউলভাজা, নীলোৎপল, চালকুমড়া, ধোয়ামোছা।
৮. সমাসবদ্ধ পদ লিখুন
মহান যে জন, যা শীত তা উষ্ণ, যিনি খান তিনি বাহাদুর, সিঁদুরের ন্যায় রাঙা, ছায়া প্রধান তরু; চিত্ত রূপ চকোর, শোক রূপ অগ্নি, ভিক্ষা লব্ধ অন্ন, কাঠের মতো কঠিন, প্রাণ রূপ পাখি।

পাঠ ৪ ঃ তৎপুরুষ সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা ও লিখতে পারবেন ও শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

পাঠটি বারবার পড়ুন। তাহলে আপনি তৎপুরুষ সমাস সমাস সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন এবং এই সমাসটি বর্ণনা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

দ্বিতীয়া তৃতীয়া ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত পূর্বপদের সঙ্গে পরপদের যে সমাস হয় এবং যাতে পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসে দুটি সমস্যমান পদের মধ্যে অন্বয় ঘটে। 'গাছ' এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়ে– গাছে পাকা বিভক্তির যোগ দেখিয়েই ব্যাসবাক্য তৈরি হয়। সমাসবদ্ধ পদে বিভক্তির লোপ হয়। যেমন-

গাছে পাকা ⟶ গাছ পাকা।

স্কুল থেকে পালানো ⟶ স্কুল পালানো।

তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এগুলোর নাম হয়েছে।

১) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ২) তৃতীয়া তৎপুরুষ ৩) চতুর্থী তৎপুরুষ
৪) পঞ্চমী তৎপুরুষ ৫) ষষ্ঠী তৎপুরুষ ৬) সপ্তমী তৎপুরুষ

*প্রথমা তৎপুরুষ বলতে কিছু নেই। প্রথমা বিভক্তি 'ী' বা '০' এর লোপ হওয়া কিছু নেই। সে জন্য প্রথমা তৎপুরুষও নেই।

'তৎপুরুষ' শব্দের অর্থ তার সম্পর্কীয় পুরুষ। এই দিক থেকে ছয়টি তৎপুরুষ সমাসকে যথাক্রমে কর্ম তৎপুরুষ, করণ-তৎপুরুষ, সম্প্রদান-তৎপুরুষ, অপাদান-তৎপুরুষ, সম্বন্ধ-তৎপুরুষ ও অধিকরণ তৎপুরুষ বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলে।

[দ্বিতীয়া বিভক্তি - এ(য়), কে, রে)

ফুলকে তোলা = ফুলতোলা

কলাকে বেচা = কলাবেচা

ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা

ছেলেকে ভুলানো = ছেলেভুলানো

কাঠকে কাটা = কাঠকাটা

হাঁড়িকে ভাঙা = হাঁড়ি ভাঙা

মরণকে আপন্ন = মরণাপন্ন

সাহায্যকে প্রাপ্ত = সাহায্য প্রাপ্ত

গৃহকে আশ্রিত = গৃহাশ্রিত

ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত

ব্যপ্তি, বিস্তৃতি বা জুড়ে থাকা অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা-
ক্ষণকাল ব্যাপী স্থায়ী – ক্ষণস্থায়ী
চিরকাল ব্যেপে শত্রু – চিরশত্রু
বহুকাল ব্যেপে প্রচলিত – বহুপ্রচলিত

পূর্বপদ ক্রিয়া বিশেষণ বা অবস্থা-জ্ঞাপক বিশেষণ হলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা–
ধীরভাবে গামী – ধীরগামী
মৃদুভাবে ভাষী – মৃদুভাষী
অর্ধমাত্র স্ফূট – অর্ধস্ফুট
নিমমাত্র রাজি – নিমরাজি

২) তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস
পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে।

[তৃতীয়া বিভক্তি : এ(য়), তে(এতে) দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক]
ঢেঁকি দ্বারা ছাটা = ঢেঁকিছাটা
বাদুড় কর্তৃক চোষা = বাদুড়চোষা
শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ
গুণে মুগ্ধ = গুণমুগ্ধ
বায়ু দ্বারা পূর্ণ = বায়ুপূর্ণ
হস্থ দ্বারা চালিত = হস্তচালিত
পদ দ্বারা দলিত = পদদলিত
ছায়া দ্বারা শীতল = ছায়াশীতল
বুদ্ধি দ্বারা হীন = বুদ্ধিহীন
শ্রী দ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত
জ্ঞান দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য
হীরক দ্বারা খচিত = হীরক খচিত
কালি দিয়ে মাখানো = কালিমাখানো
শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল
জরা দ্বারা জীর্ণ = জরাজীর্ণ
এক দ্বারা কম = এক্‌কম

লক্ষণীয়, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বিশেষণ বাচক হয়।

অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ

যে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলা হয়।

পোকায় কাটা = পোকায় কাটা
তেলে ভাজা = তেলেভাজা
কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা
হাতে বোনা = হাতে বোনা
বাপে তাড়ানো = বাপে তাড়ানো

পাঠ ৫ বহুব্রীহি সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বহুব্রীহি সমাসের নানা বিষয় ও শ্রেণী সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদগুলোর অর্থাৎ পূর্বপদ ও পরপদের প্রাধান্য থাকে না বরং উভয় পদ মিলে তৃতীয় একটি অর্থের ইঙ্গিত করে থাকে। বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে 'যার', যাকে, যাতে, যে, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। তবে প্রায়শ ব্যবহৃত হয় 'যার'। যথা–

মহান আত্মা যার = মহাত্মা (কোন ব্যক্তি)
সু (সুন্দর) শ্রী যার = সুশ্রী (বালক)
কালো বরণ (বর্ণ) যার = কালোবরণ (গাই)
বীণা পাণিতে যার = বীণাপানি (সরস্বতী)
নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ (শিল)

উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণে সমাস নিষ্পন্ন পদটি তৃতীয় কোন কিছু বুঝিয়েছে। সুতরাং বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

পূর্বপদ বা পরপদের প্রাধান্য না থেকে যে সমাসের সমাসবদ্ধ পদ তৃতীয় কোন অর্থ বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

বহুব্রীহি সমাসের কিছু নিয়ম

১. বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ প্রায়শ বিশেষণ হয়, তবে বিশেষ্যও হতে পারে। যেমন–
লাল (রক্ত বর্ণের) চোখ যার = লাল চোখ (পূর্বপদ বিশেষণ)
মন মরা যার = মনমরা (পূর্বপদ বিশেষ্য)

২. বহুব্রীহি সমাসের সমাসবদ্ধ পদটি সাধারণত বিশেষণ হয়, তবে তা বিশেষ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যথা–

মুখ পোড়া যার = মুখপোড়া।

৩. আ-কারান্ত স্ত্রী বাচক শব্দ সমস্ত পদে অকারান্ত হয়। যেমন–

ধীর গতি যার = ধীরগতি

স্থিরা বুদ্ধি যার = স্থির বুদ্ধি

চঞ্চল মতি যার = চঞ্চলমতি

৪. স্ত্রীবাচক সমস্ত পদে 'আ' বা 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়–

আয়ত লোচন যার (যে স্ত্রীলোকের) = আয়তলোচন

স্বচ্ছ সলিল যার (যে নদীর) = স্বচ্ছ সলিলা

শস্য শ্যামল যার (যে দেশের) = শস্যশ্যামলা

নীল বসন যার (যে স্ত্রীলোকের) = নীলবসনা

কোকিলের মতো কন্ঠ যার (যে নারীর) = কোকিলকণ্ঠী

বিড়ালের মতো চোখ যার (যে রমনীর) = বিড়ালচোখী

৫. বহুব্রীহি সমাসে কখনো কখনো 'সহ' বা সহিত' ও সমাস-এর জায়গায় 'স' মহৎ' বা মহানের জায়গায় 'মহা' এবং কু এর জায়গায় 'ক'দ' হয় যেমন–

জলের সহিত বর্তমান = সজল

বান্ধবের সহিত বর্তমান = সবান্ধব

পরিবারের সহিত বর্তমান = সপরিবার

সমান উদর যার = সহোদর

সমান তীর্থ যার = সতীর্থ

মহান আশয় যার = মহাশয়

মহৎ বল যার = মহাবল

কু আকার যার = কদাকার

কু অর্থ যার = কদর্থ

৬. পরপদ 'ঈ'-কারান্ত বা 'ঋ'-কারান্ত স্ত্রীবাচন বলে সমস্ত পদে 'ক' যুক্ত হয়। যেমন–

বি (বিগত)পত্নী যার = বিপত্নীক

স্ত্রী সঙ্গে বর্তমান যে = সস্ত্রীক

নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক

৭. বহুব্রীহি সমাসের সমাস নিষ্পন্ন শব্দে 'অক্ষি' স্থানে 'অক্ষ' এবং 'নাভি' শব্দের স্থানে 'নাভ' হয়। যথা–

কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ

বিশাল অক্ষি যার = বিশালাক্ষ

পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ

ঊর্ণা নাভিতে যার = ঊর্ণনাভ

৮. বহুব্রীহি সমাসের সমাস নিষ্পন্ন পদে 'জায়া' শব্দের বদলে জানি হয়।

যুবতী জায়া যার = যুবজানি

প্রিয় জায়া যার = প্রিয়জানি

৯. কখনো কখনো পরপদের 'গন্ধ' শব্দ সমস্ত পদে 'গন্ধি' হয় কখনো 'গন্ধ' হয়। যেমন–

সু গন্ধ যার = সগন্ধি

পদ্ম গন্ধ যার = পদ্মগন্ধি

মৎস্য গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা

১০. পর পদের 'আ' কার সমস্ত পদে 'অ' কার হয়, অথবা পূর্ব পদের 'অ' কার সমস্ত পদে আ-কার হয়। যথা–
চন্দ্র চূড়াতে যার = চন্দ্রচূড়
বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা
বিশ্ব মিত্র যার = বিশ্বামিত্র

নানা রকম বহুব্রীহি

বহুব্রীহি সমাসের নানা ধরণ রয়েছে এবং সে অনুযায়ী এগুলোর নামকরণও হয়েছে। এভাবে আট রকমের বহুব্রীহি দেখা যায়। যথা–

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
খ) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঘ) নঞ বহুব্রীহি
ঙ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
চ) অলুক বহুব্রীহি
ছ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
জ) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি

এগুলোর সংজ্ঞা ও পরিচয় দেওয়া হল –

ক) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ঃ

পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হয়ে যে সমাস হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলে। প্রকৃত পক্ষে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সমাস।

মন্দ ভাগ্য যার = মন্দভাগ্য
বদ নসীব যার = বদনসীব
হৃত সর্বস্ব যার = হৃতসর্বস্ব
হত শ্রী যার = হতশ্রী
পীত অম্বর যার = পীতাম্বর

খ) ব্যধিকরণ বহুব্রীহি

পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য হয়ে যে সমাস গঠিত হয় তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলে। অর্থাৎ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি হল বিশেষ্য ও বিশেষ্যের সমাস।

আশীতে বিষ যার = আশীবিষ
শূল পানিতে যার = শূলপানি
পেট সর্বস্ব যার = পেটসর্বস্ব

গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি

যে সমাসে একই ক্রিয়া করা বুঝায় তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–

কানে কানে যে কথা = কানাকানি

কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি
লাঠিতে লাঠিতে যে সংঘর্ষ = লাঠালাঠি
দেখে দেখে যে কাজ = দেখাদেখি
চুলে চুলে ধরে যে ঝগড়া = চুলোচুলি

ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
ব্যাসবাক্যের মধ্য পদলোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন–
গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খায় না যে = গোঁফখেজুরে
হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি
গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ
সাত বছর বয়স যার = সাতবছুরে

ঙ) নঞ বহুব্রীহি
নঞ অর্থাৎ না-বোধক অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে নঞ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
নি (নেই) ভুল যাতে = নির্ভুল
বে (নেই) হায়া যার = বেহায়া
ন (নেই) অন্ত যার = অনন্ত
বে (নেই) পরোয়া যার = বেপরোয়া
নি (নেই) উপায় যার = নিরুপায়

চ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
সমস্ত পদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে যে সমাস হয় তাকে প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি বলে। সাধিত শব্দটি বিশেষণ হয়। যথা–
ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো
এক দিকে চোখ যার = এক চোখা
ঊন (কম) পাঁজর যার = ঊনপাঁজুরে
দুটি তল যে গৃহে = দোতলা

ছ) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদ বিশেষ্য হয়ে যে সমাসবদ্ধ পদ হয় এবং যা মূলত বিশেষণ বোঝায় তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস বলে। যথা–
চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা
তে (তিন) পায়া যার = তেপায়া
পাঁচ গজ পরিমাণ যার = পাঁচগজী
পাঁচ সের পরিমাণ আছে যাতে = পসুরি

কখনো সমস্ত পদ বিশেষ্যও হতে পারে। যেমম–
সে (তিন) তার যে যন্ত্রের = সেতার

জ) অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদে বিভক্তির লোপ হয় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন–
হাতে ছড়ি যার = হাতেছড়ি
মাথায় পাগড়ী যার = মাথায়পাগড়ী
মুখে ভাত যার = মুখেভাত

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে বহুব্রীহি সমাস প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন।

১. বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে?
২. বহুব্রীহি সমাস কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যক প্রকারের দুটি করে উদাহরণ দিন।
৩. ব্যতিহার, সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসের সংজ্ঞা দিন।
৪. নিম্নোক্ত সমাস নিষ্পন্ন পদগুলো ব্যাসবাক্য লিখুন ঃ
খোশ দিল, নীলকণ্ঠ, হাতাহাতি, বদমেজাজী, অজ্ঞান।

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

পূর্বপদের চতুর্থী ‘কে’ বিভক্তি এবং ‘নিমিত্ত’, ‘জন্য’, ‘তরে’ ইত্যাদি অনুসর্গ লোপ পেয়ে পর পদের সঙ্গে যে সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ বলে।

গুরুকে বক্তি = গুরুভক্তি
দেবকে দত্ত = দেবদত্ত
এতিমের জন্য খানা = এতিমখানা
অনাথের জন্য আশ্রম = অনাথ আশ্রম
আরামের তরে কেদারা = আরামকেদারা
হজের নিমিত্তে যাত্রা = হজযাত্রা
রান্নার জন্য ঘর = রান্নাঘর
রণের জন্য সজ্জা = রণসজ্জা
বিয়ের নিমিত্তে পাগলা = বিয়েপাগলা
নামাজের জন্য জায় বা স্থান = জায়নামাজ
পীরের নিমিত্তে ‘উত্তর’ (নিষ্কর জমি) = পীরোত্তর
বালিকার জন্য বিদ্যালয় = বালিকাবিদ্যালয়

এইভাবে জীয়ন-কাঠি, শিশু সাহিত্য, বসতবাড়ি, ছাত্রাবাস, চিড়িয়াখানা, যুদ্ধযাত্রা, ডাক মাশুল, মুসাফির খানা, চোষ কাগজ, শয়ন-গৃহ ইত্যাদি।

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি লুপ্ত হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে।

'হতে' বা 'থেকে' অনুসর্গ পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ চ্যুত, জাত, আগত, বিরত, মুক্ত, পালানো ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে পূর্বপদের মিলনে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয়। যেমন,
বৃন্ত হতে চ্যুত = বৃন্তচ্যুত
আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া
বিদেশ থেকে আগত = বিদেশাগত
দুগ্ধ থেকে জাত = দুগ্ধ জাত
বিপদ হতে মুক্ত = বিপদমুক্ত
স্কুল থেকে পালানো = স্কুল পালানো
খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচা ছাড়া
স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট = স্বর্গভ্রষ্ট
লোক হতে ভয় = লোকভয়
জেল হতে খালাস = জেল খালাস
আদি থেকে অন্ত = আদ্যন্ত
ঋণ হতে মুক্ত = ঋণমুক্ত
বোঁটা হতে আলগা = বোঁটা আলগা

এইভাবে পদচ্যুত, চাকভাঙ্গা, বিলাত ফেরত, সর্পভয়, শাপমুক্ত, হাটভাঙ্গা, অগ্নিভয়, পাপমুক্ত ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ

পূর্বপদের 'র' 'এর' সম্বন্ধসূচক ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে।

যেমন
ধানের ক্ষেত = ধানক্ষেত
চায়ের বাগান = চা বাগান
বটের তলা = বটতলা
আমের গাছ = আম গাছ
ফুলের বাগান = ফুল বাগান
দেশের সেবা = দেশ সেবা
পরের অধীন = পরাধীন

নয়নের মণি = নয়নমণি
ভাইয়ের পো (পুত্র) ভাইপো
এইভাবে বাঁশঝাড়, কলমদানী, খেয়াঘাট, কুকুরছানা, হাতঘড়ি, গাছতলা, রেলগাড়ি, পাটকাঠি ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস গঠনের বিশেষ নিয়ম

১. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজার স্থানে রাজ এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা পিতৃ, মাতৃ, ও ভাতৃ-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন,

রাজার পুত্র = রাজপুত্র
বঙ্গের রাজা = বঙ্গরাজ
পিতার স্নেহ = পিতৃস্নেহ
মাতার সেবা = মাতৃসেবা
ভ্রাতার স্নোহ = ভ্রাতৃস্নেহ
রাজার কুমারী = রাজকুমারী
অনেক সময় 'রাজা' শব্দ পূর্বে আসে এবং 'রাজা'র 'আ' বিভক্তি লুপ্ত হয়। যেমন,
হংসের রাজা = রাজহংস
পথের রাজা = রাজপথ

২. 'ঘোড়া' শব্দের সঙ্গে যুক্ত 'র' বিভক্তির লোপ এবং 'ঘোড়া'র 'আ' কারেরও লোপ দেখা যায়।
ঘোড়ার দৌড় = ঘোড়দৌড়
ঘোড়ার সওয়ার = ঘোড়সওয়ার

৩. 'ডিম্ব', 'দুগ্ধ', শিশু ইত্যাদি শব্দ পর পদ রূপে ব্যবহৃত হলে, স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক বাচক হয়। যেমন,
ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ
হংসীর ডিম্ব = হংস ডিম্ব
পক্ষিনীর শাষক = পক্ষিশাবক
মৃগীর শিশু = মৃগশিশু

৪. সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাসে 'মাঝ' শব্দ আগে আসে। যেমন,

দরিয়ার মাঝ = মাঝদরিয়া
পথের মাঝ = মাঝপথ
রাতের মাঝ = মাঝরাত

৫. কালবাচক পদের সঙ্গে কালের কোন অংশের সমাস হলে সমাসবদ্ধ পদে পরপর আগে আসে। যেমন
অহ্নের মধ্য ভাগ = মধ্যাহ্ন
অহ্নের পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ন
রাত্রির পূর্বভাগ = পূর্বরাত্রি।

'অর্ধ' উত্তরপদও আগে আসে
পথের অর্ধ = অর্ধপথ

চন্দ্রের অর্ধ = অর্ধচন্দ্র

৬. সহ, তুল্য, সম, প্রায়, প্রতিম ইত্যাদি পরপদ হলে পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয়। যেমন
কন্যার সহ = কন্যাসহ
মাতার তুল্য = মাতৃতুল্য
মৃতের প্রায় = মৃতপ্রায়
রত্নের রাজি = রত্নরাজি
পিতার সম = পিতৃসম
ভ্রাতার প্রতিম = ভ্রাতৃপ্রতিম

৭. বৃন্দ, গণ, যূথ, রাজি, বৃন্দ, গ্রাম ইত্যাদি পরপদ হলে পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয়। যেমন,
ছাত্রের বৃন্দ = ছাত্রবৃন্দ
জনের গণ = জনগণ
ভগিনীর গণ = ভগিনীগণ
বৃক্ষের রাজি = বৃক্ষরাজি
হস্তীর যূথ = হস্তিযূথ
গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম

অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস

সমাস নিস্পন্ন পদে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের বিভক্তির লোপ না হলে অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন,

মাটির মানুষ, টাকার কুমীর, চোখের বালি, সাপের পা, মনের মানুষ, ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

পূর্বপদের এ, য়, তে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হয়ে যে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন,

ঘরে পাতা = ঘরপাতা
বস্তায় পচা = বস্তাপচা
গাছে পাকা = গাছপাকা
সাহিত্যে বিশারদ = সাহিত্যবিশারদ
বিশ্বে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত
রাতে কানা = রাত কানা
পুঁথিতে গত = পুঁথিগত
জলে মগ্ন = জলমগ্ন
ইরেজিতে শিক্ষিত = ইংরেজিশিক্ষিত
দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা
বনে বাস = বনবাস
গলায় ভরা = গলা ভরা
মনে মরা = মন মরা

এইরূপ গালভরা, লিস্টিভুক্ত, অধ্যয়নরত, বাকপটু, তালকানা, দানবীর, রণদক্ষ, কর্মদক্ষ, ভোজনপটু, সর্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

কখনো কখনো সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদ পরে যায় যেমন-
পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব
পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

নঞ্ অব্যয় (না, নাই, নয) পূর্বপদের সঙ্গে পরপদের যোগে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে।

গঠনের বিশেষ নিয়ম ঃ স্বরবর্ণ পরে থাকলে ন স্থানে ‘অন’ এবং ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকলে ন-স্থানে ‘অ’ হয়।
যেমন-
ন আদর = অনাদর
ন কাতর = অকাতর
ন অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ
ন ভাব = অভাব
ন অতি বৃহৎ = নাতিবৃহৎ
ন আদায় = অনাদায়
ন ঐক্য = অনৈক্য
ন কাজ = অকাজ
ন ইষ্ট = অনিষ্ট
ন উর্বর = অনুর্বর
কখনো কখনো ‘নাই’ অর্থে ‘নি’, নয় অর্থে ‘না’ হয়। ‘নাই’ অর্থে ‘বে’, গর’ ইত্যাদি ফারসি অব্যয়েরও ব্যবহার রয়েছে।

নাই খোঁজ = নিখোঁজ
নাই আদব = বেআদব
নাই লাজ = নিলাজ
নয় হাজির = গরহাজির
নয় পছন্দ = না পছন্দ

অনেক সময় ‘ন’ স্থানে ‘অ’ এর বদলে ‘আ’ হয়, ‘অনা’ও হয়
ন মঞ্জুর = নামঞ্জুর
ন কাল = আকাল
ন ধোয়া = আধোয়া
ন আবাদী = অনাবাদী
ন সৃষ্টি = অনাসৃষ্টি>অনাছিষ্টি

উপপদ তৎপুরুষ সমাস

সংজ্ঞা

উপপদের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দের যে সমাস হয় তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়।

কৃৎ প্রত্যয়ান্ত বা কৃদন্ত শব্দের আগে যে পদ থাকে তাকে উপপদ বলা হয়। যেমন ধর্+আ = 'ধরা', ধরা কৃদন্ত শব্দ। এখন 'ধরা'র আগে যদি 'ছেলে' বসে তাহলে তাকে বলা হবে উপপদ। উপপদের আর কৃদন্ত শব্দের মিলনে যে সমাস গঠিত হয় তা-ই উপপদ তৎপুরুষ সমাস। উদাহরণ

ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা

পকেট মারে যে = পকেটমার

ছা পোষে যে = ছাপোষা

পোঁ ধরে যে = পোঁ ধরা

যাদু করে যে = যাদুকর

এইভাবে বাজিকর, হালুইকর, ধামাধরা, হরবোলা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে পাঠের সাহায্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে নিজে করুন।

১. তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে? তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা দিন।
২. তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক তৎপুরুষ সমাসের দুটি করে উদাহরণ দিন।
৩. দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের সংজ্ঞা লিখুন।
৪. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস গঠনের বিশেষ নিয়মগুলি লিখুন।
৫. নঞ তৎপুরুষ সমাসের গঠন বৈশিষ্ট্য দেখান।
৬. উপপদ তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে? দৃষ্টান্তসহ বুঝিয়ে দিন।
৭. ব্যাস বাক্য লিখুন ঃ

আপন ভোলা, সংখ্যাতীত, মরণাপন্ন, দ্রুতগামী, ঘি-ভাজা, কালিমাখা, শোকাকুল, দোষযুক্ত, জীয়নকাঠি, পাঠশালা, লণ্ডনফেরত, মাঝখান, পারশ্য-রাজ, ছাত্রবৃন্দ, রাজপুরুষ, পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন-ভোজন, অশ্রুতপূর্ব, রাতচরা, নগণ্য, অসাধু, জলচর, ইন্দ্রজিৎ।

পাঠ ৬ ঃ দ্বিগু সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- দ্বিগু সমাসের পরিচয় ও সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- দ্বিগু সমাস গঠনের নিয়ম জানতে পারবেন।

সংজ্ঞা

সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

দ্বিগু সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন,

ত্রি(তিন) ভুজের সমাহার = ত্রিভুজ
ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন
ত্রি (তিন) কালের সমাহার = ত্রিকাল
ত্রি (তিন) লোকের সমাহার = ত্রিলোক
চৌ (চার) রাস্তার মিলন = চৌরাস্তা
তিন মাথার মিলন = তেমাথা
চতু: (চার) মাথার মিলন = চৌমাথা
পঞ্চ ভুতের সমাহার = পঞ্চভূত
ষড় রিপুর সমাহার = ষড় রিপু
অষ্ট ধাতুর সমাহার = অষ্টধাতু
সাত সমুদ্রের সমাহার = সাত সমুদ্র
নব রত্নের সমাহার = নবরত্ন
দশ চক্রের সমষ্টি = দশচক্র
তের নদীর সমষ্টি = তেরনদী

দ্বিগু সমাসের সমাসবদ্ধ পদে কখনো কখনো ঈ বা আ যুক্ত হয়। যেমন,
শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী
পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী
ত্রি (তিন) ফলের সমাহার = ত্রিফলা
ত্রি (তিন) নয়নের সমাহার = ত্রিনয়নী
ত্রি (তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী
দুই আনার সমাহার = দুয়ানি

কিন্তু, পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ (পঞ্চনদী নয়)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. দ্বিগু সমাসের সংজ্ঞা দিন এবং উদাহরণ লিখুন।
২. কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দ্বিগু সমাস গঠনের পরিচয় দিন।

পাঠ ৭ ঃ অব্যয়ীভাব সমাস

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য জানবেন।
- অব্যয়ীভাব সমাসের দ্বারা গঠিত বিচিত্র শব্দের পরিচয় জানবেন।

পাঠটি ভালো করে পড়ুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন।

সংজ্ঞা

যে সমাসের সমস্যমান পদ দুটির পূর্বপদ অব্যয় হয় এবং সমাসবদ্ধ পদে অব্যয়েরই প্রাধান্য থাকে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

অব্যয়ীভাব সমাসে রীতিমত ব্যাসবাক্য নেই। সে জন্য অন্য শব্দের (অব্যয়ের) সাহায্যে এই সমাসের সমাসবদ্ধ পদের অর্থ বুঝে নিতে হয়।

'বর্ণের সদৃশ' এই ব্যাসবাক্যের সমাসবদ্ধ পদ 'উপবন'। 'সদৃশের' অব্যয় রূপ 'উপ'। এই অব্যয় রূপটিই সমাসবদ্ধ পদে অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে।

নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যেমন- সাপীপ্য, সাদৃশ্য, পর্যন্ত, অভাব, পৌনঃপুনিকতা, যোগ্যতা, অনতিক্রম্যতা, পশ্চাৎ প্রভৃতি বিভিন্ন তাৎপর্যে এই সমাস গঠিত হয়।

১) সামীপ্য [উপ] – কূলের সমীপে = উপকূল
কণ্ঠের নিকট = উপকণ্ঠ

২) সাদৃশ্য [উপ] – গ্রহের সদৃশ = উপগ্রহ
নগরের সদৃশ = উপনগর

৩)পর্যন্ত [আ] – জানু পর্যন্ত = আজানু
গুল্‌ফ পর্যন্ত = আগুল্ফ
পদ থেকে মস্তক পর্যন্ত = আপাদমস্তক

৪) অভাব [নির, দুর, গর] – জনের অভাব = নির্জন
ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ
মিলের অভাব = গরমিল

৫) পৌন:পুনিকতা (অনু বা প্রতি, ফি, হর ইত্যাদি) ঘরঘর = প্রতিঘর
রোজ রোজ = হররোজ
বছর বছর = ফি বছর
ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ

৬) অনতিক্রম্যতা (যথা) রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি
ইষ্টকে অতিক্রম না করে = যথেষ্ট
সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য

৭) অতিক্রান্ত (উৎ) বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল
বেগকে অতিক্রান্ত = উদ্বেগ
শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল

৮) যোগ্যতা (অনু বা অ) রূপের যোগ্য = অনুরূপ
জ্ঞানের যোগ্য = অভিজ্ঞ

৯) পশ্চাৎ (অনু) পশ্চাৎ গমন = অনুগমন
পশ্চাৎ শোচনা = অনুশোচনা

১০) বিরোধ (প্রতি) বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল
বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ

১১) ঈষৎ (আ) ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম

	ঈষৎ নত = আনত
১২) ছোট অর্থে (উপ)	ছোট নদী = উপনদী
	ছোট পরিচালক = উপ পরিচালক
১৩) সম্মুখ অর্থে (প্রতি)	অক্ষির সম্মুখ = প্রত্যক্ষ
১৪) দূরবর্তিতা অর্থে (পর)	অক্ষির অগোচর = পরোক্ষ
১৫) পূর্ণতা অর্থে (পরি বা সম্)	সমগ্র পূর্ণ = পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ
১৬) প্রতিনিধিত্ব অর্থে (প্রতি)	ছবির প্রতিনিধি = প্রতিচ্ছবি
	মূর্তির প্রতিনিধি = প্রতিমূর্তি
১৭) প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্থে (প্রতি)	বিরুদ্ধ পক্ষ = প্রতিপক্ষ
	পাল্টা উত্তর = প্রত্যুত্তর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. অব্যয়ীভাব সমাসের সংজ্ঞা দিন এবং কয়েকটি উদাহরণ দিন।

২. অব্যয়ীভাব সমাস গঠনের নিয়ম লিখুন এবং উদাহরণ দিন।

৩. নিম্নলিখিত ব্যাস বাক্যগুলোর সমাসবদ্ধ পদ লিখুন

জন জন, উৎসাহের অভাব, কণ্ঠ পর্যন্ত, মরণ পর্যন্ত, বিধিকে অতিক্রম না করে, ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে, শহরের সদৃশ, অক্ষির অগোচর, জানু পর্যন্ত লম্বিত, দ্বীপের সদৃশ।

পদ প্রকরণ

ইউনিট ৯

ভূমিকা

আমরা জানি যখন শব্দসমষ্টি একটি বিশেষ নিয়মে পাশাপাশি বসে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে বাক্য বলে। বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় বাক্যে ব্যবহৃত শব্দে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক তৈরি করার জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলে। যেহেতু বাক্যে ব্যবহৃত শব্দে বিভক্তি যুক্ত থাকে, তাই বিভক্তিযুক্ত শব্দকেও পদ বলা হয়ে থাকে।

একটি উদাহরণ দিলে ধারণাটি আরও স্বচ্ছ ও বোধগম্য হবে।

রহিম স্কুলে যাইতেছে।

রহিম+০ স্কুল+এ যাইতেছে।

রহিম এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ০ বিভক্তি। স্কুল-এর সঙ্গে ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

মনে আছে আপনাদের শব্দ ও ধাতুর পরে যে বর্ণ/বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয় তাকেই বিভক্তি বলে। বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত সব পদেই কিন্তু বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি দেখা যায় না। তবে সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে ০ বিভক্তি আছে। তাই বলা হয় বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ বিভক্তিযুক্ত। আর এজন্যই এগুলো শব্দ নয়- পদ।

বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে।

পদ পাঁচ প্রকার। যথা– বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়। এ পদগুলোর বৈশিষ্ট্য আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করব। এখানে আমরা কেবল ৫টি পদের নাম জেনে রাখব।

পদ

বিশেষ্য | বিশেষণ | সর্বনাম | ক্রিয়া | অব্যয়

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নীচের বাক্যগুলোতে পদের সঙ্গে যে বিভক্তিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা আলাদা করে লিখুন।

পদ কাকে বলে লিখুন

এখানে উত্তর লিখুন --

শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য কি?

এখানে লিখুন---

বিভক্তি কি? ---

পদ কত প্রকার ও কি কি? ---

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বিশেষ্য পদ কাকে বলে লিখতে পারবেন।
- বিশেষ্য পদের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

যে পদ দিয়ে কোন কিছুর নাম বোঝায় তাকেই বিশেষ্য পদ বলে। এ নাম কোন বস্তু, জাতি, স্থান, কাজ, গুণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তাহলে বিশেষ্যপদের সংজ্ঞার্থ আমরা এভাবে করতে পারি।

কোন কিছুর নামকে বিশেষ্যপদ বলে।

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। এগুলো হচ্ছে সংজ্ঞা বা নামকবাচক বিশেষ্য, জাতিবাচক বিশেষ্য, বস্তু বাচক বিশেষ্য, ভাববাচক বিশেষ্য, গুণবাচক বিশেষ্য। নিচের ছকটি ভালভাবে মনে রাখুন–

সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য

যে পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, স্থান ভৌগোলিক পরিচিতি, গ্রন্থের নাম ইত্যাদি বুঝায় তাকে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন–

ব্যক্তি– রহিম, আলিম, তনু, সাইকেল

স্থান – ঢাকা, কলকাতা, মক্কা, লণ্ডন

ভৌগোলিক পরিচিতিমূলক – হিমালয়, মেঘনা, মহানন্দা, বঙ্গোপসাগর

গুণবাচক বিশেষ

যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোন বস্তুর গুণ বা দোষের নাম বোঝায়, তাকেই গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– তরল দ্রব্যের গুণ- তারল্য, মধুর বস্তুর গুণ – মধুরতা, বীরের গুণ-বীরত্ব ইত্যাদি।

গুণবাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য পদে কোন বস্তুর গুণ অথবা দোষ প্রকাশিত হয় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে।

গ্রন্থের নাম – সোনার তরী, অগ্নিবীণা, নকসী কাঁথার মাঠ, দেশেবিদেশে

জাতিবাচক বিশেষ্য ঃ যে পদ দ্বারা এক জাতীয় প্রাণী অথবা একই শ্রেণীর পদার্থের নাম বুঝায় তাকে বলে জাতিবাচক বিশেষ্য। কেমন গরু, ছাগল, পাখি, মানুষ, ইংরেজ, ফরাসি, পর্বত, মরুভূমি,হ্রদ।
মনে রাখুন

বস্তুবাচক বিশেষ্য

যে পদ দ্বারা বস্তুবাচক পদার্থের নাম বোঝায় তাকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। এ বস্তুবাচক পদার্থের পরিমাণ করা যায়, কিন্তু গণনা করা যায় না। যথা– চাল, ডাল, চিনি, লবণ ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য

যে পদে ব্যক্তি অথবা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ বলে। যেমন– দল, সভা, জনতা, বহর, ঝাঁক ইত্যাদি।

ভাববাচক বিশেষ্য

যে বিশেষ্য পদে ক্রিয়ার ভাব প্রকাশিত হয় তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– 'গমন। গমন ভাববাচক বিশেষ এজন্য যে এতে যাওয়ার ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এরকম আরও উদাহরণ দর্শন, ভোজন, শয়ন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ধারিত স্থানে লিখুন

১। বিশেষ্যপদ কাকে বলে?

উত্তর --
-- .

২। বিশেষ্য পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? নামগুলো লিখুন।

উত্তর --
-- .

৩। নামবাচক বিশেষ্যপদের ৫টি উদাহরণ দিন।

১) ------------ ২) -------------- ৩) --------- ৪) --------- ৫) -------

৪। জাতিবাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? তিনটি উদাহরণ দিন

উত্তর --
-- .

৫। বস্তুবাচক বিশেষ্য পদের সংজ্ঞা লিখুন ও ৩টি উদাহরণ দিন

৬। সমষ্টিবাচক বিশেষ্যপদের সংজ্ঞা লিখুন ও ৩টি উদাহরণ দিন

৭। ভাববাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? ৩টি উদাহরণসহ লিখুন।

৮। গুণবাচক বিশেষ্যপদের সংজ্ঞা লিখুন ও উদাহরণ দিন।

৯। নিচের বিশেষ্যপদগুলি কোন প্রকারের লিখুন

রাজশাহী	সুখ	দুধ	মানুষ	ক্ষমা	শয়ন
নায়েগ্রা	মাছ	চিনি	শৈত্য	কাল্লোল	ভদ্রতা
বর্গ	তেল	সিলেট	মন্ডলী	বানর	
সিংহ	শ্রেণী				

বিশেষণ

বাক্যের কোন কোন পদকে আমরা বিশেষিত করি। যেমন ধরা যাক– পাকা আম ও গভীর রাত্রি – এই দুটি বাক্য। এখানে ‘আম’ পদটিকে ‘পাকা’ ও ‘রাত্রি’ পদটিকে ‘গভীর’ পদদ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ‘পাকা’ ও গভীর পদ দুটি ‘আম ও রাত্রি পদ দুটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। যে পদ বা পদগুলো বাক্যের অন্যপদকে এরকম বিশিষ্টতা দান করে অথবা বিশেষিত করে তাকেই বলে বিশেষণ। তাহলে বিশেষণ পদের সংজ্ঞা এভাবে আমরা নির্ধারণ করতে পারি– **বাক্যের কোন পদের গুণ, দোষ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম, ইত্যাদি** বোঝানর জন্য যে পদ ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে বিশেষণ।

বিশেষণকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) নাম বিশেষণ, ও (২) ভাব বিশেষণ।

বিশেষণ পদ

নাম বিশেষণ | ভাব বিশেষণ

নাম বিশেষণ

যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনামকে বিশেষিত করে তাকে, নাম বিশেষণ বলে। আমরা দুটি বাক্য লক্ষ্য করি– অতল সমুদ্র, বুদ্ধিমান ছেলে। এ বাক্যদুটিতে সমুদ্র ও ছেলে বিশেষ্যপদ। এপদ দুটিকে বিশেষিত করেছে যথাক্রমে অতল ও বুদ্ধিমান। এ পদদুটিকে (অতল ও বুদ্ধিমান) আমরা বলবো বিশেষ্যের বিশেষণ।

সর্বনামের বিশেষণ ঃ আমরা দুটি বাক্য লক্ষ্য করি

১) সে রূপবাণ বটে তবে গুণহীন

২) তারা অনভিজ্ঞ

প্রথম বাক্যে ‘সে’ ও দ্বিতীয় বাক্যে তারা সর্বনামপদ। এ পদদুটিকে বিশেষিত করেছে ‘রূপবান’ ও গুণহীন এবং দ্বিতীয় বাক্যে বিশেষিত করেছে ‘অনভিজ্ঞ বিশেষণটি। তাহলে আমরা বলতে পারি সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ দোষ, গুণ, অবস্থান, ধর্ম ইত্যাদি প্রকাশ করে যে বিশেষণ, তাই সর্বনামের বিশেষণ।

নাম বিশেষণকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১. গুণ বা বৈশিষ্ট্যবাচক
২. পরিমাণ বা মাত্রাবাচক
৩. সংখ্যাক্রম বা পূরণবাচক
৪. বর্ণবাচক
৫. উপাদানবাচক
৬. প্রশ্নাত্মক
৭. সম্বন্ধ বাচক

১. **গুণ বা বৈশিষ্ট্যবাচক ঃ** সুন্দর ফুল, বুদ্ধিমতী মেয়ে, সবুজ মাঠ, নীল আকাশ, দক্ষ বাজিকর, গরম চা।
২. **উপাদানবাচক ঃ** স্বর্ণময় পাত্র, মেটে কলসী
৩. **সংখ্যা বা পরিমাণবাচক ঃ** লাখ টাকা, পাঁচ হাত, দশ জন, এক বিঘা জমি, বহু লোক।
৪. পূরণ বা ক্রমবাচক ঃ প্রথম শ্রেণী, তৃতীয় প্রহর, পয়লা আষাঢ়।

৫. **সর্বনামজাত বিশেষণ ঃ** এই ব্যক্তি, ওই ছেলে, কোন্ ভাবুক।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত বিশেষণ

ক্রিয়াজাত – হারানো সম্পত্তি

অব্যয়জাত – হঠাৎ বড়লোক

সর্বনামজাত – কবেকার কথা

সমাসজাত – চৌচালা ঘর

বীপ্সামূলক - হাসিহাসি

অনুকার অব্যয়জাত – কনকনে শীত

ভাববিশেষণ

বিশেষণ পদ অনেক সময় বিশেষ্য ও সর্বনাম ছাড়া অন্য পদকেও বিশেষিত করতে পারে। এ ধরনের বিশেষণ পদকে ভাব-বিশেষণ বলে। তাহলে ভাব বিশেষণের সংজ্ঞা আমরা এ ভাবে নির্ধারণ করতে পারি–

যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ছাড়া অন্য পদকে বিশেষিত করে তাই ভাব বিশেষণ।

ভাববিশেষণ তিন প্রকার। যথা– (১) ক্রিয়া বিশেষণ, ২) বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ, (৩) অব্যয়ের বিশেষণ।

১) ক্রিয়া বিশেষণ ঃ যে বিশেষণ ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয় বা ক্রিয়াপদকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। যেমন– বেগে ধায়, পরে এসো ইত্যাদি।

২) বিশেষণীয় বিশেষণ ঃ যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে।

নাম- বিশেষণের বিশেষণ

ক্রিয়া - বিশেষণের বিশেষণ

৩) অব্যয়ের বিশেষণ ঃ যে ভাব বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে।

যথা–

৪) বাক্যের বিশেষণ ঃ

বিশেষণের অতিশায়ন–

বিশেষণ পদ যখন দুই বা তার চেয়ে বেশী পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, আয়তন প্রভৃতি বিষয়ের তুলনায় একটির উৎকর্ষ, অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন– সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য বৃহত্তম, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে বৃহত্তর এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম।

১। খাঁটি বাংলা শব্দের অতিশায়ন ঃ

খাঁটি বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনা হলে, চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ক. গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি

খ. বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান

বহুর মধ্যে অতিশায়ন – অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ, অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোন পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়।

সর্বনাম

সর্বনাম শব্দের অর্থ সর্ব বা সবকিছুর নাম। অর্থাৎ নামের পরিবর্তে যা ব্যবহার হয়, তাই সর্বনাম। আমরা জানি যে কোন কিছুর নামকে বিশেষ্য বলে। সর্বনাম, বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়।

নিচের বাক্যটি লক্ষ্য করুন।

রহিম ভাল ছেলে, সে প্রতিদিন স্কুলে যায়।

নিম্নরেখ 'সে' পদটি 'রহিম'কে প্রতিনিধিত্ব করছে। 'রহিম' একটি ছেলের নাম তার পরিবর্তে 'সে' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'সে' পদটিকে আমরা সর্বনাম বলব। এ পদের ব্যবহার দ্বারা একই পদের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যায় ও এতে বাক্য শ্রুতিমধুর হয়।

উপরের আলোচনা থেকে সর্বনাম পদের সংজ্ঞা এভাবে নির্ধারণ করতে পারি–

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা হয় তাকে সর্বনাম বলে।

শ্রেণী বিভাগ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো এরকম–

১. **ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক** – আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তাহারা, তারা, তিনি, ইত্যাদি।

২. **আত্মবাচক** – স্বয়ং, খোদ, নিজ

৩. **সামীপ্যবাচক** – এ, এই, এরা

৪. **দূরত্ববাচক** – ঐ, ঐসব

৫. **প্রশ্নবাচক** – কে, কি, কোন, কাহার, কার

৬. **সাকুল্যবাচক** – সব, সকল, সমুদয়

৭. **অনির্দিষ্টবাচক** – কোন, কেহ, কেউ, কিছু

৮. **ব্যতিহারিক** – আপনা-আপনি, নিজে-নিজে

৯. **সংযোগজ্ঞাপক** – যে, যিনি, যারা

১০. **অন্যাদিবাচক** – অন্য, অপর, পর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

প্রশ্নের উত্তর নির্ধারিত স্থানে লিখুন

প্রশ্ন ঃ 'সর্বনাম' শব্দটির সাধারণ অর্থ কি?

উত্তর ----------------------------------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম কি একটি পদ?

উত্তর ---------------------------------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম কোন পদের পরিবর্তে বসে?

উত্তর ঃ ------------------------------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম কিসের ব্যবহার রোধ করে?

উত্তর ----------------------------------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম পদের সংজ্ঞা লিখুন।

উত্তর ---------------------------------

প্রশ্ন ঃ সর্বনাম পদের একটি উদাহরণ দিন।

উত্তর -------------------------------

নিচের সর্বনাম পদগুলো সনাক্ত করুন ও এগুলোর নিচে দাগ দিন।

১. তারা কাল দেখা করেছে।
২. সব কেনাকাটা শেষ হয়েছে।
৩. উনি বুঝি আসেননি
৪. এরা কোথা থেকে আসছেন?
৫. কেউ কেউ বলে
৬. অধীনের বিনীত নিবেদন
৭. যে যে যাবে, তারা এসো।

পাঠ ৩ ঃ ক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ক্রিয়াপদের একটি সংজ্ঞার্থ রচনা করতে পারবেন।
- ক্রিয়াপদকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষন করতে পারবেন।
- ক্রিয়ার কাল সনাক্ত করতে পারবেন।

আমরা কথা বলার সময়, লক্ষ্য করে দেখবেন, আমরা সব সময়ই কিছু হওয়া, কিছু করা, কিছু ঘটা ইত্যাদি বলে থাকি। আমরা যখন বলি 'সে পড়ছে'। তখন পড়ছে পদটি দিয়ে কোন কিছু করাকে বুঝি অথবা 'সে যায়'- যায় পদটি দিয়ে বিশেষ একটি কাজ করাকে বুঝায়। এই যে, কিছু হওয়া, কিছু করা, থাকা, খাওয়া, ঘটা ইত্যাদি। যে পদগুলো দিয়ে

বোঝায়, তাকে বলে ক্রিয়াপদ। এ ক্রিয়াপদের সাহায্যে কোন কালের, কোন ভাবের নানা প্রকারের ক্রিয়া ঘটার কথা বুঝিয়ে থাকে। তাহলে যদি আমরা ক্রিয়াপদের সংজ্ঞার্থ তৈরি করি, তাহলে তা হবে এরকম–

যে পদ দিয়ে কোন কাজ করা বোঝায় তাকেই বলে ক্রিয়াপদ।

ক্রিয়ার মূল হচ্ছে ধাতু। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। "সে পড়ে" বাক্যটিতে 'পড়ে' ক্রিয়াপদটি (কারণ এতে একটি কাজ হওয়া বোঝাচ্ছে) পড়্ ধাতুর সঙ্গে এ বিভক্তি (পড়্+এ = পড়ে) যুক্ত হয়ে 'পড়ে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

নিচের বাক্য দুটি ভাল করে লক্ষ্য করুন–

ক) ছেলেরা মাঠে খেলা করছে।

খ) সকালে আমরা হাতমুখ ধুয়ে ....

প্রথম বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ 'করছে' পদটি দিয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়াপদ 'ধুয়ে' পদটি দিয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি। সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্য 'ধুয়ে' পদের পরে আরও কিছু পদ যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যদি 'ধুয়ে' পদের পরে 'পড়তে বসি' পদ দুটি যুক্ত করি তবে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন কোন ক্রিয়াপদ দিয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় আর কোন কোন ক্রিয়াপদ দিয়ে বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। যে ক্রিয়াপদ দিয়ে বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায়, তাকে বলে সমাপিকা ক্রিয়া। আর যে ক্রিয়াপদ দিয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না, তাকে বলে অসমাপিকা ক্রিয়া।

সমাপিকা ক্রিয়া - মনোভাব সম্পূর্ণতা পায়

অসমাপিকা ক্রিয়া - মনোভাব সম্পূর্ণতা পায় না।

সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তাই সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়াকে কি বা কাকে প্রশ্ন করলে ক্রিয়ার কর্মপদ পাওয়া যায়। সে বই পড়ে। বাক্যটিতে কি পড়ে? প্রশ্ন করলে উত্তর হবে 'বই'। 'বই' পদটি কর্মপদ। তাই আলোচ্য বাক্যের 'পড়ে' ক্রিয়াপদটি সকর্মক ক্রিয়া।

অকর্মক ক্রিয়ার কোন কর্ম থাকে না। যেমন- সে হাসে। ক্রিয়াকে কি হাসে বা কাকে হাসে, প্রশ্ন করলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এতে কোন কর্মপদ নেই। আলোচ্য বাক্যের 'হাসে' ক্রিয়াপদটি তাই অকর্মক ক্রিয়া।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণ কর্ম বলে। যেমন- শিক্ষক ছেলেদের বাংলা পড়ান। এ বাক্যে বাংলা মুখ্য বা প্রধান কর্ম ও 'ছেলেদের' গৌণ কর্ম। বাক্যটিতে 'পড়ান' তাই দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

ক্রিয়ার কাল

এর আগে আমরা জেনেছি-কিছু হওয়া, ঘটা ইত্যাদিই ক্রিয়া। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন ক্রিয়ার অর্থাৎ হওয়া, যাওয়া, খাওয়া, ঘটা সবগুলোরই একটি কাল নির্দেশ করা থাকে। নিচের বাক্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন-

বুলু প্রতিদিন স্কুলে যায়।

তনিমা সকালে পড়িত।

আবুল বাজারে যাবে।

প্রথম বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ 'যায়' দিয়ে বর্তমান কালের ঘটনা বুঝাচ্ছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'পড়িত' পদ দিয়ে অতীত কাল বুঝাচ্ছে। তৃতীয় বাক্যে 'যাবে' ক্রিয়াপদ দিয়ে ভবিষ্যত কালের কথা বোঝান হচ্ছে। বাক্যগুলোতে আরও দেখা যাবে তিনটি বাক্যের তিনটি ক্রিয়া পদ তিনটি কাল, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত কালকে বুঝাচ্ছে। সময়ের এ বোধকেই বলে ক্রিয়ার কাল। ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিনটি। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল।

বর্তমান কাল

কোন কাজ বর্তমানে হয়, হচ্ছে, হয়ে থাকে বুঝালে বর্তমান কাল হয়। যেমন– করিম যায়। মিলন পড়িতেছে।

সময়ের ভিন্নতা অনুযায়ী বর্তমান কালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়–

ক) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান

খ) ঘটমান বর্তমান

গ) পুরাঘটিত বর্তমান।

সাধারণ বা নিত্য বর্তমান– অনির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজ সম্পন্ন হয় বুঝালে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান হয়। যেমন– পশ্চিমে সূর্য অস্ত যায়। বৃক্ষ ফল দান করে।

ঘটমান বর্তমান– কোন কাজ বর্তমানে চলছে এবং এখনও তা শেষ হয়নি বুঝালে ঘটমান বর্তমান হয়। যেমন– তাহারা যাইতেছে। করিম পড়িতেছে।

পুরা ঘটিত বর্তমান কোন কাজ শেষ হয়েছে অথচ তার ফল এখনও বর্তমান আছে এমন বুঝালে পুরা ঘটিত বর্তমান কাল বুঝায়। যেমন –আজ বিকেলে বৃষ্টি হয়েছে। তারা খেলায় জয়লাভ করেছে।

ঐতিহাসিক বর্তমান– অতীতের ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে গুরুত্ব দানের জন্য বর্তমান কাল ব্যবহৃত হলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন– ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেরপা তেনজিং এভারেষ্ট প্রথম জয় করেন।

অতীত কাল

যে কাজটি অতীতে সংঘটিত হয়েছে বুঝায় তাকে অতীত কাল বলে। যেমন– তাহারা প্রতিদিন কলেজে যাইত। আমি ঢাকা গিয়াছিলাম।

অতীতে কালকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে–

১) সাধারণ বা নিত্য অতীত

২) নিত্যবৃত্ত অতীত

৩) ঘটমান অতীত

৪) পুরাঘটিত অতীত

সাধারণ বা নিত্য অতীত ঃ যে কাজ অনির্দিষ্ট অতীত কালে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাকে সাধারন বা নিত্য অতীত বলে। যেমন– আমি গল্পটি পড়িয়াছিলাম। পুরু আলেকজান্ডারের কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন।

নিত্যবৃত্ত অতীত ঃ অতীত কর্তা কোন কাজ নিয়মিত করত অথবা সে কাজে অভ্যস্ত ছিল, বুঝাতে নিত্যবৃত্ত অতীত হয়। যেমন– কলি প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়িত। রাজা অপত্য স্নেহে প্রজা পালন করিতেন।

ঘটমান অতীত ঃ অতীত কালে কোন কাজ কিছু সময় ধরে চরছিল বুঝাতে ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন– আমরা সেদিন গল্পের বই পড়ছিলাম।

পুরাঘটিত অতীত ঃ অতীতের দুটি ঘটনার মধ্যে একটি পূর্বে ঘটে গেছে বোঝালে পুরাঘটিত অতীত হয়। যেমন– সে আসার পূর্বে আমি চলে গিয়েছিলাম।

ভবিষ্যৎ কাল

যে কাজটি ভবিষ্যৎ কালে সংঘটিত হবে। বুঝাতে ভবিষ্যৎ কাল হয়। ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার। যথা–

১) সাধারণ ভবিষ্যৎ
২) ঘটমান ভভিষ্যৎ
৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

সাধারণ ভবিষ্যৎ ঃ অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ সময়ে কোন কাজ সংঘটিত হবে বুঝালে সাধারণ ভবিষ্যৎ হয়। যেমন– আমি কাল বাড়ি যাব। সামনে মাসে তোমার পরীক্ষা হবে।

ঘটমান ভবিষ্যৎ ঃ ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ চলতে থাকবে বুঝালে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল হয়। যেমন– আমি বইটি পড়িতে থাকিব।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঃ পূর্বে একটি কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে বুঝালে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ হয়। যেমন– আমি কলেজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। ক্রিয়াপদের সংজ্ঞার্থ লিখুন।
২। সমাপিকা ক্রিয়ার নিচে দাগ দিন।
ক) আমি বই কিনতে যাচ্ছি।
খ) তাহারা মাঠে খেলিতেছে।
গ) শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের পড়ান।
ঘ) হিল্লোল মাঠে ঘুড়ি উড়ায়।
ঙ) বৃষ্টি পড়ছে।
৩। অসমাপিকা ক্রিয়ার নিচে দাগ দিন ও বাক্যটি সম্পূর্ণ করুন।
ক) পাখিরা গান গাইলে ....।
খ) দীপা যদি আসে ....।

গ) অনাবৃষ্টি হলে .... ।

ঘ) লড়াই বাধলে .... ।

ঙ) সমীর বইটি দিলে .... ।

৪। শুন্যস্থান পূরণ করুন।

ক) যে ক্রিয়ার কোন কর্মপদ থাকে না তাকে বলে .... ।

খ) যে ক্রিয়ার কর্মপদ থাকে তাকে বলে .... ।

গ) ক্রিয়ার কাল .... প্রকার।

ঘ) ক্রিয়ার কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়কে বলে .... ।

৫। ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করুন। বন্ধনীর মধ্যে লিখুন।

ক) প্রভাতে সূর্য ওঠে। (   )

খ) আমি চিঠিটি লিখব। (   )

গ) গভীর রাত্রিতে অভিযাত্রীরা তাঁবুতে ঘুমাইতেছিল। (   )

ঘ) ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডিগামা প্রথম ভারত উপমহাদেশে পদার্পণ করেন। (   )

ঙ) পাখি গান গায়। (   )

চ) সেই রাত্রে অঝোরে বৃষ্টি ঝরিতেছিল। (   )

ছ) সে স্কুলে পুরস্কার পেয়েছে। (   )

জ) আমি প্রতিদিন বিকেলে নদীর তীরে ভ্রমণ করতাম। (   )

ঝ) মাঝি নৌকা চালাইতেছে। (   )

ঞ) কমল আগামীকাল ক্লাসে যাবে। (   )

পাঠ ৪ ঃ অব্যয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- অব্যয় পদের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করতে পারবেন।
- অব্যয় কত প্রকার ও কি কি লিখতে পারবেন।

যার কোন ব্যয় হয় না অর্থাৎ যার কোন পরিবর্তন হয় না তাই অব্যয় পদ। অব্যয়ের সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না ও তাদের একবচন, বহুবচন হয় না।

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার। যথা–

১. সমুচ্চয়ী
২. অনন্বয়ী
৩. অনুসর্গ
৪. অনুকার

১. সমুচ্চয়ী অব্যয় - যে অব্যয় একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সঙ্কোচন ঘটায় তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে। যেমন-রহিম ও করিম দুজনেই ভাল ছাত্র। এখানে 'ও' পদটি রহিম ও করিম পদদ্বয়কে সংযুক্ত করেছে। আবার, রেজা নির্ভিক, তাই সকলেই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। এখানে 'তাই' পদ দিয়ে দুটি বাক্যকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২. অনন্বয়ী অব্যয় - যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্যপদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে নানা ভাব প্রকাশ করে তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন- মরি মরি। কি সুন্দর দৃশ্য। এখানে মরি মরি! অনন্বয়ী অব্যয়। আবার ছি ছি! এ কাজ তুমি কেমন করে করলে। ছি ছি! বিরক্তি প্রকাশে একটি অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. অনুসর্গ অব্যয় ঃ যে সকল অব্যয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে বিভক্তির মত বসে তাকে অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন– ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। এখানে দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়।

৪. অনুকার অব্যয় ঃ যে সকল অব্যয় কোন শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত তাকে অনুকার অব্যয় বলে। যেমন বজ্রের ধ্বনি- কড়কড়। জলের স্রোত - কলকল, বাতাসের গতি শন শন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. 'অব্যয়' শব্দের অর্থ কি?
২. অব্যয় পদের একটি সংজ্ঞার্থ রচনা করুন।
৩. অব্যয় কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে অর্থ লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. পদ বলতে কি বুঝেন? পদ কত প্রকার হতে পারে?
২. বিশেষ্য পদ বলতে কি বোঝায়? বিভিন্ন প্রকার বিশেষ্য পদের উদাহরণ দিন।
৩. বিশেষণ পদ কাকে বলে বুঝিয়ে লিখুন।
৪. অব্যয়-এর ব্যবহার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন।
৫. ক্রিয়ার কাল কাকে বলে?
৬. উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লিখুন।

সকর্মক ক্রিয়া, অকর্মক ক্রিয়া, ঐতিহাসিক বর্তমান, ঘটমান অতীত, সাধারন ভবিষ্যৎ, নিত্য অতীত।

ইউনিট ১০

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ধাতুর সংজ্ঞা এবং ক্রিয়াপদ দেখে সহজে ধাতু চিনতে পারার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধাতু কত প্রকার ও কি কি তা লিখতে পারবেন।
- উদাহরণসহ সংস্কৃত মূলধাতু ও খাঁটি বাংলা মূলধাতুর পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যে কোন ভাষায় অসংখ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদের মতে, সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দুই হাজার ধাতু আছে। তবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সাত শতের বেশি ধাতুর ব্যবহার দেখা যায় না, বাংলা ভাষায় সিদ্ধ সাধিত সকল প্রকার ধাতুর সংখ্যা দেড় হাজারের কিছু বেশি। এর মধ্যে কিছু ধাতু লোপ পেয়েছে অথবা অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

বাংলাভাষায় যে সকল ক্রিয়াপদ রয়েছে তার মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল। অন্যভাবে বলা যায়, ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় ঃ (১) ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং (২) ক্রিয়াবিভক্তি ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়াবিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু। যেমন ‘পড়ে’ একটি ক্রিয়াপদ। এতে দুটো অংশ রয়েছে ঃ পড়+এ, এখানে ‘পড়’ ধাতু ‘এ’ বিভক্তি। সুতরাং ‘পড়ে ক্রিয়ার মূল বা ধাতু হলো ‘পড়’ আর ক্রিয়া বিভক্তি হলো ‘এ’। অর্থাৎ ‘পড়’ ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে এ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ‘পড়ে’ ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায় ঃ

ক্রিয়ার সব থেকে ছোট অংশ, যেখানে ক্রিয়ার কাজের ইঙ্গিত থাকে, এবং যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে বলা হয় ধাতু বা ধাতু প্রকৃতি।

ধাতু বা ক্রিয়ামূল চিনতে পারার অন্যতম উপায় হলো বর্তমানকালের অনুজ্ঞা তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ আর ধাতুরূপ এক। যেমন- (তুই) ক, যা, যা পড়, ডাক, দেখ, লেখ ইত্যাদি। এগুলো ধাতু ও আবার মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদ।

ধাতু তিন প্রকার ঃ

১. মৌলিক ধাতু, ২. সাধিত ধাতু, ৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

মৌলিক ধাতু

যে সব ধাতুর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, রূপ গঠনের দিক দিয়ে ন্যূনতম একক সেগুলো মৌলিক ধাতু। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু বলা হয়। যেমন চল, পড়. কর, শো, হ, খা ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সংস্কৃত মূলধাতু, খাঁটি বাংলা ধাতু, বিদেশীধাতু।

সংস্কৃত মূল ধাতু

ক. সংস্কৃত মূল ধাতু ঃ বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত মূল ধাতু বলে। সংস্কৃত মূল ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ ও গঠিত হয়। যেমন কৃ ধাতু থেকে করা, কর ইত্যাদি ক্রিয়া এবং কর্তা, কৃত, কর্তব্য, করণীয়, কর্তৃত্ব ইত্যাদি পদ গঠিত হয়।

গম ধাতু থেকে গমন করা ক্রিয়া এবং গত, গতি, গম গন্তব্য ইত্যাদি পদ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দা ধাতু থেকে দান করা ক্রিয়া এবং দান, দাতা, দাতব্য ইত্যাদি পদ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ভূ ধাতু থেকে জাত শব্দ ভূতি, অনুভূতি, বিভূতি, ভার, ভব, উদ্ভাবন, ভূত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা ধাতু

খাঁটি বাংলা ধাতু ঃ যে ক্রিয়াপদগুলো সংস্কৃত থেকে সরাসরি আসেনি সেগুলো খাঁটি বাংলা ধাতু হিসেবে পরিচিত। প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে কখনো বা স্বতন্ত্রভাবে যে সকল ধাতু আমাদের ভাষায় এসে গেছে সেসব ধাতুকেই খাঁটি বাংলা ধাতু বলা হয়।

এদের উপর ভিত্তি করেই বাংলা ক্রিয়াপদ, কৃদন্ত বিশেষ্য এবং কৃদন্ত বিশেষন গঠিত হয়ে থাকে। যেমন– কাট্, কাঁদ, জান, নাচ্ ধাতু থেকে যথাক্রমে কাটা, কাঁদা, জামা, নাচা সাধিত পদ গঠিত হয়ে থাকে।

নিম্নে সংস্কৃত ধাতু এবং তদর্থবাচক খাঁটি বাংলা ধাতুর মিল দেখিয়ে কয়েকটি সাধিত শব্দ বা পদ গঠন করে দেখান হলো।

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
অঙ্ক	অঙ্কন, অঙ্কিত	আঁক্	আঁকা
কথি	কথ্য, কথিত	কহ্	কওয়া, কহন
কৃৎ	কর্তন কর্তিত	কাট্	কাটা
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর্	করা, করে
ক্রন্দ	ক্রন্দন	কাঁদ্	কাঁদা, কাঁদুন
ক্রী	ক্রয়, ক্রীত	কেন্	কেনা, কেনাকাটা
খাদ	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গট্	গঠিত	গড়	গড়া, গড়ন
ঘৃষ	ঘৃষ্ট, ঘর্ষণ	ঘষ্	ঘষা
চব্	চর্বন, চর্বিত	চিব্	চিবানো
ছিদ্	ছিন্ন, ছেদ	ছিঁড়	ছেঁড়া
দল্	দলন, দলিত	দল্,ডল্	দলা, ডলা
দৃশ্	দৃশ্য, দর্শন	দেখ,	দেখা, দেখন
ধৃ	ধৃত, ধারণ	ধর্	ধরা, ধরন
পট্	পঠন, পাঠ্য, পঠিত	পড়্	পড়া, পড়ন
বন্ধ	বন্ধন	বাঁধ	বাঁধন, বাধা
বুধ	বুদ্ধ, বোধ	বুঝ্	বুঝা
রক্ষ	রক্ষণ, রক্ষিত, রক্ষী	রাখ্	রাখা
শ্রু	শ্রবণ, শ্রুত	শুন্	শুনা, শোনা

স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক্	থাকা, থামা
হস্	হাসা, হাসত	হাস্	হাসা, হাসি
হৃ	হরণ হৃত	হর্	হার

বিদেশী ধাতু

বিদেশী ধাতু

প্রধানত হিন্দি এবং আরবি ফারসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেগুলোকে বিদেশী ধাতু বলা হয়। এছাড়াও কতগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যার মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে বলা হয়, অজ্ঞাত মূল ধাতু। যেমন– ভিক্ষে মেগে খায়। এই বাক্যের 'মাগ' ধাতু হিন্দি 'মাঙ্' থেকে আগত। কিন্তু 'হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়ায়ে কাঙালিনী মেয়ে' – এই বাক্যে হের ধাতুটি কোন্ ভাষা থেকে এসেছে তা জানা যায় না। এ জাতীয় ধাতুকে বলা হয় অজ্ঞাতমূল ধাতু।

নিম্নে কয়েকটি বিদেশী ধাতুর উদাহরণ দেয়া গেল

ধাতু	ব্যবহৃত অর্থ
আঁট	শক্ত করে বাঁধা
ঘাট	মেহনত করা
চেঁচ	চিৎকার করা
জম্	ঘনীভূত হওয়া
ঝুল	দোলা
টান	আকর্ষণ

ধাতু	ব্যবহৃত অর্থ
ফির	পুনরাগমন, পুনরাবৃত্তি
চাহ	প্রার্থনা করা
বিগড়	নষ্ট হওয়া
ভিজা	সিক্ত হওয়া
ঠেল	ঠেলা
ডাক	আহবান করা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ধাতু কত প্রকার?

ক) পাঁচ প্রকার ☐ খ) তিন প্রকার ☐

গ) দুই প্রকার ☐ ঘ) চার প্রকার ☐

২. বাংলা ভাষায় যে সকল ক্রিয়াপদ রয়েছে, তার মূল অংশকে বলা হয়।

ক) ক্রিয়া বিভক্তি ☐ খ) প্রত্যয় ☐

গ) ধাতু বা ক্রিয়ামূল ☐ ঘ) ক্রিয়াপদ ☐

৩. বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের বলা হয়-

ক) খাঁটি বাংলা ধাতু ☐ খ) নাম ধাতু ☐

গ) সাধিত ধাতু ☐ ঘ) সংস্কৃত মূল ধাতু ☐

৪. প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে যে সকল ধাতু বাংলা ভাষায় এসেছে, তাদের বলা হয়

ক) বিদেশী ধাতু ☐ খ) সংস্কৃত মূল ধাতু ☐

গ) খাঁটি বাংলা ধাতু ☐ ঘ) যৌগিক ধাতু ☐

৫. সংস্কৃত মূলধাতু, খাঁটি বাংলা ধাতু ও বিদেশী ধাতু নির্ণয় করুন ঃ

অঙ্ক, আঁক, কথি, কহ, ফ্রী, কেন, ঘৃষ, ঘষ, পট, পড়, বুধ, বুঝ, আট্, চাহ স্থা, রাখ্, ফির, হাস্, রক্ষ, শুন্।

উত্তর

১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ

৫. সংস্কৃত মূলধাতু ঃ অঙ্ক, কথি, ফ্রী, ঘৃষ, পঠ, বুধ, স্থান, রক্ষ

খাটি বাংলা ধাতু ঃ আঁক, কহ, কেন, ঘষ, পড় বুঝ, রাখ, হাস, শুন

বিদেশী ধাতু ঃ আঁট, চাহ, ফির।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- সাধিত ধাতু ও সংযোগমূলক ধাতুর পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- উদাহরণসহ নাম ধাতু ও প্রয়োজক ধাতুর সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধাতু যোগে ক্রিয়াপদ গঠন করতে পারবেন।

সাধিত ধাতু

মৌলিক ধাতু অথবা কোনো কোনো নাম শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষসূচক বিভক্তিযুক্ত হলে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন- মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। (এখানে দেখ+আ+বর্তমান কালের সাধারণ নাম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি 'য়' = দেখায়) অনুরূপ শোনায় বসা, হাসায় ইত্যাদি গঠনরীতি ও অর্থের দিকে থেকে সাধিত ধাতুকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন - নামধাতু, প্রযোজক বা নিজস্ব ধাতু এবং সবাচ্যের ধাতু।

ক) নাম ধাতু

ক. নাম ধাতু ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাকেই নাম ধাতু বলে। যেমন সে ঘুমাচ্ছে। 'ঘুম' বিশেষ্যের সঙ্গে 'আ' যোগ করে গঠিত হয় 'ঘুম' এর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে- 'ঘুমাচ্ছে' (স্বর সংগতির কারণে হয় ঘুমুচ্ছে)। এরকম– পাকা আম, ঝিলমিলিয়ে, ধমকানো, বেতানো, ঠকানো, ঝলসানো, মুচড়ানো, উত্তরিলা, নীরবিলা ইত্যাদি।

খ) প্রযোজক ধাতু

খ. প্রযোজক ধাতু ঃ মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রযোজক বা নিজস্ব ধাতু গঠিত হয়। যেমন কর+আ = করা(এখানে করা একটি ধাতু) দেখ+আ ইত্যাদি। যেমন– সে নিজে করে না আর একজনকে দিয়ে করায়। হাসিয়ে রেখো না।

গ) কর্মবাচ্যের ধাতু

গ) কর্মবাচ্যের ধাতু ঃ মৌলিক ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্য মধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। যেমন কাজটি ভাল **দেখায়** না। 'যা কিছু **হারায়** গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর'। বরং বলা যায়, কর্মবাচ্যের ধাতু বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই। কারণ এটি প্রযোজক ধাতুরই অন্তর্গত। যেমন 'দেখায়' এবং হারায় প্রযোজক ধাতু।

সংযোগমূলক ধাতু

সংযোগমূলক ধাতু ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু যুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক ধাতু বলা হয়। যেমন যোগ (বিশেষ্য পদ) +কর (ধাতু) = 'যোগ' কর সংযোগমূলক ধাতু।

বাক্য– তিনের সঙ্গে পাঁচ যোগ কর।

সাবধান (বিশেষ্য)+হ(ধাতু) = সাবধান ২ (সংযোগমূলক ধাতু)

বাক্য এখনি সাবধান হও, নতুবা আখের খারাপ হবে।

সংযোগমূলক ধাতুজাত ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুই-ই হতে পারে। নিম্নে সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত কয়েকটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেয়া গেল।

১. **কর- ধাতু যোগের ঃ**
   ক. বিশেষ্যের সঙ্গে ঃ ভয় কর্, লজ্জাকর্, গুণকর্।
   খ. বিশেষণের সঙ্গে ঃ ভাল কর্, মন্দ কর্, সুখী কর্।
   গ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে ঃ ক্রয় কর, দান কর, দর্শন কর, রান্নাকর, ।
   ঘ. ক্রিয়াজাত (কৃদন্ত) বিশেষণের সঙ্গে ঃ সঞ্চিত কর্, স্থগিত কর্।
   ঙ. ক্রিয়া বিশেষণের সঙ্গে ঃ জলদি কর, তাড়াতাড়ি কর, একত্র কর।
   চ. অব্যয়ের সঙ্গে ঃ না কর্, হাঁ কর, হায় হায় কর, ছি ছি কর্।
   ছ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে ঃ সঙ্গে, খাঁ খাঁ কর্, বনবন কর, টন টন কর্।
   জ. ধন্যাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া বিশেষণ গঠনে ঃ চট করে, ধা করে, হন হন করে।
২. হ-ধাতু যোগে ঃ বড় হ, ছোট হ, ভাল হ, রাজি হ, সুখী হ।
৩. দে-ধাতু যোগে ঃ উত্তর দে, চাকা দে, দাগ দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে
৪. পা-ধাতু যোগে ঃ কান্না পা, ভয় পা, দুঃখ পা, লজ্জা পা, ব্যথা পা, টের পা, যন্ত্রনা পা।
৫. খা-ধাতু যোগে ঃ মার খা, হিমসিম খা, সেঁক, সুদখা, ঘুষ খা।
৬. কাট ধাতু যোগে ঃ সাঁতার কাট, ভেংচি কাট্, জিভ কাট্।
৭. ছাড় ধাতু যোগে ঃ গলা ছাড়, ডাক ছাড়, হাল ছাড়।
৮. ধর-ধাতু যোগে ঃ গলা ধরা, ঘুণে ধরা, পচা ধরা, মাথা ধরা, গোঁ-ধরা।
৯. যা-ধাতু যোগে ঃ অস্ত যা, বাড়ি যা।
১০. বাস ধাতু যোগে ঃ ভাল বাস্, মন্দবাস, সুখ বাস্।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. মৌলিক ধাতু বা কোনো কোনো নাম শব্দের সঙ্গে ‘আ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলে–

ক) সংযোগমূলক ধাতু ☐ খ) নাম ধাতু ☐

গ) প্রযোজক ধাতু ☐ ঘ) সাধিত ধাতু ☐

২. বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পার ‘আ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন দাতু গঠিত হয় তাকে বলে

ক) নিজন্ত ধাতু ☐ খ) মৌলিক ধাতু ☐

গ) নাম ধাতু ☐ ঘ) সাধিত ধাতু ☐

৩. উদাহরণসহ প্রযোজক ধাতুর সংজ্ঞা দিন

৪. ‘কর্মবাচ্যের ধাতু বলে আলাদা নামকরণের প্রযোজন নেই- কেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর

১. ঘ ২. গ

ইউনিট ১১

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
- সমোচ্চারিত শব্দের অর্থপার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- প্রতিশব্দের ব্যবহার করতে পারবেন।
- বিশেষ্য থেকে বিশেষণপদে রূপান্তর করতে পারবেন।
- বাক্য সঙ্কোচন করতে শিখবেন।
- বাগধারা ব্যবহার করতে পারবেন।

পাঠ ১ ঃ একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভূমিকা

শব্দ ভাষার মৌখিক উপাদান। শব্দের সাফল্যজনক ব্যবহার শিখতে হলে শব্দের বিভিন্নমুখী প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। নিজের উদাহরণগুলিতে একই শব্দের বিভিন্নমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করবেন।

চোখ

১. দৃষ্টি – তার চোখ কবেই শেষ হয়ে গেছে।
২. সতর্ক – ছেলেটাকে চোখে চোখে রাখ।
৩. রোগ – চোখ ওঠা রোগে দেশ চেয়ে গেল।
৪. ভয় দেখান – তোমার চোখ রাঙানিকে আমি ভয় পাইনা।
৫. শত্রু – ছেলেটি সৎমায়ের চোখের বালি উঠতে বসতে গালি দেয়।
৬. লজ্জা – তোমার চোখের পর্দা বলে কিছু নেই – তাই এ কথা আমাকে বলতে পারলে।

গা

১. আত্মগোপন করা – পুলিশের ভয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে।
২. উদ্যম – একটু গা তোল, না হলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে যে।
৩. মন লাগান – কাজে গা লাগাও, না হলে সময়মত শেষ হবে না।
৪. ভয় পাওয়া – ভর সন্ধ্যে বেলা, ভূতের ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠেছে।
৫. নিশ্চিন্ত হওয়া – পরীক্ষা শেষ তো তাই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে।
৬. অল্প জ্বর – তোমার গা গরম হয়ে উঠেছে দেখছি।

কথা

১. প্রসঙ্গ – কথায় কথায় ফারুকের প্রসঙ্গ এসে গেল।
২. উপদেশ – বুড়োর কথা শোন ভবিষ্যতে ভাল হবে।
৩. অঙ্গীকার – সে কথা দিয়েছে এক মাসের মধ্যেই পাওনা টাকা ফেরত দেবে।
৪. বক্তব্য – তোমার কথা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।
৫. উপাখ্যান – মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
৬. অসদ্ভাব – দুভায়ের মধ্যে কথা নেই আজ এক বছর।

কান

১. বিশ্বাস নষ্ট করা – আমার বিরুদ্ধে বলে বলে বড় সাহেবের কান ভারি করেছো তোমরা।
২. গ্রাহ্য করা – বাজে ছেলেদের কথায় মোটেই কান দিও না।
৩. অঙ্গ – আমরা কান দিয়ে শুনি।
৪. বিরক্তি – একের পর এক তোমাদের অভিযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।
৫. প্রকাশ – বিষয়টা যেন পাঁচ কান না হয়।
৬. আমাদের বড় সাহেব কান পাতলা লোক – যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে।

পাকা

১. পক্ব – পাকা আম খুব সুস্বাদু।
২. চূড়ান্ত – মেয়ের বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে।
৩. দক্ষ – এ তো পাকা হাতের লেখা, দেখেই বোঝা যায়।
৪. খাঁটি – পাকা সোনা দিয়ে এ গয়না তৈরি করা হয়েছে।
৫. স্থায়ী – এ কাপড়ের রং পাকা।
৬. বাঁধানো – পাকা রাস্তায় চলতে আরাম।

অঙ্ক

১. গণিত – ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।
২. ক্রোড় – বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।
৩. নাটকের বিভাগ – এ নাটকে পাঁচটি অঙ্ক আছে।
৪. সংখ্যা – ঝড়ে মৃতের অঙ্ক এক শত ছাড়িয়ে গেছে।

কাঁচা

১. অদক্ষ – ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।
২. নির্বোধ – সে এত কাঁচা লোক নয় যে তোমরা যা বোঝাবে সে তাই বুঝবে।
৩. অপরিণত – কাঁচা বয়স তো, তাই এরকম একটা ভুল করে ফেলেছে।
৪. অপক্ব – গাছের কাঁচা আমগুলো পাড়লে কেন?
৫. পোড়া নয় – কাঁচা ইটের তৈরি ঘর সামনের বর্ষাতেই হয়তো ভেঙে পড়বে।

৬. ছোট ছেলেমেয়ে – কচি-কাঁচাদের বাড়ন্ত শরীর ওদের একটু ভাল খাবার তো দিতেই হবে।

হাত

১. অঙ্গ বিশেষ – কাজ করার জন্য আমাদের দুটি হাত আছে।
২. দক্ষতা – দীর্ঘদিন একই কাজ করে তার হাত পেকেছে।
৩. দ্রুত কাজ করা – হাত চালিয়ে কাজ কর।
৪. বশে আনা – লোকটাকে হাত কর, নইলে বিপদ বাধাবে।
৫. ত্যাগ – কাজটা হাতছাড়া করিও না, পরে পস্তাবে।
৬. পকেট খরচ – ছেলেটাকে প্রতিদিন কিছু টাকা হাত খরচ দিও?
৭. ভিক্ষা করা – পরের কাছে প্রতিদিন হাত পাততে তোমার লজ্জা করে না।
৮. চুরি – চাকরটার হাতটানের অভ্যাস আছে।

মুখ

১. সম্মান/সুনাম – ছেলেটি পরীক্ষায় ভাল রেজল্ট করে সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছে।
২. ভাষা – লেখাপড়া শিখলেও লোকটির মুখ খুব খারাপ।
৩. কথা – এ ব্যাপারে সে মুখ খুলবে না।
৪. লজ্জিত – মুখচোরা হয়ে থাকলে এ সংসারে সব জায়গাতেই ঠকতে হবে।
৫. দিক – এই ভরসন্ধ্যায় হন হন করে কোন মুখে চললে?
৬. প্রসন্ন – খোদা, তুমি আমার দিকে মুখ তুলে চাও।

মাথা

১. দিব্যি দেওয়া – মাথা খাও, খাবারগুলো খেতে যেন ভুলো না।
২. বুদ্ধি – ছেলেটির অঙ্কে মাথা আছে।
৩. নষ্ট করা – আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খেয়েছ, দেখছি।
৪. ঝোঁক – রাগের মাথায় কি যা তা বলে চলেছ।
৫. মিলন – চৌরাস্তার মাথায় লোকটি বসে আছে।
৬. ক্রোধ – মাথা গরম করো না ঠান্ডা মাথায় বুঝবার চেষ্টা করো।
৭. কঠোর পরিশ্রম – মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবেই এ সম্পদ অর্জন করতে পেরেছি।
৮. প্রধান – নবীনই এ গ্রামের মাথা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের শব্দগুলো দিয়ে আপনার খাতায় ৫টি করে ভিন্নার্থক বাক্য রচনা করুন।
মাথা, কাঁচা, হাত, কান, মুখ।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করবেন।

ভূমিকা

প্রায়ই একই রকম উচ্চারণ হলেও শব্দগুলির বানান ও অর্থ আলাদা। শিক্ষার্থীদের এগুলো ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার।

সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

অংশ – ভাগ	অংস – স্কন্ধ, কাঁধ	অনু – পশ্চাৎ	অণু – বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ
অন্ন – খাদ্য	অন্য – অপর	অবদান – মহৎ কাজ	অবধান – মনোযোগ
আপণ – দোকান	আপন – নিজ	আশা – কামনা	আসা – উপস্থিত হওয়া
উপাদান – উপকরণ	উপাধান – বালিশ	কুল – বংশ	কূল – কিনারা
কৃত – তৈয়ারি	ক্রীত – কেনা	কোটি – ক্রোর	কটি – কোমর
কোমল – নরম কমল – পদ্মফুল	গুড় – মিষ্ট দ্রব্য	গূঢ় – গুপ্ত	চাল – ঘরের চাল
চা'ল – চাউল	চির – দীর্ঘকাল	চীর – ছেঁড়া কাপড়	তরণী – নৌকা
তরুণী – যুবতী	দার – স্ত্রী	দ্বার – দরজা	দিন – দিবস
দীন – দরিদ্র	দীপ – আলোক	দ্বিপ – হস্তী	দ্বীপ – জলবেষ্টিত স্থান
দেশ –রাজ্য	দ্বেষ – হিংসা	ধ্বনি – শব্দ	ধনী – ধনবান
ধনি – রমনী	নীর – জল	নীড় – পাখির বাসা	প্রসাদ – অনুগ্রহ
প্রাসাদ –অট্টালিকা	প্রকার – রকম	প্রাকার – প্রাচীর	বাধা – বিঘ্ন
বাঁধা – বন্ধন	বিনা – ব্যতীত	বীণা – বাদ্যযন্ত্রবিশেষ	বাণ – শর
বান – বন্যা	বিষ – গরল	বিস – মৃণাল	বিশ – কুড়ি
বসন – বস্ত্র	ব্যসন – আসক্তি	মণ – ৪০ সের	মন – অন্ত:করণ
শক্ত – সমর্থ	সক্ত – আসক্ত	শীত –ঠান্ডা	সিত – সাদা
শূর – বীর	সুর – দেবতা	সূর – সূর্য	শ্বশ্র – শাশুড়ী
শ্মশ্রু – দাড়ি	সব – সকল	শব – মৃতদেহ	সর্গ – অধ্যায়
স্বর্গ – অমরলোক	স্বর – গলার স্বর	শর – তীর	সর – দুধের স্বর
সম – সমান	শম – শান্তি	সার্থ – অর্থযুক্ত	স্বার্থ – নিজ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করুন

নীর / নীড়	দার / দ্বার
কোটি / কটি	আশা / আসা
চির / চীর	কুল / কূল
সব / শব	আপন / আপণ
সর্গ / স্বর্গ	দ্বিপ / দ্বীপ
শক্ত / সক্ত	শর / সর

পাঠ ৩ ঃ বিপরীতার্থক শব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

¨ বিপরীতার্থতক শব্দ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভূমিকা

দক্ষতার সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীর জানা শব্দসম্ভার বৃদ্ধি করা দরকার। বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার করতে জানলে মনের ভাব অনেকক্ষেত্রে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এজন্য নিচে প্রদত্ত শব্দগুলো ভাল করে পাঠ করুন।

বিপরীতার্থক শব্দ

মূলশব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ
অম্ল	মধুর
অধম	উত্তম
অলস	পরিশ্রমী
অমর	মর
আলোক	অন্ধকার
আয়	ব্যয়
আদি	অন্ত

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
কু	সু
কুটিল	সরল
অনুকূল	প্রতিকূল
অন্তর	বাহির
আসল	নকল
আকাশ	পাতাল
আবির্ভাব	তিরোধান
ইচ্ছা	অনিচ্ছা

মূলশব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
ইতর	ভদ্র
ইহকাল	পরকাল
উত্থান	পতন
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন
ক্ষুদ্র	বৃহৎ
গোপনীয়	প্রকাশ্য
গ্রহণ	বর্জন
মান	অপমান
সুলভ	দুর্লভ
আয়	ব্যয়
ইতর	ভদ্র
উদয়	অস্ত
ঊর্ধ্ব	অধ:
গুণ	দোষ
গুরু	শিষ্য
চঞ্চল	স্থির
জড়	চেতন
দীর্ঘ	হ্রস্ব
নূতন	পুরাতন
প্রিয়	অপ্রিয়
বিদ্বান	মূর্খ
মধুর	কটু
লাভ	ক্ষতি
শান্ত	দুরন্ত
শ্রদ্ধা	ঘৃণা
শীতল	উষ্ণ
সমতল	অসমতল
সন্ধি	বিগ্রহ
সরস	নীরস
সুখ	দু:খ
সুপ্ত	জাগ্রত
সংকীর্ণ	প্রশস্ত
সরল	বক্র

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
উর্বর	অনুর্বর
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উন্নতি	অবনতি
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
গুরু	শিষ্য
গ্রাম্য	নাগরিক
প্রশংসা	নিন্দা
ন্যায়	অন্যায়
উপকার	অপকার
আদি	অন্ত
উচ্চ	নীচ
উষ্ণ	শীতল
কৃশ	স্থূল
গৌণ	মুখ্য
ঘন	তরল
জন্ম	মৃত্যু
তিরস্কার	পুরস্কার
ধনী	নির্ধন
প্রভু	ভৃত্য
বন্ধুর	মসৃণ
মহৎ	নীচ
মিথ্যা	সত্য
লঘু	গুরু
শিষ্ট	অশিষ্ট
শত্রু	মিত্র
সকাল	সন্ধ্যা
সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
সুধা	গরল
স্বর্গ	নরক
সমাপ্ত	অসমাপ্ত
সুশ্রী	কুশ্রী
স্মৃতি	বিস্মৃতি
সুলভ	দুর্লভ

হর্ষ	বিষাদ

হ্রাস	বৃদ্ধি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দলিখুন।

শব্দ	**বিপরীতার্থক শব্দ**	**শব্দ**	**বিপরীতার্থক শব্দ**
আলোক		সুলভ	
গ্রহণ		উন্নতি	
সরস		হর্ষ	
হ্রাস		লাভ	
সমাপ্ত		সুখ	
শীতল		আসল	
গোপনীয়		আয়	
ক্ষুদ্র		অন্তর	
গুরু		গ্রাম্য	

পাঠ ৪ ঃ প্রতিশব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- প্রয়োজনীয় শব্দের প্রতিশব্দ লিখতে পারবেন।

ভূমিকা

অনেক শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ আছে। ভাষা ব্যবহার দক্ষতা অর্জনের জন্য এ প্রতিশব্দগুলো আমাদের জানা দরকার। নিচের প্রতিশব্দগুলো ভাল করে জেনে নিন।

অশ্রু – নেত্রজল, লোর।

আকাশ – নভঃ, গগন, ব্যোম, অম্বর, অন্তরীক্ষ, আসমান।

আগুন – অগ্নি, বহ্নি, পাবক, অনল, হুতাশন।

ইচ্ছা – আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, লিপ্সা, মনোরথ, বাসনা, কামনা, অভিলাষ, অভিপ্রায়।

কথা – ভাষা, বানী, উক্তির, বচন, বাক্য।

কাল – অসিত, কৃষ্ণ, শ্যাম, শ্যামল।

ক্রোধ – কোপ, রোষ, রাগ, উষ্মা।

ঘর – গৃহ, নিলয়, আলয়, আবাস, নিকেতন

ঘোড়া – ঘোটক, বাজী, অশ্ব, তুরগ, তুরঙ্গ, হয়।

চাঁদ – চন্দ্র, ইন্দ্র, চন্দ্রমা, হিমাংশু, শীতাংশু, সুধাকর, নিশাকর, মৃগাঙ্ক, শশধর, শশী।

চোখ – চক্ষু, লোচন, নেত্র, নয়ন, অক্ষি, আঁখি।

জল – জীবন, সলির, পয়ঃ, বারি, নীর, অপ, উদক, পানি।

ঝড় – ঝটিকা, প্রভঞ্জন, বাত্যা।

দিন – দিবস, দিবা, বাসর, অহঃ।

নদী – তটিনী, প্রবাহিনী, তরঙ্গিনী, শৈবালিনী, সরিৎ, স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী।

পাহাড় – পর্বত, অদ্রি, গিরি, শৈল, জগ।

পৃথিবী – ধরনী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ধরা, অবনী, মহী।

বায়ু – অনিল, সমীর, সমীরণ, মরুৎ, পবন।

বিদ্যুৎ – তড়িৎ, চপলা, সৌদামিনী, বিজলী, দামিনী।

রাত্রি – শর্বরী, নিশা, নিশীথিনী, বিভাবরী, রজনী, যামিনী।

সমুদ্র – সাগর, সিন্ধু, অর্ণব, জলধি, পারাবার।

সাদা – শুক্ল, শুভ্র, শুচি, শ্বেত, সিত, গৌর, ধবল।

সিংহ – কেশরী, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, হরি।

সূর্য – আদিত্য, দিবাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, বিভাকর, মার্তন্ড, মিহির, ভানু, তপন, রবি।

পাঠ ৫ ঃ পদ পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- পদ পরিবর্তন ও প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভূমিকা

ভাষা বলা ও লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য পদ পরিবর্তনের রীতি ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য পাঠটি ভাল করে পড়ুন।

বিশেষ্য - বিশেষণ	বিশেষ্য - বিশেষণ	বিশেষ্য - বিশেষণ	বিশেষ্য - বিশেষণ
অনু – আনবিক	অনুবাদ – অনুদিত	অভ্যাস – অভ্যস্ত	আদি – আদিম
ইতিহাস – ঐতিহাসিক	উদয় – উদিত	গাঁ – গেয়ো	গ্রহণ – গৃহীত
জল – জলো	তামা – তামাটে	দোষ – দুষ্ট	ন্যায় – ন্যায্য
পুলক – পুলকিত	পশু – পাশবিক	বসন্ত – বাসন্তী	বিধান – বিহিত
মাছ – মেছো	শ্রবণ – শ্রাব্য	অংশ – আংশিক	অধ্যয়ন – অধীত
অনুমান – অনুমিত	আনন্দ – আনন্দিত	উপন্যাস – ঔপন্যাসিক	উল্লাস – উল্লসিত

গ্রাম – গ্রাম্য	ঘর – ঘরোয়া	জাতি – জাতীয়	দাঁত – দেঁতো
ধর্ম – ধার্মিক	প্রত্যহ – প্রাত্যহিক	পৃথিবী – পার্থিব	বন – বুনো
বিদ্যুৎ – বৈদ্যুতিক	লোক – লৌকিক	সূর্য – সৌর	অঙ্গ – আঙ্গিক
অগ্নি – আগ্নেয়	অন্ত – অন্ত্য	আদর – আদুরে	উপনিবেশ – ঔপনিবেশিক
কাজ – কেজো	গাছ – গেছো	চক্ষু – চাক্ষুষ	ঝড় – ঝড়ো
দেহ – দৈহিক	প্রকৃতি – প্রাকৃতিক	প্রমাণ – প্রামান্য	বৎসর – বাৎসরিক
ভূগোল – ভৌগোলিক	শহর – শহুরে	স্ত্রী – স্ত্রৈণ	অবধান – অবহিত
অরণ্য – আরণ্য	অর্থ – আর্থিক	আষাঢ় – আষাঢ়ে	কর্ম – কর্মঠ
গো – গব্য	চোর – চোরাই	ঢাকা – ঢাকাই	দিন – দৈনিক
নিশা – নৈশ	পরলোক – পারলৌকিক	পুর – পৌর	বিমান – বৈমানিক
মন – মানসিক	শরীর – শারীরিক		

বিশেষণ – বিশেষ্য	বিশেষণ – বিশেষ্য	বিশেষণ – বিশেষ্য	বিশেষণ – বিশেষ্য
ধীর – ধৈর্য	অনুগত – আনুগত্য	অলস – আলস্য	পাগল – পাগলামি
বীর – বীর্য	মধুর – মাধুর্য	দীন – দৈন্য	চঞ্চল – চাঞ্চল্য
তরল – তারল্য	ধীর – ধৈর্য	গুরু – গৌরব	কিশোর – কৈশোর
সৎ – সততা	সুন্দর – সৌন্দর্য	শীত – শৈত্য	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বিশেষ্য থেকে বিশেষণ করুন।

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
মাছ		নিসা		উদয়	
বৎসর		উপন্যাস		অংশ	
অঙ্গ		পরলোক		শ্রবণ	
গ্রহণ		প্রমাণ		গো	
শরীর		দিন		দেহ	

২. বিশেষণ থেকে বিশেষ্য করুন।

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
সুন্দর		তরল		গুরু	
বীর		শীত		কিশোর	
অনুগত		মধুর		অলস	

পাঠ ৫ ঃ বাক্য সঙ্কোচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

¨ বাক্য সঙ্কোচন করতে পারবেন।

বাক্য সংকোচন

অতি দীর্ঘ নয় যা — নাতিদীর্ঘ
অক্ষির সম্মুখে — প্রত্যক্ষ
অক্ষির অগোচর — পরোক্ষ
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা — অনুসন্ধিৎসা
অন্যদিকে মন যার — অন্যমনস্ক
অপকার করার ইচ্ছা — অপচিকীর্ষা
অন্যদেশ — দেশান্তর
অন্য বারে — বারান্তর
অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে যে কাজ করে — অবিমৃষ্যকারী
অতি শীতও নয় অতি গ্রীষ্ম নয় — নাতিশীতোষ্ণ
অবশ্যই যা হবে — অবশ্যম্ভাবী
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত — আদ্যন্ত
আকাশে গমন করে যে — বিহঙ্গ
আকাশে চরে যে —খেচর
আদরের সাথে — সাদরে
আটপ্রহর যা পরা যায় — আটপৌরে
আপনার রং লুকায় যে — বর্ণচোরা
আমিষের অভাব — নিরামিষ
আয় আনুসারে যিনি ব্যয় করেন — মিতব্যয়ী
আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন যিনি — কৃতার্থন্মন্য
ইতিহাস লেখেন যিনি — ঐতিহাসিক
ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি — আস্তিক
ঈশ্বরে যিনি বিশ্বাস করেন না — নাস্তিক
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে — কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে — অকৃতজ্ঞ
যা উড়ছে — উড্ডীয়মান
যে রমনীর বিবাহ হয় নাই — কুমারী, অনূঢ়া
যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই — অদৃষ্টপূর্ব

যাহা কষ্টে লাভ করা যায় – দুর্লভ
যাহার স্ত্রী বিগত হয়েছে – বিপত্নীক
যাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় – হৃদয়বিদারক
যে বিদেশে থাকে – প্রবাসী
যে জমিতে দুইবার ফসল হয় – দোফসলী
যাহা বপন করা হইয়াছে – উপ্ত
যে স্ত্রীর বশীভূত – স্ত্রৈণ
যাহা মাটি ভেদ করে ওঠে – উদ্ভিদ
লাভ করিবার ইচ্ছা – লিপ্সা
রব শুনিয়া যাহারা আসিয়াছে – রবাহূত
যাহার হৃদয় শোভন – সুহৃদ
যে নারীর সন্তান হয় না – বন্ধ্যা
যে ভরণ করে – ভর্তা
যাহারা এক মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে – সহোদর
যাহার গন্ধ ভাল – সুগন্ধ
যিনি কষ্ট সহ্য করিতে পারেন – কষ্টসহিষ্ণু
যিনি বিদ্যা লাভ করিয়াছেন – কৃতবিদ্য
যা লেহন করে খাওয়া যায় – লেহ্য
যা প্রবীন বা প্রাচীন নয় – অর্বাচীন
যাহার আকার কুৎসিত – কদাকার
পা হইতে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক
কোথাও নত কোথাও উন্নত – বন্ধুর
জানিবার ইচ্ছা – জিজ্ঞাসা
জয় করিবার ইচ্ছা জিগীষা
একই গুরুর শিষ্য – সতীর্থ
অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা – অনুসন্ধিৎসা
যে রমণী প্রিয় কথা বলে – প্রিয়ংবদা
যা চিবিয়ে খাওয়া যায় – চর্ব্য
মরণ পর্যন্ত – আমরণ
পিতার ভ্রাতা – পিতৃব্য
অগ্রে জন্মিয়াছে যে – অগ্রজ
কর্মে অতিশয় কুশল – কমর্ঠ
অনুকরণ করিবার ইচ্ছা – অনুচিকীর্ষা
যাহার উপস্থিত বুদ্ধি আছে – প্রত্যুৎপন্নমতি
যে উপকারীর অপকার করে – কৃতঘ্ন
যাহা পানের যোগ্য – পেয়
যিনি অধ্যাপনা করেন – অধ্যাপক

যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাগ্মী
হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত – আসমুদ্র হিমাচল

যে গমন করে না – নগ
যে রোগ নির্ণয় করিতে হাতড়াইয়া মরে – হাতুড়ে
শ্রবণের যোগ্য – শ্রব্য
যাহা উদিত হইতেছে – উদীয়মান
ক্ষমার যোগ্য – ক্ষমা
যা জলে জন্মে – জলজ
যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়
যা কষ্টে নিবারণ করা যায় – দুর্নিবার
যাহার অন্য উপায় নাই – দুর্নিবার
যাহার অন্য উপায় নাই – অনন্যোপায়
যাহা দমন করা যায় না – অদম্য
ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় – ওষধি
জীবন পর্যন্ত – আজীবন
আচরণের যোগ্য – আচরণীয়
বাঘের চামড়া – কৃত্তি
হরিণের চামড়া – অজিন
অশ্বের ডাক – হ্রেষা
হস্তীর ডাক – বৃংহতি
কোকিলের ডাক – কুহু
ময়ুরের ডাক – কেকা
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময় – নিদাঘ
নৌকা চালনা করে যে – নাবিক
নূপুরের ধ্বনি – নিক্কন
পরে জন্মেছে যে – অনু
পূর্বে ছিল এখন নাই – ভূতপূর্ব
পাখির কলরব – কুজন
মৃতের মত অবস্থা যার – মুমূর্ষু
যার কোন ভয় নেই – অকুতোভয়
যিনি বিদ্যালাভ করেছেন – কৃতবিদ্য
গণনার অযোগ্য – নগণ্য
যে হিত ইচ্ছা করে – হিতৈষী
যার কুল ও শীল জানা নেই – অজ্ঞাতকুলশীল
দেখা যায় না যা – অদৃশ্য
যা সহজে ভেঙে যায় – ভঙুর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এক কথায় প্রকাশ করুন
আদরের সাথে
যা উড়ছে
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়
লাভ করিবার ইচ্ছা
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়
যাহা পানের যোগ্য
যাহা দমন করা যায় না
যা কষ্টে জয় করা যায়
যা জলে জন্মে
বাঘের চামড়া
গণনার অযোগ্য
যা সহজে ভেঙে যায়
যার কুল ও শীল জানা নেই
যা মাটি ভেদ করে ওঠে
যে বিদেশে থাকে।

পাঠ ৭ ঃ বাগধারা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাগধারা ব্যবহার করতে পারবেন।

নিচের বাগধারাগুলো ভাল করে পড়ুন

১. অরণ্যে রোদন (বৃথা চেষ্টা করা) – বুড়ো কৃপণের কাছে চাঁদা চাওয়া আর 'অরণ্যে রোদন করা একই কথা।

২. অক্কা পাওয়া (মরে যাওয়া) – পকেটমারটি জনতার হাতে বেদম মার খেয়ে অক্কা পেয়েছে।

৩. অগস্ত্য যাত্রা (চিরতরে প্রস্থান) – ছেলেটি বাবা-মার উপর অভিমান করে সেই যে বাড়ি ছাড়লো আর ফিরে এলো না; কে জানতো এযাত্রাই হবে তার অগস্ত্য যাত্রা।

৪. অর্ধচন্দ্র দান (গলাধাক্কা দেওয়া) – থানা পুলিশ না করে চোরটিকে এখন অর্ধচন্দ্র দান করে বিদেয় কর।

৫. অকূলে কূল পাওয়া (মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া) – তোমার দয়াতে এবার অকূলে কূল পেলাম; না হলে এ বিপদ থেকে আমার বাঁচার উপায় ছিল না।

৬. অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন) – বিধবা স্ত্রীলোকটির অন্ধের যষ্টি একমাত্র এই ছেলেটি-এ ভুবনে তার আর কেউ নেই।

৭. অহিনকুল সম্পর্ক (শত্রু সম্পর্ক) – ভাইয়ে ভাইয়ে এখন অহিনকুল সম্পর্ক– কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখে না।

৮. অকাল কুষ্মান্ড (অপদার্থ)– ছেলেটির একেবারে অকাল কুষ্মান্ড; তাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না।

৯. অগাধ জলের মাছ (চালাক) – করিম অগাধ জলের মাছ তার মনের ফন্দিফিকির আমি জানবো কি করে!

১০. অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শণীয় বস্তু) – হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা যেন অমাবস্যার চাঁদ হাতে পেলেন।

১১. অথৈ জলে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – চাকুরিটা হারিয়ে সে এখন অথৈ জলে পড়েছে।

১২. অগ্নি শর্মা (অতিশয় ক্রুদ্ধ) – কথাটি শোনামাত্র তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

১৩. অকূল পাথার (সীমাহীন বিপদ) ভিটে মাটি সর্বস্ব হারিয়ে এখন আমি অকূল পাথারে ভাসছি।

১৪. অন্ধকারে ঢিল মারা (না জেনে কিছু করা) – তুমি এ বিষয়ের কিছুই না জেনে অন্ধকারে ঢিল মারার চেষ্টা করছো।

১৫. অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে কঠিন কাজ করার চেষ্টা) – এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয় তবু বন্ধুদের অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে।

১৬. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী (অল্পবিদ্যার দেমাক) – পড়েছো হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে, সে কি রোগীর প্রাণান্ত না করে ছাড়বে; জানতো অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

১৭. আক্কেল সেলামী (বোকামীর দন্ড) বিনা টিকেটে ট্রেনে উঠে পঞ্চাশ টাকা আক্কেল সেলামী দিলাম।

১৮. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) তোমার মত একজন দরিদ্র শ্রমিক একদিন কারখানার মালিক হবে – এ আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র।

১৯. আমড়া গাছি করা (তোষামোদ করা) বড় সাহেবকে আমড়াগাছি করে সে এবার বড় একটা ঠিকাদারি পেয়ে গেছে।

২০. আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি হওয়া) – শফিক যেভাবে তার বাবার সঙ্গে তর্ক করে; দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

২১. আকাশ ভেঙ্গে পড়া (মহা বিপদ উপস্থিত হওয়া) – নৌকাডুবির খবর পেয়ে মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

২২. আকাশ থেকে পড়া (না জানার ভান করা) – চুরির দায়ে তার জেল হয়েছে শুনে তুমি যেন আকাশ থেকে পড়লে মনে হচ্ছে।

২৩. আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনী) – রশিদ খালি হাতে একটা বাঘ মেরেছে, এরকম একটা আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করতে বলছ!

২৪. আকাশ পাতাল (দুস্তর ব্যবধান) – আকাশ পাতাল ভেবে কোন লাভ নেই হাতের কাছে যে সুযোগটা আছে সেটাই গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ।

২৫. আলালের ঘরের দুলাল (আদুরে ছেলে) – ওতো আলালের ঘরের দুলাল, সে এত পরিশ্রমের কাজ পারবে কেন?

২৬. আমড়া কাঠের ঢেঁকি(অপদার্থ) – ছেলেটি একটি আমড়া কাঠের ঢেঁকি, তাকে দিয়ে কোন কাজেরই ভরসা পাওয়া যায় না।

২৭. আঙ্গল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক) – এই ডামাডোলের বাজারে ঠিকাদারি করে সে এখন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।

২৮. আঁতে ঘা দেওয়া (মনে কষ্ট দেওয়া) – তুমি এমন আঁতে ঘা দেওয়া রূঢ় কথা বলছ কেন?

২৯. আদা জল খেয়ে লাগা (সর্বাত্মক চেষ্টা করা) — পরীক্ষা পাশের জন্য তুমি এবার আদাজল খেয়ে লেগেছ মনে হচ্ছে।

৩০. আঠার মাসে বছর(দীর্ঘসূত্রিতা) — তোমার তো আঠার মাসে বছর এই সামান্য কাজ করতেই এতদিন লেগে গেল।

৩১. আদিখ্যেতা (ন্যাকামি স্বভাব) — বাবা মায়ের শাসন না থাকায় ধেড়ে মেয়ের আদিখ্যেতা বড় বেড়েছে।

৩২. আপন পায়ে কুড়াল মারা (নিজের ক্ষতি করা) — লেখাপড়া না শিখে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছো।

৩৩. ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) আমি হলাম ইঁদুর কপালে - আমার ভাগ্যে কি আর লটারির টাকা জুটবে!

৩৪. ইঁচড়ে পাকা (অকাল পক্ব) — দশ বছর বয়সেই সিগারেট ধরেছে ইঁচড়ে পাকা ছেলে আর কাকে বলে।

৩৫. ইতর বিশেষ (ভেদাভেদ) ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ করা ঠিক নয়।

৩৬. ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) — অনেক দিন পর ছেলে বাড়ি এসেছে মা যেন হাতে ঈদের চাঁদ পেয়েছেন।

৩৭. উত্তম মাধ্যম (প্রহার) চোরটিকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩৮. উলুবনে মুক্তা ছড়ান (অস্থানে মূল্যবান জিনিষ ছড়ান) —চোরকে উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ান একই কথা।

৩৯. উনপাঁজুরে (দুর্বল) মেয়েটি উনপাঁজুরে দুপা হাঁটতেই হাঁপিয়ে উঠে।

৪০. এক ঢিলে দুই পাখি (একই সঙ্গে দুক্ষেত্রে সিদ্ধি) চাকরিটাও পেলে আর চিরশত্রু জলিলকে হারিয়ে দিলে— একই ঢিলে দুই পাখি আর কি!

৪১. এক মাঘে শীত যায় না — যেই টাকাটা পেয়েছে, আর দেখা নাই তবে এক মাঘে শীত যায় না, ওকে আবার আসতেই হবে।

৪২. এক চোখা (পক্ষপাতিত্ব) — লোকটা ভয়ানক একচোখা, নিজের লোকদের জন্য এক রকম ব্যবহার, অন্যদের জন্য অন্যরকম।

৪৩. একাদশে বৃহস্পতি (সুসময়) — তোমার তো একাদশে বৃহস্পতি, যাতে হাত দাও তাতেই সোনা ফলে।

৪৪. এলাহি কান্ড (বিরাট ব্যাপার) — ছেলের বিয়েতে সে এক এলাহি কান্ড করে বসেছে- শহরের সবাইকেই দাওয়াত দিয়ে বসেছে।

৪৫. ওষুধ ধরা (কাজ হওয়া) — মনে হয় ওষুধ করেছে- বুড়োটা এবার কথামত কাজ করবে।

৪৬. কথায় চিড়া ভিজা (বিনা ব্যয়ে কাজ না হওয়া) — কথায় কি আর চিড়ে ভিজে কিছু টাকা পয়সা ছাড়, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।

৪৭. কড়ায় গন্ডায় (পুরোপুরি হিসাব) মাসের পয়লাতেই তোমার ধার কড়ায় গন্ডায় শোধ করে দেব।

৪৮. কেঁচে গন্ডুষ করা (পুনরায় আরম্ভ) — সবই ভুলে গেছি- এখন ছোট ভাইকে অঙ্ক করাতে গিয়ে কেঁচো গন্ডুষ করতে হচ্ছে।

৪৯. কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন) — ঠিকাদারী করা কাঁচা পয়সা তো তাই দুহাতে উড়াচ্ছে।

৫০. কপাল ফেরা (অবস্থা ভাল হওয়া) ওর কপালে ফিরেছে- এখন ভাল টাকা-পয়সা উপার্জন করে।

৫১. কান ভারি করা (কুপরামর্শ দেওয়া) — আমার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে ও বড় সাহেবের কান ভারি করেছে।

৫২. কলুর বলদ (পরাধীন) — দিনরাত কলুর বলদের মত সংসারের ঘানি টানছি, তবু কারো নেক নজরে পড়িনি।

৫৩. কথার কথা (মামুলি কথা)— এটা একটা কথার কথা কিছু মনে করো না যেন!

৫৪. কই মাছের প্রাণ (যে সহজে মরে না) — চোরটির কই মাছের প্রাণ, না হলে এত মার খেয়েও মরল না।

৫৫. ক অক্ষর গোমাংস (বর্ণ পরিচয়হীন) ওতো একটা ক অক্ষর গোমাংস লেখাপড়া কিছুই জানে না।

৫৬. কাক ভুষন্ডী (দীর্ঘায়ু) বুড়িটা কাক ভুষন্ডী - না হলে এত দিন ভিটে আগলে পড়ে আছে।

৫৭. কল্কে পাওয়া (পাত্তা পাওয়া) – ঐ বিদ্যা নিয়ে একানে কল্কে পাওয়া যাবে না- অন্য চাকরির চেষ্টা করো।

৫৮. কাঁঠালের আমসত্ব (অসম্ভব বস্তু) – হিংসার পৃথিবীতে শান্তি এখন কাঁঠালের আমসত্বের মতই অসম্ভব বস্তু।

৫৯. কূপমন্ডুক (সীমাবদ্ধ জ্ঞান) – মানুষের চাঁদ বিজয়ের কথাও শোননি- তুমি তো আচ্ছা কূপমন্ডুক।

৬০. কেতাদুরস্ত (বাইরে পরিপাটি) – ও বাইরে কেতাদুরস্ত হলে কি হবে পেটে একটুও বিদ্যা নেই।

৬১. কত ধানে কত চাল (প্রকৃত অবস্থা না জানা) – সংসারে খাওদাও আর ঘুরে বেড়াও তুমি তো জানই না কত ধানে কত চাল।

৬২. কাঠের পুতুল (নির্বাক ও অসাড়) কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? দেখছো না ছেলেটা পুকুরে ডুবে যাচ্ছে।

৬৩. খয়ের খাঁ (ধামাধরা) – ওতো মনিবের খয়ের খাঁ - আমাদের আন্দোলনে সে আসবে না।

৬৪. খাল কেটে কুমীর আনা (বিপদ ডেকে আনা) – ভাইয়ে ভাইয়ের বিবাদে প্রতিবেশী ডেকে নিয়ে এসে খাল কেটে কুমীর এনেছ এখন ঠ্যালা সামলাও।

৬৫. গা ঢাকা দেওয়া (লুকিয়ে থাকা) পুলিশের ভয়ে ও গা ঢাকা দিয়েছে।

৬৬. গায়ের ঝাল ঝাড়া (শোধ দেওয়া) অনেকদিন পর বদমায়েশটার দেখা পেয়ে আচ্ছা করে গায়ের ঝাল ঝেড়েছি।

৬৭. গলগ্রহ (অন্যের উপর নির্ভরশীল) – আমার জমি জিরেত সবই আছে - আমি কোন দুঃখে অন্যের গলগ্রহ হতে যাব?

৬৮. গোকুলের ষাঁড় (বাধাবন্ধনহীন) বাপের হোটেলে খাওদাও আর গোকুলের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াও, বলি লেখাপড়া কি একেবারে ছেড়েই দিয়েছো!

৬৯. গোঁয়ার গোবিন্দ (কান্ডজ্ঞানহীন) – ছেলেটা একটা গোঁয়ার গোবিন্দ - নইলে ছোট ভাইটিকে এরকম করে মারে!

৭০. গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) তুমি ভেবেছো বাবার কাছে মাপ চাইলেই পার পাবে - সে গুড়ে বালি।

৭১. গড্ডালিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যেয়ো না সব কিছু বুঝতে শেখো।

৭২. গৌরচন্দ্রিকা (ভনিতা) ওসব গৌরচন্দ্রিকা রেখে আসল কথাটি কি তা বলে ফেল।

৭৩. গোঁফ খেজুরে (অলস) তোমার মত গোঁফ খেজুরে লোকের উন্নতি আশা করা যায় না।

৭৪. গা তোলা (উঠা) এবার গা তুলুন ট্রেন আসবার সময় হয়েছে।

৭৫. গোবর গণেশ (মুর্খ) তুমি এমন গোবর গণেশ সামান্য কথাটাই বুঝতে পারছো না।

৭৬. গো বৈদ্য (হাতুড়ে) গ্রামে গো বৈদ্যের হাতে পড়ে কত সাধারণ রোগী যে মারা যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে।

৭৭. গভীর জলের মাছ (চালাক) রহিম গভীর জলের মাছ- তার মতলব বোঝা কি আমার সাধ্য।

৭৮. গোবরে পদ্ম ফুল (অস্থানে ভাল জিনিষ) দিন মজুরের ছেলে কিন্তু লেখাপড়ায় এত ভাল - এ যে দেখছি গোবরে পদ্মফুল।

৭৯. ঘোড়ারোগ (মাত্রাতিরিক্ত) রোজ ভাত জোটে না আবার সিনেমা দেখতে হবে - এ যে দেখছি ঘোড়ারোগ।

৮০. ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর (অপদার্থের বড় নাম) – ভাত জোটে না, নামে জমিদার! এ যে দেখছি ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর।

৮১. চোখ টাটান (হিংসা করা) – পরের উন্নতি দেখলে তোমার চোখ টাটায় কেন?

৮২. চোখের চামড়া (লজ্জা) তোমার চোখের চামড়া থাকলে এ মিথ্যা কথাটা আর বলতে না।

৮৩. চিনির বলদ (ভারবহন করে কিন্তু ফল ভোগ করে না) – ও চিনির বলদের মত খেটেই মরছে কিন্তু নিজের পাওনা বেতনটা পর্যন্ত পায় না।

৮৪. চাঁদের হাট (সুখের মিলন) পুত্র কন্যাদের নিয়ে তোমার সংসারে চাঁদের হাট বসেছে।

৮৫. চোখের বালি(অপ্রিয়) – ও চোখে মুখে মিথ্যা কথা বলে ওর চোখের পর্দা বলে কিছু নেই।

৮৬. চোখে ধুলা দেওয়া (ঠকান) মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ পয়সা কামাচ্ছ; কিন্তু এটা চিরদিন চলবে না।

৮৭. চক্ষুদান করা (চুরি করা) সামনের টেবিল থেকে কলমটা কে যে চক্ষুদান করলো ঠিক বুঝতে পারিনি।

৮৮. চোখে সরষের ফুল দেখা (হতভম্ব) – পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়েনি - কাজেই চোখের সরষের ফুল দেখছি।

৮৯. চোখের মনি (প্রিয়) – মায়ের চোখের মনিকে কখনো আড়াল হতে দেন না।

৯০. চোখের মাথা খাওয়া (না দেখা) তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, সামনের দিয়ে একটা অপরিচিত লোক বাসায় ঢুকলো আর তুমি দেখলে না।

৯১. চুল পাকানো (অভিজ্ঞতা) এই কাজ করেই চুল পাকিয়েছি - তোমার কাছে নতুন করে শিখতে হবে না।

৯২. ছেলের হাতে মোয়া (সহজলভ্য) – একি ছেলের হাতে মোয়া - চাইলেই পেয়ে যাবে।

৯৩. ছা পোষা (পোষ্য ভারাক্রান্ত) – ছা পোষা মানুষ আমি, নুন আনতে পান্তা ফুরায়, আমার কি আর বিদেশ ভ্রমণে শখ করলে চলে!

৯৪. ছাই চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন প্রতিভা) ছাই চাপা আগুন কোন দিন ঢাকা থাকে না – ওর যা প্রতিভা একদিন প্রকাশ পাবেই।

৯৫. ছিনিমিনি খেলা (অপব্যয় করা) সমিতির টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে - তা হতে দেব না।

৯৬. ছকড়া নকড়া (সস্তা) বাজারে আজ ইলিশ মাছের ছড়াছড়ি - ছকড়া নকড়া দরে বিকোচ্ছে।

৯৭. জিলিপির প্যাচ (কুবুদ্ধি) তোমার পেটে এত জিলিপির প্যাচ – ক্ষতি আমার করবেই।

৯৮. জগদ্দল পাথর (গুরুভার) নাবালক ভাইপোদের সম্পত্তি দেখা শোন দায়িত্ব জগদ্দল পাথরের মত আমার ঘাড়ে চেপে আছে।

৯৯. টনক নড়া (সজাগ হওয়া) – পরীক্ষা সামনে – এতদিনে তোমার টনক নড়েছে।

১০০. টাকার গরম (ধনসম্পদের অহঙ্কার) – টাকার গরম দেখিয়ে সমাজে যা খুশি করবে তা হতে দেব না।

১০১. টাকার কুমীর (ধনী) লোকটা টাকার কুমীর কিন্তু গরীব দুখীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

১০২. ঠোঁটকাটা (স্পষ্টভাষী) রহিম ঠোঁটকাটা, তাই মুখের উপর যা-তা বলে গেল।

১০৩. ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) তুমি ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ নাকি, আর যে দেখাই পাওয়া যায় না।

১০৪. ডান হাতের ব্যাপার (আহার) - দুপুরে বেরোবার আগে ডানহাতের ব্যাপারটা সেরেই যাই, কখন ফিরবো তার তো ঠিক নেই।

১০৫. ডামাডোল (বিশৃঙ্খলা) যুদ্ধের ডামাডোলে চোরাকারবারিরা দুহাতে পয়সা লুটছে।

১০৬. ঢাক ঢাক গুড় গুড় (কপটতা) – অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় করছো কেন! যা বলবে বলে ফেল।

১০৭. ঢাকের কাঠি (তোষামোদে) কেরানি তো বড় সায়েবের ঢাকের কাঠি যা বলবে তাই শুনবে।

১০৮. ঢাকের বাঁয়া (অকেজো) – ছেলের বিয়ের যোগাড় করেছে মা, বাবাটি তো ঢাকের বাঁয়া।

১০৯. তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত) লোকগুলো সেই সকাল থেকে তীর্থের কাকের মত বসে আছে – কিন্তু যিনি বস্ত্রদান করবেন তার দেখাই নেই।

১১০. তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা (হঠাৎ অতিশয় রাগান্বিত হওয়া) – পাওনা টাকা চাইতেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

১১১. তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) – কত বড় বড় শাসকের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত দুদিনে ভেঙে পড়লো, তার হিসেব কে রাখে।

১১২. তালপাতার সেপাই (রোগা) – ছেলেটি তো তালপাতার সেপাই – কি করে সেনাবাহিনীতে সুযোগ পাবে।

১১৩. তুলসী বনের বাঘ (ভন্ড) – দেখতে সাধুর মত হলে কি হবে, লোকটা আসলে তুলসী বনের বাঘ।

১১৪. দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – দুজনে খুব দহরম মহরম – এমন কি সব সময় এক সঙ্গেই থাকে।

১১৫. দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – এখন টাকা আছে তাই দুধের মাছির অভাব নেই।

১১৬. দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (তুমুল কান্ড) – বিয়ে বাড়িতে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার ঘটে গেল - ছেলের বাবা বিয়ে না দিয়েই বরকে নিয়ে চলে গেলেন।

১১৭. দাঁও মারা (মোটা অঙ্কে লাভ করা) – হঠাৎ চালের দাম বেড়ে যাওয়াই, চালের দোকানদাররা ভাল দাঁও মেরেছে।

১১৮. দুধে ভাতে (ভাল অবস্থায় থাকা) সব মা-বাবাই চায় তার সন্তানেরা দুধে ভাতে থাকুক।

১১৯. ধামাধরা (চাটুকারিতা) – জলিল তো বড় সাহেবের ধামা ধরা - ও কি আর আমাদের সঙ্গে থাকবে।

১২০. ধরাকে সরা জ্ঞান করা (তুচ্ছ জ্ঞান করা) হঠাৎ কিছু কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে বলে ধরাকে তুমি সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছো।

১২১. ননীর পুতুল (শ্রম বিমুখ অপদার্থ) – ছেলেগুলোকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে ননীর পুতুল করে তুলেছ, ওরা জীবন পথে চলবে কি করে!

১২২. নেই আঁকড়া (নাছোড়বান্দা) – পড়েছি নেই আঁকড়াদের হাতে চাঁদা না দিয়ে কি রক্ষে আছে।

১২৩. পটল তোলা (কু ব্যক্তির মৃত্যু) লোকটি সাপের কামড়ে পটল তুলেছে।

১২৪. পরের ধনে পোদ্দারি (পরের টাকায় বাহাদুরি) – পরের ধনে পোদ্দারি সবাই করতে পারে - নিজের টাকা খরচ করে করলে বুঝতাম বাহাদুরি।

১২৫. পুকুর চুরি (ব্যাপক চুরি) – একটু আধটু হলে না হয় বুঝতাম, এ যে পুকুর চুরি - গোটা প্রতিষ্ঠানটাই বেমালুম গায়েব।

১২৬. পোয়াবারো (সুসময়) – মিলের ম্যানেজার অফিসে নেই ছোটকর্তার তো এখন পোয়াবারো।

১২৭. পায়াভারী (অহঙ্কার) এম.এতে ভাল রেজাল্ট করে তোমার পায়াভারী হয়েছে বুঝি।

১২৮. পাথরে পাঁচ কিল (নিরাপদ ও উন্নত অবস্থা) – নিজে মোটা মাইনের চাকরি কর, ব্যবসা থেকে প্রচুর আয় আসছে, তোমার তো এখন পাথরে পাঁচ কিল।

১২৯. পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষীণ প্রাণ) – ওতো পুঁটি মাছের প্রাণ - ওকে ধমক ধামক দিয়ে কি লাভ।

১৩০. ফতো নবাব (নবাবী চালের নির্ধন ব্যক্তি) ওর পোশাক আশাক দেখে ভুলো না ও একটা ফতো নবাব, না আছে চাল না চুলো।

১৩১. বউ কাঁটকী (বৌকে যে জ্বালাতন করে) – বৌটিকে সারাদিন খাটায় - এমন বৌ কাঁটকী শাশুড়ী তো দেখিনি।

১৩২. বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী) বড় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব আর বালির বাঁধ সমান - এই খুশি এই নারাজ।

১৩৩. বক ধার্মিক (ভন্ড) – লোকটি দেখতে সাধুর মত হলে কি হবে আসলে একটা বকধার্মিক - লোকের সর্বনাশ করতে জুড়ি নেই।

১৩৪. বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ) – অফিসে বাঁ হাতের ব্যাপার খুব চলছে - স্বাভাবিকভাবে কোন কাজই হতে চায় না।

১৩৫. বাঘের দুধ(দুস্প্রাপ্য বস্তু) টাকা হলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

১৩৬. বুকের পাটা (সাহস) বয়স কম হলে কি হবে, ছেলেটার বুকের পাটা আছে, না হলে তুফানের মধ্যে এত বড় নদী সাঁতরে পার হতে পারে।

১৩৭. বুদ্ধির ঢেঁকি (বোকা) ও যে বুদ্ধির ঢেঁকি, ওকে দিয়ে এ শক্ত কাজ হবে না।

১৩৮. ব্যাঙের আধুলি (অতি সামান্য ধন) – ব্যাঙের আধুলি পেয়েই এত লাফাচ্ছ – বেশি টাকা পেলে কি করবে ভেবে পাচ্ছি না।

১৩৯. ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব) – ডাকাতকে দেখাচ্ছ পুলিশের ভয়? ব্যাঙের কোনদিন সর্দি হয় নাকি!

১৪০. বিসমিল্লায় গলদ (গোড়ায় ভুল) অঙ্ক মিলবে কি করে, বিসমিল্লায় গলদ করে বসে আছ।

১৪১. বড় মুখ (গর্ব) – বড় মুখ করে এসেছিলাম, ফিরিয়ে দিও না মা!

১৪২. বাগে পাওয়া (কায়দামত পাওয়া) এবার তোমাকে বাগে পেয়েছি - সহজে ছাড়ছিনে।

১৪৩. বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপদ) - পুত্রের মৃত্যু সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই।

১৪৪. ভরাডুবি (সব হারান) পাটের দাম পড়ে যেয়ে ব্যবসায়ের ভরাডুবি হয়েছে – এখন একরকম সর্বস্বান্ত।

১৪৫. ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে দান) – তোমার মত অপদার্থকে অর্থসাহায্য করা আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

১৪৬. ভুষন্ডীর কাক (দীর্ঘায়ু) – ভুষন্ডীর কাক এই বুড়িটা মরেও না, তার রোগ শোকও ভাল হয় না।

১৪৭. ভুঁইফোড় (অর্বাচীন) – রবীন্দ্রনাথের নাটক নির্বাচন না করে ভুঁইফোড় লেখকের নাটক নির্বাচন করেছ কেন?

১৪৮. ভিজা বিড়াল (কপট) ওতো একটা ভিজা বিড়াল, চেহারা শান্ত হলেও পেটে যত শয়তানি বুদ্ধি।

১৪৯. ভিটায় ঘুঘু চরান (সর্বনাশ করা) – তুমি আমার পিছনে লেগেছো - তোমারও ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বো।

১৫০. মাছের মা (নিমর্ম) – তুমি তো মাছের মা, নিজের ছেলের জন্যও তোমার মায়া মমতা নাই।

১৫১. মগের মুল্লুক (অরাজকতা) – এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছ যে যা খুশি তাই করবে।

১৫২. মান্ধাতার আমল (পুরানো আমল) মান্ধাতার আমলের নয় আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর চাষাবাদ করে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করতে হবে।

১৫৩. মিছরির ছুরি (মিষ্টি কথায় তীক্ষ্ণ আঘাত) – তার কথা শোনায় মধুর কিন্তু বুকে বেঁধে - একেই বলে মিছরির ছুরি।

১৫৪. মাকাল ফল (অন্তঃসারশুন্য) – দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, আসলে ও মাকাল ফল, গুণ বলতে কিছু নেই।

১৫৫. মাৎস্য ন্যায় (শোষণ নীতি) এখনও মাৎস্য ন্যায়ের যুগ চলছে - বড় ছোটকে শোষণ করতে দ্বিধা করে না।

১৫৬. রাঘব বোয়াল (অতি লোভী) ওতো একটা রাঘব বোয়াল সুযোগ পেলে সহায় সম্পত্তি সবই গিলে খাবে।

১৫৭. রুই-কাতলা (গণমান্য লোক) এখানে অনেক রুই-কাতলা এসেছিল আমার মত সামান্য লোকের জায়গা হবে কি করে?

১৫৮. লেফাফা দুরস্ত (বাইরে ঠাট) – লোকটা পোশাকে আশাকে লেফাফাদুরস্ত কিন্তু লেখাপড়া একটুও জানে না।

১৫৯. শাঁখের করাত (উভয় সঙ্কট) আমার হয়েছে শাঁখের করাত – এখন হ্যা বললেও বিপদ না বললেও বিপদ।

১৬০. শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ) সামনে মাসে চাকুরি থেকে অবসর নেব, এখন আমার শিরে সংক্রান্তি; তোমার সঙ্গে বসে আড্ডা দেবার সময় নেই আমার।

১৬১. শত্রুর মুখে ছাই (লোকের কুদৃষ্টি এড়িয়ে) শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমার সংসার ধনে জনে ভরা।

১৬২. ষোলকলা (সম্পূর্ণ) জীবনে যা কাম্য সবই পেয়েছেন তিনি– বলা চলে ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে তাঁর।

১৬৩. সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিলন) – যেমন বর তেমন কনে - একেই বলে সোনায় সোহাগা।

১৬৪. সাপে নেউলে (শত্রুভাব) দু ভাইয়ে এখন সাপে-নেউলে ভাব কেউ কারো মুখদর্শন পর্যন্ত করে না।

১৬৫. হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খলা) – অফিসের ফাইলপত্র সব হ-য-ব-র-ল হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রয়োজনের কাগজটি কি এত সহজেই পাওয়া যাবে।

১৬৬. হাতে খড়ি (আরম্ভ) ব্যবসায়ে ছেলেটার হাতে খড়ি দিলাম কিছু করে খেতে হবে তো।

১৬৭. হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা (গোপন কথা প্রকাশ করা) তুমি ভালই ভালই টাকাটা ফেরত দাও না হলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব– তোমার সব গোপন কথাই আমার জানা।

১৬৮. হাতটান (চুরির অভ্যাস) চাকরটার হাত টানের অভ্যাস আছে- জিনিষগুলো আগলে রেখো।

১৬৯. হরিষে বিষাদ (আনন্দে বিষাদ) যেদিন চাকরি পাবার খবর এল তার পরের দিনই বাবা মারা গেলেন – এ যে হরিষে বিষাদ।

১৭০. হস্তীমূর্খ (বোকা) – তুমি একটা হস্তীমুর্খ - দেহ বিরাট হলে কি হবে মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই তোমার।

১৭১. হাড়ে বাতাস লাগা (শান্তি পাওয়া) চোরটা মরেছে; এবার গাঁয়ের লোকের হাড়ে বাতাস লাগবে।

১৭২. হা পিত্যেশ (আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করা) সেই সকাল থেকে তোমার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে আছি আর তুমি এলে কিনা রাত দশটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাগধারা বলতে কি বোঝায় লিখুন।

যে বাগধারাগুলো এই প্রথম জানলেন, তার মধ্য থেকে ১০টি বাগধারা এখানে লিখুন।

৩। নিচের বাগধারাগুলোর ডানে অর্থ লিখুন।

বাগধারা	**অর্থ**	**বাগধারা**	**অর্থ**
বিসমিল্লায় গলদ		অহিনকুল	
হাপিত্যেশ		ওষুধ ধরা	
ইতর বিশেষ		গোঁফ খেজুরে	
কান ভারি করা		অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী	
ছা পোষা		চক্ষুদান করা	
দহরম মহরম		বাঘের দুধ	
অর্ধচন্দ্র দান		লেফাফা দুরস্ত	
পোয়াবারো		মাছের মা	
বিনা মেঘে বজ্রপাত		হাতটান	
খয়ের খাঁ		আমড়াগাছি করা	
আকাশপাতাল		পরের ধনে পোদ্দারি	
অর্ধচন্দ্র দান		হরিষে বিষাদ	

ইউনিট ১২

কারক ও বিভক্তি

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- কারকের সংজ্ঞা ও প্রকৃতির পরিচয় লিখতে পারবেন।
- বিভক্তির পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কারক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

বাংলা ব্যাকরণে 'কারক' একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ। কারক শব্দটির অর্থ, যে কোন কাজ বা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যে কর্তাই ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং কর্তাই কারক এই রকম মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণে শুধু কর্তাই কারক নয়। কর্তা কি করছে, কার সাহায্যে করছে, কোথায় করছে অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের অবলম্বন, উপকরন, হেতু স্থান, কাল ইত্যাদি সব কিছুই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। ক্রিয়া সম্পাদনে ক্রিয়ার সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল ইত্যাদির যে সম্পর্ক রয়েছে ব্যাকরণে তা কারক নামে অভিহিত।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন– সে আগামী কাল সকালে পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরবে। এই বাক্যে ক্রিয়া 'ধরবে'। ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে সে', কি ধরবে? মাছ; কোথায় ধরবে? জাল দিয়ে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ক্রিয়ার সঙ্গে নানা কিছুর সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কগুলিই কারক। ব্যাকরণের পরিভাষায় সম্পর্ককে 'অন্বয়'ও বলা হয়। লক্ষণীয়, বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় সর্বনাম পদের। এগুলোকে নাম পদও বলা হয়।

কারণের সংজ্ঞা

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদের যে সম্পর্ক বা অন্বয় তাকে বলা হয় কারক।

বিভক্তি

বাক্যের শব্দগুলোর নির্দিষ্ট বিন্যাস থাকে। বিন্যাসই সমগ্র বাক্যের অর্থ করে দেয়। দেখা যায় বাক্যের যথাযথ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য বাক্যস্থিত নাম শব্দগুলোর সঙ্গে কখনো কখনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে থাকে। এই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টির নাম বিভক্তি। বাংলা বাক্যের পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক নির্দেশের জন্য এই বিভক্তিগুলির সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অনেক সময় বিভক্তির প্রয়োজন পড়ে না। বিভক্তি না থাকলে শূন্য বিভক্তি (০) ধরে নিতে হয়। যেমন-

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।

এই বাক্যে তিনটি নাম শব্দ আছে – সন্ধ্যা, আকাশ, চাঁদ। আর 'উঠেছে' হল ক্রিয়াপদ। সমগ্র বাক্যটির অর্থ গ্রাহ্যতার জন্য 'সন্ধ্যা শব্দের সঙ্গে 'য়' 'আকাশ' শব্দের সঙ্গে 'এ' যুক্ত হয়েছে। 'য়, 'এ' হল বিভক্তি। চাঁদ-এর সঙ্গে কোন বর্ণ

যুক্ত হয়নি প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু ব্যাকরণ মতে সেখানেও বিভক্তি আছে, তবে তা শূন্য (০)। শূন্য (০) বিভক্তিকে অ-বিভক্তিও বলা হয়। সমগ্র বাক্যটির সজ্জা এই রকম,

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে
সন্ধ্যা+য় আকাশ+এ চাঁদ+০ উঠেছে।

এই বাক্যের বিভক্ত অংশগুলোই (য়, এ, ০) বিভক্তি। তাহলে বিভক্তির সংজ্ঞা হল এইরূপ।

বাক্যে ব্যবহৃত যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি বাক্যের অর্থগ্রাহ্যতায় সাহায্য করে তাদের বিভক্তি বলা হয়।

অনেক সময় বাক্যে বিভক্তির বদলে বিভক্তি স্থানীয় শব্দ ও ব্যবহৃত হয়। এগুলি বিভক্তিরই কাজ করে। যেমন,
আমি ছেলেগুলিকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলাম।
কিংবা, সে ঢাকা থেকে এসেছে।

উপরের দুটি বাক্যে ‘দিয়ে’ ও ‘থেকে’ বিভক্তি স্থানীয় শব্দ। এগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলা হয়। তাহলে অনুসর্গের সংজ্ঞা হল,

বাংলা বাক্যে যে অব্যয়জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে বিভক্তির ন্যায় বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা

বাংলায় অনেক বাক্য রয়েছে যেগুলোতে ক্রিয়াপদ নেই। যেমন,

মাঠে মাঠে অজস্র ফসল।

ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদীতে ভাসমান।

এই জাতীয় ক্রিয়াহীন অনেক বাক্য বাংলায় রয়েছে। ক্রিয়া নেই বলে এই বাক্যগুলোর অন্তর্গত নাম শব্দগুলোর কারকও নেই। সেজন্য বলা হয় বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়। কিন্তু বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্য ঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না এবং বাক্যও অর্থগ্রাহ্য হয় না। উপরের দুটি বাক্যের বিভক্তি তুলে নিলে বাক্যগুলো যথাযথ অর্থ প্রকাশ করবে না। ‘মাঠ মাঠ অজস্র ফসল কিংবা’ ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদী ভাসমান’ বাক্য হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথম বাক্যে ‘এ’ বিভক্তি (মাঠ+এ), দ্বিতীয় বাক্যে ‘তে’ বিভক্তি (নদী+তে) বাক্য দুটির বিন্যাস ও অর্থ ঠিক করে দিয়েছে। ‘গাছের পাতায় রাতের শিশির লেগে আছে’– এই বাক্যেও আমরা দেখছি এর বিভক্তি [গাছ+এর, রাত+এর] ও ‘য়’ বিভক্তি [পাতা+য়] বাক্যটিকে সম্পূর্ণ অর্থগ্রাহ্য করেছে। নতুবা গাছ পাতা রাত শিশির’ কোন বাক্য নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিভক্তি বাক্যের অন্তর্গত শব্দ অর্থাৎ পদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং বাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট করে। সেজন্য বাংলা বাক্য বিভক্তি প্রধান। এর থেকে বাংলা বাক্যে বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। অবশ্য সব সময় বিভক্তি দিয়ে বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশ করতে পারে না, সে সব ক্ষেত্রে বিভক্তির স্থানে বিভক্তি স্থানীয় শব্দগুলো যেমন ‘দ্বারা’ ‘দিয়ে’ ‘কর্তৃক’, ‘হতে’, ‘থেকে, চেয়ে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়ের কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

বাংলা বিভক্তি

বাংলা বিভক্তিগুলি নিম্নরূপ

১) শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি (২) এ-বিভক্তি

৩) 'তে' বিভক্তি ৪) 'কে' বিভক্তি

৫) 'রে' বিভক্তি

এই বিভক্তিগুলোর মধ্যে প্রথম পাঁচটি বাক্যের কারক সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়; শেষেরটি অর্থাৎ 'র' বা 'এর' বিভক্তি সম্বন্ধ পদ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলায় প্রত্যেক কারকের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। বাংলা বিভক্তিগুলি কমবেশি প্রায় প্রত্যেক কারকে ব্যবহৃত হতে পারে। সেজন্য বিভক্তি দিয়ে বাংলা কারক চেনা যায় না, বাক্যের ক্রিয়া পদের সঙ্গে নাম পদগুলোর অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামপদগুলোর সম্বন্ধ স্থির করে বাংলা কারক নির্ণয় করতে হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিভক্তিগুলোর এক বচন রূপ আছে, বহুবচন নেই। বাংলায় একবচনে ও বহুবচনে একই বিভক্তি দেখা যায়। বহুবচনের চিহ্ন জ্ঞাপক কিছু বর্ণ সমষ্টি দেখা যায়, সেগুলি বহুবচনের রূপ মাত্র, বিভক্তি নয়। যেমন–

মানুষ+গুলো+কে = মানুষগুলোকে; এখানে বিভক্তি 'কে', গুলো বিভক্তি নয়।

নদী+গুলো+তে = নদীগুলোতে; এখানে বিভক্তি 'তে'।

প্রত্যেক কারকের জন্য বিভক্তিকে সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো

বিভক্তির নাম	বিভক্তির রূপ
প্রথমা	শূন্য (০), অ
দ্বিতীয়া	কে, রে (এরে)
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক[বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ]
চতুর্থী	কে, রে (এরে) [দ্বিতীয়ার মতো]
পঞ্চমী	হতে, থেকে, চেয়ে [বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ]
ষষ্ঠী	র, এর
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কারক বলতে কি বোঝায়? কারকের সংজ্ঞা দিন।

২. বিভক্তি কাকে বলে? বিভক্তি কেন ব্যবহৃত হয়?

৩. বিভক্তি স্থানীয় শব্দগুলো কি? এগুলোর কি কাজ?

৪. বাংলা ভাষায় বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখুন।

৫. বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়, বিভক্তি প্রধান- কথাটি বুঝিয়ে দিন।

৬. বাংলা বিভক্তিগুলির পরিচয় দিন।

৭. বুঝিয়ে দিন

শূন্য (০) বিভক্তি, অনুসর্গ

পাঠ ২ ঃ কারকের বিভক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- কারক কয় প্রকার ও কি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রত্যেক কারকের সংজ্ঞা ও বিবরণ লিখতে পারবেন।
- বিভক্তিগুলোর প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

কারকের শ্রেণীবিভাগ

পূর্বে জেনেছেন যে, বাক্যের ক্রিয়া পদের সঙ্গে নাম পদের অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সম্পর্ক বা অন্বয়কে কারক বলে। বাংলা বাক্যগুলোতে দেখা যায় এই সম্পর্ক ছয় প্রকারের হতে পারে। সেজন্য কারক ছয় প্রকার। যেমন–

১. কর্তৃ কারক
২. কর্ম কারক
৩. করণ কারক
৪. সম্প্রদান কারক
৫. অপাদান কারক
৬. অধিকরণ কারক

কর্তৃকারক

সংজ্ঞা

বাক্যে যে ক্রিয়া সম্পাদান করে তাকে বলা হয় কর্তা এবং এই কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় কর্তৃকারক।

'উপমা পড়ছে' এই বাক্যে উপমা হল কর্তা।

ক্রিয়াকে 'কে' বা 'কারা' প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্তৃকারক। সাগর দৌড়াচ্ছে – কে দৌড়াচ্ছে? সাগর। সুতরাং 'সাগর' কর্তৃকারক। তারা হাঁটছে – কারা হাঁটছে? তারা। 'তারা' কর্তৃ কারক।

নানা রকম কর্তৃকারক

বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের রীতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যায় বাক্যের কর্তা কয়েক রকম।

ক) মুখ্য কর্তা ঃ যে বা যারা নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বা তাদের বলা হয় মুখ্য কর্তা। যেমন,

শৈলী রান্না করছে।

কৃষকেরা ফসল কাটছে।

এখানে 'শৈলী ও 'কৃষকেরা' মুখ্য কর্তা

খ) প্রযোজক কর্তা ঃ মুখ্য কর্তা যখন অন্যকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করায় তখন মুখ্য কর্তাকে বলা হয় প্রযোজক কর্তা। যেমন,

কৃষক গরু দিয়ে চাষ করায়।

এই বাক্যে 'কৃষক' প্রযোজক কর্তা।

গ) প্রযোজ্য কর্তা ঃ যাকে দিয়ে মুখ্য কর্তার কাজ সম্পাদিত হয় তাকে বলা হয় প্রযোজ্য কর্তা।

মিতা ছোট বাচ্চাটিকে হাটাচ্ছে।

এখানে 'বাচ্চাটি' হল প্রযোজ্য কর্তা।

বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে আরো কয়েক রকম কর্তার রূপ বোঝা যায়। যেমন-

কর্মবাচ্যের কর্তা	–	আমাকে যেতে হবে।
ভাব বাচ্যের কর্তা	–	তার বোধ হয় খাওয়া হয়নি।
কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা	–	ঝড় আসছে। বাড়িগুলো ভেঙে পড়বে।

কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ কর্তৃকারকে সাধারণত শূন্য (০) বা অ-বিভক্তিই ব্যবহৃত হয়। তবে অন্যান্য বিভক্তির ব্যবহারও রীতিসিদ্ধ। যেমন–

কর্তৃকারকে শূন্য (০)

বা অ-বিভক্তি	ঃ	মিতা খেলছে
এ-বিভক্তি	ঃ	শাড়িটি চোরে নিয়ে গেছে।
য়-বিভক্তি	ঃ	ঘোড়ায় গাড়ি টানে।
তে-বিভক্তি	ঃ	পাখিতে ধান খেয়েছে।
কে-বিভক্তি	ঃ	আমাকে যেতেই হবে।
র-বিভক্তি	ঃ	শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হল না।
দ্বারা (অনুসর্গ)	ঃ	তোমা দ্বারা এ কাজ হবে না।
কর্তৃক (অনুসর্গ)	ঃ	নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়েছে।

কর্মকারক

সংজ্ঞা

কর্তা যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকারক বলে।

ক্রিয়াকে 'কি' বা 'কাকে' জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা কর্ম এবং ক্রিয়া পদের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধই কর্মকারক।

সে ফল কিনছে – সে কি কিনছে? ফল। সুতরাং ফল কর্মকারক।

রত্না অর্ককে মারছে – রত্না কাকে মারছে? অর্ককে। 'অর্ক", কর্মকারক।

কোন কোন ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। এর একটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম অন্যটি গৌণ কর্ম। বোঝাই যায়, গৌণ কর্মের চেয়ে মুখ্য কর্মের গুরুত্ব বেশি। মুখ কর্ম দিয়েই ক্রিয়ার কাজ পূর্ণ হয়। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক এবং গৌণ কর্ম ব্যক্তিবাচক বা প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। যেমন,

শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।
এই বাক্যে 'প্রশ্ন' মুখ্য কর্ম, ছাত্র গৌণ কর্ম।

কর্মকারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ
সাধারণত কর্মকারকে কে, রে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে অন্য বিভক্তিগুলোও প্রয়োগ হয়।

কর্মকারকে শূন্য (০) বা অ বিভক্তি– সে বই পড়ে।
কর্মকারকে কে-বিভক্তি – আমার ছেলেকে বকবে না।
কর্মকারকে কে রে-বিভক্তি – তারে ডেকে আন।
কর্মকারকে য়-বিভক্তি – তোমায় আমি চাই।
কর্মকারকে এ-বিভক্তি – বৃথা গঞ্জ দশাননে
কর্মকারকে র-বিভক্তি – আমার দেখা পাবে না।

করণ কারক

সংজ্ঞা

যার দ্বারা বা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে করণ কারক বলে।

'করণ' শব্দের অর্থ উপায় বা সহায়। বাক্যের ক্রিয়াপদকে 'কার দ্বারা' বা কি উপায়ে জিজ্ঞাসা করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা-ই করণ কারক।

নীলু ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। – নীলু কি দিয়ে ঘর সাজায়? ফুল দিয়ে সুতরাং 'ফুল' করণ কারক।

কাঠুরে কুড়াল দ্বারা গাছ কাটে। – কাঠুরে কি দ্বারা গাছ কাটে? কুড়াল দ্বারা। 'কুড়াল' করণ কারক।

করণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ – করণ কারকে সাধারনত দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি তৃতীয়া বিভক্তির (অনুসর্গের) ব্যবহার হয়। তবে অন্য বিভক্তিগুলোরও প্রয়োগ রয়েছে।

করণ কারকে 'দ্বারা বিভক্তি (অনুসর্গ) – তোমাদের দ্বারা দেশের ক্ষতি হবে।
করণ কারকে 'দিয়া' বিভক্তি (অনুসর্গ) – তোমার লোক দিয়ে কাজটা করাবে।
করণ কারকে শূণ (০) বা অ-বিভক্তি – রফিক তাস খেলে।
করণ কারকে এ-বিভক্তি – গ্যাসে গাড়ি চলে।
করণ কারকে য়-বিভক্তি – টাকায় টাকা হয়।
করণ কারকে তে-বিভক্তি – তার কথা যেন মধুতে মাখা

সম্প্রদান কারক

সংজ্ঞা

যার জন্য বা যার উদ্দেশ্যে স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দেওয়া যায় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।

গরীবের মেয়েটিকে ভাত দাও। – এই বাক্যে গরীবের মেয়েটিকে সম্প্রদান কারক।

আধুনিক ব্যাকরণবিদেরা সম্প্রদান কারক স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে এটি কর্মকারকের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। তবু প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক আছে।

সম্প্রদান কারকে কে, রে চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার হয়। অন্য দু'একটি বিভক্তিরও প্রয়োগ রয়েছে।

সম্প্রদান কারকে কে-বিভক্তি - তাঁকে আমার সালাম জানাবে।

সম্প্রদান কারকে রে-বিভক্তি - হে দেবতা, তোমারে করব না পূজা।

সম্প্রদান কারকেএ-বিভক্তি - ঘরহীনে ঘর দাও।

সম্প্রদান কারকে য়-বিভক্তি - তোমায় কেন দিই নি আমি, সকল শূন্য করে।

সম্প্রদান কারকে তে-বিভক্তি - সমিতিতে চাঁদা দিয়েছি।

সম্প্রদান কারকে র-বিভক্তি - আল্লাহর এবাদত কর।

অপাদান কারক

সংজ্ঞা

যা থেকে বা যা হতে ক্রিয়া সম্পদিত হয় এবং ক্রিয়ার বিচিত্র ভাবের প্রকাশ ঘটে তাকে অপাদান কারক বলে।

লাবলু সেদিন ঢাকা থেকে চাঁটগা গিয়েছিল। - এ বাক্যে 'যাওয়া' ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছিল ঢাকা থেকে।

আখ হতে গুড় হয়। - এই বাক্যে গুড় হওয়ার কাজটি সম্পন্ন হয় 'আখ' হতে।

সুতরাং 'ঢাকা' ও 'আখ' অপাদান কারক।

অপাদান কারকে ক্রিয়া সম্পাদনের আরও কিছু নমুনা

স্থান – বাসের ছাদ থেকে সে পড়ে গেল।

জাল – পরশু থেকে বিছানায় পড়ে রয়েছি, খুব জ্বর।

অবস্থা – কোথা হতে আশ্বাস পাব বলে মনে হয় না।

দূরত্ব – ঢাকা থেকে কুমিল্লার দূরত্ব একশ কিলোমিটারের মতো।

তারতম্য – সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

অপাদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ

অপাদান কারকে সাধারনত 'হতে', থেকে, চেয়ে' ইত্যাদি বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গের ব্যবহার হয়। অপরাপর বিভক্তিগুলোর প্রয়োগও অপাদান কারকে রয়েছে।

অপাদান কারকে 'হতে' বিভক্তি (অনুসর্গ) - সরষে হতে তেল হয়।

অপাদান কারকে 'থেকে বিভক্তি (অনুসর্গ) - কোথা থেকে এসেছে

অপাদান কারকে 'চেয়ে বিভক্তি (অনুসর্গ) - ফরিদের চেয়ে মুরিদ বয়সে বড়

অপাদান কারকে শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি - সে একজন জেল পলাতক আসামী।

অপাদান কারকে এ-বিভক্তি - বিপদে মোরে রক্ষা কর।

অপাদান কারকে য়-বিভক্তি - পড়ায় বিরত হয়ো না।

অপাদান কারকে তে-বিভক্তি - জমিতে বেশ ধান পেয়েছি।
অপাদান কারকে কে-বিভক্তি - ছোট মামাকে বড় ভয় পাই।
অপাদান কারকে র-বিভক্তি - জঙ্গলে সাপের ভয় আছে।

অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা

যে আধার বা আশ্রয়কে (স্থান, কাল, অবস্থা ইত্যাদি) অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অধিকরণ কারক বলে।

'বন্যেরা বনেই সুন্দর থাকে। - এই বাক্যে ক্রিয়া সম্পাদনের আধার হল বন। সেজন্য 'বনেই' অধিকরণ কারক।
অধিকরণ কারক তিন প্রকার
১) স্থানাধিকরণ
২) কালাধিকরণ
৩) ভাবাধিকরণ বা বিষয়াধিকরণ

১) স্থানাধিকারণ ঃ টেবিলে বইটি খোলা রয়েছে।
পুকুরে মাছ আছে।
শরীরে বেদনা বোধ করছি।
এখন পৃথিবীর সকল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।
সুন্দরবনে বেড়িয়ে আস।

২) কালাধিকরণ প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে।
গত রাতে ঝড় হয়েছে।
দুই দিনে কাজটা শেষ করব।
এ বছরে ভালো ফসল হবে মনে হয়।
তিন ঘন্টায় বাড়ি পৌঁছালাম।

৩) ভাবাধিকরণ বা বিষয়াধিকরণ
মিত্রা জীববিজ্ঞানে তেমন ভালো নয়।
মুক্তিযোদ্ধারা সাহসে দুর্জয়।
রহমান বেজায় কষ্টে পড়েছে।
বিষয় আশয়ে তার যথেষ্ট আসক্তি রয়েছে।
স্বভাব চরিত্রে ভালো হতে হবে।

অধিররণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার

অধিকরন কারকে প্রায়শ এ, য়, তে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার হয়। তবে অন্য দু'একটি বিভক্তির ব্যবহার হয়। তবে অন্য দু'একটি বিভক্তি ও অনুসর্গের ব্যবহারও দেখা যায়।

অধিকরণ কারকে 'এ'-বিভক্তি - দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি

অধিকরণ কারকে 'য়' - বিভক্তি - পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

অধিকরণ কারকে 'তে'-বিভক্তি - ঘরেতে ভ্রমর এল গুণ গুনিয়ে।

অধিকরণ কারকে শূন্য (০) বা 'অ' বিভক্তি - শুক্রবার কলেজ বন্ধ থাকে।

অধিকরণ কারকে মধ্যে অনুসর্গ - সে ঘরের মধ্যে আছে

অধিকরণ কারকে 'মাজে' অনুসর্গ - তোমার মাঝে সে আপন জনকে খুঁজে পেয়েছি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. কারক কয় প্রকার ও কি কি?
২. কর্তৃকারকের সংজ্ঞা লিখুন এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৩. কত রকম কর্তৃকারক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত দিন।
৪. কর্মকারক কাকে বলে? কোনটি মুখ্য কর্ম আর কোনটি গৌণ কর্ম?
৫. করণ কারকের সংজ্ঞা দিন এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৬. একই রকম মনে হলেও কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারকের মধ্যে পার্থক্য কি? বুঝিয়ে লিখুন।
৭. উদাহরণসহ অপাদান কারকের সংজ্ঞা দিন এবং অপাদান কারকের প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখান।
৮. অধিকরণ কারকের সংজ্ঞা দিন। অধিকরণ কারক কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের অধিকরণের দুটি করে উদাহরণ দিন।
৯. সকল কারকে শূন্য (০) বিভক্তির প্রয়োগ দেখান।

উত্তর

কর্তৃকারকে শূন্য (০) বিভক্তি – অভ্র ঘুমায়

কর্মকারকে শূন্য (০) বিভক্তি – গরু লাঙল টানে

করন কারকে শূন্য (০) বিভক্তি – চোরটাকে লাঠি মার

অপাদান কারকে শূন্য (০) বিভক্তি – ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে

অধিকরণ কারকে শূন্য (০) বিভক্তি – মা তো বাড়ি নেই।

১০. সকল কারকে 'এ' বিভক্তির (৭মী বিভক্তির) প্রয়োগ দেখান-

উত্তর

কর্তৃকারকে এ বিভক্তি – মানুষে কথা কয়

করণ কারকে এ বিভক্তি – জিজ্ঞাসিব জনে জনে।

করণ কারকে এ বিভক্তি – ঘরটি ফুলে ফুলে সাজিয়েছে।

অপাদান কারকে এ বিভক্তি – মেঘে বৃষ্টি হয়

অধিকরণ কারকে এ বিভক্তি – আকাশে চাঁদ উঠেছে।

১১. সকল কারকে 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখান

উত্তর

কর্তৃকারকে তে বিভক্তি – বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।

করণ কারকে তে বিভক্তি – টাকাতে সব হয় না।

অপাদান কারকে তে বিভক্তি – খনিতে কয়লা পাওয়া যায়।

অধিকরণ কারকে তে বিভক্তি – এ বাড়িতে কেউ কি নেই?

১২. নিম্নরেখ শব্দগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন ঃ

নিজের সাধনায় বড় হও — করণে ৭মী

সে কানে শোনে না — করণে ৭মী

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কেন? — কর্তায় ৭মী

গরীবকে সাহায্য কর — সম্প্রদানে ৪র্থী

আমাকে ভিন গাঁয়ে যেতে হবে — কর্তায় ২য়া

জোর হাওয়ায় বাড়িটি নড়ছে — করণে ৭মী

পণ্ডিত পণ্ডিতে তর্ক বেঁধেছে — কর্তায় ৭মী

তুমি কখন এসেছ? — অধিকরণে শূন্য

অনেকেই আমেরিকা যায় — অধিকরণে শূন্য

আল্লাহকে ডাক — কর্মে ২য়া

শুনেছি লোকটি বিলেত ফেরত — অপাদানে শূন্য

ভোরে বাড়ি থেকে বের হলাম — অপাদানে ৫মী

লোকে কি বলবে — কর্তায় ৭মী

লেখাপাড়ায় মনোযোগী হও — অধিকরণে ৭মী

চোখ দিয়ে পানি পড়ে — অপাদানে ৩য়া

ফাগুনের শুরুতে কোকিল ডাকে — কর্তায় শূন্য

সারাটা দিন কলেজ পালিয়ে কোথায় ছিলে ? অপাদানে শূন্য

লীলা রোগে দুর্বল হয়ে পড়েছে — করণে ৭মী

সে বাগানে ফুল তুলছে — কর্মে শূন্য

বশির চমৎকার ফুটবল খেলে — করণে শূন্য

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু — অপাদানে ৭মী

চোরকে বেত মারা হল — করণে শূন্য

চণ্ডীদাসে কয় শুন পরিচয় — কর্তায় ৭মী

ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও — সম্প্রদানে ৪র্থী

তুমি বই পড় — কর্মে শূন্য

চোরের ভয়ে এ ব্যবস্থা নিয়েছি — অপাদানে ৬ষ্ঠী

তোমার খাওয়া হল না — কর্তায় ৬ষ্ঠী

পাগলেতে কি না বলে — কর্তায় ৭মী

১৩. নিম্নরেখ শব্দগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুণ ঃ

ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুনিয়ে

খোকা মাকে জিজ্ঞাসা করে।
এ কলমে ভাল লেখা হয় না।
গগনে গরজে মেঘ
গাধায় পানি ঘোলা করে খায়
বোঁটা খসা ফল গাছে থাকবে কি করে?
ছুরি দিয়ে ফল কাট
পাঁচ দিন ঘুমাতে পারিনি
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়।
রাতভর বৃষ্টি হল।
সে জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েছে।
একবার চোখের দেখা দেখতে চাই
সৎপাত্রে কন্যা দান কর।
তিমি মাছ সাগরে থাকে।
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা।
আজকাল অনেক গাড়ি গ্যাসে চলে।
তর্কে বিরত হও
চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী
তোমার বানীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হযরত।
সাগরতীরে বসে আছি
কাঁচের জিনিস সহজে ভাঙে
পূজার ফুল কে তুলবে?
ছাগলেতে কিনা খায়।
আমি জানি কত ধানে কত চাল হয়।

পাঠ ৩ ঃ সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে একটি বর্ণনা পারবেন।

সম্বন্ধ পদ

সংজ্ঞা

বাক্যস্থিত ক্রিয়া পদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকে না এমন কোন পদের সঙ্গে নাম পদের যে অব্যবহিত সম্বন্ধ দেখা যায় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

আমি তোমার বাড়ি যাব। এই বাক্যে যাব ক্রিয়া পদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'আমি' 'বাড়ি' এই দুটি নাম পদের কিন্তু তোমার পদের সঙ্গে 'যাব' কোন সম্পর্ক নেই; 'তোমার' পদটি 'বাড়ি'র সম্বন্ধীয় এবং বিশেষণজ্ঞাপক। এ কারণে 'তোমার' সম্বন্ধ পদ।

বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধ পদের কোন সম্বন্ধ বা অন্বয় না থাকার কারণে সম্বন্ধ পদ কারক নয়।

সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন-
আমি+র>আমার (মা)
তুমি+র > তোমার (ছোট বোন)
বাড়ি+র > বাড়ির (লোক)
মাথা+র > মাথার (চুল)
জাফর+এর > জাফরের(গাড়ি)
সাগর+এর > সাগরের (ঢেউ)
ক্ষেত+এর > ক্ষেত্রের (চাল)
ডিম+এর > ডিমের (খোসা)
ভোর+এর > ভোরের (কাগজ)
স্থান, কাল, দিক ইত্যাদি বাচক কিছু শব্দের সঙ্গে 'র' বা 'এর' পরিবর্তে সম্বন্ধসূচক 'কার' >কের ব্যবহৃত হয়।

আজি+কার = আজিকার>আজকের (খবর)
কালি+কার = কালিকার > কালকার> কালকের (কথা)
আগে+কার = আগে কার (দিন)
কখন+কারে = কার = কখনকার (ঘটনা)
ভিতর+কার = ভিতরকার (অবস্থা)
পূর্বদিক+কার = পূবদিককার (অংশ)

বাংলা ভাষায় সম্বন্ধ পদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। সম্বন্ধ পদ বিশেষণের মতো ব্যক্তির বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে থাকে। নানা অর্থে সম্বন্ধ পদের প্রয়োগ হয়। কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হল –

১. অধিকার সম্বন্ধ ঃ বাংলাদেশের জলভাগ, আমার বাড়ি, তোমার ঘড়ি।
২. সামীপ্য ঃ পুকুরের পাড়, সাগরের তীর
৩. অঙ্গ ঃ ঘরের ছাদ, শিশুর দাঁত
৪. কার্যকরণ ঃআগুনের তাপ, আঘাতের বেদনা
৫. নিমিত্ত ঃ পরের দুঃখ, বিয়ের সাজ
৬. উৎপাদন ঃ জমির ধান, ফার্মের মুরগি।
৭. গুণ সম্বন্ধ ঃ পাকা আমের মিষ্টতা, রান্না গোসতের স্বাদ
৮. হেতু সম্বন্ধ ঃ বিদ্যার বিনয়, রূপের অহঙ্কার
৯. উপাদান সম্বন্ধ ঃ সোনার হার, পিতলের বাটি
১০. ব্যাপ্তি সম্বন্ধ ঈদের ছুটি, দুই দিনের পথ।
১১. ক্রম সম্বন্ধ ঃ সাতের পৃষ্ঠা, বারোর ঘর

১২. কৃতিত্ব সম্বন্ধ ঃ রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', নজরুলের 'অগ্নিবীণা'

১৩. বিশেষণ সম্বন্ধ সুখের কথা, ভিক্ষার চাল

১৪. অভেদ বা উপমা সম্বন্ধ ঃ হৃদয়ের আসন, শোকের ছায়া।

১৫. কারক সম্বন্ধ ঃ

কর্তা - আমার পড়া

কর্ম - গরীরে সেবা

করণ - লাঠির আঘাত

অপাদান - বাঘের ভয়

অধিকরণ - গ্রামের মানুষ

সম্বোধন পদ

সংজ্ঞা

আহ্বান বা সম্ভাষণ করে কিছু বলা হলে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন পদ বলে।

এই যে করিম, তুমি কোথায় যাচ্ছ। এই বাক্যের বক্তা করিম নামক জনৈক মানুষকে সম্বোধন করছে। সেজন্য করিম সম্বোধন পদ। এই যে, অব্যয় জাতীয় শব্দ। এ জাতীয় বহু সম্বোধন সূচক অব্যয় শব্দ সম্বোধন পদের আগে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ওহে বাপু, কি করছ

হে মানুষ, নিজের কথা ভাবো

ওগো বন্ধু কেমন আছো?

ওরে দুষ্ট, তোর মনে এই ছিল?

কি রে ভাই, আমার কথা একেবারে ভুলে গেলে!

বাংলা ভাষায় একসময় সম্বোধন পদের আগে অয়ি, অরে, আলো, ওলো, গো, লো, হাঁগো, হ্যাঁগা, হ্যাদে ইত্যাদি প্রাচীন অব্যয়গুলো ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় এগুলো ব্যবহার বেশ কমে এসেছে। সম্বোধনের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে উহ্য রেখে শুধু অব্যয় ব্যবহার করেও সম্বোধন বাক্য তৈরি করা যায়। যেমন,

কি, তুমি যাবে?

কি রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

এই, তুই কিন্ত দেরি করবি না।

কই, আমার কথা শুনছ?

হ্যাঁরে, তোদের এখানে কি কোন ভালো মানুষ নেই?

সম্বোধন সূচক অব্যয় বাদ দিয়ে শুধু সম্বোধন পদ দিয়ে বাক্য রচনা আধুনিক বাংলা রীতি। যেমন,

আপা, আমাকে ছুটি দিন।

ভাই, কেমন আছো, তোমাকে বহুদিন দেখিনি

রশিদ, তুমি তো আমার কোন কথা শোন না।

স্যার, একটা কথা শুনবেন

খোদা, তার দিলে রহম দাও।

তৎসম শব্দে সম্বোধন পদে পরিবর্তন হয়; কিন্তু আধুনিক বাংলায় এ রকম ব্যবহার রীতিসিদ্ধ নয়। যেমন-
দীনবন্ধো। তোমার শরম নিলাম
হে মাত: সন্তানকে ভুলে গেলি।

সম্বোধন পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়া পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। সেজন্য সম্বোধন পদও কারক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সম্বন্ধ পদ কাকে বলে? সম্বন্ধ পদের সংজ্ঞা দিন।
২. সম্বন্ধ পদ কারক নয় কেন? বুঝিয়ে দিন।
৩. সম্বন্ধ পদ কোন কোন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৪. সম্বোধন পদের সংজ্ঞা দিন।
৫. সম্বোধন পদও কেন কারক নয় তার কারণ লিখুন।
৬. কয়েকটি সম্বোধন সূচক অব্যয়ের লিখুন।
৭. কোনটি সম্বন্ধ পদ এবং কোনটি সম্বোধন পদ নির্দেশ করুন।
   ক. তোমার ছোট ভাইটিকে বেশ মেধাবী মনে হল।
   খ. পাটের গুদামে আগুন লেগেছে।
   গ. ওরে আজ তোরা ঘরের বাইরে যাবি নে।
   ঘ. শাহাদাৎ, তোমার মনে এই ছিল।
   ঙ. সে তো ননীর পুতুল। একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠেছে।
   চ. একবার তাকে চোখের দেখা দেখতে কাট।
   ছ. নদীর পানি একেবারেই কমে গিয়েছে।
   জ. বদমাশ। তোকে আজ আমি দেখে নেব।
   ঝ. সে আজ কতকালের কথা।
   ঞ.দেখছ না, লোকটা কেমন দৃষ্টিতে তাকাল!
৮. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তির ব্যবহার হয়? ঐ বিভক্তির প্রয়োগে দশটি সম্বন্ধ পদ তৈরি করুন।

ইউনিট ১৩

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- বাক্য সম্পর্কে একটি ধারণা বিবৃত করতে পারবেন।
- বাক্য রচনার মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাক্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাক্যের একটি সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- বাক্য রচনার তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাক্যের দুটি অংশ উদ্দেশ্য ও বিধেয় সনাক্ত করতে পারবেন।

ভূমিকা

ভাষার মৌলিক উপাদান শব্দ। কতকগুলো শব্দ একত্র হয়ে বাক্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছু শব্দ একত্র হলেই বাক্য হয় না। যদি শব্দগুলো দিয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাহলেই তাকে বাক্য বলে। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলে। তাহলে বাক্যের সংজ্ঞার্থ আমরা এভাবে তৈরি করতে পারি।

যে পদ বা শব্দসমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়; সেই পদ বা শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলে।

সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এমন যে বাক্য, তাতে কমপক্ষে কর্তা ও ক্রিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তা ও ক্রিয়া উহ্য থাকতে পারে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে। একটি বাক্যের উদ্দেশ্য এবং অপরটি বিধেয়। যাকে উদ্দেশ্য করে বা যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য এবং যা বলা যায় তা বিধেয়। যেমন– ছেলেটি পড়িতেছে। এখানে ছেলেটি ‘উদ্দেশ্য’ এবং পড়িতেছে ‘বিধেয়’।

বাক্যে ‘উদ্দেশ্য’ প্রথমে ও বিধেয় পরে বসে। বাক্য দীর্ঘ হলে ‘উদ্দেশ্য’ ও ‘বিধেয়’ সম্প্রসারিত হয়। যেমন–

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
মতিনের	ভাই	এসেছে
অত্যাচারি	রাজা	নিহত হয়েছে
যারা পরিশ্রমী	তারা	উন্নতি করে

বিধেয়-এর সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
ঘোড়া	অতি দ্রুত	দৌড়াতে পারে
রেবেকা	ভাল আমগুলো	খেয়ে ফেলেছে
তিনি	যে ভাবেই হোক	আজ আসবেন

আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা

বাক্যের তিনটি গুণ থাকা চাই। এগুলো হচ্ছে– আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা।

আকাঙ্ক্ষা ঃ বক্তার উক্তির সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নতুন নতুন পদের আগমন ঘটে। যেমন "বিপুল সাইকেলে চড়ে ..." ... এটুকু বললে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। কিন্তু 'চড়ে'-এর পরে যদি বলা হয় "স্কুলে যাচ্ছে"- তবে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। পূর্ণাঙ্গ বাক্য আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটায়।

যোগ্যতা ঃ বাক্যের পদগুলির অর্থগত ভাবসঙ্গতি থাকতে হবে। পদগুলি এমন অর্থ প্রকাশ করবে না যাতে যুক্তি, সঙ্গতি ও বাস্তবতার অভাব আছে। যেমন– মানুষেরা মাটিতে সাঁতার কাটে– পদসমষ্টিতে বাক্যের যোগ্যতা নেই। অর্থাৎ এর বক্তব্য পাগলের প্রলাপ বা মুর্খের মত ও অবাস্তব। তাই এটি বাক্য নয়।

আসত্তি ঃ আসত্তি শব্দের অর্থ নৈকট্য। বাক্যের পদগুলি এমনভাবে সাজান থাকে যাতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক থাকে এবং ভাষার নিয়ম অনুযায়ী নৈকট্য থাকে। একটি বাক্য ধরা যাক– 'গতকাল কামাল ঢাকা থেকে ফিরে এসেছে' – এখানে ভাষার নিয়ম অনুযায়ী পদের ক্রম রক্ষিত হওয়াই এটি একটি সার্থক বাক্য। কিন্তু যদি বলা হয় – ঢাকা কামাল গতকাল এসেছে ফিরে" – তাহলে এটি সার্থক বাক্য হবে না। কারণ এখানে পদগুলির নৈকট্যের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নির্ধারিত স্থানে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন

১। শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর --।

২। উদ্দেশ্য কি?

উত্তর --।

৩। বিধেয় কি?

উত্তর --।

৪। আকাঙ্ক্ষা কি?

উত্তর --।

৫। আসত্তি কি?

উত্তর --।

৬। যোগ্যতা কি?

উত্তর --।

আপনার উত্তরগুলো বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাক্য কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।

গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে আমরা তিন প্রকার বাক্য পাই। এগুলো হচ্ছে–

১। সরল বাক্য

২। মিশ্র বা জটিল বাক্য

৩। যৌগিক বাক্য

সরল বাক্য

যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন সে পড়ে, ঘোড়ায় গাড়ি টানে, করিম প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়। বাক্য তিনটিতে সে, ঘোড়ায়, করিম –উদ্দেশ্য এবং পড়ে, গাড়ি টানে, প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায় – বিধেয়।

সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারিত হতে পারে।

মিশ্রবাক্য

কোন কোন বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড বাক্য থাকতে পারে। এই অপ্রধান খণ্ডাংশ মূল বাক্যেরই অংশ। এ ধরনের বাক্যকে মিশ্রবাক্য বলে। যেমন– "সে আসিলে আমি যাইব", "হাত মুখ ধুইয়া খাইতে বসিবে।" এ বাক্যদুটিতে সে আসিলে এবং "হাত মুখ ধুইয়া" অপ্রধান ও খণ্ডাংশ মাত্র।

যৌগিক বাক্য

দুই অথবা দুই-এর বেশি সরল ও মিশ্র সংযোজক অব্যয় দিয়ে যুক্ত করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন– তিনি বাজারে যাবেন ও চাকরকে সঙ্গে নেবেন। এখানে দুটি সরল বাক্য যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীর বাক্যে রূপান্তরের প্রয়োজন হতে পারে। তাই রূপান্তরগুলো ভাল করে লক্ষ্য করুন।

সরল বাক্যের মিশ্রবাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যের একটি অংশকে খন্ডবাক্যে পরিণত করে তবে সে যে প্রভৃতি পদ ব্যবহার করে প্রধান বাকাংশের আশ্রিত বা সাপেক্ষ করে মিশ্রবাক্যে রূপান্তর করা যায়।

সরল – বিদ্বান হলেও তার অহঙ্কার নেই।

মিশ্র – যদিও তিনি বিদ্বান, তবুও তাঁর অহঙ্কার নেই।

সরল – ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।

জটিল – যাদের ধন আছে তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

১। সরল – ভাল ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র – যারা ভাল ছেলে তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

২। সরল – দরিদ্রকে অর্থ দাও।
মিশ্র – যে দরিদ্র তাকে অর্থ দাও।

৩। সরল – ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।
মিশ্র – যাদের ধন আছে তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

মিশ্রবাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

মিশ্রবাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করতে হলে মিশ্রবাক্যের অপ্রধান খণ্ড বাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যেমন–

মিশ্র বাক্য – যাদের বুদ্ধি নেই তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

সরল – বুদ্ধিহীনরাই একথা বিশ্বাস করবে।

মিশ্র – যিনি পরের উপকার করেন তিনি সবার শ্রদ্ধাভাজন।

সরল – পরোপকারী সবার শ্রদ্ধাভাজন।

মিশ্রবাক্য – যারা পরিশ্রম করে তারা জীবনে উন্নতি করে।

সরল – পরিশ্রমীরা জীবনে উন্নতি করে।

মিশ্রবাক্য – যাদের মেধা আছে তারা কাজটি পারবে।

সরল – মেধাবীরা কাজটি পারবে।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে সরল বাক্যের কোন অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে পরিবর্তন করতে হয় এবং সংযোজক অথবা বিয়োজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

সরল – তিনি আমাকে টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।

যৌগিক – তিনি আমাকে টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

সরল – আমি বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করেছি।

যৌগিক – আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষালাভ করেছি।

সরল – অর্থের জন্য বইটি কিনতে পারিনি।

যৌগিক – অর্থ ছিল না তাই বইটি কিনতে পারিনি।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে ঃ

১. বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।

২. অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।

৩. অব্যয় পদ বর্জন করতে হয়।

যৌগিক বাক্য – সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

সরল বাক্য – সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য – বাংলাদেশ একটি দেশ এবং এদেশই আমার জন্মভূমি।

সরল বাক্য – আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ।

যৌগিক বাক্য – চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েছে এবং এদিকে আসছে।

সরল বাক্য – চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসছে।

যৌগিক বাক্যকে মিশ্রবাক্যে পরিবর্তন করতে হলে–

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্যদুটির প্রথমটির পূর্বে যদি 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে তাহলে, তা, তাহা হইলে, তথাপি অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

যৌগিক বাক্য – দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দিব না।

মিশ্র বাক্য – দোষ স্বীকার কর তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দিব না।

যৌগিক বাক্য – তিনি দরিদ্র কিন্তু অত্যন্ত সৎ

মিশ্র বাক্য – তিনি দরিদ্র তথাপি অত্যন্ত সৎ

যৌগিক বাক্য – এ গ্রামে একটি দরগা আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।

মিশ্র বাক্য – এ গ্রামে যে দরগা আছে, সেটি পাঠান যুগে নির্মিত হয়েছে।

মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ড বাক্যগুলি এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয় ববহার করতে হয়।

মিশ্রবাক্য – যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব

যৌগিকবাক্য – সে কাল আসবে এবং আমি যাব

মিশ্রবাক্য – যদিও তার টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।

যৌগিক বাক্য – তাঁর টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে কয় ভাগে বাগ করা যায়? তাদের নাম লিখুন।

২. সরল বাক্য, মিশ্র বাক্য ও যৌগিক বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

৩. সরল, মিশ্র ও যৌগিক বাক্যের একটি করে উদাহরণ লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. বাক্য বলতে কি বোঝায়? একটি সার্থক বাক্যের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক?

২. উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লিখুন।

মিশ্র বাক্য, সরল বাক্য, যৌগিক বাক্য

৩. আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা বলতে কি বোঝায়? বুঝিয়ে লিখুন।

বাচ্য ও উক্তি পরিবর্তন

ইউনিট ১৪

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাচ্য কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- বাচ্য কত প্রকার ও কি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম বলতে পারবেন।

বাচ্য

'বাচ্য' শব্দের অর্থ বক্তব্য। বক্তব্য বিষয়টিতে যখন কর্তা প্রাধান্য লাভ করে, তখন বাক্যটি কর্তৃবাচ্যের যখন কর্মপ্রাধান্য লাভ করে, তখন কর্মবাচ্যের এবং যখন ক্রিয়াপদ প্রাধান্য লাভ করে, তখন ভাববাচ্যের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন–

১. **সেলিনা** স্কুলে যাচ্ছে।
২. পুলিশের গুলিতে **ডাকাত** আহত হয়েছে।
৩. আবুলের বাড়ি **যাওয়া** হলো না।

উপরোক্ত প্রথম বাক্যে কর্তার দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের এবং তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিই বাচ্য।

বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।

বাংলাভাষায় বাচ্য চার প্রকার

ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য, গ. ভাববাচ্য, ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য

কর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয় তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন- অভি বই পড়ছে।

১. কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ সবসময় কর্তার অনুসারী হয়। অর্থাৎ কর্তার যে পুরুষ ক্রিয়া ও সেই পুরুষের হয়ে থাকে। যেমন– শিলা কাজ করছে, সোহাগ খেলা করছে।

২. কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়, ষষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন–
   ক) তাকে খেতে বলেছি।
   খ) শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান।
   গ) রোগী পথ্য সেবন করে।
   ঘ) চোর আমগুলো চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।
   ঙ) কাঠুরে বনে কাঠ সংগ্রহ করছে।

কর্মবাচ্য

যে বাক্যে কর্মেরই প্রাধান্য এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী অর্থাৎ কর্ম যে পুরুষের, ক্রিয়াটিও যদি সেই পুরুষের হয়, তবে তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন– পাহারাদার কর্তৃক চোর ধরা পড়েছে।

১. কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা, কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি ও দ্বারা দিয়া (দিয়ে) কর্তৃক অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন–
   ক) আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়।
   খ) চোরটা ধরা পড়েছে।
   গ) আমাকে আবৃত্তি করতে হবে।
   ঘ) আজ গান শোনা হবে।

২. কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যেমন–
   ক) আসামীকে জরিমানা করা হয়েছে।
   খ) আলমকে ডাক।
   গ) আমাকে আবৃত্তি করতে হবে।

ভাববাচ্য

যে বাক্যে কর্ম থাকে না, ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে।

১. ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হয়ে থাকে। যেমন-
   ক) আমার (কর্তায় ষষ্ঠী) বাড়ি যাওয়া হলো না(নামপুরুষের ক্রিয়া)।
   খ) আমাকে (কর্তায় দ্বিতীয়া) ঢাকা যেতে হবে। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।
   গ) তোমার দ্বারা(কর্তায় তৃতীয়া) এ কাজ হবে না। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।

২. কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহ্য থাকে, কর্মের দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন–
   ক) এ পথে চলা দুষ্কর।
   খ) এবার ওটা যাক।
   গ) কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

৩. মূলক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়ার সংযোগ ও বিভিন্ন অর্থে বাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন–
   ক) এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা অনুচিত।
   খ) এ পথ আমার চেনা নেই।
   গ) মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান।
   ঘ) জিজ্ঞাসিলে কহিবারে পারি, জানো তো স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।

কর্ম-কর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্মকারক কর্তার মতো প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ম কর্তার মনোযোগ ব্যতীত সম্পাদিত হয়, তাকে কর্ম-কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন–
   ক) আম পেকেছে খুব।
   খ) তাঁর বইটি বাজারে বেশ কাটছে।
   গ) অব্যয় বাঁশি বাজায়।
   ঘ) কাপড় ছেঁড়ে।

ঙ) তোমাকে রোগা দেখায়।

সাধারণত প্রাকৃতিক ঘটনামূলক ক্রিয়ার এই বাচ্যের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য ঃ

নিয়ম ঃ কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–

১. কর্তায় তৃতীয়া

২. কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুগামী হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
ক. বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।	ক)বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।
খ) ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।	খ) বিশ্বজগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে।
গ) আনন্দময়ী পুস্তক পাঠ করছে।	গ) আনন্দমীয় কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে।

লক্ষণীয় ঃ কর্তৃবাচ্য ব্যবহৃত তৎসম ক্রিয়াটি কর্মবাচ্য যৌগিক ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য ঃ

নিয়ম ঃ কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে কর্তার ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া নাম পুরুষের হয়। যেমন–

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
ক) আমি কোথাও যাবো না।	ক) আমার যাওয়া হবে না কোথাও।
খ) তুমিই রাজশাহী যাবে।	খ) তোমাকেই রাজশাহীতে যেতে হবে।
গ) তোমরা কখন এলে।	গ) তোমাদের কখন আসা হল।

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য ঃ

কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–

১. কর্তার প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া বা মূল বিভক্তি হয়ে থাকে

ক. কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয় বা শূন্য বিভক্তি হয়ে থাকে।

খ) ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়। যেমন–

কর্মবাচ্য	কর্তবাচ্য
ক) দস্যুদল কর্তৃক গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছে।	ক) দুস্য দল গৃহটি লুণ্ঠন করেছে।
খ) হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়।	খ) হালাকু খা বাগদান ধ্বংস করে।

ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য
ক) তোমাকে পাশ করতে হবে।	ক) তুমি পাশ করবে।
খ) এবার একটি গান করা হোক।	খ) এবার (তুমি) একটি গান কর।
গ) তার যেন আসা হয়।	গ) সে যেন আসে।
ঘ) চা পান করা হোক।	ঘ) (তুমি) চা পান কর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিকে বলা হয়—
ক) কথা ☐ খ) বক্তব্য ☐
গ) বাচ্য ☐ ঘ) ব্যঞ্জনা ☐

২. যে বাক্যে কর্মের প্রাধান্য থাকে, এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী হয় তাকে বলা হয়
ক) কর্তৃবাচ্য ☐ খ) কর্মবাচ্য ☐
গ) ভাববাচ্য ☐ ঘ) কর্ম-কর্তবাচ্য ☐

৩. বাচ্য কত প্রকার-
ক) পাঁচ প্রকার ☐ খ) তিন প্রকার ☐
গ) চার প্রকার ☐ ঘ) দুই প্রকার ☐

৪. বাচ্যান্তর করুন
ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে
—আলেকজান্ডার পারস্য দেশ জয় করেন।
—মহাকবি ফেরদৌসী শাহনামা মহাকাব্য রচনা করেছেন।
—শিকারী বাঘ মেরেছে।
—আমি বইটি পড়েছি।

৫. কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে
—কাফেলা দুস্যদল দ্বারা আক্রান্ত
—স্থপতি ঈসা বুমীর তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে
—মধুসূদন কর্তৃক মেঘনাদবধকাব্য রচিত হয়েছিল
—স্বামী কর্তৃক স্ত্রী বিতাড়িত হয়েছে।

৬. কর্তৃবাচ্য থেকে ভাব বাচ্যে এবং ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করুন
—এবার একটি কবিতা আবৃত্তি হোক।
—আমি একাই খাব।
—আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।
—ধর্মস্থানে বেয়াদবি করতে নেই।

৭. বাচ্যের ব্যবহারে ভুল থাকলে শুদ্ধ করুন ঃ
—তোমার যাওয়া হউক আমি যাওয়া হবে না।
—ছাত্রগণ তোমাদিগকে কর্তৃক ব্যাকরণের পাঠ শোনা হউক।
—শাসন করা তাই সাজে, সোহাগ করে যে।

–আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজে।

–মাতা কর্তৃক একটি কলম দান করা হইয়াছি।

উত্তর

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. গ

পাঠ ২ ঃ উক্তি পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- উক্তির সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তির পার্থক্য কি তা বলতে পারবেন।

কোনো কিছু বলার নাম উক্তি

উক্তি দুই প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি

যে বাক্যে বক্তার নিজের কথাই অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে।

যেমন ঃ

১. বারেক বলল, "আজ সাত দিন যাবৎ আমি টাইফয়েড জ্বরে ভুগছি।"

২. তিনি বলিলেন "আজই আমার কোর্টে যাওয়া দরকার।"

৩. আয়েশা বলল, "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর"।

৪. কপালকুন্ডলা বলিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ, আইস পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

৫. নবীন বলল, "আমি কলেজে যাব"

বক্তার নিজের কথার যথাযথ উল্লেখ না করে যদি অন্য ব্যক্তি নিজের কথায় তা প্রকাশ করে তবে তাকে বলে পরোক্ষ উক্তি।

যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানীতে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে।

যেমন ঃ

১. কালাম বলল যে, সে আজই সাভার যাবে।

২. তনু বলল যে, তার অসুখ করেছে।

৩. অব্যয় বলল যে, তার বাবা-মা দুজনেই দেশের বাইরে আছেন।

৪. অভিন্ন বলল যে, সে ক্রিকেট খেলোয়াড় হবে।

৫. শিলা বলল যে, সে রোজা রাখবে।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম ঃ

১ প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু (“ ”) উদ্ধার চিহ্নের অর্ন্তভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধার চিহ্ন লোপ সাধন করতে হয় এবং উদ্ধার চিহ্ন স্থানে ‘যে’ এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বক্তব্যের মধ্যে বক্তার পুরুষের পবিবর্তন করতে হয়। যেমন ঃ

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আমেনা বলল, “আমার ভাই বাড়ি নেই।”

পরোক্ষ উক্তি ঃ আমেনা বলল যে, তার ভাই বাড়ি ছিলেন না।

২. বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আলিম বলল, “আমার বাবা আজই ঢাকা যাচ্ছেন”।

পরোক্ষ উক্তি ঃ আলিম বলল যে, তার বাবা সেদিনই ঢাকা যাচ্ছেন।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তি কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থ অনুসারী করতে হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ হেলাল স্যার বললেন “কাল তোমাদের ক্লাস ছুটি থাকবে।”

পরোক্ষ উক্তি ঃ হেলাল স্যার বললেন, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।”

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে থাকে।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন
এ	সে	গতকল্য	পূর্বদিন
এখানে	সেখানে	এখন	তখন
ওখানে	ঐখানে	আজ	সেদিন

৫. অর্থ-সংগতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আজাদ বলল, “আমি এক্ষুণি আসছি।”

পরোক্ষ উক্তি ঃ আজাদ বলল যে, সে তক্ষুণি যাচ্ছে।

৬. আশ্রিত খন্ড বাক্যের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সব সময় মূল বাক্যাংশের ক্রিয়ার কালের ওপর নির্ভর করে না। যেমন–

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** ফারুক লিখেছিল, “বগুড়ায় খুব শীত পড়েছে”।
পরোক্ষ উক্তি ঃ ফারুক লিখেছিল যে, বগুড়ায় খুব শীত পড়েছিল।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** জামাল বলেছিল, “আমি বাজারে যাচ্ছি।”
পরোক্ষ উক্তি ঃ জামাল বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।

গ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** মইন বলল, “আমি সিলেট যাব।”
পরোক্ষ উক্তি ঃ মইন বলল যে, সে সিলেট যাবে।

৭. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন–

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

পরোক্ষ উক্তি ঃ শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** বৈজ্ঞানিক বললেন, "চম্বুক লোহাকে আকর্ষণ করে।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ বৈজ্ঞানিক বললেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

৮. প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তি পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খন্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–

প্রশ্নবোধক বাক্য

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** শিক্ষক বলেন, "তোমরা ছুটি চাও?"

পরোক্ষ উক্তি ঃ আমাদের ছুটি চাই কিনা শিক্ষক তা জিজ্ঞেস করলেন।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** মা বললেন, "কবে পর্যন্ত তোমাদের ফল বের হবে?"

পরোক্ষ উক্তি ঃ আমাদের ফল কবে পর্যন্ত বের হবে মা তা জানতে চাইলেন।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** জলি বলল, "তোমরা আগামীকাল এসো।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ জলি তাদের পরদিন আসতে (বা যেতে) বলল।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** তিনি বললেন, "দয়া করে বাইরে আসুন।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ তিনি (আমাকে) বাইরে যেতে অনুরোধ করলেন।

আবেগসূচক বাক্য

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** ফরিদা বলল, "বা"! ফুলটি খুব সুন্দর।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ ফরিদা আনন্দের সঙ্গে বলল যে, ফুলটি খুব সুন্দর।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** বস্তিবাসী মেয়েটি দুঃখের সঙ্গে বলল, "শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. উক্তি বলতে কি বোঝায়? উক্তি কয় প্রকার ও কি কি?

২. উক্তি পরিবর্তনের নিয়মগুলো সংক্ষেপে লিখুন।

৩. যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয় তাকে বলে

ক) উক্তি ☐ খ) বাচ্য ☐

গ) প্রত্যক্ষ উক্তি ☐ ঘ) পরোক্ষ উক্তি ☐

৪. যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানীতে রূপান্তরিতভাবে প্রকাশিত হয় তাকে বলে

ক) বাচ্য ☐ খ) পরোক্ষ উক্তি ☐

গ) উক্তি ☐ ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তি ☐

৫. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু যে চিহ্নে অর্ন্তভুক্ত থাকে তাকে বলে☐

ক) কমা চিহ্ন ☐ খ) দাঁড়ি চিহ্ন ☐

গ) উদ্ধার চিহ্ন ☐ ঘ) যতি চিহ্ন ☐

৬. উদ্ধার চিহ্ন স্থানে কোন্ সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়

ক) সে	☐	খ) কে	☐
গ) যা	☐	ঘ) যে	☐

৭. নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ উক্তিগুলো পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করুন

ক) তনু বলল, "সেকি? আপনি এখনই যাবেন।"

খ) সেনাপতি বললেন, "মহারাজ আমরা থাকতে আপনি কেন যুদ্ধে যাবেন? আজই শত্রুদের বন্দী করে আনব। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের যেতে অনুমতি দিন।"

গ) বাবা বললেন, "পৃথিবী গোলাকার! পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যই ফল মাটিতে পড়ে।"

ঘ) মা বললেন, "অমিত দেরী না করে চলে এস, পড়তে বস। মন দিয়ে পড়ো। আগামীকাল তোমার ইতিহাস পরীক্ষা, মনে নেই?"

ঙ) বড় ভাই বললেন, "আমি একজন আদর্শ মানুষ হতে চাই।"

ছ) সাবেরা বলল, "এবার আমার ঈদের পোশাকটি সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে।"

উত্তর

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. ঘ

ইউনিট ১৫

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- বাংলা সাহিত্যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ও এর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- বিরাম চিহ্ন সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বিরাম চিহ্ন বলতে কি বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কথা বলে। এই যে কথা, আমরা মুখে বলে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি তা কিন্তু লিখেও অন্যকে জানান যায়। দূরের আত্মীয় বা বন্ধুকে আমরা লিখে আমাদের মনের ভাব সম্পূর্ণ জানাতে পারি। আবার যে ভাবনা সরাসরি কাউকে জানাচ্ছি না – অনাগত মানুষ ও কালের জন্যও লিখে যেতে পারি। লিখিত ভাষায়, নিশ্চয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন – আমরা চিহ্ন ব্যবহার করি। এ চিহ্নগুলো দুটো কারণে ব্যবহৃত হয় – (এক) বাক্যের অর্থকে সঠিকভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানর জন্য, দুই– বাক্যটি উচ্চারণ করে পড়লে বাক যন্ত্রকে বিরাম দানের জন্য। আপনারা খেয়াল করেছেন, আমরা একনাগাড়ে কথা বলে যেতে পারি না। মাঝে মাঝে থেকে আমাদের নি:শ্বাস গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া স্বরসঙ্গতিহীন অবস্থায় একের পর শব্দ উচ্চারণ করে গেলে তার অর্থ বোঝা যায় না। এসব কারণে– কথা অন্যের কাছে বোধগম্য ও আমাদের বাগযন্ত্রকে বিরাম দানের জন্য মাঝে মাঝে কথা বলার মধ্যে বিরতি দেই। এই বিরতিগুলোই কথা লেখার সময় অর্থাৎ ভাষাকে যখন আমরা লিখিত রূপ দেই, তখন নানা রকম চিহ্ন দিয়ে বিরতির ইঙ্গিত দেই। কথা বলার সময় শ্বাস গ্রহণের জন্য আমরা থামি, তাকে বলে শ্বাস পর্ব বা breath pause, আগেই বলেছি অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যও আমরা বিরতি দেই – একে বলে সার্থপর্ব বা Sense Pause।

বিরতিচিহ্নহীন নিচের অংশটি পড়ুন

অর্থ হায় রে অর্থ পাতকী অর্থ তুই জগতের সকল অনর্থের মূল জীবনের ধ্বংস সম্পত্তির বিনাশ পিতা পুত্রের শক্রতা স্বামী স্ত্রীতে মনোমালিন্য ভ্রাতা ভগ্নীতে কলহ রাজা প্রজায় বৈরীভাব বন্ধু বান্ধবে বিচ্ছেদ বিবাদ বিসংবাদ কলহ বিরহ বিসর্জন বিনাশ এ সকলই তোমার জন্য সকলের অনর্থের মূল ও কারণই তুমি।

এবারে উপরে উদ্ধৃত অংশটি বিরতিচিহ্নসহ নিম্নে উদ্ধৃত হয়েছে। পড়ে দেখুন বিরতি চিহ্নের কারণে কত সহজে অর্থ বোধগম্য হচ্ছে।

অর্থ? হায় রে অর্থ! হায়রে পাতকী অর্থ? তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা পুত্রের শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য। ভ্রাতা-ভগ্নীতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বন্ধবে বিচ্ছেদ। বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জন, বিনাশ ও সকলই তোমার জন্য। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি।

বাক্যে বিরামচিহ্ন বসালেই চলবে না। উপযুক্ত স্থানে যদি বিরতি চিহ্নের ব্যবহার না হয় তাহলে অর্থ বিপর্যয় ঘটে যায়। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন।

যেখানে সেখানে থুথু না ফেলার জন্য একস্থানে নির্দেশ দেওয়া আছে – এখানে থুথু ফেলিবেন না, ফেলিলে দশ টাকা জরিমানা হইবে।

এ বাক্যটিতে সঠিকভাবে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে। বিরাম চিহ্ন সঠিক স্থানে না বসালে অর্থ কি রকম বদলে যায় দেখুন। যদি এরকম লেখা হয়–

এখানে থুথু ফেলিবেন, না ফেলিলে দশ টাকা জরিমানা হইবে।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় বলুন তো! অর্থ একেবারে বদলে যাচ্ছে না?

এজন্য বিরামচিহ্নের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া দরকার। না হলে অর্থ বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম – বিরাম চিহ্ন কি, এগুলো কেন ব্যবহার হয় ইত্যাদি। ঐ আলোচনাকে সংহত করে বিরাম চিহ্নের সংজ্ঞার্থ আমরা এরকম করে রচনা করতে পারি–

লিখিত বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করার জন্য ছেদ বা বিরাম নির্দেশক যে চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয়, তাকেই বলে বিরাম চিহ্ন।

বাংলা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

বাংলা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল কবিতা। এসব কবিতায় দাঁড়ি ছাড়া আর কোন বিরাম চিহ্নের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি না। অবশ্য দাঁড়ি তাঁরা দুই রকমের ব্যবহার করতেন। যেমন– এক দাঁড়ি [।] ও দুই দাঁড়ি [॥]। প্রথম পংক্তির শেষে এক দাঁড়ি[।] ও দ্বিতীয় পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি [॥] তখনকার কবিরা ব্যবহার করতেন। নিচের উদ্ধৃতিটিতে এক দাঁড়ি[।] ও দুই দাঁড়ির [॥] ব্যবহার লক্ষ্য করুন।

যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যায়॥

আধুনিক কালে বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকে প্রাণবন্ত ও প্রাঞ্জল ও বেগবান করে তোলার প্রয়োজনে বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সার্থকভাবে বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্নের ব্যবহার করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দকে বিদ্যাসাগরই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন এবং গদ্যে ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বাক্যের মধ্যে শ্বাসপর্ব ও সার্থপর্বকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন। বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের এ অসামান্য অবদান চিরস্মরনীয় হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্দিষ্ট স্থানে লিখুন

১. মানুষ কি ভাবে অন্যের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করে।

উত্তর...
.... ।

২. আমরা লিখি কেন?

উত্তর॥..
.... ।

৩. আমরা থেমে থেমে কথা বলি কেন?

উত্তর॥..
.... ।

৪. শ্বাসপর্ব ও সার্থ পর্ব কি? এগুলোর ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?

উত্তর॥..
.... ।

৫. বিরতি চিহ্নহীন একটি বাক্য লিখুন। পরের লাইনে ঐ বাক্যটি লিখে বিরতি চিহ্ন বসান।

উত্তর॥..
.... ।

৬. বিরাম চিহ্নের একটি সংজ্ঞার্থ লিখুন।

উত্তর...
.... ।

৭. বাংলা গদ্যে প্রথম সার্থকভাবে বিরামচিহ্নের ব্যবহার করেন কে?

উত্তর॥..
.... ।

৮. প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কিভাবে লেখা হোত?

উত্তর॥..
.... ।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- বাংলায় ব্যবহৃত বিরতি চিহ্নসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।
- বিরামচিহ্নের ব্যবহার বিধি প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা আগের পাঠের আলোচনায় দেখেছি প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা এক দাঁড়ি[।) ও দুই দাঁড়ির[॥] প্রচলন ছিল। এখনও বাংলায় এক দাঁড়ির [।] প্রচলন আছে, তবে দুই [॥] দাঁড়ির প্রচলন নাই। অন্যান্য যে সব বিরাম চিহ্ন বাংলায় ব্যবহৃত হয় তা সবই এসেছে ইংরেজি থেকে। তবে ইংরেজি থেকে আসলেও বাংলায় এ চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হতে হতে বাংলায় নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এখন আমরা বিরাম চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত হবো।

ক্রমিক নং	বাংলা নাম	ইংরেজি প্রতিশব্দ	আকৃতি	ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য
১.	দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	Full Stop	।	বাক্য সমাপ্তির পর দীর্ঘতম বিরতি। Point indicating the longest pause after the end of sentence.
২.	কমা বা পাদচ্ছেদ	Comma	,	বাক্যের ভেতরে স্বল্পতম সময়ের বিরতি। Point indicating the shortest pause
৩.	সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	কমার চাইতে দীর্ঘ কিন্তু দাঁড়ির চাইতে কম সময়ের বিরতি Point indicating longer pause than comma but shorter pause than fullstop.
৪.	কোলন	colon	ঃ	সেমিকোলন সমান বিরতি Same pause like semi colon.
৫.	জিজ্ঞাসা চিহ্ন বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of Interrogatio n	?	জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হলে এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। Point indicating the question mark
৬.	বিস্ময় চিহ্ন	Exclamatio n mark	!	বিস্ময়বোধ অথবা গভীর অনুভূতিসূচক চিহ্ন Point indicating great feeling.
৭.	ড্যাস	Dash	-	বাক্যের পরবর্তী অংশে গতিসঞ্চার অথবা উদাহরণ সন্নিবেশের জন্য ব্যবহার করা হয়। Mark for some example or statement.
৮.	কোলন ড্যাস	Colon Dash	ঃ-	নির্দিষ্ট উদাহরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। mark for specific example
৯.	লোপ চিহ্ন	Apostrophe	’	অক্ষর লোপ পেয়েছে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। Mark used to show omitted letters
১০.	বন্ধনী চিহ্ন বা ব্রাকেট	Brackets	[{()}]	বিশেষ শব্দাবলী ব্রাকেট চিহ্নিত থাকে Points indicating word within brackets.
১১.	কোটেশন বা	Quotation	“ ”	বক্তার মুখের প্রকৃত কথা উদ্ধৃত হয়েছে বোঝানর

	উদ্ধৃতি চিহ্ন	mark		জন্য ব্যবহৃত হয় Point indicating quotation mark to show exact word of the speaker.
১২.	হাইফেন বা সংযোগ	Hyphen	-	দুই বা ততোধিক শব্দের সংযোগ বোঝানর জন্য ব্যবহার করা হয়। It marks two or more connecting words.
১৩.	বর্জন চিহ্ন	Asterisk	...	কোন অংশ বর্জিত হলে পরপর তিনটি বিন্দু বসে। Point indicating to some left out portions.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বিরাম চিহ্নের বাংলা ও ইংরেজি নাম এবং পাশে বিরাম চিহ্নটি বসান

বাংলা নাম ইংরেজি বিরাম চিহ্ন

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবেন।
- সৃজনশীল রচনায় লেখকদের বিরামচিহ্ন ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

বিরাম চিহ্নের ব্যবহারবিধি

১. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ[।]

বাক্যের মধ্যে বক্তব্য সমাপ্ত হলে অথবা অর্থ সম্পূর্ণ হলে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ বসে। দাঁড়ি ছেদের পূর্ণতা বোঝায়। একটি বাক্যের দাঁড়ির শেষে বক্তা পুনরায় শ্বাস গ্রহণ করেন ও পরবর্তী বাক্য উচ্চারণ করতে থাকেন।

যেমন– সে পড়ে।

করিম খেলা করে।

মৌলি গান গায়।

২. কমা বা পাদচ্ছেদ

বাক্যের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের বিরতি নির্দেশ করে কমা বা পাদচ্ছেদ। এর ব্যবহারের পদ্ধতি লক্ষ্য করুন।

ক] বাক্যে একই পদের একাধিক শব্দ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন–

বিশেষ্য পদ

এবার রক্ষা কর তোমার কুল, মান, প্রাণ।

রেজা, রফিক, রায়হান – সবাই ফুটবল খেলতে গেছে।

বিশেষণ পদ

নীল আকাশ, সবুজ বন, ফুরফুরে হাওয়া – এসব ছেড়ে কি উঠতে ইচ্ছে করে।

সর্বনাম পদ

সে, তুমি, আমি তিনজনেই বিকেলে বেরিয়ে পড়বো।

ক্রিয়াপদ

খেলাম, ঘুমালাম, পড়লাম, বেড়ালাম – এতেই সারাদিন শেষ।

অব্যয়

হা হা, করে হাসলেই সব দু:খ ভুলে যাব ভেবো না।

(২) সমজাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশে থাকলে কমা ব্যবহার করা হয়।

বসতে দিলে, শুতে চায়, শুতে দিলে, ঘুমাতে চায়।

দুই দুষ্ট সমবয়সী, সমান চালাক, সমান পাকা।

খাঁচার পাখি উড়তে চায়, উড়তে দিলে বনের মাঝে হারিয়ে যায়, আর ফিরে আসে না।

(৩) অসমাপিকা ক্রিয়াপদ পরপর বসলে কমার ব্যবহার হয়।

বলে-বলে, বকে-বকে, শেষে হাল ছেড়েছি।

(৪) বাক্যের প্রারম্ভে সম্বোধন থাকলে কমা বসে।

কল্যাণী, ঘর থেকে বইটা এনে দাওতো।

দীপু, তোর বাবা কোথায় রে?

(৫) উদ্ধৃতি চিহ্নের পূর্বে কমা বসে।

তিনি বললেন, “তোমাদের কাছে এমন ব্যবহার আশা করিনি।”

(৬) বাক্যের সূচনায় সুতরাং, বিশেষত, মুখ্যত ইত্যাদি পদের পরে কমা বসে।

সুতরাং, তোমার কোন কথা আমরা শুনবো না।

বিশেষত, তিনি যখন এ গ্রামের মাথা, তাঁকে অমান্য করা যাবে না।

(৭) নামের শেষে উপাধি, পদ পরিচয় ও পেশার উল্লেখ থাকলে কমা বসে

অধ্যাপক আবুল হায়াত, এম.এ. পি.এইচ. ডি

খায়রুল আনাম খান, মুনসেফ, সুনামগঞ্জ।

(৮) ঠিকানা লিখতে
দাদা ভাই স্টোর, ১৪৪ নং, নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫
(৯) অনেকগুলো কার্যকারণ একত্র বসলে কমা থাকে।
'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, শাস্ত্রের বচন।

সেমি কোলন

কমার চেয়ে একটু বেশি কিন্তু দাঁড়ির চেয়ে কম সময়ের জন্য সেমিকোলনে থামতে হয়। শব্দ বা পদের পরে সেমিকোলন বসে না। সাধারণত বাক্যাংশে পরে সেমিকোলন বসে।

দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের নৈকট্য থাকলে।
ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল; কিন্তু দুরন্ত স্বভাবের।

বাক্যগুলোর মধ্যে একই ভাব থাকলে।
দিনকাল ভাল যাচ্ছে না; ব্যবসায়ে প্রতিমাসেই ক্ষতি হচ্ছে।
বছরটা ভাল যাবে; এবারে ভাল ফসল হবে।
প্রবাদ-প্রবচন বাগধারা দিয়ে দুটি বাক্য সংযুক্ত করলে সেমিকোলন বসে।
সমাজে সৎ লোক পাওয়া মুস্কিল; ঠক বাছতে গাঁ উজাড়। এমন সুদর্শন ছেলের সঙ্গে কিনা ঐ কুরূপা মেয়ের বিয়ে; এ যে বানরের গলায় মুক্তোর হার।
সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত না হলে সেমিকোলন বসে।
আগে চাই লেখাপড়া; পরে গান বাজনা।
বাক্যে বৈপরীত্য প্রকাশ করতে সেমিকোলন ব্যবহার হয়।
সে অসুখে ভুগছে; তাই সমিতিতে আসতে পারে না।

৪. কোলন ও কোলন ড্যাশ

উদ্ধৃতি অথবা দৃষ্টান্ত বোঝানর জন্য কোলনের ব্যবহার হয়।
সাধুর উপদেশের মর্মবাণী ঃ মানুষকে ভালবাস।
কারক ছয় প্রকার ঃ যথা– কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

৫. জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন

সংশয়সূচক শব্দ ব্যবহারে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে।
এ কি সেই মোগল সম্রাট শাজাহান? যার ইঙ্গিতে মাত্র গোটা ভারত কেঁপে উঠতো?
প্রশ্নবাচক বা জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যের শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে।
তোমার নাম কি?
তোমাদের গ্রাম আর কতদূর?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

বিস্ময়সূচক বাক্যের পরেও জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে।

ও কি, সকাল বেলাতেই ঝগড়া শুরু করেছো?

জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যে একাধিক শব্দে প্রশ্ন থাকলে প্রতিটি শব্দের পরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে?
সে তাহলে কি? পিশাচ? দেবতা?

৬. বিস্ময়সূচক চিহ্ন

ক] আনন্দ, বিষাদ দু:খ, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি বুঝতে বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।
ও! মরি মরি! কি সুন্দর এই দৃশ্য!
হায়! আমার কপালে এত দু:খ লিখেছ বিধি!

৭. ড্যাস

বাক্যের মধ্যে গতির প্রয়োজনে ড্যাস ব্যবহৃত হয়।
'বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না– আমরা যাব কি করে'?
'চল তোকে ফিরে রেখে আসি – কাপুরুষ'।
প্রত্যক্ষ উক্তি বোঝাতে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়।
'আমার বড় কৌতূহল হইল, বলিলাম – যদি আমরা একবার দেখতে যাই, তাতে কি কোন আপত্তি আছে?'
বাক্যের মধ্যে ভিন্ন প্রসঙ্গ আসলে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার হয়।
'হাত ভেরে চিত হয়ে থাকলেই হল – তাছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।'
উদাহরণ দিতে গিয়ে ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহার হয়।
সমান ছয় প্রকার– দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

৮ লোপচিহ্ন

শব্দ বা পদের মধ্যস্থ কোন অক্ষর লোপ পেলে লোপচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এ চিহ্নের ব্যবহার খুবই কম।
যাব 'খন।
দু'বেলা ভাতই জোটে না – রেডিও কিনবো কি দিয়ে?

৯. ব্রাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন ( ) [ ]

বাক্যে সাধারণত প্রথম বন্ধনী ও তৃতীয় বন্ধনীর ব্যবহার হয়।
নিম্নোক্ত কারণে বন্ধনীর ব্যবহার প্রযোজ্য।
ক] বাক্যের কোন অংশের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে ব্রাকেটের ব্যবহার হয়।
দেশের সর্বত্র আইন আছে (তা রক্ষিত হোক আর না হোক)।
উদ্ধৃতির উৎস দেখাতে গিয়ে বন্ধনী ব্যবহার হয়।
আমি বৃদ্ধ সেজে তোমাদের উপদেশ দিতে চাইনে (আকাঙ্ক্ষা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
যে অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার জন্য।
'যাকে আমরা বিবেক(বিচার শক্তি) বলি, তার ব্যবহার শিখতে হবে।'
নাটকে অভিনয়ের নির্দেশ ব্রাকেটে থাকে।
[হো হো করিয়া হাসিয়া] এখন আর কথা নয় বাবা।

১০. উদ্ধৃতি চিহ্ন

বক্তার বক্তব্য অবিকৃতভাবে তুলে ধরতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার হয়।
শিক্ষক বলিলেন, “ঘন্টা পড়ার পর কোন ছাত্র ক্লাশের বাইরে যেতে পারবে না।”
ভাগিনা বলিল, “মহারাজ পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।”
অন্যের রচনা উদ্ধৃত করলে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করা বিধেয়।
“যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।”
বাক্যের মধ্যে বাগধারা অথবা বিশেষার্থক শব্দ ব্যবহার করলে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে থাকে।
ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয়দিন ইন্দ্র ‘চুরিবিদ্যা’ সপ্রমাণ করিয়া নিবিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে।”

১১. হাইফেন

দুই বা তার চেয়ে বেশি পদের মধ্যে সংযোগ বা সমাস বোঝাতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়।
কত নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত--বন-বনানী- দেখেছি; কিন্তু মন ভরেনি।
কখনও কখনও দুটি শব্দের গভীর সম্পর্কের কারণে সংযোগ চিহ্ন ব্যবহার হয়।
প্রবল জল-তাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা চলিয়া গেল।”

১২. বর্জন চিহ্ন [....]

রচনার অংশবিশেষ বর্জন করা হলে সেখানে বর্জন চিহ্নের প্রয়োগ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্দিষ্ট স্থানে লিখুন।

১. নিচের বাক্যগুলোতে দাঁড়ি বসান।

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ করিয়া নড়িত দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত

২. নিচের বাক্যগুলোতে যথাস্থানে কমা বসান।

চাল ডাল মাছ সব্জী – সবই কিনেছি। তারা বর্বর হলে কি হবে দিল তাদের সাচ্চা খাঁটি সোনার মত। দলের একজন বলিল ওহে হরি ভুষণো পোয়ালার দরুণ কলা বাগানটা তোমার কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

৩. নিচের বাক্যগুলো জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসান।

তোমার নাম কি বাড়ি কোথায় কি জন্য এসেছো এরা কারা কি চায় তারা কথা বলছো না কেন তোমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে

৪. উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার করুন

রাত পৌহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

কর্তা বললেন পুকুরের সব মাছ এখনই জাল দিয়ে ধরে ফেল।

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, দেখ দেখি বোন। যদি কোন বাদশাহ কিংবা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

১. আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত।

২. চাল, ডাল, মাছ, সব্জী – সবই কিনেছি। তারা বর্বর হলে কি হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মত। দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভুষনো গোয়ালার দরুণ কলা বাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

৩. তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কি জন্য এসেছো? এরা কারা? কি চায় তারা? কথা বলচো না কেন? তোমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে?

৪. "রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?"

কর্তা বললেন, "পুকুরের সব মাছ এখনই জাল দিয়ে ধরে ফেল।" আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, "দেখ দেখি বোন। যদি কোন বাদশাহ কিংবা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।"

বিরতিচিহ্ন প্রয়োগের কিছু নমুনা

১. তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে মুখস্থর বুক ধড়াস সন্ধ্যেবেলা ঘাড়ে চেপে বসেনি সেজদাদা বলতেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুরের সব পেড়োরা গড়গড় করে আওড়ে চলছে () আমি হই উপরে () তিনি হন নিচে তখনও বি এ ডি ব্যাড এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছায়নি।

উত্তর

তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে মুখস্থর বুক ধড়াস সন্ধ্যেবেলা ঘাড়ে চেপে বসেনি। সেজদাদা বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুরে সব পোড়োরা গড়গড় করে আওড়ে চলেছে () আমি হই উপরে, () তিনি হন নিচে, তখনও বি এ ডি ব্যাড, এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছায়নি।

২. কী হইল তোমার বিবি

রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বসে ধান দিয়ে কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

উত্তর – কি হইল তোমার বিবি?

রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

ধান দিয়ে কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

৩. আজরের স্ত্রী খড়গ হস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন দেখিতেছিস ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম দেখিতেছিস তিনটি পুত্রের রক্তে এই খড়গ রঞ্জিত করিয়াছি পরপর আঘাতে স্পষ্টত: তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে পামর নিকটে আয় চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি

উত্তর

আজরে স্ত্রী খগড় হস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন "দেখিতেছিস? ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম! দেখিতেছিস? তিনটি পুত্রের রক্তে এই খড়গ রঞ্জিত করিয়াছি। পরপর আঘাতে স্পষ্টত: তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর নিকটে আয়। চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।"

৪. হু এসব কি লেখা হচ্ছে শ্লেটে সতে ধরে নিয়ে আয়তো দুজনকে কান ধরে নিয়ে আয়

যে ভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল এবং যেভাবে বিপন্ন মুখ সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরু মহাশেয়র কাছে যাইতেছিল তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল

গুরু মহাশয় বলিলেন হাসে কে হাসচো কেন খোকা এটা কি নাট্যশালা অ্যা এটা নাট্যশালা নাকি।

উত্তর

হুঁ এসব কি লেখা হচ্ছে শ্লেটে? – সতে, ধরে নিয়ে আয়তো, দুজনকে, কান ধরে নিয়ে আয়!

যে ভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটে লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্ন মুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাটশালা? অ্যা? এটা নাট্যশালা নাকি?

৫. জেল খানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর

চন্দরা কহিল একবার আমার মাকে দেখিতে চাই

ডাক্তার কহিল তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায় তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।

চন্দরা কহিল মরণ

উত্তর

জেল খানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর"?

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব"।

চন্দরা কহিল, "মরণ!"

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বিরাম চিহ্নের একটি সংজ্ঞার্থ লিখুন। বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি?

২. তিন প্রকার বিরাম চিহ্নে প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন।

৩. নিচের অনুচ্ছেদগুলিত যথাযথ বিরামচিহ্ন দিন।

১. অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল বাবু তোমার লড়কী কোথায় গেল

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙ্গাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্ত:পুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্ধিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে খিসমিস কোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল সে কিছুতেই লইল না দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল

২. অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল কবে যাবি রে আসবি নে আর কখনো

রানীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল বলিল তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ এমন নদী এমন মাঠ কোথাও নেই সেই গাঁ চেড়ে তুই যাবি কি করে

৩. ঘরে কিছু নেই ভাগাভাগি লুটালুটি আর স্থান বিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ দৃষ্টি বাইরের পানে মস্ত নদীটার ওপারে জেলার বাইরে প্রদেশেরও হয়তো বা আরো দূরে

৪. কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছলছল খলখল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই

৫. ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল অ্যা

মা আবার ডাকিলেন ওরে ফটিক বাপধন রে

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি

৬. আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই এমন কি এ ক্ষেত্রে দাতা কর্ণেরও অভাব নেই এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে সেখানে থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে

৭. এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে করবে কে প্রকাশক না ক্রেতা প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে সে ঝুঁকিয়া নিতে নারাজ এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ কিন্তু বই কিন কেউ তো কখনও দেউলে হয়নি

৮. সে ঘরে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল সর্বজয়া বলিল এলে এসো ভাত তৈরী খেয়ে আমায় উদ্ধার করো তারপর আবার কোন দিকে বেরুতে হবে বেরোও

পাঠ ১ ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত বানান সংস্কারের বিশেষ দিক

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বানান সংস্কারের উদ্‌যোগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়মগুলো বলতে পারবেন।
- প্রস্তাবিত নিয়মগুলোর ত্রুটি নির্দেশ করতে পারবেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যের পুঁথির লিপিকারেরা বানানের ক্ষেত্রে ছিলেন স্বৈরাচারী মনোভাবের অধিকারী– স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্বাদ তারা, এক্ষেত্রে অন্তত, পুরোটাই ভোগ করতে চাইতেন। তাদের এ মনোভাবের ধারাবাহিকতার সুবাদে বাংলাভাষী মানুষেরা বানান সম্পর্কে সতর্ক হবার সুযোগ পাননি বা প্রয়োজনও বোধ করেননি। কিন্তু এ দেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর এবং অভিধান সংকলনের প্রয়োজনে বাংলা বানানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবার একটি সম্ভাবনা দেখা গেল। তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তেমন সমস্যা ছিল না– কারণ সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন ও অঙ্কুশ দুটোই সর্বদা সজাগ ছিল। সমস্যা দেখা দিল অতৎসম শব্দ অর্থাৎ অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ নিয়ে। ঐসব উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণ শব্দ আমাদের সাহিত্যে ঢুকে পড়লো স্রোতের মত– আহুত, অনাহুত উভয়ভাবেই। কিন্তু ঢুকলো নানাজনের হাত দিয়ে নানান চেহারা নিয়ে– ফলে অতৎসম শব্দের বানানে শৃঙ্খলা ঘুচে গেল প্রায়। এ সমস্যা অনুধাবন করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেন বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠনের। তাঁর পরামর্শক্রমে ১৯৩৫ সালে রাজশেখর বসুকে সভাপতি ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি’ গঠিত হয়। বানান-সংস্কার সমিতির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, বিধু শেখর ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মুজমদার, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সমিতির একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সমিতি নানা শ্রেণীর লোকের, যাদের মধ্যে প্রেসের কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিও ছিলেন মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে বানান সংস্কারের জন্য যে প্রস্তাব পেশ করেন, তা পুস্তিকা আকারে ১৯৩৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এক বছরের মধ্যে পুস্তিকাটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতির প্রস্তাবসমূহ সর্বমহলে সাদরে গৃহীত হয়নি– তৈরি করেছে নানামুখী বিতর্ক, তাতে অংশগ্রহণও করেছেন নানান ধরনের লোক। সমিতির প্রভাবশালী সদস্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় সহ আরো অনেকেই ঐ বানান-রীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ পণ্ডিত বানান-সংস্কার সমিতিরি সঙ্গে কোথাও কোথাও দ্বিমত পোষণ করলেও তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেননি। আসুন এবার ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতির প্রস্তাবিত নিয়মগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, তারপর সেগুলোর অন্তরত্রুটি ও বিতর্ক সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করবো।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব –রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না, যথা– অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, সর্ব।

২। সন্ধিতে ঙ-স্থানে অনুস্বার- যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ বিধেয়, যথা– 'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন, অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ।

৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত হবে না, যথা– 'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪। হস্‌-চিহ্ন ঃ শব্দের শেষে সাধারণত হস্‌চিহ্ন দেয়া হবে না, যথা– 'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্‌-চিহ্ন দেয়া যেতে পারে। হ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা– 'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্‌-চিহ্ন দেয়া উচিত যথা– 'শাহ, তখ্‌ত, জেমস, বণ্ড। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলবে, যথা– যদি উপান্ত্য, স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যথা– 'কট্‌কট্‌, খপ্‌, সার্‌'।

বাংলায় কতকগুলো শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা– গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষে অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা– অচল, গভীর, পাঠ, কক, করিস, করিলেন। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হবে কি হবে না তা বুঝাবার জন্য কেউ চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্‌-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত-উচ্চারণ হবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা– বাই-ল। কিন্তু প্রভেদরক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্‌- চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়।

৫। ই ঈ উ ঊ- যদি মূল সংস্কত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসম শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে, যথা– কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব্বা কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব। কিন্তু কতকগুলো শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হবে, যথা– নীলা(নীলক), হীরা(হীরক), দিয়াশলাই(দীপশলাকা), খিল(কীল), পানি(পানীয়); চুল(চূল), তাড়ু(তর্দূ, জুয়া(দ্যুত)।

(বর্তমানে বাংলা দীর্ঘস্বর বর্জন করে হ্রস্বস্বর ব্যবহারের প্রবণতা প্রবল। এসব শব্দে বর্তমানে কেবল হ্রস্ব ই-কার ও হ্রস্ব উ-কার ব্যবহৃত হচ্ছে।)

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হবে, যথা– কলূনী, বাহিনী, কাবুলী, কেরাণী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলো শব্দে ই হবে, যথা– ঝি, দিদি, বিবি; কচি, মিহি, মাঝারি, চল্‌তি। পিসী, মাসী, স্থানে বিকল্পে পিসি মাসি লেখা চলবে।

(এসব শব্দে বর্তমানে কেবল ই-কার ব্যবহৃত হয়।)

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হবে যথা– বেঙাচি, বেজি, কাঠি, সুচি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি।

৬। জ য ঃ এই সকল শব্দে য না লিখে জ লেখা বিধেয়, যথা– কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া জোত, জোয়াল।

৭। ণ, ন – অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হবে, যথা– কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড চলবে যথা– ঘুণ্টি, লুণ্ঠন, ঠাণ্ডা।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলবে। (বর্তমানে 'রাণী' বানানটি অচলিত)।

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি ঃ সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেয়া যেতে পারে, যথা– কাল, কালো, ভাল, ভালো, মত, মতো, পড়ো, পড়ো(পড়ুয়া বা পতিত)।

এ সকল বানান বিধেয়– এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল, (চাউল, ছাত, গতি), ডাল, (ডাইল, শাখা)

৯। ং ঙ ঃ 'বাঙ্গালা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি 'বাংলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই চলবে। হসন্ত-ধ্বনি হলে বিকল্পে ং ঙ বিধেয়, যথা– রং, রঙ, সং, সঙ, বাংলা বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা– 'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাই হোক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমন, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখলে আপত্তির কারণ নেই। রং-এর অপেক্ষা রঙের লেখা সহজ। রঙ্গের লিখলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসবে না, কারণ রঙ্গ ও রং-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু রং ও রঙ সমান।

১০। শ ষ স ঃ মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্‌ভব শব্দে শ, ষ বা স হবে, যথা আঁশ(আংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য) মশা(মশক), পিসী (পিতৃঃ স্বসা), কিন্তু কতকগুলো শব্দে ব্যতিক্রম হবে, যথা– মিন্‌সে (মনুষ্য), সাধ(শ্রদ্ধা)। sh স্থানে স, sh স্থানে শ হবে, যথা– আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্‌পিয়র। কিন্তু কতকগুলো শব্দে বিকল্পে ব্যতিক্রম হবে, যথা– ইস্তাহার (ইশতিহার), গোমস্তা(গুমাশতাহ্‌), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীস্ট, খ্রিষ্ট (Cshrist)।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুটি বর্জন করলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সহজ হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্‌ভব শব্দে মূল অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহু প্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতি সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতগুলো শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানানই দেখা যায়, যথা– সরবত, শরবত; সরম, শরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হবে, যথা– করিস, ফরসা(ফরশা), সরেস(সরেশ), উসখুস(উশখুশ)।

১১। ক্রিয়াপদ ঃ সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান প্রভৃতি অথবা বিকল্প 'করানো, পাঠানো' বিধেয়। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল। বিকল্পে ঊর্ধ্ব কমা বর্জন করা যেতে পারে, এবং লাম বিভক্তি স্থানে লুম বা লেম লেখা যেতে পারে।

হ-ধাতু হয়, হন, হও, হস, হই। হচ্ছে, হয়েছে। হক, হন, হও, হ; , হচ্ছিল, হয়েছিল; (হবো, হবে। হেয়, হস, হতে, হয়ে হলে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু ঃ খায়, খান, খাও, খাস, খাই; খেয়েছে, খাক, খান, খাও, খা, খেরে, খেলাম, খেত, খাচ্ছিল, খেয়েছিল, খাব (খাবো), খাবে, খেয়ো, খাস, খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু ঃ দেয়, দেন, দাও, দিন, দিই, দিচ্ছে, দিয়েছে, দিক, দিন, দাও, দে; দিলে, দিলা,, দিত, দিচ্ছিল, দিয়েছিল; দেব(দেবো), দেবে, দিও, দিস, দিতে, দিয়ে, দিলে দেবার, দেওয়া।

ধু-ধাতু ঃ শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই; শুচ্ছে, শুয়েছে, শুক, শুন, শোও, শো; শুল, শুলাম, শুত শুচ্ছিল, শুয়েছিল; শোব(শোবো), শুয়ো, শুস; শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্‌-ধাতু ঃ করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে, করেছে, করুক, করুন, কর, কর্‌। করলে, করলাম। করত। করছিল। করেছিল। করব(করবো), করবে। করো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্‌-ধাত ঃ কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটছে। কেটেছে, । কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্‌। কাটলে, কাটলাম, কাটত। কাটছিল। কেটেলিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটা।

লিখ্‌-ধাতু ঃ লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্‌। লিখলে, লিখলাম। লিখিত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব(লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখরে, লেখবার, লেখা।

উঠ্‌-ধাতু ঃ ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্‌। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠি। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা ধাতু ঃ করায়, করান, করাও করাস,করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম, করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করারে, করাবার, করান (করানো)।

১২। **কতকগুলি সাধু মন্দের চলিত রূপ ঃ** কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর, প্রভৃতি শবগুলি সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্য প্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তার সাধু রূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয় যথা– পিছন, পিতল ভিতর, উপর। যার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা– কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উন্ন, পুরন।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a এবং f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নেই। অল্প কয়েকটি নতুন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করলে মোটামুটি কাজ চলতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নে বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নেই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হলেই লেখার কাজ চলবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলে আসছে সে-সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা– কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড।

১৩। **বিবৃত অ (cut-এর u) ঃ** মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা-ক্লাব (club), বাস্‌(bus), বাল্‌ব্‌(bulb), সার্‌(sir), থার্ড(third), বাজেট(budget), জার্মান(German), কাটলেট(cutlet), সার্কাস(circus), ফোকাস(focus), রেডিয়ম(radium), ফসফরাস(phosphorus), হিরোডোটস(Herodotus)।

১৪। **বক্র আ(বা বিকৃত এ cut-এর a)** মূল শব্দের বক্র আ থাকলে বাংলায় আদিতে ‘অ্যা’ এবং মধ্যে ‘্যা’ বিধেয়, যথা– অ্যাসিড (acid), হ্যাট(hat)।

এইরূপ বানানে ‘্যা’-কে য-ফলা+আ-কার মনে না করে একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যেতে পারে,

১৫। **ঈ উ ঃ** মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ উ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ উ বিধেয়, যথা– সীল (seal), ঈস্ট(east), উস্টার (worcester), স্পূল(spool)।

১৬। fv-f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা– ফুট (foot), ভোট(vote)। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f-এর তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হবে, যথা– ফন(von)

১৭। w-w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা– উইলসন(wilson), উড(wood), ওয়ে(way)।

১৮। য় ঃ নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। ‘মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটার’ প্রভৃতি বানান চলতে পারে, কারণ য় লিখলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর ‘হার্ডওয়ার’ (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯। s.sh- ১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। st- নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নতুন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা– স্টোভ(stove)

২১। z-z স্থানে জ বা জ বিধেয়।

২২। হস্‌-চিহ্ন - ৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের কতিপয় নিয়মের সমালোচনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়মের প্রথম নিয়মটি নিয়ে সেকালে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। সংস্কৃতি পণ্ডিতেরা রেফ-এর এর পর দ্বিত্ব প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন এবং তাঁরা প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন এ-নিয়মের

বিরুদ্ধে; যাদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ এ-নিয়মটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে, এতে করে বাংলা ভাষার মুদ্রণ সৌকর্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লিখতে গিয়ে অহেতুক বিলম্বের অবসান ঘটেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানের নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মটি মূলত সংস্কৃত শব্দ ভান্ডারের অন্তর্গত। সংস্কৃতে বিকল্প ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ নিয়মটি নতুন করে রচনার ফলে যেখানে সচরাচর অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর, সঙ্গম সঙ্ঘাত লিখিত হতো সেখানে বিকল্প বানানরীতি অহংকার, ভয়ংকর, সংগম, সংঘাত লিখিত হতে লাগলো– এতে জটিলতা বাড়লো বই কমলো না। এখন আমাদের চোখে পড়ে একই বানানের দুটি ভিন্নরূপ ঃ গঙ্গা ও গংগা, বঙ্গ ও বংগ, সঙ্গ ও সংগ – যা সব সময় সকলে অনুসরণ করতে বা কেউ লিখলে শুদ্ধ বলে মানতে চান না।

চতুর্থ নিয়মে বলা হয়েছে ‘শব্দের শেষে সাধারন হস্-চিহ্ন দেওয়া হবে না। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি বিদেশী শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন ওস্তাদ, চেক, ডিশ, পকেট, টি-পট, মক্তব ইত্যাদি। এ বিধানের পরে অবশ্য সাবধান করা হয়েছে ‘ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, শাহ্ তখত্, জেম্স্ বণ্ড ইত্যাদি। তবে সুপ্রচলিত শব্দে হস্ চিহ্ন না দিলেও চলবে - যেমন আর্ট, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ। কিন্তু কোন শব্দটি সুপ্রচলিত আর কোনটি নয়, তা নির্ণয় করা দুরূহ।

উচ্চ শিক্ষিত লোকের কাছে ‘স্পঞ্জ’ হয়তো উচ্চারণে কোন সমস্যা নয় কিন্তু এর অনুসরণে কোন নবীন বিদ্যার্থী যে খঞ্জ কে খঞ্জ্ পড়বে না তার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং সর্বত্র এ নিয়মটি কার্যকরভাবে প্রযোজ্য নয়।

পঞ্চম নিয়মটি সম্পর্কে বানান সমিতি ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। বানান সমিতিরি প্রভাবশালী সদস্য সুনীতিকুমার চট্টোচাপাধ্যায় এবং সমিতিরি প্রস্তাবক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল এ বিষয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল হ্রস্ব-ইকারের দিকে আর সুনীতিকুমারের ছিল দীর্ঘ-ঈ-কার প্রীতি। সুনীতিকুমারের লেখায় যেখানে পাওয়া যায় ‘একটী, কলমটী, গাছটী, বা খুঁটিটী’ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ‘টী’কে সব সময় ‘টি’ হিসেবেই লিখেছিলেন। এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা বানান-সমিতির বিধানেই ছিল। তাঁরা বলেছিলেন “যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসমদৃশ শব্দে ‘ ু বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে; যথা কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চুন, পূব অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি শিষ, উনিশ, চুন পুব। অর্থাৎ ই-কার, ঈ-কার, উ-কার ও ঊ-কার নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে তার কোন সুস্পষ্ট বিধি ব্যবস্থা দিতে তাঁরা ব্যর্থ হলেন। ফলে জটিলতা জটিলতর হয়ে দেখা দিল।

সংস্কার সমিতির ষষ্ঠ নিয়ম ‘জ’ ও ‘য’ নিয়ে। কিন্তু সেখানেও সর্বত্র সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বস্তুত ঐ বর্ণ দুটির উচ্চারণে কোন ধ্বনি-পার্থক্য বাংলাতে নেই। ফলে জাঁতা, জো, জোড়া লেখা হবে নাকি যাঁতা, যো, যোড়া লেখা হবে তা নির্দিষ্ট নয়।

একই ধরনের সমস্যা থেকে গেছে ‘ণ’ ও ‘ন’ নিয়ে সংস্কার সমিতির সপ্তম বিধানে। যেমন বর্ণ>বরন, প্রাণ>পরান, বর্ষণ> বরিষন, কাণ>কানা, কোণ> কোনা, দক্ষিণ >দক্ষিনা, পুণ্য > পুন্যি, মাণিক্য >মানিক শব্দগুলোতে বিকল্প বানানে কোন সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয়নি।

সংস্কার সমিতির দশম, নিয়মটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও সুচিন্তিত। শ, স ও ষ নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে বাংলা বানানে, তা অনেকখানি প্রশমিত হয়েছে। বিধানটিতে বলা হয়েছে ‘মূল সংস্কৃত অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা– আঁশ<অংশু, আঁষ<আমিষ, মশা<মশক, সরিষা <সর্ষপ। বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম ও ২০ সংখ্যক নিয়মটি একটি সাম্য সৃষ্টি করতে পেরেছে। বিদেশী শব্দের sh এর বেলায় বাংলায় শ এবং st এর বেলায় ‘স্ট’ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলনের ফলে বর্তমানে বানানে একটি সাম্য তৈরি হয়েছে। তবে police শব্দের 'ce` এর উচ্চারণ নিয়ে এখনো জটিলতা রয়েছে প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে। কারণ সাম্প্রতিক দৈহিক পত্রিকাগুলোতে ‘পুলিশ ও ‘পুলিস’ এবং ‘ক্লাস ও ‘ক্লাশ’ বানান দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও একটি প্রবিধি থাকা প্রয়োজন।

বানান-সংস্কারের বিধানগুলো প্রচলিত হওয়ার পূর্বে বাংলা ক্রিয়াপদের বানানে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল দুঃসহ। সংস্কার সমিতির একাদশ নিয়ম সেক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও এখনো পর্যন্ত ক্রিয়াপদের বানানে প্রত্যাশিত স্থিরতা আসেনি। কারণ করি, কোরি, ক’রি, ধরি, ধোরি, ধরি, হব, হবো, হল, হ’ল, হোল, হলো, হোলো এ ধরনের বানান এখনো দেখা যাচ্ছে।

চতুর্দশ নিয়মে বলা হয়েছে ‘বক্র আ (বা বিকৃত এ, cut-এর a) : মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা– অ্যাসিড, হ্যাট। ‘অ্যা’ ধ্বনিটি নিয়ে বাংলায় একটি সমস্যা রয়েছে কারণ বাংলায় ধ্বনিটির জন্য কোন আলাদা বর্ণ নেই। ফলে নানা সময়ে এ্যাসিড, ঢ্যাসিড, অ্যাসিড, অ্যাডিস বানানও দেখা যায়। এ-ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানান সংস্কারের বিধানগুলো সমকালে এবং এখনো পর্যন্ত নানা বিতর্কু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। অনেকেই তাদের বানান রীতিকে গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করেন নি এবং অগ্রহণের কারণও তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন যুক্তিযুক্তভাবেই। তবে একথা সত্য যে, বাংলা বানানের জটিলতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত ঐ বানানরীতিই পরবর্তীকালে বানান সংস্কারের পথকে সহজ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান সংস্কারের একটি প্রধান দুর্বলতা ছিল : তাঁরা প্রচুর পরিমাণে বিকল্প বানানের অবকাশ রেখেছিলেন। যখনই বিকল্পের অবকাশ থাকে সঙ্গে সঙ্গে তার বিচ্যুতিরও সম্ভাবনা থাকে এবং অধিকাংশ সময়ই কোন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর বাংলা বানানের এখনো পর্যন্ত প্রধান সমস্যা অনৈক্য ও সমরূপতার অভাব। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানের নিয়মগুলো বাঙালিকে একদিকে যেমন বানানের ঐক্য ফিরিয়ে এনে সমরূপতা দানের বিষয়ে সচেতনতা প্রদান করেছে পাশাপাশি অনৈক্য ও অসমরূপতা তৈরির স্বীকৃতি দিয়েছে। যা নিয়মের আন্তরিক শক্তি ও স্থিতিকে বিনষ্ট করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি গঠিত হয় কত সালে?
   ক) ১৯৩০   খ) ১৯৩৫   গ) ১৯৪০   ঘ) ১৯৪৫

২। বাংলা বানানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ ঘটে–
   ক) ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর   খ) লেখকদের সচেতনতার মাধ্যমে
   গ) অভিধান সংকলনের প্রয়োজনে   ঘ) ক ও গ-এ বর্ণিত দুটো কারণেই

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত বানানের নিয়ম পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়–
   ক) ১৯৩৬ সালে জানুয়ারি মাসে   খ) ১৯৩৬ সালে মে মাসে
   গ) ১৯৩৫ সালে মার্চ মাসে   ঘ) ১৯৩৬ সালের মে মাসে

৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির প্রভাবশালী সদস্য কে ছিলেন?
   ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   খ) হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
   গ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়   ঘ) বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

৫। কার পরামর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি গঠন করে?
   ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ   খ) ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়
   গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   ঘ) হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

৬। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না– এই নিয়ম অনুসরণ করে নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করুন।
   ক) অর্চ্চনা ----------------.   খ) কার্য্যালয় ----------------.
   গ) মূর্চ্ছা ----------------.   ঘ) সূর্য্য ----------------
   ঙ) অর্জ্জুন ----------------.   চ) কর্ম্ম ----------------.
   ছ) ধর্ম্ম ----------------.   জ) কার্ত্তিক ----------------.
   ঝ) বার্দ্ধক্য ----------------.   ঞ) সর্ব্ব ----------------.

৭। বিদেশী শব্দে St স্থানে সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয় এই নিয়ম অনুসরণ করে নিচের শব্দগুলোর বাংলা প্রতিবর্ণকরণকৃত রূপ লিখুন। যেমন : Stove স্টোভ
   ক) Star   খ) Station
   গ) Photostat   ঘ) Studio
   ঙ) Stationery   চ) Steel
   ছ) Master   জ) Store
   ঝ) Restaurant   ঞ) Stadium
   ট) Student   ঠ) Stove

পাঠ ৪ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বানান রীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গৃহীত বাংলা বানান সংস্কারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পাঠ্য পুস্তকে অনুসরিত বানান রীতির তাৎপর্য লিখতে পারবেন।
- বানানের বিভিন্ন নিয়ম আয়ত্ত করে আপনার লেখায় তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তিত হবার পর তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনা, উত্তাপ-নিরুত্তাপ, পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর বাক্য বিনিময় হয়। দেব প্রসাদ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির সুপারিশকে কোথাও কোথাও মেনে নিয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রমণ করে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান' গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি মূলত বানানের পরিবর্তন-বিরোধি যে মহল ছিল তাদের পক্ষ নিয়েই ঐ গ্রন্থটি রচনা করেন। মণীন্দ্রকুমার ঘোষও তাঁর 'বাংলা বানান' (১৩৮৫-৯৩) গ্রন্থটিতে প্রধানত আলোচনা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বাংলা বানান সংস্কারের নিয়মনীতিগুলোর অন্তর-ক্রটি ধরা পড়েছে। পরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাঙলা বানানবিধি' (১৯৮২) বইটিতে বাংলা বানানের সমতা বিধানের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও তার নিয়মরীতি প্রয়োগ করে দেখিয়েছে যে ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি বানান সমস্যার ক্ষেত্রে একটি সহজ সমাধান হতে পারে। বাংলা বানানের সমস্যা সংকুল এলাকা হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বিজ্ঞাপন ও পোস্টারের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য। তিনি দেখিয়েছেন যে ছাত্র-শিক্ষক লেখকদের অনুসৃত সমান্তরাল বানানের আদর্শ এতোটাই বিভ্রান্তিকর যে সর্বৈব বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে বাংলা বানানের সমতা বিধান ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য কয়েকটি পূর্বশর্তের কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে : প্রথমত, অনুস্বারের সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তাকে উপেক্ষা না করা; তৃতীয়ত, হস্-চিহ্নের ব্যবহার, উর্ধ্বকমার ব্যবহার এবং ও-কারের ব্যবহার অযথা না করা; চতুর্থত, উচ্চারণানুগ বানান যে বাংলায় সর্বত্র অনুসরণ করা সম্ভব নয় এ-সত্যকে স্বীকার করে নেয়া। 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা'(১৩১৪) পবিত্র সরকারের এ গ্রন্থটি পূর্ববর্তী তিনটি বইয়ের মত কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারের নিয়মনীতিগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়। বরং বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে গত পঞ্চাশ বছরে যে সমস্ত সমস্যা ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে তিনি ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়াও বিগত কয়েক বছরে বানান বিষয়ে বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ১. রমেন ভট্টচার্যের 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম'(১৯৯০); ২. মাহবুবুল হকের 'বাংলা বানানের নিয়ম'(১৯৯১); ৩. আনন্দ বাজার পত্রিকার প্রস্তাবিক 'বানানবিধি' ৪. অরুণ সেনের বাঙলা বানান ও বিকল্প বর্জন' (১৯৯১); ৫. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন' (১৯৯১) প্রভৃতি। এ সব গ্রন্থের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় প্রমাণিত হয়, বানানের সমরূপতা এখনো তৈরি হয়নি এবং এখনো তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার অবকাশ রয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

কিন্তু নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা বানানের জটিলতা একটি মারাত্মক হুমকি : তারা এতো বিকল্প, এতো রূপান্তর, এতো বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলা দেখলে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত হতে পারে। এদের কথা বিবেচনা করেই বিদ্যালয় পর্যায়ের সকল পাঠ্য বইয়ে একটি অভিন্ন বানানরীতি প্রচলনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৯৭৪ সালের কুদরাত-ই খোদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে এবং ১৯৭৬ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তকের মনোন্নয়ন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের অন্তরায় দূর করার উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট বানানরীতি প্রণয়ন ও তা অনুসরণ কারা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতাবিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। তাঁরা অভিন্ন বানানের জন্য কিছু নিয়ম সুপারিশ করেন এবং সে সঙ্গে অনেকগুলো যুক্তবর্ণের অন্তর্ভুক্ত বর্ণগুলো স্পষ্টীরূপ মুদ্রণের ক্ষেত্রেও সব জায়গায় সাফল্য পাওয়া যায় নি। এ সকল সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় ১৯৮৮ সালের ২১ থেকে ৩০ অক্টোবর

কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক, সাহিত্যিক সাংবাদিক, ভাষাবিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা প্রশাসককে নিয়ে একটি জাতীয় কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঐ জাতীয় কর্ম শিবিরে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে কিভাবে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতা বিধান করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর কর্মশিবিরে ২৪ দফা নিয়ম সুপারিশ করা হয়। নিচে ১৯৮৮ সালে বানানের সমতা বিধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সুপারিশমালা প্রদান করা হল ঃ

সুপারিশমালা

পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হবে :

১. রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন– কর্ম, কার্য, শর্ত, সূর্য।

২. সন্ধিতে প্রথম পদের পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন, অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্যবর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ লেখা হবে। যেমন, অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার ব্যবহৃত হবে। যেমন– রং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তিযুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলে ঙ হবে। যেমন, বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

৩. হস্‌চিহ্ন ও উর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন– করব, চট, দুজন।

৪. যে শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধানসিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অ-তৎসম ও বিদেশী শব্দের বানানে শুধু হ্রস্ব স্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন– পাখি, বাড়ি, হাতি।

৫. ক্ষ-বিশিষ্ট সকল শব্দে ক্ষ অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন– অক্ষয়, ক্ষেত, পক্ষ।

৬. কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন– গাভী, রাণী, হরিণী, কিঙ্করী, পিশাচী, মানবী।

৭. ভাষা ও জাতির নামের শেষে-ই কার থাকবে। যেমন– ইংরেজি, জাপানি, বাঙালি

৮. বিশেষণবাচক ‘আলি’-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন– বর্ণালি, রূপালি, সোনালি।

৯. পদাশ্রিত নির্দেশক ‘টি’-তে ই-কার হবে। যেমন– লোকটি।

১০. অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন–কি (অব্যয়), কী (সর্বনাম); তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ); নিচ (নিম্ন অর্থে), নীচ (অর্থে); কুল (বংশ অর্থে), কূল (তীর অর্থে)।

১১. বাংলায় প্রচলিতকৃত ঋণ বিদেশী শব্দ বাংলাভাষার ধ্বনি পদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন– কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে :

ক) ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত নিম্নলিখত শব্দে যে, ‘যোয়াদ’ ও ‘যাল’-এর জন্য য (ইংরেজি () ধ্বনির মতো) ব্যবহৃত হবে। যেমন– আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যাকাত, যিকির, যোহর, রমযান, হযরত।

খ) অনুরূপ শব্দে আরবি ‘সোয়াদ’ ও ‘সিন’-এর জন্য স এবং ‘শিন’-এর জন্য শ হবে। যেমন সালাম, মসজিদ, সালাত, এশা।

গ) ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত () ধ্বনির স, () প্রভৃতি ধ্বনির জন্য শ এবং () ধ্বনির জন্য স্ট যুক্তবর্ণ লেখা হবে।

ঘ) ইংরেজি বক্র () ধ্বনির জন্য শব্দের প্রারম্ভে এ ব্যবহার্য। যেমন– এলকহল, এসিড।

ঙ) () ও () শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান। এই নিয়মে খ্রিস্টান হবে।

১২. পূর্ববর্তী নিয়মের (ক) থেকে (ঘ) পর্যন্ত বর্ণিত বিধি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। তা ছাড়াও সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ণত্ব-ষত্ব বিধি অনুসরণ করা হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেবল ণ(যেমন- কাণ্ড, ঘণ্টা এবং ত-বর্গের পূর্বে কেবল ন (যেমন– তন্ত, পান্থ) লেখা হবে। অনুরূপভাবে, শিষধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল শ (যেমন– নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র) ট-বর্টের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল ষ (যেমন– কষ্ট, কাষ্ঠ) এবং ত-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল স (যেমন– অস্ত, আস্থা) ব্যবহৃত হবে।

১৩. পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। যেমন– ক্রমশ, প্রধানত, মূলত।

১৪. ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন– করব, হল ইত্যাদি। এত, মত, কোন প্রভৃতি শব্দে ও-কার আবশ্যক নয়। তবে বর্তমান ও ভবিষ্যত অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন করো, কোরো, বলো, বোলো।

১৫. ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু) ঊ-কার (ূ) ও ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারগুলি বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে। যেমন– শুভ, রূপ, হৃদয়।

১৬. যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে। যেমন– অঙ্ক, সঙ্গে, স্পষ্ট।

১৭. যে সব যুক্তব্যঞ্জন বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে। যেমন– ক্ষ(ক্+ষ), জ্ঞ(জ্+ঞ) হ্ম (হ্+ম), সেগুলির রূপ অক্ষুণ্ন থাকবে। তাছাড়া নন্দনাত্ত্বিক বিচারে ঞ্চ (ঞ্+চ), ঞ্ছ (ঞ্+ছ), ঞ্জ (এ্+জ), ট্ট (ট+ট), ট্র (ট্+র), ত্ত (ত্+ত), থ (ত্+থ), ত্র (ত্+র), ভ্র (ভ্+র), হ্ন (হ্+ণ), হ্ন (হ্+ন), ষ্ণ (ষ্+ণ) ইত্যাদি যুক্তবর্ণের প্রচলিত রূপও অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন গঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

১৮. সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন– জটিলতামূলক, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্থগতভাবে একক হলেও তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন– ষোলকলা। প্রয়োজনবোধে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেওয়া যেতে পারে। যেমন– কিছু-না-কিছু, লজ্জা-শরম, সংগত-পাঠ-নির্ধারণ।

১৯. বিশেষণবাচক পদ(গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন– একজন কত দূর, সুন্দর ছেলে।

২০. নঞর্থক শব্দ পৃথকভাবে বসবে। যেমন– ভয়ে নয়, হয় না, আসেনি, হাতে নেই।

২১. হযরত মুহম্মদ (স)-এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (স), অন্য নবী ও রসুলের নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে (আ), সাহাবিদের নামের রা) এবং বিশিষ্ট মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে (র) লিখতে হবে।

২২. লেখক ও কবি নিজের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবে লেখা হবে।

২৩. বাংলাদেশের টাকার প্রতীকচিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অঙ্কের বইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল-নির্দেশক সংখ্যার পূর্বে টাকার চিহ্ন () ব্যবহার করা হবে।

২৪. পূর্ববর্ণিত নিয়মাবলির বহির্ভূত শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অভিধানগুলিতে প্রদত্ত প্রথম বানান গ্রহণ করা যেতে পারে :

চলন্তিকা : রাজশেখর বসু
ব্যবহারিক শব্দকোষ : কাজী আবদুল ওদুদ
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দু খণ্ড : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
বাঙলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দ সঙ্কলন : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল
পারসো-এরাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি : গোলাম মকসুদ হিলালী।

জাতীয় কর্মশিবিরে গৃহীত বানানের নীতিমালা অনুযায়ী একটি শব্দ তালিকা প্রণয়নের পর তা কর্মশিবিরে উপস্থিত সদস্যদের মহামদের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করার কথাও সুপারিশে বলা হয়েছিল। শব্দ সংকলন করতে গিয়ে চূড়ান্তকারী কমিটি কর্মশিবিরে গৃহীত বানানের নিয়মাবলির কোন কোনটি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করেছেন। যেমন ৪ সংখ্যক নিয়মে বলা হয়েছে, যে সব শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়স্বর অভিধান সিদ্ধ সেখানে শুধু হ্রস্বস্বর প্রযুক্ত হবে। তবে বহুল প্রচলিত কিছু শব্দে এ-কার সিদ্ধ হলেও ঈকার রাখা যেতে পারে। কমিটি প্রচলনের কারণে অন্তরীক্ষ, গাভী, মারী, পল্লী ও শ্রেণী শব্দে দীর্ঘস্বর রাখাই সুবিধাজনক মনে করেছেন। এ বিধি তারা কিছু কৃতঋণ শব্দে ব্যাপকভাবে প্রচলনন থাকায় ঈ-কার গ্রহণ করেছেন। যেমন ঈদ, একাডেমী, নবী, পরী, পীর, ফী(অর্থ), বীমা, লীগ, শহীদ, শাস্ত্রী, স্পীকার প্রভৃতি। কৃতঋণ শব্দ বলেই ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান অনুসরণ না করে তারা ইঞ্জিন, মঞ্জুরী, ঠাণ্ডা, প্রেসিডেন্ট ও লণ্ঠন ব্যবহার করেছেন। অবশ্য যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙ্গে লেখা হয়েছে সেখানে 'ন'-ই রাখা হয়েছে। যেমন সিলিনডার, পেনডুলাম ইত্যাদি।

সুপারিশের ১১ সংখ্যক বানানের নিয়মে বলা হয়েছিল, ইংরেজি বক্র () ধ্বনির জন্য সর্বত্র এ ব্যবহার করতে হবে। এ নিয়মের ফলে () ও () উভয় শব্দেরই বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ কৃত রূপ হয় এণ্ড। এতে উচ্চারণ ও অর্থগ্রহণ দুক্ষেত্রেই

সমস্যা তৈরি হয়। এ-জন্য যে ক্ষেত্রে উচ্চারণে সমস্যা তৈরির সম্ভাবনা থাকবে সেখানে বক্র ()-এর জন্য অ্যা ব্যবহার করেছেন। যেমন– অ্যাকসিডেন্ট, অ্যারেস্ট, অ্যালাউন্স প্রভৃতি।

তবে সে সব শব্দে বক্র ()-এর জন্য বাংলায় ব্যাপকভাবে এপ্রচলিত সে সব শব্দে বিকল্পে এ রাখা হয়েছে। যেমন– একাডেমী, এডভোকেট, এডমিরাল, এভিনিউ, এসিড ইত্যাদি।

শিক্ষাঙ্গণ ও সমরাঙ্গণ প্রভৃতির মত যে সমস্ত শব্দে অন্তে, ‘ন’ ও ‘ণ’ উভয়ই সিদ্ধ সেক্ষেত্রে কমিটি ‘ণ’ ব্যবহারের পক্ষেই মত দিয়েছেন। তা ছাড়া আমাদের হস্তলিপি ও মুদ্রণের গ+ণ ও গ+ন এর যেহেতু ‘গ্ন’-রূপেই দেখা যায় তাই ‘রুগ্ন’ শব্দের বানান যুক্ত বর্ণটি ভেঙে ‘রুগ্ণ’ লেখার পরামর্শ দিয়েছেন।

বানানের ১৪ সংখ্যক নিয়মে বলা হয়েছে ক্রিয়াপদের বানানে ও-কার অপরিহার্য নয়। কিন্তু ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের সামান্য ও তুচ্ছ রূপের পার্থক্য দেখানোর জন্যে এবং অনুজ্ঞা ও প্রযোজক ক্রিয়ার পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য ও-কার অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন– নাচ ও নাচো, পড় ও পড়ো, বল ও বলো। একইভাবে করান ও করানো, খাওয়ান ও খাওয়ানো, দেখান ও দেখানো ও দেখানো, পাঠান ও পাঠানো বানানের ভিন্নতা প্রয়োজনীয়। কমিটি বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয় শব্দেও ও-কার দেওয়ার কথাও বলেছেন। যেমন– কাল ও কালো, কোন ও কোনো, ভাল ও ভালো, মত ও মতো এবং শুধু ‘ত’ দিয়ে নয় হয়তো, নয়তো প্রভৃতি রূপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

বানানের ১৭ সংখ্যক নিয়মে বলা হয়েছিল ক্ষ, জ্ঞ ও হ্ম এ-তিনটি যুক্ত ব্যঞ্জন মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ রূপ বজায় থাকবে। মুদ্রণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবস্থা প্রচলনের কারণে হ্ম-কে তাঁরা হ+ম রাখার প্রস্তাব করেছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বাংলা বানানের সমতা বিধানের ক্ষেত্রে যে সুপারিশ করেছেন তার একটি প্রধান সুবিধা হচ্ছে গৃহীত বানান রীতিতে তাঁরা যতদূর সম্ভব বিকল্প বানান পরিহার করেছেন। শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বানানের অসমরূপতা ও বিশৃঙ্খলা যেমন একটি অন্তরায় তেমনি একটি বানানের একাধিক অভিধান সিদ্ধ বিকল্প রূপও সমানভাবে দায়ী। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যদি অভিন্ন বানান রীতির সঙ্গে শৈশব হতেই পরিচিত করে তোলা যায় তবে ভাষায় দক্ষতা অর্জন তার জন্য সহজ হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সুপারিশ মালায় সে চেষ্টাই প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. পাঠ্যপুস্তকের বানানের সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে?

ক) ১৯৮২ খ) ১৯৮৪

গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৭৬

২. কুদরাত-ই খোদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট কত সালে পেশ করা হয়?

ক. ১৯৭২ খ) ১৯৭৪

গ) ১৯৭৬ ঘ) ১৯৭৮

৩. নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য বানানের জটিলতা কেন হুমকি হিসাবে বিবেচিত হয়?

ক) তারা বানান আয়ত্তের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হতে পারে।

খ) তাদের ভাষিক দক্ষতা অর্জন বিলম্বিত হয়।

গ) তারা মাতৃভাষার আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

ঘ) ওপরের সবগুলোই

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রস্তাবিত বানানের প্রধান সুবিধা হল–

ক) ঐ বানান রীতি আয়ত্ত করা সহজ

খ) ঐ বানান রীতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক

গ) ঐ বানান রীতিতে যতদূর সম্ভব বিকল্প পরিহার করা হয়েছে

ঘ) ঐ বানান রীতি লেখার জন্য সুবিধাজনক

৫. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ—এর বাংলা বইটির মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান রীতির–

ক) বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে খ) অন্তর-ত্রুটি ধরা পড়েছে

গ) সংস্কার সাধিত হয়েছে ঘ) সার্বজনীনতা লাভ হয়েছে।

খ. অশুদ্ধি সংশোধন

১. নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধ রূপ প্রতিটির পাশে রাখা খালি জায়গায় লিখুন।

কার্য	কর্‌ব	ইংরেজি	বাঙালী	জাপানী
লোকটী	হাঁসপাতাল	খ্রিষ্টাব্দ	খ্রিষ্টান	য়্যাসিড
রূপালী	ছালাম	প্রধানতঃ	ক্রমশঃ	রুপ
সংবাদ পত্র	হয় না	করিনি	বিজ্ঞান সম্মত	এ্যাকাডেমী
মূলতঃ	কাগয	রাস্ট্র	জার্মানী	নদি
সোনালী	পাখীটা	চল্‌ব	ধার্য্য	খ্রিস্ট

ইউনিট ১৭

ভূমিকা

মনে করা যাক, একালের মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র কম্পিউটার নিয়ে কোথাও আলোচনা হচ্ছে, আর আপনি সেখানে একজন শ্রোতা। আলোচনা শুনতে শুনতে আপনি খেয়াল করলেন হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার, প্রোগ্রামিং, উইন্ডোজ, ডাটা, কমান্ড, হ্যাং, স্কিপ, ফাইল, ডিরেক্টরি এরকম বেশ কিছু শব্দ তাদের আলোচনায় ঘুরে ফিরে আসছে। আপনি আরো খেয়াল করলেন ঐ শব্দগুলো যারা আলোচনা করছেন তাঁরা যেভাবে এবং যে অর্থে ব্যবহার করছেন তার সঙ্গে আপনি পরিচিত নন। হয়তো আপনি শব্দগুলোর অর্থও দাঁড় করাতে পারছেন কিন্তু আপনার জানা অর্থের সঙ্গে আলোচনাকারীদের অর্থগত কোন মিল হচ্ছে না। না হবারই কথা। যদি আপনি কম্পিউটার সম্পর্কে কোন ধারণা না রাখেন তাহলে ঐ শব্দগুলো বেশ জটিল এবং অর্থহীনও মনে হতে পারে। আসলেই কি শব্দগুলো অর্থহীন। মোটেই নয়। যাদের কম্পিউটার সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা আছে তাদের কাছে কিন্তু ঐ শব্দগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ ধরা পড়ে। আপনিও যদি কম্পিউটার সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণা পোষণ করেন তাহলে আপনার কাছেও আমি যখন শব্দগুলোর কথা বলেছি, তখন খুব একটা অপরিচিত মনে হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, যে শব্দগুলো সাধারণভাবে আমাদের রোজকার কথা-বার্তায় ব্যবহৃত হয় না, বা প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু ঐ বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় শব্দগুলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রায় অনিবার্য। যেমন কম্পিউটার সম্পর্কিত আলোচনায় এসেছে হ্যাং, ডাটা, স্কিপ, ফাইল ইত্যাদি শব্দ তেমনি হয়তো অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় চাহিদা, যোগান, বাজার, মুদ্রা এসব শব্দ ঘুরে ফিরে আসবে। অনেক সময় দেখা যায়, এই বিশেষ শব্দগুলোর ব্যবহার না করে ঐ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করাই যাচ্ছে না। তাই এ ধরনের শব্দগুলোকে বলা হয় চাবি শব্দ (Key word) যেগুলোর একটি ছাড়া অন্য কোন অর্থ বা তাৎপর্য নেই। একটু খানি এগিয়ে অনেকটা সংজ্ঞার মত করে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট ও অদ্ব্যর্থ তাৎপর্য জ্ঞাপনকারী শব্দই হচ্ছে ঐ বিশেষ জ্ঞানের পরিভাষা। হার্ডওয়্যার, সফট্‌ওয়্যার, ডাটাবেজ, হ্যাং এগুলো যেমন কম্পিউটার বিজ্ঞানের পরিভাষা তেমনি বাজার, যোগান, চাহিদা, মুদ্রা এগুলো অর্থনীতির পরিভাষা। আর পরিভাষাগুলো যেহেতু এক একটি শব্দ (যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়) সেজন্য আমরা সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দও বলতে পারি। আসুন এবারে আমরা পরিভাষা নিয়ে খানিকটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- ♦ পরিভাষা বলতে কি বুঝায় এবং বাংলা পরিভাষার ইতিহাস বলতে পারবেন।
- ♦ পারিভাষিক শব্দগুলো চিনতে পারবেন।
- ♦ কিভাবে পরিভাষা সৃষ্টি হয় তা জানতে পারবেন।
- ♦ পরিভাষা সৃষ্টির নীতিমালা বলতে পারবেন।
- ♦ পরিভাষা কিভাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ ১ ঃ পরিভাষার সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ♦ পরিভাষার একটি সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ♦ পারিভাষিক শব্দ চিনতে পারবেন।
- ♦ পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কাকে বলে পরিভাষা

আলোচনার শুরুতেই আমাদের জানা দরকার পরিভাষা কাকে বলে? আসল বিষয়টি বুঝবার জন্য আমরা প্রথমে দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির দেয়া দুটো সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত হই এবং সেখান থেকে নিজেদের মত করে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করি।

ক) "অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গ বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা স্থানীয়। সাধারণত: 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন বিজ্ঞানীদের আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।" {রাজ শেখর বসু : বাংলা পরিভাষা]

খ) "ইংরেজিতে কথাটি যা বোঝায় তা হচ্ছে- A word (=ferm) connected with methods or objects used by experts in science, technology or arts by way of abberviation, অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যা, চারু ও কারুকলা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ব্যবহৃত বস্তু অথবা তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতির সহিত সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত শব্দ। উদাহরণ স্বরূপ লাতিন 'Alma-mater কথার উল্লেখ করা যায়। এর মৌলিক অর্থ 'সদাশয় জননী' হলেও, বর্তমানে এতে যা বোঝায় তা হচ্ছে। ছাত্রদের সেই বিদ্যালয় যাতে তারা শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়েছে।' মূলের সঙ্গে Technical Term-এর কোন প্রকারের সম্বন্ধ থাকা প্রত্যাশিত হলেও, তার সাথে কোন সম্বন্ধ না থাকলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।' [এনামুল হক :]

এবার আসুন আমরা ঐ দু'জন খ্যাতনামা পন্ডিতের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা থেকে নিজেদের মতো করে 'পরিভাষা'কে বুঝে নিই। 'পরিভাষা' শব্দটি আসলে ইংরেজি 'defination' শব্দের বাংলা অনুবাদ। এর কাছাকাছি আরেকটি শব্দ আমরা জানি technical term`-যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'পারিভাষিক শব্দ'। আজকাল 'পরিভাষা' ও 'পরিভাষিক শব্দ- প্রায় একই অর্থ বুঝিয়ে থাকে; যদিও 'পরিভাষা' এই বিশেষ্যবাচক শব্দটির বিশেষণ হচ্ছে 'পারিভাষিক' "পরিভাষা শব্দটি এদেশে ইংরেজ আসার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল সংজ্ঞা বাচক বিশেষ অর্থে। 'বাচস্পত্য' অভিধান অনুসারে 'পরিভাষা' শব্দের অর্থ হল 'শাস্ত্রাকারে সংজ্ঞা বিশেষ'। এ ছাড়া অন্য প্রাচীন অভিধানগুলোতেও শব্দটির যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তার মূল কথা হল, অর্থান্তর নেই এমন বিশেষ অর্থবোধক সংজ্ঞার নাম পরিভাষা"। **বস্তুত পরিভাষা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহৃত এমন কিছু শব্দ যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ বিশেষ ধারণাকে যথার্থভাবে, নির্ভুলভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করে। পণ্ডিতেরা একমত হয়ে একটি বিশেষ ধারণার (Concept) জন্য একটি বিশেষ শব্দকে বেঁধে দেন যে শব্দটি সংশয়হীনভাবে কেবল ঐ বেঁধে দেওয়া অর্থকেই বোঝাবে অন্য কোন অর্থ বোঝাবে না**। পরিভাষা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের কাছে হাতিয়ার স্বরূপ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক কথাকে ঠিকমত বোঝানো; ইংরেজিতে যাকে বলে hitting the nail on the head সাধারণ শব্দের সঙ্গে পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য এখানেই। সাধারণ প্রয়োগে একই শব্দ দিয়ে একাধিক ভাব প্রকাশ করা যায় আবার একাধিক শব্দ দিয়েও একটিমাত্র ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন- 'মাথা' শব্দটি দিয়ে বোঝানো যায় গ্রামের মাথা, রাস্তার মাথা, চৌমাথা, দলের মাথা, মাথা খাওয়া, মাথা ধরা ইত্যাদি। এখানে 'মাথা' এই শব্দটি নানা অর্থে নানানভাবে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার প্রেম, ভালবাসা, সম্প্রীতি, সখ্য, হৃদ্যতা, প্রণয়, আন্তরিকতা শব্দগুলো প্রায় একই রকম ভাব বোঝানোর (শব্দগুলোর মধ্যে যে সূক্ষ্ম অর্থগত পার্থক্য আছে তা যদি বিবেচনা না করি) জন্য এগুলো শব্দের যে কোন একটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু পরিভাষার ক্ষেত্রে ঐ দুটো শব্দের মত কোনটিই হবার উপায় নেই– একটি 'পরিভাষা' বা পারিভাষিক শব্দ একাধিক অর্থে যেমন ব্যবহৃত হতে পারবে না, তেমনি একাধিক ভাব নির্দেশের জন্য একই পরিবাষা ব্যবহৃত হতে পারবে না। যেমন 'সমাস' বললে পরস্পর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট একাধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। কিংবা 'কারক' বললে বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য শব্দের কোন না কোন প্রকাশের সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। তাই 'সমাস' বা 'কারক' বাংলা ব্যাকরণ শাস্ত্রের দুটি পারিভাষিক শব্দ। তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ব্যবহৃত হয় অসংখ্য পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ।

মনে রাখবেন

পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ

- সংক্ষেপে কোন বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করে;

- পণ্ডিতগণের সম্মতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত;
- একটি মাত্র ভাবকেই কেবল প্রকাশ করে;
- একাধিক ভাবকে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় না;
- মূলের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হলেও তার প্রযুক্ত অর্থই শব্দটির যথার্থ পারিভাষিক অর্থ।

কিভাবে চিনবেন পারিভাষিক শব্দ

আজকাল আমরা জেনেই হোক আর না জেনেই হোক পদে পদে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসব পারিভাষিক শব্দ আপনি চিনবেন কি করে? একটু আগেই আমরা বলেছি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই রয়েছে কিছু নিজস্ব পারিভাষিক শব্দ। যে শব্দগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কথাবার্তায় তেমন প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু ঐ বিশেষ জ্ঞানের আলোচনায় শব্দটি যদি অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাহলেই বুঝতে হবে শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। মনে করুন আপনি সমাস সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি 'পূর্বপদ', 'পরপদ, সমস্যমান পদ, ব্যাস বাক্য এসব শব্দের সাহায্য ছাড়া আপনি আলোচনাই করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি ধরে নেবেন ঐ শব্দগুলো পারিভাষিক শব্দ।

সব সময় পারিভাষিক শব্দ আবার এতো সহজে চেনা যায় না। কারণ পারিভাষিক শব্দটির বহুল ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা। উকির, মোক্তার, আবাসিক, অনাবাসিক এগুলো যে পারিভাষিক শব্দ তা আজ আর আমাদের মনেই হয় না। একারণে পারিভাষিক শব্দ চেনার জন্য আমাদের প্রয়োজন খানিকটা অতিরিক্ত সতর্কতা। যখনই কোন পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হবেন, শব্দটি একাধিকবার আবৃত্তি করে মনে গেঁথে নিন, প্রয়োজনে একটি নোট খাতায় আপনার পরিচিত পারিভাষিক শব্দগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

পরিভাষা কেন প্রয়োজন

এক একটি পরিভাষার সঙ্গে বিশেষ ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্মৃতি ধারণা-বোধ মিশে থাকে। সে সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা। নাইট্রোজেন চক্র, শীতনিদ্রা, অভিযোজন, ক্ষমতা, নিরক্ষীয় বায়ু, মরাকাটাল এ পারিভাষিক শব্দগুলো যেমন বিশেষ বিশেষ জ্ঞান জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত তেমনি প্রতিটি শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের অনুভূতি। ফলে রসায়ন (এটি একটি পারিভাষিক শব্দ) সম্পর্কিত আলোচনায় শীত নিদ্রা ও অভিযোজন ক্ষমতা, ভূগোল (এটি একটি পারিভাষিক শব্দ) সম্পর্কিত আলোচনার বেলাতেই নিরক্ষীয় বায়ু ও মরাকাটাল শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। ফলে ঐ পারিভাষিক শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত মানুষের মনে জড়িয়ে থাকে বিশেষ ধরনের অনুভূতি যার ফলে বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলো বাণিজ্যের আলোচনায় কিংবা ভূগোলের পরিভাষাগুলো রসায়নের আলোচনায় অচল। যেহেতু পরিভাষাগুলোর সঙ্গে মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে তাই বিশেষ জ্ঞানের আলোচনায় ঐ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিভাষা অবশ্যই প্রয়োজন। যার সাহায্যে সহজেই বক্তব্যের মূল কথা পাঠকের বা শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করে দেয়া যায়। এজন্য রাজশেখর বসু বলেছেন, পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত না করলে বিজ্ঞানী তার বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না। মোট কথা পরিভাষা ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা প্রায় অসম্ভব। পরিভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক-পাঠক বা বক্তা-শ্রোতার মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া পরিভাষা ব্যবহারের ফলে তত্ত্বমূলক রচনার প্রকাশভঙ্গি শক্তিশালী ও সংহত হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পরিভাষার সংজ্ঞা দিন।

২. পারিভাষিক শব্দ কিভাবে চেনা যায়?

৩. পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গে দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

৫. ভূগোলের সঙ্গে সম্পর্কিত দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- বাংলা পরিভাষা রচনার ইতিহাস জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত হবেন
- পরিভাষা তৈরির নিয়মাবলি লিখতে পারবেন।
- পরিভাষা তৈরির পদ্ধতির পরিচয় দিতে পারবেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে যখন প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই সৃষ্টি হয় পরিভাষার। ঐ যে একটি কথা বলা হয় যে, প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী– একথাটি যেন পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরো বেশী সত্যি বলে মনে হয়। যে দেশ বা জাতি নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যত বেশী নিবেদিত তাদের জন্য পরিভাষার প্রয়োজন তত বেশী এবং তারা তৈরি করেন বা করতে বাধ্য হন নতুন সব শব্দ। বিগত দুশো বছরে দেশী ও বিদেশী প্রশাসক, সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞদের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠেছে বাংলা পরিভাষা এবং এখনো সে চেষ্টা শেষ হয়নি। এদেশে প্রথমে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয় মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গপ্রদেশে। শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা এদেশে চালু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। ইংরেজি ভাষায় রচিত বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই অনুবাদকেরা অনুভব করেন পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা। এজন্য বলা যায়, আইন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলা পরিভাষা চর্চার সূত্রপাত ঘটে। ১৭৮৪ সালে জনাথান ডানকান 'মপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম' বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে ছেপে প্রকাশ করেন। ডানকানের পর এডমন স্টোন, ফরস্টার, উইলিয়াম কেরী প্রমুখের অনুবাদের মাধ্যমে বৃটিশ ইংরেজি আইন বাংলায় রূপান্তর ঘটে। এই সকল বিদেশীদের প্রয়োজনের হাত ধরেই বাংলা ভাষায় আইনের আলোচনায় পরিচিত হয়ে ওঠে হাকিম, আদালত, ইজারা, জজ, গয়রহ, তহশীল, তহশীলদার প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজ অনুবাদকদের হাতে সৃষ্ট ঐ সব পারিভাষিক শব্দ এখন বাংলা ভাষার প্রায় নিত্য পরিচিত শব্দে পরিণত হয়েছে।

এখন আমরা 'গভর্ণর বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ তাবৎ আইন'(১৭৯৩) নামে ফরস্টার কৃত একটি আইনের বাংলা অনুবাদ উপস্থিত করছি। এই আইনটির মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এমন পারিভাষিক শব্দগুলো আপনারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন; তবে মনে রাখবেন এখানে যে গদ্যের সঙ্গে আপনারা পরিচিত হবেন তা প্রায় দুশো বছরের পুরনো বলে তা আপনাদের কাছে একটু খটোমটো, কোথাও বা গদ্য অশুদ্ধ বলে মনে হতে পারে– আপনার ও সব দেখার দরকার নেই। আপনি নমুনা লক্ষ করুন :

"হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষত: সুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতয়ের ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাষী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালের তাহাই নির্দিষ্ট করেন কিন্তু এমন সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যাধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।"

কি খুঁজে বের করতে পেরেছেন এখানে কি কি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? নিশ্চয়ই পেরেছেন। তবুও আমার সঙ্গে একটু মিলিয়ে নিন। এখানে যে সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল– হাকীম, মফস্বলী তালুকদার, প্রজা, জমিদার, হুজুরী তালুকদার, মোকররী জমা ও ওজর।

আইনের অনুবাদের মাধ্যমে পরিভাষা তৈরির যে সূচনা ঘটে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় তার পরবর্তী পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়। বাংলায় বিজ্ঞান পুস্তক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবীদার ফেলিকস্ কেরী। তিনি বাংলাতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার খানিকটা বাংলা অনুবাদ করেছিলেন 'বিদ্যাহারাবলি' নাম দিয়ে। তাঁর অপর মূল্যবান গ্রন্থ 'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা' প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালে। ঐ বইতে তিনি যে সকল পরিভাষা তৈরি করেছিলেন সেগুলো এখনো আমরা ব্যবহার করছি। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

Anatomy – ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা	Solid – ঘন
Muscle – মাংস পেশী	Surgery – অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা
Nerve – নাড়ী	Vein –শিরা।

ফেলিকস কেরীর পর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অন্য যাদের অবদান রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন জন ম্যাক, পীটার বৃটন, পীয়ারসন প্রমুখ।

বাঙালিদের মধ্যে যিনি বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা তৈরিতে মনোযোগী হন তিনি অক্ষয় কুমার দত্ত। উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের তিনিই একমাত্র বিজ্ঞান মনস্ক সাহিত্যিক। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক যে চারটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলো হচ্ছে : ১) ভূগোল (১৮৪১); ২। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয়ভাগ ১৮৫৯); পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)। এসব বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি তৈরি করেন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ। তাঁর সৃষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের নমুনা এখানে দেওয়া হল ঃ

Magnet – চুম্বক	Compass – দিগ্‌দর্শন
Solid – কঠিন	Biology – প্রাণিবিদ্যা
Microscope –অনুবীক্ষণ যন্ত্র	Botany –উদ্ভিদ বিদ্যা
Telescope –দূরবীক্ষণ যন্ত্র	Southpole –কুমেরু
Astrology – জ্যোতিষ	North pole –সুমেরু

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অধিকাংশই পরবর্তীকালে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে– আজো ব্যবহৃত হচ্ছে।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্ররায়, বি.এন.শীল, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে বাংলা পরিভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা।

শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই নয় প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়েও বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যোগ্য নেতৃত্বে একদল কৃতবিদ্য বাঙালি সম্মিলিতভাবে পরিভাষা তৈরির যে চেষ্টা করেছিলেন তা দীর্ঘ ৪২ বৎসর যাবত (১৮৯৪-১৯৩৫) পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের শেষ দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি গঠনে করে (১৯৩৪) বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে খণ্ডে খণ্ডে তা প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাজনের পর পশ্চিম বঙ্গ সরকার গঠন করে পরিভাষা সংসদ (১৯৪৮)। সংসদ বিভিন্ন ধরনের পরিভাষা নির্মাণের আত্মনিয়োগ করে। অন্যদিকে পূর্ববাংলার ভাষা কমিটি (১৯৪৮),

বাংলা একাডেমী (১৯৫৭), কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৬৩), সরকারী শিক্ষা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বাংলা পরিভাষা বহুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটিও (১৯৭৪) বাংলা পরিভাষা তৈরিতে বড় রকমের ভূমিকা রেখেছেন।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন পরিভাষা তৈরি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ ঘটছে নতুন নতুন শব্দের আর আমরা পরিচিত হচ্ছি সে সব শব্দের সঙ্গে ফলে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে শব্দটির একটি বাংলা পরিভাষার। যখনই প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তখনই হয়তো আমরা তৈরি করছি বা করতে বাধ্য হচ্ছিল নতুন একটি পরিভাষা। সঙ্গে সঙ্গে যোগ হচ্ছে আমাদের ভাষায় একটি নতুন শব্দ এবং সবার অজান্তেই ভাষা হয়ে উঠে সমৃদ্ধ।

মনে রাখবেন

বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রথম উদ্যোক্তা হিসাবে জনাথান ডানকানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আইনের অনুবাদের পর বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবীদার ফেলিকস্ কেরী। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে অক্ষয়কুমার দত্ত অগ্রগণ্য। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঐ চারটি বইতে তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তা আমরা এখনও সাদরে গ্রহণ ও ব্যবহার করে থাকি। অক্ষয়কুমার দত্তের পর ব্যক্তিগতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন প্রয়োজনে অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিভাষা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছে সেগুলো হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী প্রভৃতি।

পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি

নিয়ম

যে কোন পারিভাষিক শব্দেরই থাকতে হয় চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। সেগুলো হচ্ছে : সর্বজনস্বীকৃতি, স্বাভাবিকতা, বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ, আড়ষ্টহীনতা। কিন্তু এই সব গুণ সম্পন্ন শব্দ তৈরি করতে হলে, যিনি পরিভাষা তৈরি করবেন, তাঁকে অবশ্যই মেনে নিতে হয় ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো। তা ছাড়া ভাষাবিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কেও পরিভাষা সৃষ্টিকারীর থাকতে হয় পরিষ্কার ধারণা। এই ধারণার সাহায্যেই তিনি নির্বাচন করবেন এমন শব্দ যা সহজেই সমাজে গৃহীত হবে। দুরূহ ও দুরুচ্চার্য শব্দে পরিভাষা তৈরি হলে তা জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয় না। তাছাড়া, আমরা আগেই বলেছি (পাঠ ১) যে শব্দটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে তার থাকবে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবন্ধ অর্থ এবং স্পষ্ট তাৎপর্য। প্রত্যেকটি শব্দই একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে তাকে দ্বিতীয় কোন অর্থে প্রয়োগ করা যাবে না।

পদ্ধতি

যে কোন ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি তিনটি হল : ঋণ, ঋণ-অনুবাদ ও নির্মাণ। আসুন আমরা ঐ তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি।

১। ঋণ

পৃথিবীর সকল ঋণেই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; একমাত্র ভাষার ঋণে মানুষ ধনী ও সমৃদ্ধ হয়। যে ভাষায় যতো বেশী ঋণকৃত শব্দ আছে সেভাষা ততো সমৃদ্ধ। বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানে অন্য সকলের মত বাঙালিরও সমান অধিকার আছে। তাই যে ভাষা থেকে আমরা জ্ঞান আহরণ করবো তার শব্দ, ভাব, প্রেরণা আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোন দ্বিধা থাকা

উচিত নয়। উগ্র স্বাদেশিকতা দ্বারা তাড়িত হয়ে হাইড্রো অক্সাইডকে ‘অম্লজানমূলক উদ্বায়ীগ্যাস’, টেলিফোনকে ‘দূরালাপনী’, বুনসেন বার্নারকে ‘পিনাল-দাহক’, ইনকেজশনকে ‘সূচিকাভরণ’ না লেখাই সঙ্গত। আজকাল আমরা সবাই লোডশেডিং, চ্যারিটি বা ওয়ার্মআপ ম্যাচ, বাস, স্টেশন, অক্সিজেন এসব পারিভাষিক শব্দ অপরিবর্তীত ভাবেই গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ এসব শব্দ অমরা ঋণ করে বাংলা ভাষায় নিয়ে এসেছি এবং ঋণ শোধ না করলেও কেউ কখনো তাগাদা দিতে আসবে না; বরং বাংলা ভাষাকে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ করবে।

২। ঋণ-অনুবাদ

পুরনো, ভুলে যাওয়া কোন বাংলা শব্দকে তুলে এনে নতুন অর্থে ব্যবহার করেও পরিভাষা তৈরি করা যায়। শব্দের আগের অর্থটা জানা থাকলে বা বহাল থাকলেও ধীরে ধীরে নতুন অর্থটাই সবার কাছে পরিচিতি পেয়ে, নতুন অর্থ ধারণ করে ফেলে। ঋণ-অনুবাদ হতে পারে দু’ধরনের। সংস্কৃত বা দেশী এমন অনেক শব্দ পাওয়া যাবে যেগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ একটিই কিন্তু শব্দ অনেক। এ ধরনের শব্দগুলোর ভেতর থেকে একটি বেছে নিয়ে আমরা নতুন অর্থে প্রয়োগ করে গড়ে তুলতে পারি একটি পরিভাষা। ‘বিজ্ঞান’, ইতিহাস, পদার্থ প্রভৃতি শব্দ এমন ধরনের ঋণ অনুবাদের উদাহরণ। বিজ্ঞান শব্দটি বুঝাতো বিশেষ জ্ঞান- তা সে যে কোন জ্ঞানকেই বুঝাতো কিন্তু এখন পরিভাষা হিসাবে আমরা বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করছি।

৩। নির্মাণ

শব্দ নির্মাণের মত পরিভাষা নির্মাণের বেলাতেও ভাষার মূল প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী থেকে উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ হতে গৃহীত পরিভাষা যেমন ‘দ্রাঘিমা’, বিষুবরেখা’, ল.সা.গু (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক), গ.সা.গু (গরিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক) ইত্যাদি শব্দ পরিভাষা হিসাবে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলা পরিভাষার রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. বাংলা পরিভাষা তৈরির নিয়মগুলো লিখুন।
৩. পরিভাষা তৈরির পদ্ধতির পরিচয় দিন।
৪. আইন সম্পর্কিত দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।
৫. বিজ্ঞান বিষয়ক দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।
৬. আপনার জানা যে কোন দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পরিভাষা বলতে কি বোঝেন? জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনায় পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা কি?

২. পরিভাষা কিভাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে?

৩. আপনি প্রায়ই ব্যবহার করেন এমন কিছু পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা তৈরির করুন।

৪. টীকা লিখুন

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, অক্ষয়কুমার দত্ত, ফেলিকস্ কেরী, বাংলা একাডেমী।

পরিশিষ্ট - ১

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার বাংলা নাম

১.	President`s Secretariat অধিদপ্তর/পরিদপ্তর Bureau of Anti-corruption স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা Elcetion Commission Parliament Secretariat	১.	রাষ্ট্রপতির সচিবালয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ সচিবালয়
২.	Prime Minister`s Secretariat	২.	প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়
৩.	Ministry of Defence স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা Bangladesh Meteorological Department Inter-Service Public Relations Directorate	৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আন্ত:বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর।
৪.	Ministry of Communications স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা Bangladesh Road Transport Corporation	৪.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
৫.	Ministry of Post and Tele-Communication	৫.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
৬.	Ministry of Ports, Shipping and Inland Woter Transport	৬.	বন্দর, সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়
৭.	Ministry of Education স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা National Curriculum and Text Book Board.	৭.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৮.	Ministry of Agriculture	৮.	কৃষি মন্ত্রণালয়
৯.	Ministry of Fisheries and Livestock.	৯.	মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়
১০.	Ministry of Irrigation, Water Development and Flood Control.	১০.	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়
১১.	Ministry of Finance	১১.	অর্থ মন্ত্রণালয়
১২.	Ministry of Planning	১২.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৩.	Ministry of Energy and Mineral Resources Bangladesh Power Development Board.	১৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

	Rulal Electrification Board.		বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
১৪.	Ministry of Extablishment	১৪.	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
১৫.	Ministry of Foreign Affairs	১৫.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৬.	Ministry of Food	১৬.	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৭.	Ministry of Relief and Rehabilitation	১৭.	ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়
১৮.	Ministry of Health and Family Planning	১৮.	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৯.	Ministry of Home Affairs	১৯.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০.	Ministry of Commerce	২০.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২১.	Ministry of Industries	২১.	শিল্প মন্ত্রণালয়
২২.	Ministry of Jute	২২.	পাট মন্ত্রণালয়
২৩.	Ministry of Textiles	২৩.	বস্ত্র মন্ত্রণালয়
২৪.	Ministry of Information	২৪.	তথ্য মন্ত্রণালয়
২৫.	Ministry of Labour and Manpower	২৫.	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
২৬.	Ministry of Law and Justice	২৬.	আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়
২৭.	Ministry of Works	২৭.	পূর্ত মন্ত্রণালয়
২৮.	Ministry of Local Government Rural Development and Co-operatives.	২৮.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২৯.	Ministry of Social Welfare and Women`s Affairs	২৯.	সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩০.	Ministry of Youth and Sports	৩০.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩১.	Ministry of Land	৩১.	ভূমি মন্ত্রণালয়
৩২.	Ministry of Religious Affairs.	৩২.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-২

বহুল ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

A

Abandoned property — পরিত্যক্ত সম্পত্তি
Absconder — ফেরারী
Absorption — আত্মীকরণ
Account — হিসাব
Accounts Officer — হিসাব রক্ষণ অফিসার
Accused — আসামী
Acquired — হুকুমদখলকৃত/অধিগৃহীত
Ad hoc appointment — অড্হক নিয়োগ

Administration	প্রশাসন
Administrator	প্রশাসক
Adult Franchise	প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার
Advertisement	বিজ্ঞাপন
Advice	পরামর্শ/উপদেশ
Adviser	উপদেষ্টা
Agenda	আলোচ্যসূচী
Allocate	বরাদ্দ করা
Allocation	বরাদ্দ
Allotment	বরাদ্দ
Allowance	ভাতা
Annexure	সংযুক্তি
Annual Confidential Report(ACR)	বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট
Applicant	আবেদনকারী
Arrears	বকেয়া
Attestation	সত্যায়ন
Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত

B

Baggage	মালপত্র
Bail	জামিন
Ballot	ভোট
Bank draft	ব্যাংক ড্রাফট
Bankrupt	দেউলিয়া
Basic Education	বুনিয়াদি শিক্ষা
Basic pay	মূল বেতন
Biased	পক্ষপাত দুষ্ট
Black list	কালো তালিকা
Body search	দেহতল্লাসী
Bond	মুচলেকা
Book-post	খোলা-ডাক
Budget allotment	বাজেট বরাদ্দ
Bureaucracy	আমলাতন্ত্র
By-election	উপ-নির্বাচন

C

Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ
Calendar	বর্ষপঞ্জি
Cancel	বাতিল করা

Care of (C/O)	প্রযত্নে
Cash	নগদ
Cash-memo	ক্যাশ-মেমো
Casual leave	নৈমিত্তিক ছুটি
Certificate	প্রত্যয়ন/প্রমাণপত্র/সনদপত্র
Certified	প্রত্যয়িত
Chalan	চালান
Chief Guest	প্রধান অতিথি
Circular	পরিপত্র
Citizen	নাগরিক
Civil action	দেওয়ানী মামলা
Civilsuit	দেওয়ানী মামলা
Civil Court	দেওয়ানী আদালত
Client	মক্কেল
Compulsory	বাধ্যতামূলক
Complimentary Copy	সৌজন্য সংখ্যা
Compromise	আপস

D

Daily Balance	দৈনিক জের
Debit Balance	খরচের জের
Defence	প্রতিরক্ষা
Defendant	বিবাদী
Deputation	প্রেষণ
Discrepancy	গরমিল
Discrimination	বৈষম্যমূলক
Dispensary	ঔষধালয়
Dock worker	ডক শ্রমিক
Duty	শুল্ক

E

Earnest money	জামানত
Eid advance	ঈদ অগ্রিম
Employment	কর্মসংস্থান/চাকুরি
Enclosure	সংলগ্নী
Enquiry	তদন্ত
Enquiry Commission	তদন্ত কমিশন
Excise	আবগারী
Excise duty	আবগারী শুল্ক

Export promotion রপ্তানী উন্নয়ন

F

Factories কলকারখানা
Field worker মাঠকর্মী
Final report চূড়ান্ত প্রতিবেদন
Financial year অর্থ বছর
Fire Service দমকল বাহিনী
Firm খামার/বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান
Foreign aid বৈদেশিক সাহায্য
Freight মাশুল

G

Gist সারমর্ম
Good conduct শিষ্টাচার
Govt. Security সরকারি ঋণপত্র
Grant অনুদান/মঞ্জুরি
Growth প্রবৃদ্ধি

H

HandCoome Board তাঁত বোর্ড
House Search গৃহ তল্লাশি
House building advance গৃহ নির্মাণ ঋণ
Housing and Settlement গৃহ সংস্থা

I

Immigration বহির্গমন
Implementation বাস্তবায়ন
In-charge ভারপ্রাপ্ত
Incidental আনুষঙ্গিক
Income tax আয়কর
Inspector পরিদর্শক
Inspector-General মহা-পরিদর্শক
Investment বিনিয়োগ

J

Joint collaboration যৌথ সহযোগিতা
Joint venture যৌথ উদ্যোগ
Junior কনিষ্ঠ
Jute goods পাটজাত দ্রব্য
Jute mill চটকল

L	
Labour court	শ্রম আদালত
Land Record	ভূমি রেকর্ড
Land revenue	জমির খাজনা/খাজনা
Land tax	জমির খাজনা/খাজনা
Liabilities	দায়-দায়িত্ব
Livestock	পশুপালন
Look after	দেখাশুনা করা
M	
Magistrate	হাকিম
Management	ব্যবস্থাপনা
Manpower employment	জনশক্তি কর্মসংস্থান
Marginal	প্রান্তিক
Manketing	বিপণন
Mass Communication	গণ যোগাযোগ
Mercantile Marine	নৌ-বাণিজ্য
Metropolitan Magistrate	মহানগর হাকিম
Metropolitan Police	মহানগর পুলিশ
Minimum Wage	নিম্নতম মজুরী
N	
Nationality Certificate	জাতীয়তাপত্র
News commentary	সংবাদভাষ্য
Notice	নোটিশ
Notification	প্রজ্ঞাপন
Nuclear	পারমাণবিক
O	
Office	দপ্তর
Official	দাপ্তরিক
On duty	কর্তব্যরত
Opening balance	ইজা
Ordinance	অধ্যাদেশ
Organization	সংগঠন
P	
Passport	পাসপোর্ট
Pay Fixation	বেতন নির্ধারণ
Pay increase	বেতন বৃদ্ধি
Permanent	স্থায়ী
Plaintiff	বাদী

Postage	ডাকমাশুল
Prescription	ব্যবস্থাপত্র
Printing	মুদ্রণ
Probation	শিক্ষানবিসী
Promotion	পদোন্নতি
Provisional	সাময়িক
Public Health	জনস্বাস্থ্য
Public holiday	সাধারণ ছুটি
R	
Recruitment	নবনিয়োগ
Regulation	প্রবিধান
Remark	মন্তব্য
Residence	বাসা
Residential	আবাসিক
Revenue	রাজস্ব
Rural Development	পল্লী উন্নয়ন
Rural Electrification	পল্লী বিদ্যুতায়ন
S	
Sale tax	বিক্রয় কর
Search warrant	তল্লাসী পরোয়ানা
Selection Committee	বাছাই কমিটি
Social Service	সমাজ সেবা
Standing Committee	স্থায়ী কমিটি
Steering Committee	পরিচালনা কমিটি
Summary	সার সংক্ষেপ
Supplement	ক্রোড়পত্র
Survey	জরিপ
T	
Tariff	অভিশুল্ক
Technology	প্রযুক্তি
Telegraph	তার
Town Development	শহর উন্নয়ন
Traffic jam	যানজট
Transport	যানবাহন/পরিবহণ
U	
Undertaking	অঙ্গীকার
Uniform	উর্দি
Urban Development	নগর উন্নয়ন
W	
Water Transport	নৌ পরিবহণ
Wealth	সম্পদ
Weather	আবহাওয়া